ٱلْمُهَذَّبُ مِنْ مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ গ্রন্থের অনুবাদ

আল্লাহওয়ালা হওয়ার সার্বিক দিকনির্দেশনা

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম

পরিমার্জন : শাইখ সালিহ আহমাদ শামি

বায়ান

اَلْمُهَذَّبُ مِنْ مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ গ্রন্থের অনুবাদ

মাদারিজুস সালিকীন

আল্লাহওয়ালা হওয়ার সার্বিক দিকনির্দেশনা

اَلْمُهَذَّبُ مِنْ مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ গ্রন্থের অনুবাদ

মাদারিজুস সালিকীন

আল্লাহওয়ালা হওয়ার সার্বিক দিকনির্দেশনা

মূল

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله

পরিমার্জন : শাইখ সালিহ আহমাদ শামি

অনুবাদ : মাওলানা আমাদ আফরোজ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ. اَللّٰهُمَّ مَا أَمْسٰى بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। প্রতিটি নেককাজ কেবল তাঁরই দয়া, অনুগ্রহ ও করুণায় সম্পন্ন হয়। তাঁর দয়া ও দান ছাড়া কেউ একবার তাসবীহ পাঠেরও সক্ষমতা রাখে না। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসে মানুষ কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী।

প্রিয় পাঠক, আপনি এখন যে বইটি অধ্যয়ন করছেন তা হলো : اَلْمُهَذَّبُ مِنْ مَّدَارِجِ السَّالِكِيْنَ بَيْنَ مَنَازِلِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ গ্রন্থের অনুবাদ। মূলগ্রন্থ 'মাদারিজুস সালিকীন'-এর রচয়িতা হলেন সপ্তম শতাব্দির বিখ্যাত আলিম ও দার্শনিক ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله। তার নাম শোনেননি এমন মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ৬৯১ হিজরিতে সিরিয়ার দিমাশক শহরে। জীবনের পুরা সময় তিনি দিমাশকেই অতিবাহিত করেছেন। তার জীবনাবসানও হয়েছে সেখানেই। ৭৫১ হিজরিতে মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি ছিলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা رحمه الله-এর সুযোগ্য শাগরিদ। তার পিতাও ছিলেন তখনকার অনেক বড়ো একজন আলিম; যিনি দিমাশকের আল-মাদরাসাতুল জাওযিয়্যাহ-এর পরিচালক ছিলেন। এ কারণে তার পিতাকে বলা হতো قَيِّمُ الْجَوْزِيَّةِ (জাওযিয়্যাহর

পরিচালক)। আর পিতার এই নামের সাথে যুক্ত করে তার ছেলে আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ-কে ডাকা হতো 'ইবনু কাইয়্যিমিল জাওযিয়্যাহ' বলে; অর্থাৎ জাওযিয়্যাহ মাদরাসার পরিচালকের ছেলে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷬-এর বিশ্বনন্দিত কিতাব *'মাদারিজুস সালিকীন'*-কে পরিমার্জন করেছেন আরবের বিখ্যাত আলিম, লেখক ও সাহিত্যিক সালিহ আহমাদ শামি[১] হাফিজাহুল্লাহ। আসলে মাদারিজুস সালিকীন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷬-এর মৌলিক কোনো একক রচনা নয়। বরং এটি শাইখুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ হারাবি[২] ﷬-এর *'মানাযিলুস সায়িরীন'* কিতাবকে কেন্দ্র করে লেখা। সালিহ আহমাদ শামি 'মাদারিজুস সালিকীন' থেকে কেবল ইবনুল কাইয়্যিম ﷬-এর কথা, মতামত ও সিদ্ধান্তগুলোই একত্র করেছেন এবং সুন্দর শিরোনামে সুবিন্যস্ত করে সাজিয়েছেন। 'মানাযিলুস সায়িরীন' গ্রন্থের লেখকের অভিমত এখানে উল্লেখ করেননি। সুতরাং বলা যায়, অনূদিত এই গ্রন্থটির সম্পূর্ণ লেখাই ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷬-এর রচিত। আল্লাহ তাআলা মহান এই ইমামকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।

প্রিয় পাঠক, নবি ﷺ বলেছেন, "মনে রেখো, নিশ্চয় দেহের ভেতর গোশতের একটি টুকরা রয়েছে, যা সংশোধিত হয়ে গেলে পুরা দেহই সংশোধিত হয়ে যায়; আর যা নষ্ট হয়ে গেলে পুরা দেহটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো, তা হলো কল্‌ব বা অন্তর।"[৩]

আপনার ভাবনাকে শরীরের বৃত্ত থেকে বের করে প্রশান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবনে পৌঁছিয়ে দিতে শক্তিশালী সহায়ক হবে 'মাদারিজুস সালিকীন'। এখানে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷬ একজন মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে কী কী গুণ অর্জন করা আবশ্যক, কোন কোন মানযিল তাকে পাড়ি দিতে হবে আর কোন কোন বাধা তার সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে সবিস্তারে তা উল্লেখ করেছেন। পাঠক প্রতি

---

[১] তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার দিমাশ্‌ক শহরের বূমা নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ৫০ বছর বয়সে সপরিবারে সৌদি আরবে এসে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থান করছেন। তার রচনাবলির মধ্যে অন্যতম হলো :

⊙ مِنْ مَعِينِ الشَّمَائِلِ ⊙ مِنْ مَعِينِ السِّيرَةِ ⊙ الْجَامِعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ

[২] জন্ম ৩৯৬ হিজরি এবং মৃত্যু ৪৮১ হিজরি। তিনিও হাম্বালি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

[৩] বুখারি, ৫২; মুসলিম, ১৫৯৯।

আলোচনাতেই আত্মার এমন কিছু খোরাক পাবেন, যা তার আখিরাতের জীবনকে আরও সুন্দর করতে উদ্‌বুদ্ধ করবে। এই গ্রন্থটিকে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়।

অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমরা মূলানুগ করার চেষ্টা করেছি, তবে বইটি তাত্ত্বিক কথায় পরিপূর্ণ হওয়ায় কোথাও কোথাও ভাবানুবাদ করেছি আর ১৭ নং মানযিল থেকে এক পৃষ্ঠার মতো ব্যাকরণগত কঠিন আলোচনা বাদ দিয়েছি। মনীষীদের অধিকাংশ বাণী ও ঘটনারই নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ফুটনোটে যুক্ত করে দিয়েছি। ফলে বইটি আরও শক্তিশালী হয়েছে।

মাকতাবাতুল বায়ানের প্রকাশক ইসমাইল সাহেবের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা যে, তিনি এই মহৎ কাজটি করার জন্য আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে কবুল করুন, মাকতাবাতুল বায়ানকেও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দান করুন।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সকলের জন্য কল্যাণের ফায়সালা করুন। এই বরকতময় কাজে যতগুলো মানুষ শ্রম দিয়েছেন, সবার পরিশ্রমকে আপনি কবুল করুন। বইটির মূল লেখকদ্বয়, পরিমার্জনকারী, অনুবাদকসহ এ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। বইটিকে উম্মাহর জন্য উপকারী বানান এবং এর প্রতিটি পাঠককে হিদায়াতের আলো নসীব করুন। বিশেষ করে আমার আম্মাজানের গুনাহ মাফের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

আসাদ আফরোজ

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের অধিপতি। সুন্দর পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষমাণ, যারা আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। শাস্তিলাভের উপযুক্ত তারাই, যারা জুলুমের পথে চলে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি মহাবিশ্বের অধিপতি, তিনি সমস্ত রাসূলের ইলাহ্, আসমান-জমিনের পরিচালক। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাঁকে পাঠানো হয়েছে সুস্পষ্ট কিতাব দিয়ে, যা পার্থক্যরেখা টেনে দেয়—হিদায়াত ও ভ্রষ্টতার মাঝে, সঠিক পথ ও ভুল পথের মাঝে এবং নিশ্চিত জ্ঞান ও সংশয়ের মাঝে।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন এ উদ্দেশ্য নিয়ে—আমরা যেন চিন্তাশীল মন নিয়ে তা পাঠ করি, সেখান থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভের চেষ্টা করি, তা থেকে উপদেশ নিয়ে ধন্য হই, এর সর্বোত্তম অর্থকে গ্রহণ করি, এর সংবাদগুলোকে সত্য বলে মেনে নিই, এর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করি, এর বৃক্ষ থেকে উপকারী-জ্ঞান-সদৃশ ফল আহরণ করি—যা মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে—আর এর বাগান ও পুষ্পরাজি থেকে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা-সদৃশ সুবাসিত উদ্ভিদ সংগ্রহ করি।

কুরআন আল্লাহর কিতাব, যা আল্লাহকে-চিনতে-ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পথ দেখায়; এ হলো তাঁর দেখানো পথ, যা পথিককে তাঁর কাছে নিয়ে যায়; তাঁর স্পষ্ট আলো, যা অন্ধকার দূর করে দেয়; তাঁর দেওয়া রহমত, যাতে রয়েছে সৃষ্টিজগতের সবার

কল্যাণ; তাঁর ও তাঁর বান্দার মধ্যে সংযোগকারী মাধ্যম, যখন অন্যসব মাধ্যম ছিন্ন হয়ে যায়, (তখন কেবল এ মাধ্যমটিই টিকে থাকে); আর (এই কুরআন হলো) তাঁর কাছে পৌঁছার বিশাল প্রবেশদ্বার, সব দরজা বন্ধ হলেও এ দরজা কখনো বন্ধ হবে না।

কুরআনই হলো সেই সরল পথ, যে পথে চললে মানুষের চিন্তাধারা কখনো বিকৃত হয় না; সেই প্রজ্ঞাময় উপদেশ, যা থাকলে মন কখনো বাঁকাপথে যায় না; মহান আপ্যায়ন, যার ব্যাপারে বিদ্বানরা কখনো তৃপ্ত হয় না; যার বিস্ময় শেষ হবার নয়; যার ছায়া কখনো সরে যাবে না; যার নিদর্শন অফুরন্ত; যার উত্থাপিত প্রমাণগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; এ কিতাব নিয়ে যত চিন্তাভাবনা করা হয়, হিদায়াত ও অন্তর্দৃষ্টি ততই বৃদ্ধি পায়; আর যখনই এর সরোবর উন্মুক্ত করা হয়, তখনই সেখান থেকে প্রবলবেগে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার ফোয়ারা ছুটতে থাকে।

কুরআন হলো চোখের অন্ধত্ব-দূরকারী আলো, অন্তরকে ব্যাধিমুক্ত রাখার ওষুধ, অন্তরের সঞ্জীবনীশক্তি, মনের প্রফুল্লতা, অন্তরের বাগিচা, আত্মাকে আনন্দময় জগতে প্রেরণের চালিকাশক্তি, আর সকাল-সন্ধ্যায় এ কথার ঘোষক—“হে সফলতা-সন্ধানীরা! সফলতার দিকে আসো!” সীরাতে মুসতাকীমের মাথায় দাঁড়িয়ে ঈমানের ঘোষক এভাবে ডাকছে—

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

> “আমাদের স্বজাতির লোকজন, তোমরা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর ওপর ঈমান আনো, তা হলে তিনি তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদের মুক্তি দেবেন।”[৪]

সুবহানাল্লাহ! যারা ওহির মূলপাঠ এড়িয়ে চলে, যারা এ কুরআনের বিশাল জ্ঞানভান্ডার থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে না—তারা যে কী বিশাল জিনিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে!! অন্তরের জীবনীশক্তি, চোখের উজ্জ্বল জ্যোতি আরও কত কিছু যে তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে!!

---

[৪] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩১।

যে তার রবের কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে দূরে থাকে, সে কি মনে করে—মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত মতামতের দোহাই দিয়ে তার রব থেকে রেহাই পেয়ে যাবে? অথবা প্রচুর জ্ঞান-গবেষণা, যুক্তিতর্ক, বুদ্ধিবৃত্তিক উদাহরণ ও রকমারি প্রশ্ন-উত্থাপন কিংবা ইশারা-ইঙ্গিত, লাগামহীন আলোচনা, নানারকম কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপন—এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর শক্ত পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে?

আল্লাহর কসম! এ এক বিরাট ভুল ধারণা! যে এমনটা ধারণা করেছে, তার ধারণা জঘন্য মিথ্যা! তার মন তাকে অসম্ভব জিনিসের প্রবোধ দিয়েছে। বাস্তবতা হলো—নাজাত কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই নির্ধারিত, যে আল্লাহর দেখানো পথকে অন্য সবার মতের ওপর প্রাধান্য দেয়, তাকওয়ার রসদ সংগ্রহ করে, দলীলের অনুসরণ করে, সরল পথে চলে, আর ওহিকে এমন মজবুত রশি দিয়ে আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিঁড়বার নয়। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

মূলকথায় আসি। মানুষের পূর্ণতা মাপা হয় উপকারী জ্ঞান ও ভালো কাজ—এ দুয়ের ভিত্তিতে; আর জিনিস দুটি হলো যথাক্রমে 'হিদায়াত' ও 'দ্বীনে হক'। অন্যদের ভেতর পূর্ণতা আনতে হলেও, আনতে হবে এ দুটি জিনিসের মাধ্যমেই, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣
>
> "শপথ মহাকালের! সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; ব্যতিক্রম কেবল তারা—যারা ঈমান আনে, ভালো ভালো কাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয়, আর দেয় ধৈর্যধারণের পরামর্শ।"[৫]

আল্লাহ তাআলা শপথ করে বলেছেন—প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যতিক্রম কেবল সে, যে তার জ্ঞানের শক্তিকে ঈমান দিয়ে পূর্ণ করে, কর্মের শক্তিকে পূর্ণ করে ভালো কাজের দ্বারা, আর অন্যকে পূর্ণতা দেয় সত্য-অনুসরণ ও ধৈর্যধারণ—এ দুয়ের উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে। (এখানে) সত্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও আমল; আর এ দুটি বিষয় পূর্ণতা পায় না, যতক্ষণ-না এ দুটি বিষয়ে ধৈর্য ধরা হয় এবং পরস্পরকে এ দুটি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। মানুষের দায়িত্ব হলো তার জীবনের

[৫] সূরা আসর, ১০৩ : ১-৩।

সময়গুলো—বরং প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস—এমন কাজে খরচ করা, যার মাধ্যমে সে তার সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে এবং যার দ্বারা সুস্পষ্ট ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। আর তা কেবল তখনই সম্ভব, যখন সে কুরআনের দিকে এগিয়ে আসবে, তা ভালোভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা চালাবে, তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করবে, এর বিপুল সম্পদ লাভ ও এর গুপ্তধন উত্তোলনের উদ্যোগ নেবে, এর পেছনে সবসময় লেগে থাকবে এবং এর জন্য কষ্ট সহ্য করবে। কারণ, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে কুরআনই হলো বান্দার কল্যাণের জিম্মাদার, এটিই তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে, এটিই হাকীকত, এটিই তরীকত, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মহিমা-প্রকাশের সঠিক মাধ্যম এটিই। এ সবকিছুই নিতে হবে কেবল কুরআন থেকে, আর ফল লাভের আশা করা যায় শুধু এরই বৃক্ষ থেকে।

আল্লাহর মদদে আমরা এ বিষয়ে (পাঠকদের) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছি। আর তা করা হবে কুরআনের মূল—সূরা ফাতিহা সম্পর্কে কিছু কথা বলার মাধ্যমে। (মানবজীবনের) লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আল্লাহর-পথের-পথিকদের বিভিন্ন মানযিল, আল্লাহর মা'রিফাত-লাভকারীদের অবস্থান, সেসবের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও উপকরণের মধ্যকার পার্থক্য, আল্লাহর দান ও নিজের উপার্জন—এসব ব্যাপারে এ সূরা যা ধারণ করেছে এবং তাতে যা বলা হয়েছে, তার ওপর আলোকপাত করা হবে। আর স্পষ্টভাবে দেখানো হবে, (এসব বিষয়ে) সূরা ফাতিহার যে অবস্থান, অন্য কোনো সূরাই সেই অবস্থানে নেই; এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাওরাত ও ইনজীলে—এমনকি কুরআনেও—এর অনুরূপ কোনো সূরা নাযিল করেননি।

আল্লাহ তাআলাই সাহায্য-লাভের উৎস, ভরসা করতে হবে কেবল তাঁরই ওপর, মহামহিম আল্লাহ ছাড়া না আছে কারও কোনো শক্তি, আর না আছে কোনো সামর্থ্য।

***

সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আলোচনা

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝٢ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٥ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝٧

"পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে। প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের অধিপতি, পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু, প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই। আমাদের সরল পথ দেখাও—তাঁদের পথ, যাঁদের ওপর তুমি করুণা করেছ; ওদের পথ নয়, যারা (তোমার) ক্রোধের শিকার হয়েছে, ওদের পথও নয়, যারা ভুল পথে চলছে।"

সূরা ফাতিহা ১ : ১-৭।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতিহা'র উচ্চতর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

প্রথমে বুঝে নিতে হবে, এ সূরায় চারটি মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা পূর্ণাঙ্গভাবে স্থান পেয়েছে :

১. সূরা ফাতিহায় তিনটি নামে মহান মা'বূদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; (আল্লাহ্ তাআলার) আল-আসমাউল হুসনা ও উচ্চতর গুণসমূহের উৎস ও ভিত্তি হলো এ তিনটি নাম :

আল্লাহ,

রব ও

রহমান।

আর এ সূরার ভিত্তি রাখা হয়েছে ইলাহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও রহমতের ওপর।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা কেবল তোমার দাসত্ব করি"—এটি আল্লাহ তাআলার 'ইলাহিয়্যাত বা ইবাদাতসংক্রান্ত বিষয়াদির'-নির্দেশক।

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই"—এটি তাঁর 'রুবূবিয়্যাত বা পরিচালনাগত বিষয়াদির'-নির্দেশক।

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ আর তাঁর কাছে সরল পথের নির্দেশনা চাওয়া—এটি 'রহমত'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(اَلْحَمْدُ) বা 'প্রশংসা'র ভেতরও এ তিনটি বিষয় রয়েছে : আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলাহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও রহমত সবদিক দিয়েই প্রশংসিত। গুণকীর্তন ও মহিমা-প্রকাশ—এ দুটি হাম্‌দ বা প্রশংসাকে পূর্ণতা দেয়।

২. আখিরাতকে সাব্যস্ত করা, ভালো ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে বান্দার আমলের প্রতিদান, সেদিন মহান রবের একক কর্তৃত্ব এবং তাঁর ইনসাফপূর্ণ বিচার—এসব বিষয়কেও সূরা ফাতিহা অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এ সবগুলোই রয়েছে مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "প্রতিদান দিবসের মালিক" আয়াতটির অধীনে।

৩. এ সূরায় বেশ কয়েকটি দিক দিয়ে নুবুওয়াতের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে :

ক) আল্লাহ্ তাআলা "মহাবিশ্বের অধিপতি" رَبُّ الْعَالَمِينَ, সুতরাং তাঁর বান্দাদের অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া তাঁর শানের সঙ্গে মানানসই নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কোন জিনিস উপকারী আর কোন জিনিস ক্ষতিকর—সেসবের পরিচয় বান্দাদের সামনে তুলে ধরবেন না, এমন চিন্তা লালন করা মানে (আল্লাহ্ তাআলার) রুবূবিয়্যাতকে নাকচ করে দেওয়া এবং মহান রবের সঙ্গে এমন কিছু জুড়ে দেওয়া, যা তাঁর সঙ্গে একেবারে বেমানান। যারা এ কাজ করে, তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি।

খ) আল্লাহ্ তাআলার একটি নাম 'পরম করুণাময়' (الرَّحْمٰنُ)। তাঁর করুণা তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দিতে বাধা দেয়। কী করলে বান্দারা পূর্ণতার শিখরে পৌঁছাতে পারবে, তা তিনি বলবেন না—এমন ধারণাকেও 'করুণাময়' নাম বাধা দেয়। যে ব্যক্তি 'করুণাময়' শব্দটিকে যথাযথ অধিকার দেয়, সে জানে, বৃষ্টিবর্ষণ করা, তৃণলতা গজিয়ে তোলা ও বীজ থেকে চারা উদগত করা—এসব কাজের সঙ্গে 'রহমান' নামের যেটুকু সম্পর্ক, তার চেয়ে বেশি সম্পর্ক রাসূল পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার সঙ্গে। দেহ ও বাহ্যিক সূরত সজীব রাখার জন্য আল্লাহর করুণা যেটুকু প্রয়োজন, কল্ব ও রূহকে সজীব রাখার জন্য আল্লাহর করুণার প্রয়োজন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু যাদের চোখে পর্দা পড়ে আছে, তারা 'করুণাময়' শব্দের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের প্রয়োজন মেটানোর বিষয়টিই দেখতে পায়, আর বুদ্ধিমান লোকেরা এর মধ্যে তার চেয়েও বেশিকিছু দেখতে পায়।

গ) এ সূরায় 'প্রতিদান দিবস' يَوْمِ الدِّينِ-এর কথা বলা হয়েছে। কারণ সেদিন বান্দাদের আমল অনুযায়ী পাওনা পরিশোধ করা হবে—ভালো কাজের জন্য তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে আর অবাধ্যতা ও গুনাহের জন্য দেওয়া হবে শাস্তি। তবে, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আগ-পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর শানে

মানানসই নয়; প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূল ও আসমানি কিতাব পাঠানোর মাধ্যমে; তাঁদের পাঠানোর পরই পুরস্কার ও শাস্তি অবধারিত হয়ে ওঠে; তাদের ভিত্তিতেই বিচারের দিন 'হাঁকিয়ে নেওয়ার ঘটনা' ঘটবে—ভালো লোকদের নেওয়া হবে জান্নাতে আর গুনাহগারদের নেওয়া হবে জাহান্নামে।

ঘ) আল্লাহ তাআলা বলেছেন, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "আমাদের সরল পথ দেখাও"। হিদায়াত বা পথ-দেখানো মানে পথের বিবরণ ও নির্দেশনা দেওয়া, তারপর (সেই পথে) চলার সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয় সংকেত দেওয়া, আর শেষের এ দুটি হয়ে থাকে পথের বিবরণ ও নির্দেশনা দেওয়ার পর। পথের বিবরণ ও নির্দেশনা দেওয়া—এ দুটি কাজ কেবল আল্লাহর প্রেরিত রাসূলদের দ্বারাই সম্ভব। পথের বিবরণ, নির্দেশনা ও পরিচয়—এসবের পরে আসে পথচলার সামর্থ্যের বিষয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়—আল্লাহর কাছে সরল পথের নির্দেশনা চাওয়া, বান্দার সব প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জরুরি। যারা বলে 'আমরা তো (কুরআনের মাধ্যমে) হিদায়াত পেয়ে গিয়েছি, আবার হিদায়াত চাইব কীভাবে?', তাদের এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, আল্লাহর নাযিল-করা হকের ব্যাপারে আমরা যা জানি, তার চেয়ে আমাদের না-জানার পরিমাণ বহুগুণ বেশি। আমরা যা করতে চাই, পরিমাণে তার চেয়ে বেশি অথবা কম অথবা সমান হলো সেসব কাজ, যা আমরা তুচ্ছ মনে করে ও অলসতার কারণে করতে চাই না। কিছু কাজ আমরা করতে চাই, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে করতে পারি না, এমন ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব বিষয়ের পূর্ণ ও বিস্তারিত চিত্র আমাদের সামনে নেই; তাই আমরা কী পরিমাণ কাজ করতে পারছি না, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আমাদের দরকার পরিপূর্ণ হিদায়াত। যে এসব বিষয় পরিপূর্ণভাবে হাসিল করতে পেরেছে, আল্লাহর কাছে তার হিদায়াত চাওয়ার উদ্দেশ্য হবে, সে যেন হিদায়াতের ওপর অবিরামভাবে অবিচল থাকতে পারে।

হিদায়াতের আরেকটি স্তর আছে, সেটি হলো এর সর্বশেষ স্তর। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন জান্নাতে যাওয়ার পথপ্রদর্শন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর সরল পথের দিশা পায়—যে সরল পথ দিয়ে তিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন আর কিতাব নাযিল করেছেন—, আখিরাতেও সে সরল পথের দিশা পাবে, যা তাকে জান্নাত ও পুরস্কার-গৃহে পৌঁছে দেবে। এ দুনিয়ায় আল্লাহর নির্ধারিত সরল পথের ওপর বান্দা

যতটুকু অটল থাকবে, জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাতের ওপর সে ততটুকুই অটল থাকতে পারবে; দুনিয়ায় সরল পথে যে গতিতে সে চলেছে, পুলসিরাতেও তার গতি থাকবে ততটুকু : তাদের মধ্যে কেউ পার হবে বিজলির গতিতে, কেউ চোখের পলকে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ বাহনের গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ নতজানু হয়ে গায়ে অনেক আঁচড় লাগিয়ে, আবার কেউ নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

যে ব্যক্তি পুলসিরাতে তার গতি কেমন হবে তা দেখতে চায়, সে যেন এ দুনিয়ায় সীরাতে মুসতাকীমের ওপর তার গতির দিকে তাকায়। কারণ সেখানে সে হুবহু একই গতি প্রাপ্ত হবে, যা হবে তার যথাযথ পাওনা:

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

> "তোমরা যা করছিলে, (আজ) কেবল তারই পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।"[৬]

৬) সূরা ফাতিহায় (১) অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকদের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে (২) গজবপ্রাপ্ত ও (৩) পথভ্রষ্ট দুটি দল থেকে আলাদা করা হয়েছে। সত্যকে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা—এসবের ভিত্তিতে মানুষ এই তিনভাগে বিভক্ত। শারীআতের-আওতাধীন-মানুষ কখনো এ তিনশ্রেণির বাইরে যেতে পারে না। কারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত, কারা গজবের শিকার আর কারা পথভ্রষ্ট—এসব বিষয় নুবুওয়াত ও রিসালাতকে অপরিহার্য করে তোলে (অর্থাৎ, রাসূল পাঠানো ছাড়া এসব বিষয় জানার কোনো সুযোগ নেই)।

৪. اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-এ اَلصِّرَاطَ শব্দটি একবচন; পাশাপাশি একে দুদিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে: প্রথমবার (শুরুতে) আলিফ-লাম লাগিয়ে, আর দ্বিতীয়বার আরেকটি শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ করার মাধ্যমে। ফলে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ও বিশেষায়িত হয়েছে, অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকীম একটিই।

বিপরীতদিকে, গজব ও ভ্রষ্টতার পথগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কখনো বহুবচন আবার কখনো একবচন ব্যবহার করেন; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

[৬] সূরা নাম্‌ল, ২৭ : ৯০।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

"এ হলো আমার-দেওয়া সিরাতে মুস্তাকীম, তোমরা এ পথ অনুসরণ করো; অনেক পথ অনুসরণ করো না, তা হলে সেগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে।"[৭]

এ আয়াতে আল্লাহ্ নিজের পথ বোঝাতে 'সিরাত' ও 'সাবীল' একবচন ব্যবহার করেছেন, আর এর বিপরীত পথগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন এর বহুবচন 'সুবুল'।

ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের সামনে একটি রেখা টেনে বললেন,

هَٰذَا سَبِيلُ اللهِ

"এটি আল্লাহর পথ।"

তারপর এর ডানে-বামে কয়েকটি রেখা টেনে বললেন,

هَٰذِهِ سُبُلٌ، عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ

"এ হলো অনেক পথ, প্রত্যেকটি পথে একজন করে শয়তান আছে, সে ওই পথের দিকে ডাকছে।"

এরপর নবি ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

"এ হলো আমার-দেওয়া সিরাতে মুস্তাকীম, তোমরা এ পথ অনুসরণ করো; অনেক পথ অনুসরণ করো না, তা হলে সেগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে।" আল্লাহ্ তোমাদের এ নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা তার নাফরমানি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারো।"

---

[৭] সূরা আনআম, ৬ : ১৫৩।

(সূরা আনআম, ৬ : ১৫৩)[৮]

এর কারণ হলো—আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছানোর রাস্তা মাত্র একটি। আর সেটি ওই রাস্তা, যা দিয়ে তিনি তাঁর রাসূলদের পাঠিয়েছেন, যার বিবরণ দিয়ে তিনি আসমানি কিতাবগুলো নাযিল করেছেন; এ রাস্তা ছাড়া কেউ তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারবে না। মানুষ যদি অন্যসব রাস্তায় গিয়ে প্রত্যেকটি দরজায় কড়া নাড়ে, তারা দেখবে—একপর্যায়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে; ব্যতিক্রম কেবল এই একটি পথ, যা আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত, যা মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়।

সিরাতে মুস্‌তাকীম-সন্ধানী যেহেতু এমন এক বিষয়ের সন্ধানে নেমেছে, যা থেকে বেশিরভাগ মানুষ সরে যায়, সে যেহেতু এমন এক পথে চলতে চাচ্ছে, যে পথে বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম ও দুর্লভ, আর প্রকৃতিগতভাবেই একাকিত্ব মানুষের কাছে অপছন্দের এবং বন্ধুর প্রতি থাকে তার গভীর মমত্ববোধ ও ঘনিষ্ঠতা, তাই আল্লাহ তাআলা এ পথের বন্ধুদের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

“যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা থাকবে সেসব লোকের সঙ্গে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আর তারা হলেন নবি, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাগণ; তারা অত্যন্ত চমৎকার বন্ধু।”[৯]

আল্লাহ তাআলা সিরাতে মুস্‌তাকীমকে সেসব বন্ধুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন, যারা এ পথের পথিক, যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। যাতে করে যে ব্যক্তি হিদায়াত খুঁজে ফিরে আর সীরাতে মুসতাকীমের ওপর চলতে চায়, তার মন থেকে যেন নিজ জামানার স্বজাতীয় লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বেদনা দূর হয়ে যায়। এভাবে সে যেন বুঝতে পারে—এ পথে তার বন্ধু হলো সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; ফলে এ পথ-থেকে-সরে-যাওয়া লোকদের বিরোধিতাকে সে মোটেই পরোয়া করবে না। কারণ সংখ্যায় তারা বেশি হলেও মর্যাদায় তারা

[৮] দারিমি, ২০২; ইবনু মাজাহ, ১১।

[৯] সূরা নিসা, ৪ : ৬৯।

খুবই নগণ্য। যেমন পূর্ববর্তী মনীষীদের কোনো একজন বলেছিলেন—'সত্যপথে অটল থেকো, ওই পথের পথিক কম হলেও নিজেকে একা মনে কোরো না; আর মিথ্যার পথ থেকে দূরে থেকো, ধ্বংসের-পথে-পা-বাড়ানো লোকদের সংখ্যাধিক্য যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।' সিরাতে মুস্তাকীমে চলতে গিয়ে কখনো যদি নিজেকে বড্ড একা মনে হয়, তা হলে তোমার-আগে-চলে-যাওয়া বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন কোরো, অন্যদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেখো, কারণ আল্লাহর সামনে তারা তোমার কোনো উপকারে আসবে না, তোমার সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর চলা দেখে তারা যতই চিৎকার করুক, তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ কোরো না।

যেহেতু সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দিক্‌নির্দেশনা চাওয়া হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, আর তার সন্ধান পাওয়া হলো আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সেটি চাইতে হবে, তিনি তাদেরকে (সূরা ফাতিহার ১-৪ নং আয়াতে) এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তারা যেন সিরাতে মুস্তাকীম চাওয়ার আগে তাঁর প্রশংসা-স্তুতি ও মহিমা বর্ণনা করে। এরপর তিনি (৫ নং আয়াতে) তাঁর তাওহীদ ও ইবাদাত পাওয়ার অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাম ও গুণসমূহের ওসীলা এবং তাঁর ইবাদাতের ওসীলা—এ দুটি হলো বান্দার কাঙ্ক্ষিত মানযিলে পৌঁছার মাধ্যম। এ দুটি ওসীলা থাকলে, দুআ কবুল না হয়ে পারে না।

***

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতিহায় তাওহীদ বা একত্ববাদ

সূরা ফাতিহা তাওহীদ বা আল্লাহ তাআলার এককত্বের তিনটি প্রকারকেই শামিল করেছে; যার ওপর সমস্ত নবি ও রাসূল ﷺ একমত পোষণ করেছেন।

তাওহীদ দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার হলো জ্ঞান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। এটিকে বলা হয় 'জ্ঞানগত তাওহীদ'। কারণ ওহি ও আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে জ্ঞান—এ দুটির সঙ্গেই জ্ঞানগত তাওহীদের সম্পর্ক রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো ইচ্ছা ও সংকল্পের ক্ষেত্রে। এটিকে বলা হয় 'সংকল্পগত তাওহীদ'। ইচ্ছা ও সংকল্পের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণেই এই নামকরণ।

সংকল্পগত তাওহীদ আবার দুই প্রকার :

১. রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাওহীদ এবং

২. ইলাহিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাওহীদ।

এই হলো তাওহীদের মোট তিনটি প্রকার :

১. জ্ঞানগত তাওহীদ,

২. রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাওহীদ ও

৩. ইলাহিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাওহীদ

জ্ঞানগত তাওহীদের ভিত্তি হলো—আল্লাহ তাআলার জন্য পরিপূর্ণতার গুণাবলি সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ তাআলার সত্তাকে সমস্ত প্রকার দোষ, ত্রুটি ও উপমা

থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। এর ওপর প্রমাণ বহন করে দুটি বিষয় : একটি সংক্ষিপ্ত, আরেকটি বিস্তারিত।

সংক্ষিপ্তটি হলো আল্লাহ তাআলার জন্য হামদ বা প্রশংসা সাব্যস্ত করা।

আর বিস্তারিতটি হলো ১. ইলাহিয়্যাত, ২. রুবুবিয়্যাত, ৩. রহমত ও ৪. মালিকানা এই গুণসমূহের আলোচনা করা। এই চারটি গুণাবলির ওপরই আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাতের ভিত্তি।

হাম্‌দ বা প্রশংসা তাওহীদকে ধারণ করে। কারণ প্রশংসা করার অর্থ হলো : যার প্রশংসা করা হচ্ছে তার প্রতি ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও নম্রতা দেখিয়ে তার পরিপূর্ণ ও মহৎ গুণাবলির স্বীকৃতি দেওয়া। কারণ কারও উত্তম গুণাবলি অস্বীকার করে কেউ তার প্রশংসাকারী হতে পারে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কারও প্রতি মহাব্বত, শ্রদ্ধা ও নম্রতা প্রদর্শন করে না, সেও তার প্রশংসাকারী হতে পারে না। যার উত্তম গুণাবলি যত বেশি হবে, তার প্রশংসাও তত পরিপূর্ণ হবে। আর যার ভালো গুণসমূহ কম হবে, তার প্রশংসাও সে অনুপাতে কমে যাবে।

আর এ কারণেই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য; এমন প্রশংসা যা তিনি ব্যতীত আর কেউ গণনা করার সক্ষমতা রাখে না। কারণ আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ গুণাবলির একচ্ছত্র মালিক। আর এ কারণেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কেউ তাঁর প্রশংসা গুণে শেষ করতে পারবে না। কেননা তাঁর পরিপূর্ণ ও মহৎ গুণাবলি তিনি ব্যতীত আর কেউ গণনা করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তাআলা কাফিরদের উপাস্যদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের মন্দ বলেছেন; কারণ তারা পরিপূর্ণ গুণাবলির অধিকারী নয়। তিনি এই বলে তাদের দোষারোপ করেছেন যে, তারা শুনতে পারে না, দেখতে পারে না, কথা বলতে পারে না, কাউকে পথ দেখাতে পারে না, কারও উপকার করতে পারে না আবার কারও ক্ষতিও করতে পারে না।

সুতরাং আল্লাহর জন্য হাম্‌দ বা প্রশংসা সাব্যস্ত করার দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে, পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা একক ও অদ্বিতীয়।

আল্লাহ, রব, রহমান, রহীম ও মালিক—এই পাঁচটি নাম পরিপূর্ণ গুণাবলি ও নামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা যে একক, তার ওপর প্রমাণ বহন করে। এটি দুইটি

ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত :

প্রথম ভিত্তি : আল্লাহ তাআলার নামসমূহ তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলির প্রমাণ বহন করে। নামগুলো গুণাবলি থেকেই উৎসারিত। এগুলো নামও আবার গুণও। এ কারণেই আল্লাহ তাআলার নামসমূহের বিশেষণ হুসনা (সুন্দর) দ্বারা করা হয়েছে। কারণ এটি যদি শুধুই অর্থহীন শব্দের ব্যাপার হতো, তা হলে তা হুসনা বা সুন্দর হতো না। এমনিভাবে তা প্রশংসা ও পরিপূর্ণতার ওপর দলীলও হতো না। (নামগুলো যদি শুধুই নাম হতো; সিফাত বা গুণের বিবেচনা করা না হতো,) তবে প্রতিশোধ ও রাগ-সংবলিত নামগুলো দয়া ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত; অথবা এর বিপরীতভাবেও ব্যবহার করার সুযোগ থাকত। তখন বলা যেত :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمُنْتَقِمُ

'হে আল্লাহ, আমি আমার নফসের ওপর জুলুম করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী!'

অথবা বলা যেত :

اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ الْمَانِعُ

'হে আল্লাহ, আমাকে দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষতিসাধনকারী ও বাধাদানকারী!'

আল্লাহ তাআলার আল-আসমাউল হুসনা বা উত্তম নামসমূহ থেকে অর্থকে বাদ দেওয়া অনেক বড়ো ইলহাদ বা নাস্তিকতা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে উত্তম নাম ধরেই তাঁকে ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।"[১০]

---

[১০] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮০।

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার নামসমূহ যদি অর্থ ও গুণাবলির ওপর প্রমাণ বহন না করত, তা হলে সেগুলোর দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করা এবং সেগুলোর মূল ও উৎসসমূহের খবর দেওয়া বৈধ হতো না। অথচ আল্লাহ তাআলা সেগুলোর মূল সম্পর্কে জানিয়েছেন এবং নিজের জন্য তা সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আল্লাহ তাআলার জন্য গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"আল্লাহ নিজেই রিয্কদাতা এবং মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী।"[১১]

সুতরাং জানা গেল, আল্লাহ তাআলার নামসমূহ থেকে একটি নাম হলো اَلْقَوِيُّ (মহাশক্তিধর)। আর তিনি শক্তির গুণে গুণান্বিত।

ইলহাদ বা ধর্মত্যাগ হলো নামগুলোকে অস্বীকার করা, অথবা এর অর্থকে অস্বীকার করা এবং নামগুলো গুণহীন ও বেকার মনে করা, অথবা এগুলোকে সত্য থেকে বিকৃত করা এবং মিথ্যা অপব্যাখ্যা করে হক থেকে বের করে দেওয়া, অথবা আল্লাহ তাআলার কোনো নামকে তাঁর কোনো সৃষ্টির জন্য প্রয়োগ করা; যেমন : 'ইত্তিহাদ'-এর অধিকারীদের ইলহাদ। কারণ আল্লাহ তাআলার নামসমূহকে তারা সৃষ্টিজগতের ভালো-মন্দ সবার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করে থাকে।

দ্বিতীয় ভিত্তি : আল্লাহ তাআলার নামসমূহের মধ্য থেকে একটি নাম যেমন তাঁর সত্তা ও গুণের ওপর সরাসরি প্রমাণ বহন করে, তেমনি তা আরও দুইটি বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত প্রদান করে—ইঙ্গিত প্রদান করার বিষয়টি হয় অধিনস্থতা ও আবশ্যকীয়তার ভিত্তিতে—একটি হলো শুধু গুণের ওপর ইঙ্গিত প্রদান করে, আরেকটি হলো গুণ ব্যতীত শুধু সত্তার ওপর ইঙ্গিত প্রদান করে। তবে এটি আবশ্যকীয়তার ভিত্তিতে ভিন্ন আরেকটি গুণের প্রতিও ইঙ্গিত করে। (উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হবে,) যেমন : اَلسَّمِيعُ (সর্বশ্রোতা) নামটি ১. আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং 'শ্রবণ' গুণের ওপর সরাসরি প্রমাণ বহন করে, এমনিভাবে ২. শুধু আল্লাহর সত্তার ওপরও প্রমাণ বহন করে। আবার সত্তা বাদ দিয়ে কেবল ৩. শ্রবণশক্তির প্রমাণও বহন করে। তাছাড়া এটি আল্লাহ তাআলা যে জীবিত (اَلْحَيُّ) তার ওপরও প্রমাণ

[১১] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৮।

বহন করে। এখানে 'জীবন'-এর গুণটি সাব্যস্ত হয়েছে আব্যশকীয়ভাবে। (কারণ যে শুনবে তার জীবন থাকা আবশ্যক।) এ রকমভাবে সমস্ত নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

তবে কোনো বস্তুর কী কী আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ থাকতে পারে, তা বোঝা না-বোঝার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বেশ পার্থক্য রয়েছে। (কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না।) আর এখান থেকেই অধিকাংশ নাম, গুণ ও হুকুমের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কেননা যে ব্যক্তি জানে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করতে হলে অপরিহার্যভাবেই জীবনের প্রয়োজন, শোনা এবং দেখাও পরিপূর্ণ জীবনসত্তাকে আবশ্যক করে, এমনিভাবে এটাও জানে যে, সব ধরনের পরিপূর্ণতা ধারণের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন আবশ্যক, সেই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাম, সিফাত ও কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই সাব্যস্ত করতে পারবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি উপরিউক্ত বিষয়গুলো জানে না এবং জীবনের আবশ্যকীয় গুণাবলি সম্পর্কেও জ্ঞান রাখে না, সে নিশ্চিতভাবেই এগুলোকে অস্বীকার করবে। সব গুণাবলি সম্পর্কে এই একই কথা।

যখন এই দুটি ভিত্তি স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন জেনে রাখুন, ﷲ নামটি উপরিউক্ত তিনটি পন্থায়ই সমস্ত উত্তম নাম ও মহৎ গুণাবলিকে সাব্যস্ত করে। কেননা 'আল্লাহ' নামটি সিফাতে ইলাহিয়্যাতের ওপর প্রমাণ বহন করে; যা তাঁর জন্য ইলাহিয়্যাতের সিফাতকে সাব্যস্ত করে এবং এর বিপরীত গুণাবলিকে প্রত্যাখ্যান করে।

আর ইলাহিয়্যাত সিফাতটি হলো সর্বদিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ একটি সিফাত। তুলনা-উপমা ও সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সমস্ত উত্তম নামসমূহকে এই নামের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সব উত্তম নাম।"[১২]

বলা হয় 'আর-রহমান', 'আর-রহীম', 'আল-কুদ্দূস', 'আস-সালাম', 'আল-আযীয', 'আল-হাকীম'—এগুলো হলো 'আল্লাহ'র নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত; তবে এ রকমটা বলা হয় না যে, 'আল্লাহ' হলো আর-রহমান বা আল-আযীযের নামসমূহের

[১২] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮০।

অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য আর কোনো নামের ক্ষেত্রেই এ রকম বলা হয় না।

সুতরাং জানা গেল, 'আল্লাহ' নামটি আল-আসমাউল হুসনার সমস্ত অর্থকেই আবশ্যক করে; সেগুলোর প্রতি এটি সংক্ষিপ্তভাবে দিক্‌নির্দেশনা দান করে। আর আল-আসমাউল হুসনা হলো ইলাহিয়্যাতের গুণের বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। الْإِلٰهِيَّةُ থেকেই اللهُ নামের উৎপত্তি। 'আল্লাহ' নামটি ইলাহ্ ও উপাস্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে; সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে মহাব্বত, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে এবং সব ধরনের প্রয়োজন ও বিপদাপদে আশ্রয়স্থল হিসেবে তাঁকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে নিতে উদ্‌বুদ্ধ করে। যা তাঁর পরিপূর্ণ রুবূবিয়্যাত ও রহমতকে আবশ্যক করে; আর এই দুটি গুণ পরিপূর্ণ মালিকানা ও প্রশংসাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তাআলার ইলাহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত, রহমানিয়্যাত, মিলকিয়্যাত এই গুণগুলো সমস্ত উত্তম সিফাতকে আবশ্যক করে। কারণ এই গুণগুলো সেই সত্তার জন্য সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব, যিনি জীবিত নন, শ্রোতা, দ্রষ্টা, শক্তিধর ও আদেশ-নিষেধকারী নন, কিংবা সর্বময় ক্ষমতার মালিক বা নিজের কাজকর্মে একমাত্র সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী নন।

সূরা ফাতিহায় হাম্‌দ বা প্রশংসার পরে আল্লাহ তাআলার নামগুলো উল্লেখ করার মাঝে এই দলীল রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলাহিয়্যাতে প্রশংসিত, রুবূবিয়্যাতে প্রশংসিত, রহমানিয়্যাতে প্রশংসিত এবং মিলকিয়্যাতেও প্রশংসিত। এমনিভাবে এই দলীলও রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রশংসিত ইলাহ্, প্রশংসিত রব, প্রশংসিত রহমান এবং প্রশংসিত মালিক। আর এসবের মাধ্যমে তিনি সমস্ত পরিপূর্ণতার অধিকারী।

***

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সূরা ফাতিহা দুটি আরোগ্য ধারণ করে

সূরা ফাতিহা দুইটি আরোগ্য ধারণ করে :

১. অন্তরের আরোগ্য (شِفَاءُ الْقُلُوْبِ) এবং

২. শরীরের আরোগ্য (شِفَاءُ الْأَبْدَانِ)

১. অন্তরের আরোগ্য (شِفَاءُ الْقُلُوْبِ) : এই সূরার মধ্যে অন্তরের সমস্ত রোগের পরিপূর্ণ সুস্থতা ও রোগমুক্তি রয়েছে। কেননা অন্তরের যত রোগব্যাধি রয়েছে তার ভিত্তি হলো দুইটি বিষয়ের ওপর—১. ইলম সঠিক না হওয়া এবং ২. ইচ্ছা সঠিক না হওয়া।

আর এই দুটি বিষয় থেকে আরও মারাত্মক দুটি রোগের সৃষ্টি হয়—**গোমরাহি ও ক্রোধ**। গোমরাহি হলো ইলম সঠিক না হওয়ার ফল আর ক্রোধ হলো ইচ্ছা সঠিক না হওয়ার ফল। এই দুটি ব্যাধিই হলো অন্তরের সমস্ত রোগের উৎসমূল। সুতরাং সূরা ফাতিহায় উল্লেখিত সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়াত সকল প্রকার গোমরাহিজনিত রোগ থেকে আরোগ্য দান করে। আর এ কারণেই এই হিদায়াত প্রার্থনা করা প্রত্যেক বান্দার ওপর জরুরি ও আবশ্যক। প্রতিদিন প্রত্যেক সালাতে এই দুআ পাঠ করা বান্দার জন্য অবশ্যকরণীয়। এর তীব্র প্রয়োয়জনীয়তা থাকার কারণেই এই হুকুম দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনো দুআ কখনো এই দুআর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

অপরদিকে ইলম, মা'রিফাত, আমল ও অবস্থা অনুসারে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই"—এই আয়াতের বাস্তবায়নে রয়েছে অন্তরের অনিষ্টতা এবং ইচ্ছা ও সংকল্পের ক্ষেত্রে সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমাধান। কেননা ইচ্ছা সঠিক না হওয়ার সম্পর্ক হলো লক্ষ্য ও মাধ্যমের সাথে। আসলে যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, ধ্বংসশীল-অস্থায়ী

কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে এবং তাতে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তার এই দুই প্রকারের ইচ্ছাই ভ্রান্ত।

এটিই হলো প্রতিটি মুশরিক ও প্রবৃত্তির অনুসারিদের অবস্থা, যাদের লক্ষ্য ও ইবাদাতের উদ্দেশ্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যকিছু; তা ছাড়া তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। মূলকথা হলো লক্ষ্য ও মাধ্যম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এদের ইচ্ছা ও সংকল্প খারাপ হয়েছে। যেদিন তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুল বলে প্রমাণিত হবে; যার জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে—সেদিন তারা সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। এই সমস্ত ব্যক্তিরাই সেদিন সবচেয়ে বেশি আফসোস করতে থাকবে এবং লজ্জিত হবে। সেসময় সত্য সত্য হিসেবে আর মিথ্যা মিথ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে, তাদের সমস্ত মাধ্যম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হবে যে, সৌভাগ্য ও সফলতা থেকে তারা অনেক দূরে। এ বিষয়টি অনেক সময় দুনিয়াতেও প্রকাশ পেয়ে যায়। আর বেশ প্রকটভাবে প্রকাশ পায়, যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং আল্লাহ-অভিমুখে যাত্রা করে। কবরজীবনে বিষয়টি তারা আরও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে। আর সবশেষে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন সবকিছু পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে যাবে; যখন সমস্ত রহস্য উন্মোচিত হবে, সত্যপন্থিরা সফল হবে আর বাতিলপন্থিরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তারা সেদিন জানতে পারবে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল, তারা ধোঁকাগ্রস্ত ও প্রতারণার শিকার ছিল। কিন্তু সেদিনকার এই জ্ঞান আর বিশ্বাস তাদের না কোনো কাজে আসবে আর না কোনো উপকার করবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি সুউচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সন্ধান করে, কিন্তু সে জন্য সঠিক মাধ্যম অবলম্বন করে না; যা তাকে ওই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে; বরং এমন মাধ্যম গ্রহণ করে তার ধারণায় যা সঠিক, কিন্তু বাস্তবে তা সঠিক নয়; এই ব্যক্তির অবস্থাও উপরিউক্ত ব্যক্তি মতোই; দুজনের ইচ্ছাই ভ্রান্ত। এদের এই রোগের একটিই মাত্র ওষুধ রয়েছে আর তা হলো—إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

কারণ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর এই ওষুধটি ছয়টি উপকরণ নিয়ে গঠিত :

১. দাসত্ব হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে, অন্য কারও উদ্দেশ্যে নয়;

২. তাঁর হুকুম ও শারীআ অনুযায়ীই হবে তাঁর দাসত্ব;

৩. প্রবৃত্তির অনুসরণে নয়:

৪. কোনো মানুষের দেওয়া মানদণ্ড, সিদ্ধান্ত, রীতিনীতি বা যুক্তি মেনেও নয়;

৫. আল্লাহ তাআলার দাসত্বের ক্ষেত্রে শুধু তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে;

৬. কেবল বান্দার নিজের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে বা অন্য কারও সাহায্য নিয়ে নয়।

এই হলো إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর উপকরণসমূহ। সুতরাং রোগ সম্পর্কে অবগত, দয়ালু কোনো ডাক্তার যখন এই উপকরণগুলো ব্যবহার করতে বলবে আর রোগী তা ব্যবহারও করবে, তখন এর দ্বারা পরিপূর্ণ সুস্থতা ও আরোগ্য লাভ হবে। সুস্থতায় যদি ঘাটতি থাকে, তা হলে বুঝতে হবে ওষুধের সব উপকরণগুলো ব্যবহার করা হয়নি; হয়তো একটি, দুটি বা তারও অধিক উপকরণ বাদ পড়েছে।

এই স্তর অতিক্রম করার পর অন্তরে আরও বড়ো বড়ো দুটি রোগ এসে হাজির হয়। ব্যক্তি যদি এগুলো সম্পর্কে সচেতন না হয়, তা হলে নিশ্চিতভাবেই সেগুলো তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। রোগ দুটি হলো : ১. রিয়া বা লোক-দেখানো-প্রবণতা এবং ২. অহংকার।

সুতরাং লোক-দেখানো-প্রবণতার ওষুধ হলো : إِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি" আর অহংকারের ওষুধ হলো : وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আর আমরা কেবল তোমার কাছেই সাহায্য চাই"।

যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর মাধ্যমে লোক-দেখানো-প্রবণতা, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর মাধ্যমে অহংকার ও গর্ব এবং اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ-এর মাধ্যমে মূর্খতা ও গোমরাহিজনিত রোগব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করবে এবং সুস্থতার চাদর গায়ে জড়াবে, তখন তার ওপর আল্লাহ তাআলার নিয়ামাত পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, সে পুরস্কারপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে গজবপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ যাদের ইচ্ছা ও সংকল্প খারাপ ছিল, যারা সত্য চিনে নেওয়ার পরও তা থেকে ফিরে গেছে। এবং সে পথভ্রষ্টদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে না وَلَا الضَّالِّينَ যারা ছিল মূর্খ সম্প্রদায়; যারা সত্য সম্পর্কে জানতেও পারেনি এবং তা চিনতেও পারেনি।

এই দুটি আরোগ্যকে যে সূরা ধারণ করে সেটিই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত যে, তার

মাধ্যমে প্রত্যেক রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করা হবে। সূরা ফাতিহা যখন সবচেয়ে বড়ো আরোগ্যকেই অন্তর্ভুক্ত করে, তখন ছোটো ছোটো আরোগ্যগুলোকে তো সহজেই অন্তর্ভুক্ত করবে। শীঘ্রই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব, ইন শা আল্লাহ্। সুতরাং যে অন্তর আল্লাহর বাণী বুঝতে সক্ষম এবং তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে, সে অন্তরের জন্য এই সূরার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করার চেয়ে উত্তম কোনো শিফা বা রোগমুক্তি আর নেই।

২. শরীরের আরোগ্য (شِفَاءُ الْأَبْدَانِ) : *'সহীহ বুখারি'*-তে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর একদল সাহাবি কোনো এক সফরে যাত্রা করেন। তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। পরে সে গোত্রের সরদার দংশিত হলো বিচ্ছু দ্বারা। লোকেরা তার (রোগমুক্তির) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কোনোকিছুতেই উপকার হলো না। তখন তাদের কেউ বলল, 'এই কাফেলার যারা এখানে অবতরণ করেছে তোমরা তাদের কাছে গেলে ভালো হতো। সম্ভবত, তাদের কারও কাছে কিছু থাকতে পারে।' ওরা তাদের কাছে গিয়ে বলল, 'ওহে মুসাফির, আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারও কাছে কি কিছু আছে?' সাহাবিদের মধ্যে একজন বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি ঝাড়ফুঁক করতে পারি! আমরা তোমাদের মেহমানদারি কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারি করোনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড়ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত-না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো।' তখন তারা এক পাল বকরি দেওয়ার শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। তারপর তিনি সেখানে গিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (সূরা ফাতিহা) পড়ে তার ওপর ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে সুস্থতা লাভ করল) যেন বন্ধন হতে মুক্ত হলো এবং সে এমনভাবে চলতে-ফিরতে লাগল যেন তার কোনো কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন,) তারপর তারা তাদের চুক্তিকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিলো। সাহাবিদের কেউ কেউ বললেন, 'এগুলো বণ্টন করো।' কিন্তু যিনি ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন, 'এটা করব না, যে পর্যন্ত-না আমরা নবি ﷺ-এর নিকট গিয়ে এই ঘটনা জানাই এবং দেখি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন।' তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। নবি ﷺ বললেন, 'তুমি কীভাবে জানলে যে, সূরা ফাতিহা একটি

রুকইয়া?' তারপর বললেন, 'তোমরা ঠিকই করেছ। বণ্টন করো এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখো।' এ বলে নবি ﷺ হাসলেন।'[১৩]

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমেই সেই দংশিত ব্যক্তির ব্যথা সেরে গিয়েছিল। ফলে অন্য কোনো ওষুধের প্রয়োজন পড়েনি। কখনো কখনো সূরা ফাতিহা দ্বারা এমন এমন রোগ থেকেও আরোগ্য লাভ হয়; যেগুলো ওষুধ সেবনের মাধ্যমেও ভালো হয় না। এই ঘটনাটি ঘটেছে এমন জায়গায়, যা দুআ কবুলের স্থান নয়; হয়তো তারা অমুসলিম হওয়ার কারণে অথবা কৃপণ ও নীচ প্রকৃতির মানুষ হওয়ার কারণে। সুতরাং দুআ কবুলের স্থানে (তা প্রয়োগ করা) হলে, কেমন প্রতিক্রিয়া হবে বলে আপনার ধারণা?!

***

[১৩] বুখারি, ২২৭৬; মুসলিম, ২২০১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতিহায় ইবাদাত এবং সাহায্য প্রার্থনা

ইবাদাত এবং সাহায্য প্রার্থনা

نَعْبُدُ، نَسْتَعِيْنُ এই দুটি শব্দের মধ্যেই আদেশ ও নিষেধ, কিতাব ও শারীআত, সাওয়াব ও শাস্তির রহস্য নিহিত রয়েছে। এই দুটি শব্দের ওপরই দাসত্ব ও তাওহীদের ভিত্তি। এমনকি বলা হয়—আল্লাহ তাআলা ১০৪টি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; আর এর সবগুলো একত্রিত করে দিয়েছেন তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর এই তিনটির সবগুলো একত্রিত করে দিয়েছেন কুরআন মাজীদে। আর কুরআনের সবগুলো একত্রিত করে দিয়েছেন কুরআনের মুফাসসাল[১৪] অংশে। আর মুফাসসাল অংশের সবগুলো একত্রিত করে দিয়েছেন সূরা ফাতিহার এই আয়াতে—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

"আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"[১৫]

এই শব্দ দুটি আল্লাহ তাআলার মাঝে ও তাঁর বান্দাদের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টিত। إِيَّاكَ نَعْبُدُ হলো আল্লাহ তাআলার জন্য আর দ্বিতীয় অংশ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ হলো বান্দাদের জন্য। যথাস্থানে খুব শীঘ্রই এর রহস্য ও অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করব, ইন শা আল্লাহ।

---

[১৪] কুরআন মাজীদের শেষ অংশ, অর্থাৎ সূরা হুজুরাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাসমূহকে 'মুফাসসাল' বলা হয়।

[১৫] সূরা ফাতিহা, ১ : ৫।

ইবাদাত (اَلْعِبَادَةُ) : ইবাদাত বা দাসত্ব দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তা হলো : চূড়ান্ত বিনয় ও আনুগত্যের সাথে চূড়ান্ত ভালোবাসা। আরবরা বলে, طَرِيْقٌ مُعَبَّدٌ অর্থাৎ অধিক চলাচলকৃত, মসৃণ পথ। দাসত্ব বা তাআব্বুদ হলো বিনয় ও বশ্যতা স্বীকার করা। সুতরাং আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন, কিন্তু তার প্রতি বিনয়ী ও তার অনুগত না হন; তা হলে আপনি তার ইবাদাতকারী নন। এমনিভাবে আপনি কারও আনুগত্য করেন, কিন্তু তাকে ভালোবাসেন না; তা হলেও আপনি তার ইবাদাতকারী নন—যতক্ষণ-না আপনি তাকে ভালোবাসবেন এবং তার আনুগত্য করবেন।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, যারা আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসাকে অস্বীকার করেন, তারা মূলত দাসত্বের হাকীকতকেই অস্বীকার করেন। যারা বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার প্রিয় হওয়াকে অস্বীকার করেন, তারা আসলে আল্লাহ তাআলার ইলাহ্ হওয়াকেই অস্বীকার করেন। অথচ এটিই বান্দার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং তাঁর সুমহান চেহারার দর্শন পাওয়াই হলো তাদের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা। যদিও তারা স্বীকার করেন যে, তিনি পুরা বিশ্বের প্রতিপালক, তাদের সৃষ্টিকর্তা। তাদের তাওহীদের সীমানা এ পর্যন্তই, যা রুবূবিয়্যাতের তাওহীদ; (যেখানে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নেই, শুধু প্রতিপালন ও সৃষ্টির স্বীকৃতি রয়েছে।) আরবের মুশরিকরাও এটা স্বীকার করত; কিন্তু এই প্রকার স্বীকৃতির কারণে তারা শির্ক থেকে বের হতে পারেনি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে', তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।"[১৬]

আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলার ইলাহিয়্যাত বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদের বিষয়টি দ্বারা তাদের বিপক্ষে দলীল পেশ করা হবে। আর এটিও বলা হবে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারও ইবাদাত করা তাদের জন্য উচিত হয়নি; যেমন আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, তিনি ছাড়া আর কোনো রব নেই; ঠিক তেমনি তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ অর্থাৎ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যও কেউ নেই।

---

[১৬] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮৭।

সাহায্য প্রার্থনা (اَلْاِسْتِعَانَةُ) : এটিও দুটি বিষয়কে একত্রিত করে—আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা। কারণ মানুষ একজনের প্রতি আস্থা রাখা সত্ত্বেও তার কাজকর্মের ব্যাপারে তার ওপর ভরসা করে না; সে তার থেকে অনুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে। আবার কখনো কখনো কেউ কারও প্রতি আস্থা না রাখা সত্ত্বেও তার ওপর ভরসা করে; তার কাছে নিজের কোনো প্রয়োজন থাকার কারণে অথবা সে ছাড়া আর কেউ সেই কাজ করতে পারে না বলে। ফলে সে এমন ব্যক্তির ওপরও ভরসা করে; যার প্রতি তার কোনো আস্থা নেই।

তাওয়াক্কুল একসাথে আস্থা ও ভরসা দুটি বিষয়কেই বোঝায়। সাহায্য প্রার্থনা মানে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা অর্থাৎ আস্থা রাখা ও ভরসা করা। আর এটিই হলো إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর মূল বা হাকীকত। এই দুটি মৌলিক বিষয় অর্থাৎ ইবাদাত ও তাওয়াক্কুলকে কুরআনের বহু স্থানে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭]

ইবাদাতকে সাহায্য প্রার্থনার আগে উল্লেখ করার কারণ

সূরা ফাতিহায় ইবাদাত বা إِيَّاكَ نَعْبُدُ-কে সাহায্য প্রার্থনা করা বা وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মূলত উপকরণ ও মাধ্যমের আগে উদ্দেশ্যকে উল্লেখ করা। কারণ বান্দাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো ইবাদাত; ইবাদাত করার কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ইস্‌তিআনা বা সাহায্য প্রার্থনা করা হলো ইবাদাত ঠিকমতো আদায় করার মাধ্যম।

আরেকটি কারণ—إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর সম্পর্ক হলো আল্লাহ তাআলার ইলাহিয়্যাত এবং 'আল্লাহ' নামের সাথে। অন্যদিকে وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর সম্পর্ক হলো রুবূবিয়্যাত এবং তাঁর 'রব' নামের সাথে। এ কারণেই إِيَّاكَ نَعْبُدُ-কে وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর পূর্বে আনা হয়েছে; যেভাবে সূরার শুরুতে 'আল্লাহ' নামকে 'রব' নামের আগে আনা হয়েছে।

আরেকটি কারণ—إِيَّاكَ نَعْبُدُ হচ্ছে আল্লাহর অংশ। সূরার প্রথমাংশের আলোচনার সাথে এই বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যেহেতু প্রথমে আল্লাহর প্রশংসামূলক আলোচনা করা হয়েছে। তাই ইবাদাতকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আর وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ হচ্ছে

---

[১৭] দেখুন—সূরা হূদ, ১১ : ১২৩; সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ৪; সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ৮-৯; সূরা রা'দ, ১৩ : ৩০।

বান্দার অংশ। এর পরেও বান্দার অংশই আলোচনা করা হয়েছে— اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত। এই মিল থাকার কারণে وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-কেও পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি কারণ—সাহায্য প্রার্থনা করা হলো ইবাদাতেরই একটি অংশ। কিন্তু ইবাদাত করা মানেই সাহায্য প্রার্থনা করা নয়। আবার সাহায্য প্রার্থনা হলো আল্লাহ কাছ থেকে চাওয়া আর ইবাদাত হলো আল্লাহর প্রতিই নিবেদন। এ কারণেই ইবাদাতকে ইস্‌তিআনা বা সাহায্য প্রার্থনার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি কারণ—ইবাদাত কেবল মুখলিস বা একনিষ্ঠ বান্দাদের থেকেই হয়। আর ইস্‌তিআনা বা সাহায্য প্রার্থনা মুখলিস, গাইরে মুখলিস সবার থেকেই প্রকাশ পায়।

আরেকটি কারণ—ইবাদাত হলো আল্লাহ তাআলার হক; যা তিনি আপনার ওপর আবশ্যক করেছেন। আর ইস্‌তিআনা হলো ইবাদাতের জন্য শক্তি প্রার্থনা করা। এটি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের বর্ণনা; যার দ্বারা তিনি আপনার ওপর অনুগ্রহ করবেন। আর তাঁর হক আদায় করা তাঁর কাছে অনুগ্রহ চাওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই সমস্ত কারণ জানার দ্বারাই ইবাদাতকে ইস্‌তিআনা বা সাহায্য প্রার্থনা করার আগে উল্লেখ করার রহস্য উন্মোচিত হয়।

اِيَّاكَ-কে نَعْبُدُ ও نَسْتَعِيْنُ-এর পূর্বে উল্লেখ করার হিকমত

نَعْبُدُ এবং نَسْتَعِيْنُ এর পূর্বে اِيَّاكَ (কেবল আপনার) এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—আল্লাহ তাআলার সাথে উত্তম শিষ্টাচার, বান্দা তার নিজের কাজ (দাসত্ব ও সাহায্য প্রার্থনা)-এর আগে আল্লাহ তাআলার নাম উল্লেখ করবে। এর মধ্যে আল্লাহর দিকে বান্দার পরিপূর্ণ মনোযোগ ও তীব্র প্রয়োজনীয়তার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। এটি হাস্‌র বা সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয় অর্থাৎ 'আমরা অন্য কারও দাসত্ব করি না; আমরা কেবল আপনারই দাসত্ব করি' এমনিভাবে 'আমরা আর কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি না; আমরা শুধু আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি'—اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ দ্বারা এই অর্থই বোঝায়। এটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে

উঁচু মাপের একটি অলংকার; যা আরবি সাহিত্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। আপনি নিম্নে বর্ণিত দুটি আয়াত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করুন—

وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۝

“আর কেবল আমাকেই ভয় করো।”[১৮]

وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ۝

“আর একমাত্র আমার পাকড়াও থেকে নিজেদের বাঁচাও।”[১৯]

এই দুটি আয়াতে إِيَّايَ থাকার কারণে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধতা এসেছে অর্থাৎ ‘আমাকে ব্যতীত আর কাউকে ভয় করো না’ এবং ‘আমার পাকড়াও ছাড়া আর কারও পাকড়াও থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করো না’। এমনিভাবে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর ক্ষেত্রেও একই কথা। অর্থাৎ ‘আপনাকে ব্যতীত আমরা আর কারও ইবাদাত করি না আর আপনার নিকট ছাড়া আর কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনাও করি না’—এই অর্থ প্রদান করে। প্রতিটি সুস্থ বোধসম্পন্ন ব্যক্তিই রচনার এই ঢং থেকে এর সীমিত করার বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম।

ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনা অনুসারে মানুষের প্রকারভেদ

যখন ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনা সম্পর্কে জানা হয়ে গেল, তখন জেনে রাখুন এই দুটির বিবেচনায় মানুষ চার প্রকার—

প্রথম প্রকার : সবচেয়ে উত্তম ও সম্মানিত; যারা ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রতি একনিষ্ঠ। তাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করা এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা; যাতে আল্লাহ তাদেরকে তা যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করেন। এ কারণেই বান্দা আল্লাহর নিকট যা কিছু চায় তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা। আর এই বিষয়টিই নবি ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবি মুআয

[১৮] সূরা বাকারা, ২ : ৪০।
[১৯] সূরা বাকারা, ২ : ৪১।

ইবনু জাবাল ﷺ-কে শিখিয়েছিলেন। নবি ﷺ তাকে বলেছিলেন, "হে মুআয, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এই দুআটি পাঠ করা কখনো ছাড়বে না—

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

> হে আল্লাহ, আপনার যিক্‌র, আপনার শোকর এবং আপনার উত্তম ইবাদাত পালনে আমাকে সাহায্য করুন।"[২০]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ বলেছেন, 'আমি সবচেয়ে উপকারী দুআ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করে যা পেয়েছি তা হলো—আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিষয়সমূহে সাহায্য প্রার্থনা করা। অতঃপর সূরা ফাতিহায় (এর দলীল হিসেবে) পেয়ে গেলাম—إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ'[২১]

দ্বিতীয় প্রকার : (এই প্রকারের ব্যক্তিরা হলেন প্রথম প্রকারের সম্পূর্ণ বিপরীত।) এরা আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করা থেকে ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকে। ফলে তাদের না থাকে কোনো ইবাদাত আর না থাকে কোনো ইস্‌তিআনাত। বরং তাদের কেউ আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইলে, তা চায় কেবল তাদের খাহেশাত ও চাহিদা পূরণের জন্য; আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও হক পালনের জন্য নয়। আসলে আসমান-জমিনের সবাই আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চায়; আল্লাহর ওলি, আল্লাহর শত্রু সবাই চায় আর তিনি সবারকে দান করেন। আল্লাহ তাআলার নিকট সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো, তাঁর দুশমন ইবলীস (লাআনাহুল্লাহ)। এ সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার নিকট সে একটি প্রার্থনা করেছিল আর আল্লাহ তাকে সেটা দানও করেছিলেন। কিন্তু সেই চাওয়া যেহেতু আল্লাহ তাআলার খুশি ও সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে ছিল না, তাই সেটা তার দুর্ভাগ্যকে আরও বৃদ্ধি করেছে এবং আল্লাহ থেকে তাকে আরও দূরে নিক্ষেপ করেছে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নিজের ব্যাপারে এবং অন্যের ব্যাপারে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আর এটিও জেনে রাখা উচিত যে, কারও ডাকে আল্লাহর সাড়া দেওয়া

---

[২০] আবূ দাউদ, ১৫২২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২২১১৯।

[২১] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-মুসতাদরাক আলা মাজমূয়িল ফাতাওয়া, ১/১৭৫।

তার কারামাত ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে না। বরং বান্দা যখন আল্লাহর নিকট তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাআলা (তাঁর মহত্ত্বের কারণে) তাকে তা দিয়ে দেন। অথচ সেই বস্তুর মধ্যেই সে বান্দার ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে সেটি দেওয়ার অর্থ হলো, সে আল্লাহর নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত এবং সে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে দূরে রয়েছে। অনেক সময় আল্লাহ তাআলা ব্যক্তির চাওয়ামতো বস্তু দান করেন না। এটি হয় আল্লাহর নিকট সে ভালোবাসার ও সম্মানের অধিকারী বলে। ফলে তিনি তাকে তা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন—তাকে হেফাজত করা, সুরক্ষা করা ও অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে; কৃপণতা করে নয়। সেই ব্যক্তির সাথেই তিনি এ রকম করে থাকেন, যার ব্যাপারে তিনি সম্মান, ভালোবাসা ও কল্যাণের ইচ্ছা করেন। আল্লাহ তাআলা এভাবে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন আর মূর্খতার দরুন বান্দা ভাবে যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না এবং তার ডাকে সাড়া দেন না। সে যখন দেখে অন্যদের প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে আর তার প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে না, তখন সে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিকট নির্দিষ্ট কোনো বস্তু প্রার্থনা করা থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকুন; যার কল্যাণ ও উত্তম পরিণতি সম্পর্কে আপনার জানা নেই। যখন আপনার কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর প্রয়োজন হবে, তখন তা আল্লাহ তাআলার ইলমের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে প্রার্থনা করবেন (যে, যদি সেই বস্তুর মধ্যে আপনার জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে, তা হলে যেন তিনি তা আপনাকে দান করেন।) আর প্রার্থনা করার পূর্বে ইস্‌তিখারা[২২] করবেন। ইস্‌তিখারা যেন আবার প্রজ্ঞাহীন কেবল মৌখিক কথা না হয়; বরং ইস্‌তিখারা করবেন সেই ব্যক্তির ইস্‌তিখারার মতো, যে তার প্রার্থিত বস্তুর উপকারিতা-অপকারিতা সম্পর্কে কিছুই জানে না, তা অর্জন করার সামর্থ্যও রাখে না, সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানার পথও পায় না, যে নিজের লাভ-ক্ষতি করার সক্ষমতা রাখে না; বরং যদি সে ক্ষেত্রে তাকে তার নিজের প্রতিই ন্যস্ত করা হয়, তা হলে সে পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে।

---

[২২] আল্লাহ তাআলার নিকট ইস্‌তিখারা করার অর্থ হলো—নিজের জন্য কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া, তাঁর কাছে তা পেশ করা; যাতে বান্দা কল্যাণকর বস্তুর অধিকারী হয়, ক্ষতিকর বস্তু থেকে রক্ষা পায়। ইস্‌তিখারা করার বিশেষ পদ্ধতি ও বিশেষ দুআ রয়েছে। অনুসন্ধানী পাঠক 'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া' বইটি থেকে সাহায্য নিতে পারেন।

তৃতীয় প্রকার : যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করে, কিন্তু তাঁর নিকট কোনো সাহায্য প্রার্থনা করে না। এই প্রকারের ব্যক্তিগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত—

১. কাদারিয়্যা; যারা বলে—আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সব ধরনের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়ে তাদেরকে সব ধরনের ক্ষমতা দান করেছেন। ফলে বান্দার কোনো কাজে সাহায্য করা এখন আর আল্লাহ তাআলার ক্ষমতায় নেই। (তাকদীরের ক্ষমতা এখন বান্দার হাতে।) কারণ আল্লাহ তাআলা তো নিরাপদ মাধ্যম সৃষ্টি করে দিয়ে, পথ চিনিয়ে, নবি-রাসূল প্রেরণ করে এবং কাজ করার সক্ষমতা দান করে বান্দাকে সাহায্য করেছেন। সুতরাং এর পরে আর সাহায্য চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং সাহায্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের মাঝে সমতা রক্ষা করেছেন। ফলে দুদলকেই সমান সাহায্য করেছেন। কিন্তু তাঁর বন্ধু বা ওলিরা নিজেদের জন্য ঈমানের পথ বেছে নিয়েছে। আর তাঁর দুশমনরা নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছে কুফরের পথ। বিষয়টি এমন নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুদের জন্য অতিরিক্ত তাওফীক দান করেছেন, যার কারণে তারা ঈমান এনেছে। আর তিনি তাঁর শত্রুদের বিশেষ কিছু দিয়ে লাঞ্ছিত করেছেন, যার ফলে তারা কুফর অবলম্বন করেছেন।

এই শ্রেণির ব্যক্তিদের ইবাদাতের অংশ অনেক কম। আর সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি তো তাদের সাথে নেই-ই। তারা নিজেদের প্রতিই ন্যস্ত। (তাকদীর বলে কিছুই নেই তাদের কাছে।) তাওহীদ ও ইস্তিআনার পথ তাদের জন্য বন্ধ। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, 'তাকদীরের ওপর বিশ্বাস হলো তাওহীদের মূল। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান আনে, কিন্তু তাকদীরকে অস্বীকার করে; তার এই অস্বীকার করা তার তাওহীদকে ভেঙে দেয়।'[২৩]

২. এই শ্রেণির ব্যক্তিরা ইবাদাত-বন্দেগি করে; কিন্তু তাদের তাওয়াক্কুল ও সাহায্য প্রার্থনা করার বিষয়টি অনেক কম। তাকদীরের সাথে উপায়-উপকরণের যে সম্পৃক্ততা, তার প্রতি তাদের অন্তর প্রসারিত হয় না।

ফলে তাদের অন্তর্দৃষ্টি বাহ্যিক বস্তুতেই আটকে থাকে, আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় না, কারণ থেকে প্রকৃত কার্যকারকের দিকে তাদের অন্তর ফেরে না, মাধ্যম থেকে

[২৩] আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ, আস-সুন্নাহ, ৯২৫।

মূল পর্যন্ত তারা যেতে পারে না। এ কারণে তাদের দৃঢ়তা ও ইচ্ছাশক্তি দুর্বল ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিণতিতে وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর থেকে তাদের অংশ হ্রাস পায়। তাওয়াক্কুল ও ইস্তিআনাতের মাধ্যমে তারা ইবাদাতের স্বাদ পায় না। যদিও তারা ওজীফা ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে এর কিছু স্বাদ অনুভব করে থাকে।

এই সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের তাওয়াক্কুল ও সাহায্য চাওয়া অনুপাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক, কর্তৃত্ব ও প্রভাব পেয়ে থাকে। ঠিক তেমনি তাদের তাওয়াক্কুল ও সাহায্য চাওয়ার ঘাটতি অনুযায়ী তাদের জন্য জোটে অপমান, লাঞ্ছনা, দুর্বলতা ও অক্ষমতা। আল্লাহ তাআলা যদি পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুকুম দিত; আর বান্দা আল্লাহর ওপর যথাযথ ও পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করে কাজে নেমে পড়ত; তা হলে অবশ্যই সে পাহাড়কে তার আপন স্থান হতে সরিয়ে দিতে পারত!

এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন তাওয়াক্কুল এবং সাহায্য চাওয়ার অর্থ কী?

উত্তরে বলব, এটি অন্তরের একটি অবস্থা; যা সৃষ্টি হয় আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে বান্দার সঠিক জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে; অর্থাৎ সবকিছু সৃষ্টি করা, পরিচালনা করা, উপকার ও ক্ষতি পৌঁছানো, কাউকে দেওয়া ও না-দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা যে একক, অদ্বিতীয় ও অমুখাপেক্ষী এর ওপর ঈমান আনার মাধ্যমে। এমনিভাবে এই বিশ্বাসের মাধ্যমেও এই অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তিনি যা চান, তা-ই করেন; যদিও মানুষ না চায়, আর তিনি যা চান না, তা কখনো হয় না; যদিও মানুষ তা করতে চায়। এই সমস্ত বিষয়গুলোই ব্যক্তির মনে আল্লাহর ওপর ভরসা, আস্থা, নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করে।

চতুর্থ প্রকার : এই প্রকারের ব্যক্তিরা দেখে যে, আল্লাহ তাআলাই লাভ-ক্ষতির একচ্ছত্র মালিক, তিনি যা চান, তা-ই সংঘটিত হয় আর তিনি যা চান না, তা কখনো বাস্তবায়িত হয় না। ফলে তারা তাদের দুনিয়াবি স্বার্থের বেলায়, যেমন : ধনসম্পদ, কর্তৃত্ব, রাজত্ব, পদবি, সম্মান ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর করে, তাঁর নিকটই সেগুলোর প্রার্থনা করে এবং এর জন্য চেষ্টা-মেহনত করে। কিন্তু আল্লাহ কী পছন্দ করেন, কী ভালোবাসেন, কী অপছন্দ করেন আর কী ঘৃণা করেন সেগুলোর ব্যাপারে কোনো পরোয়া করে না, কোনো খবর রাখে না। সুতরাং কেউ যদি তার দুনিয়াবি সফলতা দেখে এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সেই

ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন, তার ওপর তিনি সন্তুষ্ট, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যশীল ওলিদের অন্তর্ভুক্ত; তা হলে সে সবচেয়ে বড়ো মূর্খ; আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে অতি অজ্ঞ, যে পার্থক্য করতে পারে না, কোন বিষয়গুলো আল্লাহ্ পছন্দ করেন, কোন বিষয়গুলোতে তিনি সন্তুষ্ট; কোন বিষয়গুলো তিনি অপছন্দ করেন আর কোন বিষয়গুলো তাঁকে রাগান্বিত করে তোলে।

***

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর বাস্তবায়ন

অনুসরণ ও একনিষ্ঠতা

উপরিউক্ত বিষয়গুলো যখন জানা হয়ে গেল, তখন জেনে রাখুন—বড়ো বড়ো দুটি ভিত্তি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি إِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি"—এর গুণে গুণান্বিত হতে পারে না :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ(مُتَابَعَةُ الرَّسُوْلِ) এবং

২. আল্লাহ তাআলার প্রতি একনিষ্ঠতা (اَلْإِخْلَاصُ لِلْمَعْبُوْدِ)।

এ দুটির মাধ্যমেই إِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি"-এর বাস্তবায়ন হয়।

এই দুটি ভিত্তি অনুসারে মানুষ চার প্রকার—

প্রথম প্রকার : যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি একনিষ্ঠ এবং আন্তরিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণকারী। প্রকৃতপক্ষে এরাই হলো إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর গুণে গুণান্বিত। তাদের সমস্ত আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের সমস্ত কথাবার্তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের দান-সদাকা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কাউকে দেওয়া থেকে বিরত থাকাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত কাজকর্ম একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়, তারা নিজের আমলের মাধ্যমে মানুষের নিকট কোনো প্রতিদান, প্রশংসা, পদবি, সম্মান, ভালোবাসা বা তাদের নিন্দা থেকে বেঁচে থাকা কিছুই প্রত্যাশা করে না।

এমনিভাবে তাদের সব আমল ও ইবাদাত আল্লাহর হুকুম মোতাবিক হয়; আল্লাহ

যা ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন সে অনুসারেই সাজানো তাদের প্রতিটি কাজ। আসলে আল্লাহ তাআলা তো কেবল সে আমলই কবুল করেন, যা তাঁর হুকুম মোতাবিক করা হয় এবং শুধু তাঁর উদ্দেশ্যেই করা হয়। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বান্দাকে জীবন ও মৃত্যু দান করে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।"[২৪]

আর জমিনের ওপরে যা কিছু রয়েছে, তা তিনি সৌন্দর্যস্বরূপ বানিয়েছেন; যাতে বান্দাদের যাচাই করতে পারেন তাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ?

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷬ বলেছেন, 'উত্তম আমল হলো যা সবচেয়ে একনিষ্ঠ ও সবচেয়ে সঠিক।' সাথিসঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আবূ আলি, একনিষ্ঠ ও সঠিক আমল কী?' জবাবে তিনি বললেন, 'আমল যখন একনিষ্ঠ হয় আর সঠিক না হয়, তখন তা কবুল করা হয় না। আবার আমল যখন সঠিক হয় কিন্তু ইখলাসপূর্ণ বা একনিষ্ঠ না হয়, তখনো তা কবুল করা হয় না; যতক্ষণ-না একনিষ্ঠ ও সঠিক হয়। একনিষ্ঠ হওয়া মানে শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হওয়া আর আমল সঠিক হবে তখন, যখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসারে করা হবে।'[২৫]

দ্বিতীয় প্রকার : যাদের না আছে ইখলাস আর না আছে সুন্নাহর অনুসরণ। তাদের কোনো আমলই শারীআত মোতাবিক হয় না, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেও হয় না। যেমন : মানুষের চোখে ভালো সাজার জন্য যারা আমল করে, যারা লোক দেখানোর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতাদর্শ ব্যতীত ভিন্ন কোনো আদর্শের কথা প্রচার করে। এরা হলো সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আল্লাহ তাআলার নিকট এরা সবচেয়ে ঘৃণিত। তাদের জন্য এই আয়াতে পরিপূর্ণ অংশ রয়েছে—

لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا۟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

[২৪] সূরা মুলক, ৬৭ : ২।

[২৫] ইবনু তাইমিয়্যা, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৬/২১৭।

> “যারা নিজেদের কার্যকলাপে আনন্দিত এবং যে কাজ যথার্থই তারা নিজেরা করেনি সেজন্য প্রশংসা পেতে ভালোবাসে, তাদেরকে তোমরা আযাব থেকে সংরক্ষিত মনে কোরো না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।”[২৬]

তারা যে সমস্ত বিদআত, গোমরাহি ও শির্কি আমল করে, তার জন্য আনন্দিত হয় আর তারা ইখলাস ও সুন্নাহর অনুসরণ করেছে বলে প্রশংসাও পেতে চায়।

তৃতীয় প্রকার : এই শ্রেণির ব্যক্তিরা তাদের আমলে মুখলিস বা একনিষ্ঠ থাকে; কিন্তু তাদের আমল হয় সুন্নাহ বহির্ভূত। যেমন : মূর্খ ইবাদাতগুজার ব্যক্তিরা; যাদেরকে ‘দুনিয়াবিমুখ’, ‘সূফি-দরবেশ’ বলে অভিহিত করা হয়। তাদের কেউ কেউ ধারণা করে জুমুআ-জামাআহ ছেড়ে নির্জনতা অবলম্বন করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম!

চতুর্থ প্রকার : যাদের আমল হয় সুন্নাহ মোতাবিক; কিন্তু তা হয় গাইরুল্লাহর জন্য। যেমন : রিয়াকারী ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি যে জিহাদ করে বীরত্ব, সাহসিকতা ও আপন সম্প্রদায়কে রক্ষার উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তি হাজ্জ করে এই উদ্দেশ্যে যে, লোকে তাকে হাজী বলবে ইত্যাদি।

এদের আমল বাহ্যিকভাবে সুন্দর ও নেক বলে মনে হয়। কিন্তু ভেতরগতভাবে ইখলাস থেকে শূন্য থাকে; ফলে তা কবুল করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

> “তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো হুকুম দেওয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে।”[২৭]

ইবাদাতের ভিত্তিসমূহ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর প্রতিষ্ঠা চারটি ভিত্তির ওপর। আর তা হলো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

[২৬] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৮৮।

[২৭] সূরা বায়্যিনাহ, ৯৮ : ৫।

যা কিছু ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন, তা বাস্তবায়ন করা—

১. মুখের ভাষায়,

২. অন্তরের ভাষায়,

৩. অন্তরের আমল দ্বারা এবং

৪. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল দ্বারা।

প্রকৃত দাসত্ব বা উবুদিয়্যাহ এই চারটি ভিত্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যারা এই চারটি বিষয়ের অধিকারী, তারাই প্রকৃত إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর গুণে গুণান্বিত।

অন্তরের ভাষায় : আল্লাহ তাআলা নিজের সত্তা, নাম, গুণাবলি, কাজকর্ম, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর সাক্ষাৎ ইত্যাদি সম্পর্কে নবি ﷺ-এর মাধ্যমে যা কিছু জানিয়েছেন, তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা।

মুখের ভাষায় : এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অপরকে জানানো, এর প্রতি আহ্বান করা, এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তা প্রতিহত করা, বিদআতকে বাতিল হিসাবে প্রকাশ করা, আল্লাহ তাআলার স্মরণে নিমগ্ন থাকা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

অন্তরের আমলের দ্বারা : যেমন : আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা, তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া, তাঁকে ভয় করা, তাঁর নিকটেই আশ্রয় গ্রহণ করা, সমস্ত আমলকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশাতেই সম্পন্ন করা, আল্লাহ তাআলার হুকুম মানতে গিয়ে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে গিয়ে কষ্ট সহ্য করা, তাঁর ফায়সালা ও তাকদীরের ওপর সবর করা, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কারও সাথে দুশমনি রাখা, তার প্রতি বিনয়ী হওয়া, মুখাপেক্ষী থাকা, তাঁর ওপর আস্থা রাখা, নিশ্চিন্ত হওয়াসহ অন্তরের এ রকম আরও অনেক আমল এর মধ্যে শামিল; যার গুরুত্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের চেয়ে অনেক বেশি। অন্তরের পছন্দনীয় আমল আল্লাহ তাআলার নিকট বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পছন্দনীয় আমলের চেয়ে বেশি প্রিয়। অন্তরের এই আমলগুলো ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আমল উপকারশূন্য বা কম উপকারী।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের দ্বারা : যেমন : সালাত, জিহাদ, জুমুআ ও জামাআতের দিকে যাওয়া, অক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্য করা, সৃষ্টিজগতের কল্যাণে এগিয়ে আসা ইত্যাদি।

সুতরাং إِيَّاكَ نَعْبُدُ এই চারটি বিষয়কেই আবশ্যক করে এবং এর স্বীকৃতি দেয়। আর وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ হলো এগুলো পালনে আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক প্রার্থনা করা। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এই দুটি বিষয়কেই বিস্তারিতভাবে শামিল করে। তা পালন করতে অনুপ্রেরণা জোগায়, সালিকীন বা আল্লাহ-অভিমুখীদের আল্লাহর পথে চলা অব্যাহত রাখে।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ মৃত্যু পর্যন্ত আবশ্যক

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে বলেছেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

"এবং আপনার নিকট 'সুনিশ্চিত বিষয়' আসা পর্যন্ত আপনার রবের ইবাদাত করতে থাকুন।"[২৮]

জাহান্নামবাসীরা বলবে,

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

"আমরা বিচারের দিনকে মিথ্যা মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সে সুনিশ্চিত বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছি।"[২৯]

মুফাস্‌সিরগণের ইজমা হয়েছে—এখানে 'সুনিশ্চিত বিষয়' বলতে মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে।

উসমান ইবনু মাযঊন رضي الله عنه-এর মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে *'সহীহ বুখারি'*-র বর্ণনায় এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

---

[২৮] সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ৯৯।

[২৯] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৪৬-৪৭।

أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ مِنْ رَبِّهِ

"আর উসমান; তার কাছে তো তার রবের পক্ষ থেকে 'সুনিশ্চিত বিষয়' এসে গেছে।"[৩০] অর্থাৎ মৃত্যু ও মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয়।

সুতরাং বান্দা যত দিন এই দুনিয়ার জীবনে রয়েছে ইবাদাত-বন্দেগি আর দাসত্ব থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। বরং কবরের জীবনেও তার জন্য রয়েছে অন্য রকম এক দাসত্ব। কারণ সেখানে দুজন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'সে কার ইবাদাত করত? আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে সে কী বলে?' ফেরেশতাদ্বয় তার কাছ থেকে এর উত্তর খুঁজবে।[৩১]

কিয়ামাতের ময়দানেও বান্দার জন্য এক প্রকারের দাসত্ব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সেদিন সমগ্র সৃষ্টিকে সাজদা করার আহ্বান করবেন। ফলে মুমিনরা সাজদায় পড়ে যাবে আর কাফির-মুনাফিকরা অবশিষ্ট থেকে যাবে, তারা সাজদা করতে পারবে না। অতঃপর যখন সবাই জান্নাত-জাহান্নামে চলে যাবে, তখন আর কোনো দাসত্ব ও দায়িত্ব থাকবে না। তখন জান্নাতবাসীদের দাসত্ব হবে তাসবীহ পাঠ; যা তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে মিলানো থাকবে। এতে তারা কোনো ধরনের কষ্ট কিংবা ক্লান্তি অনুভব করবে না।

যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে এমন মর্তবায় পৌঁছে গেছে, যেখানে দাসত্ব ও ইবাদাত-বন্দেগির আর কোনো প্রয়োজন নেই—তা হলে সে যিনদীক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারী। সে এর দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করার স্তরে পৌঁছে যায়। দ্বীন থেকে সে পুরাপুরি বের হয়ে যায়। আসলে বান্দা যখন উচ্চ কোনো মানযিলে পৌঁছে, তখন তার ইবাদাতের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়, তার ওপর আরও বড়ো দায়িত্ব এসে পড়ে; যা থেকে তার নিচের স্তরের ব্যক্তিরা মুক্ত থাকে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওপর; বরং সমস্ত নবি-রাসূলের ওপর দায়িত্ব ছিল তাদের উম্মাতের চেয়ে অনেক বেশি ও বড়ো। নবি-রাসূলদের মধ্যে আবার যারা উলুল আযম বা দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন, তাদের দায়িত্ব ছিল আরও বেশি; তাদের তুলনায় যারা ছিল তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের। এমনিভাবে ইলমের অধিকারী

[৩০] বুখারি, ১২৪৩।

[৩১] দেখুন—বুখারি, ১৩৭৪; মুসলিম, ২৮৭১।

যারা ছিলেন, তাদের দায়িত্বও ছিল অনেক বড়ো, তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের তুলনায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার মর্যাদা অনুসারে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

দাসত্বের প্রকারভেদ

দাসত্ব দুই প্রকার :

১. সাধারণ দাসত্ব ও

২. বিশেষ দাসত্ব।

১. সাধারণ দাসত্ব (اَلْعُبُوْدِيَّةُ الْعَامَّةُ) : আল্লাহ তাআলার প্রতি সমস্ত আসমানবাসী ও জমিনবাসীর দাসত্ব; সৎ-অসৎ, মুমিন-কাফির সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এটি হলো আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও জবরদস্তিমূলক দাসত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

"তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। মারাত্মক বাজে কথা, যা তোমরা তৈরি করে এনেছ। আকাশ ফেটে পড়ার, পৃথিবী বিদীর্ণ হবার এবং পাহাড় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে—এজন্য যে, লোকেরা রহমানের জন্য সন্তান থাকার দাবি করেছে! কাউকে সন্তান গ্রহণ করা রহমানের জন্য শোভনীয় নয়। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলিতে যারা রয়েছে, সবাই তাঁর সামনে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে।"[৩২]

সুতরাং মুমিন-কাফির সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

২. বিশেষ দাসত্ব (اَلْعُبُوْدِيَّةُ الْخَاصَّةُ) : এটি হলো আনুগত্য, মহাব্বত ও হুকুম পালনের দাসত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

[৩২] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৮-৯৩।

"হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।"[৩৩]

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهٗ

"অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদের। যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শোনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে।"[৩৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا

"রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।"[৩৫]

সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহ তাআলার রুবূবিয়্যাতের বান্দা। আর আল্লাহর আনুগত্য ও বেলায়াতের অধিকারী বা নৈকট্যশীল ব্যক্তিরা হলো আল্লাহ তাআলার ইলাহিয়্যাতের বান্দা।

দাসত্ব (اَلْعُبُوْدِيَّةُ) দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণ হলো এই শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে—বিনয় ও নম্র হওয়া। আল্লাহর বন্ধুরা তাঁর প্রতি বিনয়ী ও নম্র হন স্বেচ্ছায় ও ইবাদাতের ভিত্তিতে। আর আল্লাহর শত্রুরা বিনয়ী হয় অনিচ্ছায় ও বাধ্য হয়ে।

***

---

[৩৩] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৬৮।

[৩৪] সূরা যুমার, ৩৯ : ১৭-১৮।

[৩৫] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইলমি ও আমলিভাবে إِيَّاكَ نَعْبُدُ -এর স্তরসমূহ

দাসত্বের স্তর

ইলম ও আমল অনুসারে দাসত্বের অনেকগুলো স্তর রয়েছে।

দাসত্বের ইলমি স্তর হলো দুইটি :

এক. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে ইলম এবং

দুই. আল্লাহ তাআলার দ্বীন সম্পর্কে ইলম।

এক. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে ইলম আবার পাঁচটি স্তরে বিভক্ত :

১. আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে ইলম,

২. আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে ইলম,

৩. আল্লাহর কার্যাবলি সম্পর্কে ইলম,

৪. আল্লাহর নামসমূহ সম্পর্কে ইলম এবং

৫. আল্লাহকে এমন সব গুণাবলি থেকে মুক্ত রাখার ইলম, যা তাঁর অনুপযুক্ত।

দুই. আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ইলমের আবার দুইটি স্তর রয়েছে :

১. দ্বীনের মধ্যে আল্লাহর আদেশসূচক বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। আর এটিই হলো সিরাতে মুস্তাকীম; যা ব্যক্তিকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

২. দ্বীনের ছোটো ছোটো বিষয়গুলো সম্পর্কেও জ্ঞান রাখা। যা সাওয়াব ও আযাব এবং আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলদের সম্পর্কে জানাকেও

অন্তর্ভুক্ত করে।

দাসত্বের আমলি স্তর আবার দুই প্রকার :

এক. ডান দিকের লোকদের স্তর এবং

দুই. নৈকট্যশীল অগ্রগামীদের স্তর।

এক. ডান দিকের লোকদের স্তর : ওয়াজিব আমলগুলো পালন করা এবং হারাম ও নিষিদ্ধ কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকা। তবে বৈধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া, কিছু অপছন্দনীয় কাজে জড়িয়ে পড়া এবং কিছু পছন্দনীয় কাজ পরিত্যাগ করাও এই স্তরের শামিল।

দুই. নৈকট্যশীল অগ্রগামীদের স্তর : ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয়গুলো পালন করা এবং হারাম ও অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। বৈধ হলেও আখিরাতে যে কথা বা কাজের কোনো উপকার পাওয়া যাবে না, সেগুলো থেকেও দূরে থাকা এবং ক্ষতির আশঙ্কা আছে এমন বস্তু থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

এই স্তরের ব্যক্তিদের (অন্যতম একটি) বৈশিষ্ট্য হলো : দুনিয়াবি বৈধ বিষয়গুলোকেও উত্তম নিয়তের মাধ্যমে তারা সাওয়াব ও নৈকট্য লাভের বস্তুতে রূপান্তরিত করে নেয়। ফলে তাদের ক্ষেত্রে এমন কোনো আমল পাওয়া যাবে না যা শুধুই বৈধ; (লাভ-ক্ষতির) উভয় দিক সমান। বরং তাদের প্রতিটি আমলই পছন্দনীয় ও লাভজনক। তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা অনেক মুবাহ বা বৈধ বিষয়কে বিভিন্ন ইবাদাতের কারণে ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই স্তরের ব্যক্তিরা সেগুলোকেই ইবাদাতে রূপান্তরিত করে নেয়। এই দুই স্তরের ব্যক্তিদের জন্য এত বেশি মর্যাদা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ তার হিসাব রাখতে সক্ষম নয়।

***

দাসত্বের চাকা ১৫টি বিষয়ের সাথে চলমান থাকে; যে ব্যক্তি এই ১৫টি বিষয়কে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করবে, তার দাসত্বের স্তরগুলোও পূর্ণতা পাবে।

১৫টি বিষয়ের বর্ণনা : অন্তর, জবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এই তিনটি ভাগে দাসত্ব বিভক্ত।

প্রত্যেকটির ওপর ভিন্ন ভিন্ন দাসত্ব রয়েছে।

আর দাসত্ব-কেন্দ্রিক হুকুম হলো পাঁচটি : ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ (অপছন্দনীয়) ও মুবাহ (বৈধ)। এই পাঁচটির প্রত্যেকটি আবার উপরিউক্ত অন্তর, জবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। (আর এভাবে ৩×৫=১৫ প্রকার হয়।)

অন্তরের দাসত্ব (عُبُوْدِيَّةُ الْقَلْبِ) : অন্তরের ওয়াজিব দাসত্বের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব, আর কিছু বিষয় রয়েছে মতভেদপূর্ণ।

সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব বিষয়গুলো হলো : যেমন : ইখলাস, তাওয়াক্কুল, মহাব্বত, সবর, আল্লাহর দিকে ধাবমান হওয়া, আল্লাহর ভয়, আশা, দৃঢ় সত্যায়ন এবং ইবাদাতে নিয়ত করা; আর এটি হলো ইখলাসের চেয়ে অতিরিক্ত একটি বিষয়। কারণ (নিয়ত করা ও ইখলাস এক কথা নয়); ইখলাস হলো ইবাদাতের ক্ষেত্রে অন্য সকল সৃষ্টি থেকে আল্লাহকে আলাদা রাখা।

ইবাদাতে নিয়ত করার দুইটি স্তর রয়েছে—

১. আদত বা অভ্যাস থেকে ইবাদাতকে পৃথক করা এবং

২. বিভিন্ন প্রকার ইবাদাতকে একটি থেকে আরেকটি আলাদা করা।

এই তিনটি প্রকার (অর্থাৎ ইখলাস এবং নিয়তের দুটি স্তর) ওয়াজিব।

এমনিভাবে সিদ্‌ক বা সত্যবাদিতাও ওয়াজিব। সত্যবাদিতা ও ইখলাসের মাঝে পার্থক্য হলো—নিশ্চিতভাবেই বান্দার (কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন) উদ্দেশ্য (اَلْمَطْلُوْبُ) ও দাবি (اَلطَّلَبُ) থাকে। ইখলাস হলো উদ্দেশ্যকে এক করা (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আমল করা) আর সত্যবাদিতা হলো দাবিকে এক করা (অর্থাৎ ভেতর-বাহিরের দাবি এক হওয়া)।

ইখলাস হলো উদ্দেশ্য বিভক্ত না হওয়া আর সত্যবাদিতা হলো দাবি বিভক্ত না হওয়া। সুতরাং সত্যবাদিতা হলো কঠোর পরিশ্রম করা আর ইখলাস হলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এক রাখা।

উম্মাহ একমত পোষণ করেছে যে, মোটামুটিভাবে এই আমলগুলোই অন্তরের ওপর ওয়াজিব।

এমনিভাবে দাসত্বের ক্ষেত্রে আন্তরিক থাকা আবশ্যক। দ্বীনের ভিত্তিই এর ওপর। এর অর্থ হলো ইবাদাতকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবিক সর্বোত্তম পন্থায় আদায় করতে চেষ্টা করা। এর মূল বিষয়টি ওয়াজিব আর এতে পরিপূর্ণতা অর্জন করা হলো নৈকট্যশীল ব্যক্তিদের স্তর।

অনুরূপভাবে অন্তরের প্রতিটি ওয়াজিব আমলের ক্ষেত্রে দুইটি দিক রয়েছে : অপরিহার্যভাবে ওয়াজিব; যা আসহাবুল ইয়ামীন অর্থাৎ ডান দিকের লোকদের স্তর এবং আরেকটি হলো ওয়াজিব আদায়ের পর আরও পরিপূর্ণ করা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা; এটি হলো নৈকট্যশীল অগ্রগামী বান্দাদের স্তর; এটি মুস্তাহাব।

এমনিভাবে সবর বা ধৈর্য ধারণ করাও সর্বসম্মতিক্রমে অন্তরের ওয়াজিব আমল। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀ বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ৯০ জায়গায় বা ৯০-এর চেয়ে কিছু বেশি জায়গায় সবরের কথা উল্লেখ করেছেন। এরও দুইটি দিক রয়েছে : ১. অপরিহার্যভাবে ওয়াজিব এবং ২. ওয়াজিব পালনের পর তা পরিপূর্ণ করা, যা মুস্তাহাব।

মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো হলো : যেমন : (সৃষ্টিগত বা তাকদীরি বিষয়ের ক্ষেত্রে) রিযা বা সন্তুষ্টি। কেননা এর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম ও সূফিয়ায়ে কেরামের দুটি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে।

যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের বক্তব্য হলো : আল্লাহ তাআলার কোনো বিধানে অসন্তুষ্ট হওয়া বা রাগান্বিত হওয়া হারাম। এর থেকে মুক্তি মেলে কেবল সন্তুষ্ট হওয়ার মাধ্যমেই। আর যা ছাড়া হারাম থেকে মুক্তি মেলে না, তা ওয়াজিব। সুতরাং রিযা বা সন্তুষ্ট হওয়াও ওয়াজিব।

আর যারা মুস্তাহাব বলেছেন তাদের বক্তব্য হলো : এ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর কোথাও কোনো আদেশসূচক বাণী আসেনি। তবে যারা সন্তুষ্ট থাকেন তাদের ব্যাপারে কুরআনে কেবল প্রশংসার বর্ণনা এসেছে; সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়নি।

যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের খণ্ডনে তারা বলেন, ‘কেবল সন্তুষ্ট হওয়ার দ্বারাই অসন্তুষ্টি বা রাগান্বিত অবস্থা থেকে মুক্তি মেলে’—এই কথাটি সঠিক নয়। কারণ

ভাগ্য মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা তিন ধরনের : ১. রিযা বা সন্তুষ্টি; এটি সর্বোচ্চ স্তরের, ২. অসন্তুষ্টি; এটি সর্বনিম্ন স্তরের এবং ৩. আপতিত বিষয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে সবর করা; এটি মধ্যম স্তরের। সুতরাং সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ সন্তুষ্টি হলো মুকাররাবীন বা নৈকট্যশীলদের জন্য। মধ্যম স্তরটি হলো সাধারণ নেককারদের জন্য আর সর্বনিম্ন স্তরটি হলো জালিম বা অত্যাচারীদের জন্য। অনেক মানুষ নিজের ভাগ্যের ওপর সবর করে জীবনযাপন করে; কিন্তু সেটি তাদের অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত করে না। তারা তাতে অসন্তুষ্টও নয়। সুতরাং বোঝা গেল সন্তুষ্টি বা রিযা হলো (রাগান্বিত হওয়া বা না হওয়া) থেকে আলাদা একটি বিষয়।

তাদের মধ্যকার এই মতভেদ কেবল সৃষ্টিগত বা তাকদীরি বিষয়ের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তাআলাকে রব ও ইলাহ্ হিসেবে এবং দ্বীনি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। বরং এই প্রকার সন্তুষ্টি ব্যতীত কেউ মুসলিমই হতে পারে না। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মানার ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক।

মূলকথা : অন্তর হলো রাজা এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হলো এর প্রজা; এরা সবাই আল্লাহ তাআলার দাসত্ব যথাযথভাবে পালন করবে এবং তাতে অবিচল থাকবে।

অন্তরের ওপর যেগুলোকে হারাম করা হয়েছে—যেমন : অহংকার, রিয়া, আত্মগর্ব, হিংসা, গাফলত, নিফাক ইত্যাদি—তা দুই প্রকার : কুফর ও গুনাহ।

কুফর : যেমন : সন্দেহ-সংশয়, নিফাক, শির্ক এবং শির্কের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

অন্তরের গুনাহ আবার দুই প্রকার : কবীরা ও সগীরা।

আত্মিক কবীরা গুনাহ : যেমন : রিয়া বা লোক-দেখানো-প্রবণতা, আত্মগর্ব, অহংকার, দম্ভ, বড়াই, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া, মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টে আনন্দ-উল্লাস করা, মুসলমানদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে যাক—এটা পছন্দ করা, আল্লাহ তাআলা অন্য মুসলিমদেরকে যে নিয়ামাত দান করেছেন সে কারণে তাদের হিংসা করা, তাদের থেকে তা নিঃশেষ

হোক—এই কামনা করা, এবং এই রকম আরও আত্মিক কবীরা গুনাহ্সমূহ; যা ব্যভিচার, মদপান ও এই ধরনের প্রকাশ্য-কবীরা গুনাহ থেকেও বেশি জঘন্য ও মারাত্মক। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এবং তাওবা করা ব্যতীত অন্তর ও শরীরের কোনো সংশোধন নেই। কারণ এগুলোর মাধ্যমে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। আর অন্তর যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন শরীরও নষ্ট হয়ে যায়।

এই সমস্ত আত্মিক রোগব্যাধি ও বিপদাপদ সৃষ্টি হয় অন্তরের দাসত্ব সম্পর্কে না জানা এবং তা পালন করা থেকে বিরত থাকার কারণে। সুতরাং إِيَّاكَ نَعْبُدُ শরীরে বাস্তবায়ন করার আগে অন্তরে বাস্তবায়ন করা অধিক প্রয়োজন। যখন অন্তরের ইবাদাত ও দাসত্ব থেকে অমনোযোগী থাকা হবে এবং তা পালন করা থেকে বিরত থাকা হবে, তখন অন্তরে মন্দ ও খারাপ গুণাবলি এসে বাসা বাঁধবে। অন্তরের ইবাদাতগুলো পালনে যত অগ্রসর হবে, অন্তর থেকে মন্দ স্বভাব তত দূর হতে থাকবে।

এই সমস্ত বিষয়গুলো কখনো ছোটো আবার কখনো বড়ো বলে প্রতীয়মান হয়। এটি নির্ভর করে সেগুলোর শক্তি, কার্যক্ষমতা, গোপনীয়তা ও তীক্ষ্ণতার ওপর।

আত্মিক সগীরা গুনাহ : আত্মিক সগীরা গুনাহ হলো হারাম বস্তুসমূহে লিপ্ত হওয়ার আগ্রহ ও ইচ্ছা করা। কবীরা ও সগীরা গুনাহের ক্ষেত্রে আগ্রহকারীর অবস্থাভেদে আগ্রহ ও ইচ্ছার স্তরের তারতম্য রয়েছে। (আগ্রহ ও আগ্রহকারীর অবস্থাভেদে হুকুম ভিন্ন হয়।) যেমন : কুফর ও শির্কের প্রতি আগ্রহ কুফর। বিদআতের প্রতি আগ্রহ ফিস্ক। কবীরা গুনাহের প্রতি আগ্রহ দেখানোও গুনাহের কাজ। কেউ যদি এগুলোতে লিপ্ত হওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা পরিত্যাগ করে, তা হলে তাকে সাওয়াব দেওয়া হবে। আর যদি নিজের সামর্থ্য ব্যয় করার পর তাতে ব্যর্থ হয়ে তা পরিত্যাগ করে, তা হলে সেই ব্যক্তি গুনাহের কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তির সমান শাস্তির উপযুক্ত হবে। কারণ সাওয়াব ও শাস্তির ক্ষেত্রে কাউকে তার আগ্রহের কারণে সেই ব্যক্তির স্থানে রাখা হয়, যে সরাসরি সেই কাজ করে; যদিও (দুনিয়াতে) শারীআতের হুকুম অনুযায়ী তাকে সেই ব্যক্তির স্থানে নামানো হবে না। এ কারণেই নবি ﷺ বলেছেন,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ

"যখন দুজন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হবে, তখন হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে।"

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এ হত্যাকারীর বিষয়টি তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ?'

নবি ﷺ উত্তরে বললেন,

إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ

"সেও তার সাথিকে হত্যা করার জন্য আগ্রহী ছিল।"[৩৬]

নবিজি এখানে নিহত ব্যক্তিকে হত্যাকারী ব্যক্তির স্থানে রেখেছেন, তার জন্য একই হুকুম সাব্যস্ত করেছেন। কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তার আগ্রহকে। এটি কেবল সাওয়াবের ক্ষেত্রে, হুকুমের ক্ষেত্রে নয়। সাওয়াব ও শাস্তির ক্ষেত্রে এ রকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

ওপরের আলোচনার মাধ্যমে অন্তরের পছন্দনীয় ও বৈধ আমল সম্পর্কেও জানা হয়ে গেল। (অর্থাৎ হারাম ও গুনাহের কাজগুলো ব্যতীত অন্যান্য আমল বৈধ ও পছন্দনীয় প্রকারের শামিল।)

জবানের দাসত্ব : জবানসংশ্লিষ্ট পাঁচ প্রকার ইবাদাতের আলোচনা :

ওয়াজিব : দুই শাহাদাত أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ জবানে উচ্চারণ করা, জরুরি পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা—আর তা হলো যেটুকু পাঠ না করলে সালাত সহীহ্ হয় না—, সালাতে ওয়াজিব যিক্‌রগুলো পাঠ করা, যেগুলোর আদেশ নবি ﷺ দিয়েছেন; যে রকমভাবে রুকূ-সাজদার তাসবীহ পাঠ করার আদেশ করা হয়েছে, রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলা, তাশাহ্হুদ পড়া এবং তাকবীর বলার আদেশ করা হয়েছে (—এগুলো হলো জবানের ওয়াজিব আমল)।

এমনিভাবে সালামের জবাব দেওয়াও ওয়াজিব। তবে সালাম দেওয়া ওয়াজিব কি না—সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

---

[৩৬] বুখারি, ৩১; মুসলিম, ২৮৮৮।

এমনিভাবে সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, মূর্খকে শেখানো, পথভ্রষ্টকে পথ দেখানো, নির্দিষ্ট বিষয়ে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া এবং সত্য কথা বলা—এগুলোও জবানের ওয়াজিব আমল।

মুস্তাহাব : কুরআন তিলাওয়াত করা, সবসময় আল্লাহর যিক্‌র করা, উপকারী ইলম নিয়ে আলোচনা করা এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ—(জবানের মুস্তাহাব আমল।)

হারাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা-কিছু অপছন্দ করেন ও ঘৃণা করেন তা নিয়ে কথা বলা। যেমন : এমন বিদআত নিয়ে আলোচনা করা, যা রাসূল ﷺ কর্তৃক আনীত দ্বীনের বিরোধী, আবার সেই বিদআতের দিকে আহ্বান করা, তা সুন্দর করে উপস্থাপন করা, তাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। এমনিভাবে কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, কোনো মুসলিমকে গালি-গালাজ করা, কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (—এগুলো হলো জবানের হারাম আমল)। আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা—এটি হলো সবচেয়ে কঠিনতম হারাম।

মাকরূহ : যে বিষয়ে কথা পরিত্যাগ করাই উত্তম, সে বিষয়ে কথা বলা; যদিও তাতে কোনো শাস্তি নেই।

মুবাহ : সালাফগণ এই বিষয়ে ইখতিলাফ করেছেন যে, জবানের জন্য মুবাহ কোনো কথা আছে কি না, যার কোনো লাভও নেই আবার ক্ষতিও নেই—দুদিকেই সমান?

সঠিক অভিমত হলো : জবানের কোনো কথাই মুবাহ নয়; যার দুদিকই সমান। কথার মাধ্যমে হয়তো লাভ হবে নয়তো ক্ষতি। কারণ জবানের অবস্থা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো নয়—মানুষ যখন সকাল করে, তখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিনীত হয়ে জিহ্বাকে বলে, 'তুমি (আমাদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো। আমরা তো তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। তুমি যদি সোজা হয়ে চলো, তা হলে আমরাও সোজা হয়ে চলব। আর তুমি যদি বাঁকা পথে চলো, তা হলে আমরাও বাঁকা পথে চলব।'[৩৭] শুধু জিহ্বার (মন্দ) উপার্জনই মানুষকে অধিকহারে নিম্নমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।[৩৮] জবান যা-ই উচ্চারণ করুক; তা হয়তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি

---

[৩৭] তিরমিযি, ২৪০৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১১৯২৭।

[৩৮] তিরমিযি, ২৬২৬।

মোতাবিক হবে, ফলে তা লাভজনক বলে বিবেচিত হবে; আর যদি এমন না হয়, তা হলে ক্ষতির আওতায় পড়ে যাবে।

আর জিহ্বা অন্যান্য সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করার বিপরীত। কারণ ব্যক্তি হয়তো তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নাড়ানোর দ্বারা কোনো বৈধ বিষয়ে উপকার হাসিল করতে পারে; যার লাভ-ক্ষতির দুদিকই সমান। কেননা এর দ্বারা হয়তো সে আরাম বা উপকার পায়, যা তার জন্য বৈধ; আখিরাতেও যার ক্ষতিকর কোনো প্রভাব নেই। আর যে বিষয়ে উপকার নেই, সে বিষয়ে জিহ্বার নড়াচড়া, (অর্থাৎ কথা বলা) অবশ্যই তার জন্য ক্ষতিকর বলে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে ভাবুন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দাসত্ব : অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাঁচ প্রকার ইবাদাত বা দাসত্ব আবার পঁচিশ ভাগে বিভক্ত। কারণ মানুষের ইন্দ্রিয় পাঁচটি আর প্রতিটি ইন্দ্রিয়েরই পাঁচ প্রকার ইবাদাত রয়েছে। (এই হিসেবে পাঁচ-পাঁচে পঁচিশ প্রকার হয়।)

শ্রবণ বা শুনতে পাওয়ার সাথে সম্পর্কিত পাঁচ প্রকার ইবাদাত :

ওয়াজিব শ্রবণ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ বান্দার জন্য যা শ্রবণ করা বাধ্যতামূলক করেছেন তা শোনা; যেমন : ইসলাম, ঈমান ও এ সংশ্লিষ্ট ফরজ বিষয়গুলো শোনা, সালাতে ইমাম সাহেব যখন উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করেন তা শোনা, (সঠিক অভিমত অনুসারে) জুমুআর খুতবা শোনা।

হারাম শ্রবণ : কুফর ও বিদআতসংক্রান্ত কোনো বিষয় শ্রবণ করা। তবে যদি তা শ্রবণ করার মাঝে কোনো উপকার থাকে, যেমন : তা প্রতিহত করা, কারও বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি তা হলে তা শ্রবণ করা দোষের কিছু নয়।

এমনিভাবে পরনারীর আওয়াজ ও স্বর শোনা; যা শোনার দ্বারা ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কোনো প্রয়োজন থাকলে ভিন্ন কথা, যেমন : সাক্ষ্য দেওয়া, লেনদেন করা, ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা, মামলা-মোকাদ্দমা করা, চিকিৎসা করা ইত্যাদি।

এমনিভাবে গানবাজনা শোনাও হারাম। তবে যদি এমন জায়গায় থাকে, যেখানে গানের আওয়াজ তার কানে আসে এবং সে শুনতে আগ্রহীও নয়, তা হলে সেখানে কান বন্ধ করে রাখা ওয়াজিব নয়।

মুস্তাহাব শ্রবণ : ইলমি আলোচনা শোনা, কুরআন তিলাওয়াত শোনা, আল্লাহর যিক্র শোনা এবং ফরজ নয় তবে আল্লাহ ভালোবাসেন, এমন সবকিছু শোনা মুস্তাহাব।

মাকরূহ শ্রবণ : মুস্তাহাবের বিপরীত। অর্থাৎ হারাম ছাড়া আল্লাহ যা কিছু অপছন্দ করেন এবং তার ওপর শাস্তি দেওয়ারও কোনো ওয়াদা করেননি, এমন বিষয়াদি শ্রবণ করা।

মুবাহ শ্রবণ : আর মুবাহ বা বৈধ বিষয়টি তো সুস্পষ্ট।

দেখার সাথে সম্পর্কিত পাঁচ প্রকার ইবাদাত :

ওয়াজিব দর্শন : কুরআন মাজীদকে দেখা; যখন ওয়াজিব কোনো ইলম শেখার প্রয়োজন হয়, তখন ইলমি কিতাবপত্র দেখা; ব্যক্তি যখন খাওয়ার জন্য, খরচ করার জন্য, ব্যবহার করার জন্য বা অন্য কোনো প্রয়োজনে কোনোকিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তখন হালাল থেকে হারামকে পৃথক করার জন্য দেখা ইত্যাদি।

হারাম দর্শন : খাহেশাত ও চাহিদার সাথে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। এমনিভাবে খাহেশাত ছাড়াও প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাদের দিকে তাকানো; তবে (জরুরি) প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা যেমন : প্রস্তাব-দানকারী, দরদামকারী, লেনদেনকারী, সাক্ষী, বিচারক, ডাক্তার, মাহরাম—এসব পুরুষদের জন্য দেখা বৈধ।

হারাম দৃষ্টির মধ্যে সতরের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও শামিল; এটি দুই প্রকার : কাপড়ের ভেতরে থাকা সতর (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে তাকানো) এবং দরজার ওপারে থাকা সতর (নারীদের দিকে তাকানো)।

মুস্তাহাব দর্শন : ইলম ও দ্বীনসংক্রান্ত বইপত্র দেখা; যেগুলো দেখার দ্বারা ঈমান-ইলম বৃদ্ধি পায়, কুরআন শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকা, উলামায়ে কেরাম, নেককার ব্যক্তিগণ ও পিতামাতার চেহারার দিকে দৃষ্টি দেওয়া।

মাকরূহ দর্শন : অনর্থক দৃষ্টি দেওয়া; যার মধ্যে কোনো উপকার নেই। কারণ এর দ্বারা ঠিক সেরকম ক্ষতি হয়, যেরকম ক্ষতি হয় অনর্থক জিহ্বা চালানোর দ্বারা। একজন সালাফ বলেছেন, 'নেককার ব্যক্তিরা যেমন অনর্থক এদিক-সেদিক

দৃষ্টি দেওয়াকে অপছন্দ করেন; ঠিক তেমনি এদিক-সেদিকের অনর্থক কথাবার্তা বলাকেও তারা অপছন্দ করেন।'[৩৯]

মুবাহ দর্শন : যেসব বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেওয়াতে দুনিয়া-আখিরাতে কোনো ক্ষতি নেই এবং উপকারও নেই, তা দেখা।

স্বাদগ্রহণ করার সাথে সম্পর্কিত পাঁচ প্রকার ইবাদাত :

ওয়াজিব স্বাদগ্রহণ : জরুরি প্রয়োজন ও মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, (এই অবস্থায়) যদি পানাহার না করে মৃত্যু বরণ করে, তা হলে সে গুনাহগার ও নিজেকে হত্যাকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

মৃত্যু থেকে বেঁচে যাবে, এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে ওষুধ সেবন করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে এটিই বিশুদ্ধ মত।

হারাম স্বাদগ্রহণ : মদের স্বাদ নেওয়া, জীবননাশী বিষের স্বাদ নেওয়া, ওয়াজিব সাওম পালন করা অবস্থায় নিষিদ্ধ তিন বস্তু (খাবার, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস)-এর স্বাদ নেওয়া।

মাকরূহ স্বাদগ্রহণ : যেমন : সন্দেহজনক বস্তুর স্বাদ নেওয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করা, যে স্থানে দাওয়াত করা হয়নি হঠাৎ সেখানে গিয়ে খাবার খাওয়া, প্রতিযোগিতা করে যে খাবারের আয়োজন করা হয় তা খাওয়া, যে আপনাকে খুশি না হয়ে লজ্জায় পড়ে খাবার খাওয়ায়, তার সে খাবারের স্বাদ নেওয়া।

মুস্তাহাব স্বাদগ্রহণ : শারীআত অনুমোদিত যে খাবার আল্লাহর আনুগত্যে শক্তি জোগায়, তা গ্রহণ করা, মেহমানের সাথে খাওয়া; যাতে মেহমান খেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং তার প্রয়োজন মতো খেয়ে নেয়, যে দাওয়াতে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব বা মুস্তাহাব, সেই দাওয়াতে খাবার গ্রহণ করা।

মুবাহ স্বাদগ্রহণ : যে খাবারে হারামের মিশ্রণ নেই বা কোনো গুনাহ নেই, সে খাবার গ্রহণ করা।

---

[৩৯] ইবনু কুদামা, আত-তাওয়্যাবীন, ১২৬।

ঘ্রাণ নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত পাঁচ প্রকার ইবাদাত :

ওয়াজিব ঘ্রাণ : যে ঘ্রাণ দ্বারা হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য করা যায়, সেই ঘ্রাণ গ্রহণ করা; যেমন : যখন ঘ্রাণের মাধ্যমে কোনো বস্তু সম্পর্কে বোঝা যায় যে, তা জীবননাশী বিষ নাকি অন্য কিছু? তার মধ্যে ক্ষতিকর কিছু আছে কি নেই? এমনিভাবে কোনো বস্তু কেনার সময় দাম বা দোষত্রুটি জানার জন্য ঘ্রাণ নেওয়া ইত্যাদি।

হারাম ঘ্রাণ : হাজ্জের ইহ্‌রাম অবস্থায় ঘ্রাণ নেওয়া, ছিনতাই করা ও চুরি করা সুগন্ধির ঘ্রাণ গ্রহণ করা। কোনো বেগানা নারীর সুগন্ধি থেকে ঘ্রাণ নেওয়া; (এটি হারাম হওয়ার কারণ হলো) পরবর্তী সময়ে ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মুস্‌তাহাব ঘ্রাণ : যে ঘ্রাণ আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করে, শক্তি জোগায়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করে এবং নফসকে ইলম-আমলে উদ্দীপ্ত করে, তা গ্রহণ করা।

মাকরূহ ঘ্রাণ : জালিম, সংশয়বাদী, ফাসিক ও এই ধরনের ব্যক্তিদের সুগন্ধি থেকে ঘ্রাণ নেওয়া।

মুবাহ ঘ্রাণ : যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবেও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, দ্বীনি কোনো উপকারও নেই এবং শারীআতের সাথে এর কোনো সম্পর্কও নেই—এমন বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করা।

স্পর্শ করার সাথে সম্পর্কিত পাঁচ প্রকার ইবাদাত :

ওয়াজিব স্পর্শ : যেমন : স্বামী-স্ত্রীর স্পর্শ; যখন সহবাস করা ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে দাসীকে স্পর্শ করা; যখন এর মাধ্যমে তাকে পবিত্র রাখা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

হারাম স্পর্শ : পরনারীর কোনো অঙ্গ স্পর্শ করা।

মুস্‌তাহাব স্পর্শ : এমন স্পর্শ যার মাধ্যমে দৃষ্টি অবনত রাখা যায়, হারাম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পবিত্র থাকতে পারে।

মাকরূহ স্পর্শ : হাজ্জে ইহ্‌রাম অবস্থায় আনন্দ লাভের জন্য স্বামী-স্ত্রীর স্পর্শ করা, এমনিভাবে ই'তিকাফের সময় স্পর্শ করা।

গোসল-করানো-ব্যক্তি ব্যতীত মৃতব্যক্তিকে অন্য কারও স্পর্শ করাও মাকরূহ স্পর্শের শামিল। কারণ মৃত ব্যক্তির শরীর তখন জীবিত ব্যক্তির সতরের ন্যায় হয়ে যায়; তার সম্মানার্থে। আর এ কারণেই একটি অভিমত অনুযায়ী তার শরীরকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা এবং তার পরিহিত কাপড়েই তাকে গোসল করানো মুস্‌তাহাব।

মুবাহ স্পর্শ : যে স্পর্শে কোনো প্রকার ক্ষতি ও দ্বীনি উপকারিতা নেই, তা স্পর্শ করা।

স্পর্শের উপরিউক্ত পাঁচটি স্তর হাতের দ্বারা ধরা, পায়ের দ্বারা চলা ইত্যাদির ওপরও প্রয়োগ হবে; যার উদাহরণ অস্পষ্ট নয়।

***

সপ্তম পরিচ্ছেদ

اِهْدِنَا-এর মধ্যে হিদায়াতের বিভিন্ন স্তর

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই"—এর হাকীকত বা প্রকৃত মর্ম হলো : বান্দা إِيَّاكَ (কেবল তোমারই) বলার দ্বারা সেই সত্তা (আল্লাহ)র সাক্ষ্য দিচ্ছে, যিনি পরিপূর্ণভাবে সমস্ত ভালো গুণাবলির অধিকারী এবং সমস্ত উত্তম নাম সেই সত্তার জন্যই।

অতঃপর نَعْبُدُ দ্বারা এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ইচ্ছাকৃত, কওলি-আমলি, বর্তমান-ভবিষ্যৎ—সব ধরনের ইবাদাতের একমাত্র হকদার আল্লাহ তাআলাই।

অতঃপর وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আমরা কেবল তোমার কাছেই সাহায্য চাই"—এর দ্বারা এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সব রকমের সাহায্য প্রার্থনা, তাওয়াক্কুল, নিজেকে অর্পণ করা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই সমীপে। এর দ্বারা বান্দা রুবূবিয়্যাতকে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই সাব্যস্ত করে।

আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি"—এর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তাআলার জন্য তাঁর ইলাহিয়্যাত বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে এককত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে।

অতঃপর বান্দা اِهْدِنَا "আমাদের সরল পথ দেখাও"—এর দ্বারা হিদায়াতের ১০টি স্তরের সাক্ষ্য দেয়; যা তার মাঝে একত্রিত হলে তার জন্য হিদায়াত লাভ হবে—

প্রথম স্তর : ইলম ও বায়ানের হিদায়াত; যা তাকে সত্য সম্পর্কে জ্ঞানী ও সত্য উপলব্ধিকারী বানিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় স্তর : আল্লাহ তাআলা তাকে এর ওপর সক্ষমতা দান করবেন; অন্যথায় সে নিজে নিজে হক পথে চলতে অক্ষম।

তৃতীয় স্তর : বান্দাকে হিদায়াতের ইচ্ছুক বানাবে।

চতুর্থ স্তর : বান্দাকে হিদায়াত পালনকারী বানাবে।

পঞ্চম স্তর : তাকে হিদায়াতের ওপর অটল রাখবে এবং ইস্তিকামাত দান করবে।

ষষ্ঠ স্তর : বান্দার নিকট থেকে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও বিপরীতমুখী বিষয় দূর করে দেবে।

সপ্তম স্তর : পথ সম্পর্কে সঠিক দিক্‌নির্দেশনা দান করবে; যা একটি বিশেষ হিদায়াত। যা প্রথম প্রকার হিদায়াতের চেয়ে বিশেষায়িত। কেননা প্রথম প্রকার হিদায়াত তো ছিল সংক্ষিপ্তভাবে পথ দেখিয়ে দেওয়া, আর এই প্রকার হিদায়াত হলো এর পথ ও পথের বিভিন্ন মানযিল সম্পর্কে বিস্তারিত হিদায়াত।

অষ্টম স্তর : পথচলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখিয়ে দেওয়া এবং এর ওপর বারবার সতর্ক করা; ফলে সে তার চলার পথে এ বিষয়ে অবগত হয় এবং সে দিকে মনোযোগী হয়।

নবম স্তর : এই হিদায়াতের প্রয়োজনীয়তা যে অন্য সমস্ত প্রয়োজন থেকে বেশি, তা দেখিয়ে দেওয়া।

দশম স্তর : তাকে সিরাতে মুস্‌তাকীম থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন পথ দুটি দেখিয়ে দেওয়া। আর সেই দুটি পথের একটি হলো গজবপ্রাপ্তদের পথ; যারা স্বেচ্ছায় ও একগুঁয়েমি করে জানার পরেও হকের অনুসরণ করা থেকে বিরত থেকেছে। আর একটি হলো গোমরাহ ও পথভ্রষ্টদের পথ; যারা সত্য পথ না জানা ও না চেনার কারণে তা অনুসরণ করা থেকে বিরত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে সীরাতে মুস্‌তাকীমের পথ দেখিয়ে দেবেন, যে পথের ওপর ছিলেন সমস্ত নবি-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারী সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ।

*****

দ্বিতীয় অধ্যায়

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

এর মানযিলসমূহ

১ নং ভূমিকা

মানযিলসমূহের পূর্বকথা

মানযিলসমূহের স্তর ও সংখ্যা

সূফিয়ায়ে কেরাম إِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি"—এর মানযিলসমূহের ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছেন; আল্লাহর পথে চলা অবস্থায় অন্তর এক এক করে সেই মানযিলগুলো অতিক্রম করে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।

তাদের কেউ কেউ এর মানযিলসমূহ গণনা করে এর এক হাজারটি মানযিল পেয়েছেন। কেউ কেউ পেয়েছেন একশটি আর কেউ পেয়েছেন এর চেয়ে বেশি কিংবা কম।

মানযিলসমূহ ও এর তারতীবের ব্যাপারে সূফিয়ায়ে কেরামের বেশ মতভেদ রয়েছে। প্রত্যেকেই আপন আপন অবস্থা ও পথচলা অনুসারে তা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু কিছু মানযিলের ক্ষেত্রে এই মতভেদও রয়েছে যে, তা মাকামের অন্তর্ভুক্ত নাকি হাল বা বিশেষ অবস্থার অন্তর্ভুক্ত?

এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো : মাকাম হচ্ছে অর্জনযোগ্য আর হাল হচ্ছে আল্লাহ-প্রদত্ত।

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, হাল হলো মাকামের ফল আর মাকাম হলো আমলের ফল। সুতরাং যে ব্যক্তির আমল উত্তম ও ভালো, সে উচ্চ মাকামের অধিকারী। আর যে উচ্চ মাকামের অধিকারী, তার হাল (অন্তরগত অবস্থা)-ও উচ্চ স্তরের হয়ে থাকে।

তবে এ ক্ষেত্রে **সঠিক অভিমত হলো** বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে মানযিলসমূহের বিভিন্ন নাম রয়েছে। সূচনা ও প্রাথমিক অবস্থায় যেকোনো মানযিলের ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ও ঝলক প্রকাশ পায়, যেমন দূর থেকে বজ্রমেঘের ঝলক ও দীপ্তি দেখা যায়। অতঃপর যখন বিষয়টি ব্যক্তির মাঝে এসে পড়ে, তখন 'হাল' বা বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরপর যখন তা স্থায়ী ও দৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয়, তখন তা মাকামে পরিণত হয়।

এটি প্রথমে ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির পর্যায়ে থাকে, মাঝপথে তা হালে রূপান্তরিত হয় আর শেষে তা মাকামে পরিণত হয়। প্রথমে যেটি ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি ছিল, পরবর্তী সময়ে হুবহু তা-ই হাল, আর হাল-ই এর পরে মাকামে পরিণত হয়। এই সমস্ত নামগুলো প্রকাশিত হওয়া ও দৃঢ়ভাবে লেগে থাকার দিক দিয়ে অন্তরের সাথে সম্পর্কিত।

সালিক বা আল্লাহর-পথের-পথিক কখনো কখনো তার মাকাম থেকে বেরিয়ে যায়, যেমন তার পরিহিত কাপড় থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সে আগের চেয়ে নিম্নস্তরের মাকামে অবতরণ করে। অতঃপর আবার কখনো সেখানে ফিরে আসতে পারে আবার কখনো পারে না।

মাকামের প্রকারভেদ

মাকামসমূহের মধ্যে এমন কিছু মাকামও রয়েছে, যা দুইটি মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। আবার এমন মাকামও রয়েছে, যা অনেকগুলো মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। এমন মাকামও রয়েছে, যার মধ্যে সমস্ত মাকাম শামিল। ফলে কোনো ব্যক্তি সেই মাকামের অধিকারী হতে পারে না, যতক্ষণ-না তার মাঝে সমস্ত মাকামের সমাবেশ ঘটে।

তাওবার মাকাম—মুহাসাবা (আত্মসমালোচনা) ও ভয়ের মাকামকে জমা করে। এ দুটি মাকাম ব্যতীত তাওবার মাকামের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

সন্তুষ্টির মাকাম—সবর ও মহাব্বতের মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ দুটি মাকাম ব্যতীত সন্তুষ্টির মাকামের অস্তিত্ব চিন্তাও করা যায় না।

তাওয়াক্কুলের মাকাম—নিজেকে অর্পণ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা এবং সন্তুষ্টির

মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো ব্যতীত তাওয়াক্কুলের মাকামের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

আশার **মাকাম**—ভয় ও ইচ্ছার মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ভয়ের **মাকাম**—আশা ও ইচ্ছার মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লাহ-**অভিমুখী হওয়ার মাকাম**—মহাব্বত ও ভয়ের মাকামকে একত্রিত করে। এ দুটি ছাড়া কেউ আল্লাহ-অভিমুখে অগ্রসর হতে পারে না।

বিনয়ের **মাকাম**—মহাব্বত, বশ্যতা ও নম্রতার মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি ব্যতীত অপরটি পাওয়া যায় না।

দুনিয়াবিমুখতার মাকাম—এটি আগ্রহ ও ভীতির মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেউ দুনিয়াবিমুখ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত-না সে তার জন্য যা উপকারী তার প্রতি আগ্রহী হয় এবং তার জন্য যা ক্ষতিকর সেগুলোকে ভয় পায়।

মহাব্বতের মাকাম—মা'রিফাত বা আল্লাহ সম্পর্কে জানা, ভয়, আশা ও ইচ্ছার মাকামগুলোকে একত্রিত করে। মহাব্বতের মাকাম এই চারটি মাকামের সমন্বয়েই গঠিত।

আল্লাহভীতির মাকাম—আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং আল্লাহর দাসত্বের হক সম্পর্কে জ্ঞান—এই দুটি মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় পায়, তাঁর হক সম্পর্কে জানে, আল্লাহর প্রতি তার ভয় বেড়ে যায়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।"[৪০]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অধিক অবগত ব্যক্তিরাই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।

ভক্তির মাকাম—মহাব্বত, শ্রদ্ধা ও তা'যীম বা সম্মানের মাকামকে জমা করে।

---

[৪০] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮।

শোকরের মাকাম—ঈমানের সমস্ত মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ কারণেই এটি সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার মাকাম। এটি সন্তুষ্টির মাকামের চেয়ে ঊর্ধ্বস্তরের। শোকরের মাকাম সবরের মাকামকেও অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু সবরের মাকাম শোকরের মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে না। শোকর—তাওয়াক্কুল, আল্লাহর প্রতি ধাবমানতা, ভালোবাসা, বিনয়, ভয়, আশা ইত্যাদি সব মাকামকেই জমা করে। সুতরাং কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত শোকরের গুণে গুণান্বিত হতে পারবে না, যতক্ষণ-না সমস্ত মাকামের অধিকারী হয়।

এ কারণেই (বলা হয়) ঈমানের দুটি অংশ—অর্ধেক সবর আর অর্ধেক শোকর। আবার সবর শোকরের মধ্যে শামিল। তাই বলা যায় ঈমানের পুরোটাই শোকর। শোকরগুজার বান্দা খুবই কম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝١٣

"আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই শোকরগুজার।"[৪১]

লজ্জার মাকাম—মা'রিফাত ও মুরাকাবা (গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া)র মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ঘনিষ্ঠতার মাকাম—নৈকট্যের সাথে ভালোবাসার মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে, কিন্তু তার থেকে দূরে থাকে, তা হলে তাদের মাঝে যেমন ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় না; ঠিক তেমনি কারও কাছে থেকে তাকে ভালো না বাসলেও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় না। ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির জন্য শর্ত হলো কাছে থাকা এবং ভালোবাসা।

সত্যবাদিতার মাকাম—ইখলাস ও দৃঢ়তার মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ দুটির সন্নিবেশেই সত্যবাদিতা বিশুদ্ধ হয়।

মুরাকাবা বা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার মাকাম—ভয়ের মাকামের সাথে আল্লাহ তাআলার মা'রিফাতের মাকামকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এ দুটির অনুপাতেই মুরাকাবার মাকাম বিশুদ্ধ হয়।

---

[৪১] সূরা সাবা, ৩৪ : ১৩।

নিশ্চিন্ততার মাকাম—ইনাবাত বা আল্লাহ-অভিমুখিতা, তাওয়াক্কুল, নিজেকে অর্পণ করা, সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের মাকামকে জমা করে।

এমনিভাবে **আগ্রহ ও আশঙ্কা (এর মাকাম)**—আশা ও ভয়ের সাথে জড়িত। তবে আশা আগ্রহের ওপর এবং ভয় আশঙ্কার ওপর প্রাধান্য পাবে।

এই সমস্ত মাকামগুলোর প্রত্যেকটির অবস্থা অনুসারে সালিকীন বা আল্লাহর-পথের-পথিকগণ দুই প্রকার : নেককার (اَلْأَبْرَارُ) এবং নৈকট্যশীল (اَلْمُقَرَّبُوْنَ)। নেককারগণ সেই মাকামের কিনারায় অবস্থান করেন আর নৈকট্যশীলগণ থাকেন এর সুউচ্চ চূড়ায়। এমনিভাবে ঈমানের সব স্তরের ক্ষেত্রেও একই কথা। এই দুই প্রকার ব্যক্তিদের পার্থক্য ও তাদের মর্যাদার তারতম্য এত অধিক যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই তা গণনা করতে সক্ষম নয়।

ভিন্ন আরেকটি প্রকারভেদ

সূফিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ-অভিমুখিদেরকে যে তিনটি প্রকারে বিভক্ত করেছেন : ১. সাধারণ, ২. বিশেষ এবং ৩. অতি বিশেষ—তা সৃষ্টি হয়েছে কেবল ফানা বা বিলীন হওয়াকে এই পথের শেষ ও চূড়ান্ত সাব্যস্ত করার কারণে। এবং যে-ইলমের প্রতি তারা বিশেষ আগ্রহী, তার কারণেও এই প্রকারভেদগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে এবং ফানা বা বিলীন হওয়ার প্রকারভেদ; এর প্রশংসনীয়-নিন্দনীয়, উপকারী-অপকারী সব দিক নিয়েই আলোচনা করব, ইন শা আল্লাহ। কারণ তাদের ইশারা-ইঙ্গিত একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত এবং এর ওপরেই তাদের সবকিছুর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

মানযিলসমূহের ক্রমবিন্যাস যারা করেছে, তাদের ক্রমবিন্যাস সব ক্ষেত্রে সঠিক নয়। কারণ কোনো বান্দা যখন ইসলামকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয় এবং ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে, তখন এর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের দায়-দায়িত্ব, অবস্থা ও বিধানাবলিকে সে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়। (তার জন্য মানযিলসমূহের ক্রমবিন্যাসের কোনো প্রয়োজন পড়ে না।) তার জন্য ইসলামের আমলসমূহের মধ্যে প্রতিটি আমলে, ওয়াজিবসমূহের মধ্যে প্রতিটি ওয়াজিব আমলে অনেকগুলো মাকাম ও হাল বা বিশেষ অবস্থা রয়েছে। যেগুলো ছাড়া সে সেই আমল ও ওয়াজিব আদায় করতে পারবে না। আর যখনই একটি ওয়াজিব

আমল পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে, তখনই এর পরবর্তী আরেকটি আমল তার জিম্মায় চলে আসবে। এভাবে যখনই সে একটি মানযিল অতিক্রম করবে, তখনই তার সামনে আরেকটি মানযিল এসে হাজির হবে। কখনো পথের শুরুতেই তার সামনে সর্বোচ্চ মাকাম ও হাল চলে আসে; যার ফলে তার জন্য মহাব্বত, সন্তুষ্টি, ঘনিষ্ঠতা, নিশ্চিন্ততার দরজা খুলে যায়; যা কারও কারও ক্ষেত্রে পথের শেষেও অর্জিত হয় না। এই ব্যক্তির জন্য তার পথচলার শেষ পর্যায়ে কিছু বিষয়ের প্রয়োজন হয়—যেমন, বিচক্ষণতা, তাওবা, মুহাসাবা বা নিজের অবস্থার গভীর পর্যবেক্ষণ—যা সূচনাকারী ব্যক্তির প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তীব্র। সুতরাং বোঝা গেল, পথচলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় কোনো ক্রমবিন্যাস নেই।

মানযিলসমূহের ক্রমবিন্যাস নির্ধারণে পূর্ববর্তীদের তরীকা

এই সমস্ত মাকামের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সূফিয়ায়ে কেরামের তরীকা বা পদ্ধতি সম্পর্কে সর্বোত্তম কথা হলো প্রতিটি মাকামের (ক্রমবিন্যাস উল্লেখ না করে সেগুলোর) ব্যাপারে আলাদা আলাদা আলোচনা করা; তার প্রকৃত অবস্থা ও দাবি, তা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা কী, কোন বস্তু পথিককে সেই মাকাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, এর সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা কী ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা। চিন্তাভাবনা করলে দেখা যায়, সূফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যারা ইমাম ছিলেন, তাদের কথা এই পদ্ধতি অনুসারেই ছিল। যেমন : সাহ্ল ইবনু আবদিল্লাহ তুসতারি, আবূ তালিব মাক্কি, জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বাগদাদি, আবূ উসমান নিশাপূরি, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয রাযি ﷺ প্রমুখ।

এবং যারা তাদের চেয়ে উঁচু স্তরের ছিলেন; যেমন, আবূ সুলাইমান দারানি, আওন ইবনু আবদিল্লাহ (যাকে 'হাকীমুল উম্মাহ' বলা হতো) এবং তাদের সমপর্যায়ের ব্যক্তিগণ; তারা সবাই ক্রমবিন্যাস করা ছাড়াই অন্তরের আমল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং মাকামসমূহকে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ না করে মাকাম ও হাল সম্পর্কে বিস্তৃত, সারগর্ভ ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ তারা ছিলেন এর চেয়েও অধিক সম্মানিত, তাদের সংকল্প ছিল অনেক উঁচু ও উন্নত। তারা পিপাসার্ত ছিলেন হিকমত ও মা'রিফাতের জন্য, অন্তর ও নফসের পবিত্রতা অর্জন করার জন্য এবং নিজেদের মুআমালা-লেনদেন সঠিক করার জন্য। আর এ কারণেই তাদের কথা ছিল কম আর তাতে বারাকাহ ছিল বেশি। অপরদিকে, পরবর্তীদের

কথা বেশি, কিন্তু বারাকাহ্ কম।

মানযিলসমূহের ক্রমবিন্যাসে লেখকের তরীকা

আমাদের জন্য সর্বোত্তম হলো আমরা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত ইবাদাত ও দাসত্বের মানযিলগুলো উল্লেখ করব এবং এর সীমা ও স্তরের পরিচয় তুলে ধরব। কারণ সেগুলো সম্পর্কে জানা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে জানাকে পূর্ণতা দান করে। আর যারা তা জানে না, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে মূর্খতা ও নিফাকের দোষে দোষী করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

"বেদুইন আরবরা কুফরি ও মুনাফিকিতে অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা কিছু নাযিল করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার আশঙ্কাই বেশি।"[৪২]

সুতরাং প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো ইসলামের নির্ধারিত সীমারেখা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা এবং খুব যত্নসহকারে তা পালন করা। তা হলে বান্দা এর মাধ্যমে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেবে এবং সে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর গুণে গুণান্বিত বলে সাব্যস্ত হবে।

আমরা মানযিলসমূহের একটি ক্রমবিন্যাস উল্লেখ করব, তবে তা অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়; বরং উত্তমতার ভিত্তিতে এবং বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে তা উপস্থাপন করব। যাতে বিষয়টি উপলব্ধি করতে সুবিধা হয়, ভালোভাবে জানা যায় এবং সহজেই তা আয়ত্ত করা যায়।

***

[৪২] সূরা তাওবা, ৯ : ৯৭।

২ নং ভূমিকা

পথচলা আরম্ভ করার পূর্বেই যা প্রয়োজন

জেনে রাখুন, বান্দার নিকট কোনো আহ্বায়ক আসার পূর্বে সে গাফলত ও অলসতার ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে, তার চোখ জাগ্রত থাকলেও তার অন্তর থাকে ঘুমন্ত। ফলে উপদেশদাতা তাকে সে ব্যাপারে উপদেশ দেয়, সফলতার দাওয়াত প্রদানকারী তাকে সফলতার কথা শুনাতে থাকে আর রহমানের ঘোষক ঘোষণা করে—'সফলতার দিকে আসো।'

সুতরাং এই ঘুমন্ত ব্যক্তির প্রথম ধাপ হলো—ঘুম থেকে জেগে ওঠা।

১. জাগরণ/ সতর্কতা

দাসত্বের প্রথম মানযিল জাগ্রত হওয়া বা সতর্কতা অবলম্বন করা। এটি হলো গাফলতের ঘুম থেকে জেগে ওঠার জন্য অন্তরকে নাড়া দেওয়া। আল্লাহর শপথ! এই জেগে ওঠা কত-না উপকারী! কত-না মর্যাদাপূর্ণ বিষয়! আর আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে কত-না উত্তম সাহায্যকারী! যে ব্যক্তি এটা অনুভব করতে সক্ষম হবে—আল্লাহর শপথ!—সে সফলতার বিষয়াদি অনুভব করবে। অন্যথায় সে গাফলতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। যখন সে জেগে উঠবে, তখন উচ্চ মনোবল নিয়ে যাত্রা শুরু করবে প্রথম মানযিল-অভিমুখে। যখন সে অমনোযোগিতার চাদর ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে এবং তার অন্তর সতর্কতা ও মনোযোগিতার আলোয় উদ্ভাসিত হবে, তখন তা আল্লাহর দেওয়া প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব নিয়ামাতের প্রতি দৃষ্টি দিতে তাকে বাধ্য করবে। আর যখনই সে তার অন্তরকে জাগ্রত রাখবে এবং দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করবে, তখনই সে নিয়ামাতের বিশালত্ব ও প্রাচুর্য দেখতে পাবে। সে তা গণনা করতে নিজের অপারগতা অনুভব করবে। তার সীমারেখা নির্ণয় করতে গিয়ে থেমে যাবে।

তার ওপর আল্লাহ তাআলার যে অনুগ্রহ, তা উপলব্ধি করার জন্য তার অন্তরকে ব্যস্ততা মুক্ত রাখবে; যখন সে দেখবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামাত ও অনুগ্রহরাজি কোনো রকমের যোগ্যতা ও প্রার্থনা ছাড়াই সে পেয়ে যাচ্ছে, তখন তার অন্তরে এই নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, এর প্রতিদান প্রদানে সে অক্ষম। এর প্রতিদান হলো যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা।

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতের প্রতি দৃষ্টিদান করা এবং (সেগুলোর শুকরিয়া আদায়ে) বান্দার অক্ষমতার অনুভূতি তার জন্য দাসত্বের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়কে আবশ্যক করবে—

১. অনুগ্রহদানকারী (আল্লাহ)র প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর স্মরণে নিবেদিত থাকা,
২. তাঁর প্রতি বিনয়ী, নম্র হওয়া ও নিজের এই ক্ষুদ্রতা অনুভব করা যে, তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে সে অক্ষম।

তারপর সে যে সমস্ত অন্যায়-অপকর্ম করেছে, সে দিকে নজর দেবে এবং জানতে পারবে সে অনেক বড়ো বিপদে রয়েছে, দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসের মুখে, আল্লাহ তাআলার শাস্তিতে গ্রেফতার হওয়ার উপক্রম। যখন সে নিজের অপরাধ সম্পর্কে অবগত হবে, তখন ইলম ও আমলের মাধ্যমে সে এর প্রতিকার করতে চেষ্টা করবে। গুনাহ ও পাপের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনার দিকে বেশ মনোযোগী হয়ে উঠবে। পরিশোধন ও মুক্তির পথ খুঁজতে থাকবে। আসলে দুনিয়ার এই জীবনে মানুষ ৪টি বিষয়ের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও পরিশোধন হতে পারে—

১. তাওবা,
২. ইস্তিগফার,
৩. এমন নেক আমল, যা গুনাহকে মিটিয়ে দেয় এবং
৪. গুনাহ ও পাপ দূরকারী বিপদ-মুসীবত।

এই ৪টি বিষয় যদি কাউকে পরিশোধন ও পরিশুদ্ধ করে, তা হলে সে ওই সব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়, ফেরেশতারা উত্তম অবস্থায় যাদের জান কবজ করে এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেয়।

যদি এই ৪টি বিষয় তাকে পরিশুদ্ধ না করে, তা হলে বুঝতে হবে তার তাওবা

খাঁটি ছিল না; খাঁটি তাওবা হলো ব্যাপকভাবে সব গুনাহ থেকে ফিরে আসার সত্য তাওবা; আর তার **ইস্তিগফারও** পরিপূর্ণ ও যথাযথ ছিল না; কারণ পরিপূর্ণ ইস্তিগফার হলো গুনাহকে পরিত্যাগ করার সাথে সাথে তার ওপর অনুতপ্ত হওয়া। এটিই হলো উপকারী ইস্তিগফার। এমনিভাবে তার **নেক আমলগুলোও** পরিমাণ ও মানের দিক দিয়ে অত উন্নত ছিল না যে, তা গুনাহকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এমনিভাবে **বিপদাপদও** (হয়তো সে জন্য যথেষ্ট ছিল না।)

কবরজগতে ৩টি বিষয়ের মাধ্যমে বান্দাকে পরিশুদ্ধ করা হয়—

এক. তার ওপর ঈমানদারদের জানাযার সালাত আদায় করা এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তার ব্যাপারে সুপারিশ করার মাধ্যমে।

দুই. কবরের পরীক্ষা, পরীক্ষক ফেরেশতাদের ভয় দেখানো, চাপ দেওয়া, তিরস্কার করা ইত্যাদির মাধ্যমে।

তিন. তার মুসলিম ভাইয়েরা যে আমল (এর সাওয়াব) তার নিকট হাদিয়া পাঠায় সেগুলোর মাধ্যমে। যেমন : তার পক্ষ থেকে সদাকা করা, হাজ্জ করা, সিয়াম পালন করা, সালাত আদায় করা ইত্যাদি। দান-সদাকা ও দুআ যে মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে—এ ব্যাপারে সবার ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

এগুলোর মাধ্যমেও যদি বান্দা পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ না হয়, তা হলে কিয়ামাতের ময়দানে রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে ৪টি বিষয়ের মাধ্যমে তাকে পরিশুদ্ধ করা হবে :

১. কিয়ামাতের ভয়াবহতা,

২. পরিস্থিতির তীব্রতা,

৩. সুপারিশকারীদের সুপারিশ এবং

৪. আল্লাহ তাআলার ক্ষমার মাধ্যমে।

এই ৪টি বিষয় যদি তার জন্য যথেষ্ট না হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করতে হবে। এটি তার জন্য আল্লাহর রহমতস্বরূপ; যাতে করে সে নিজের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পরিশুদ্ধ হতে পারে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে। সুতরাং (জাহান্নামের) আগুন তার জন্য পবিত্রকারী ও তার

ময়লা-আবর্জনা পরিশোধনকারী হিসেবে কাজ করবে। সে আগুনে অবস্থান করবে তার পাপ ও গুনাহের কম-বেশির পরিমাণ অনুসারে। যখন গুনাহ ও পাপমুক্ত হয়ে যাবে, তখন তাকে আগুন থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

২. চিন্তা-ফিকির

কেউ যখন গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন এই জাগরণই তার মাঝে চিন্তা-ফিকিরের সৃষ্টি করে। চিন্তা-ফিকির হলো অন্তরকে উদ্দেশ্যের প্রতি সজাগ রাখা, সেদিকে ধাবিত করা; যার ব্যাপারে পূর্বেই সে সংক্ষিপ্তভাবে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু বিস্তারিত দিক্‌নির্দেশনা এবং সে পর্যন্ত পৌঁছার পথ জানা ছিল না।

চিন্তা-ফিকির দুই প্রকার : ইলম ও মা'রিফাতের সাথে সম্পর্কিত এবং অনুসন্ধান ও ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত।

ইলম ও মা'রিফাতের সাথে সম্পর্কিত চিন্তা-ফিকির হলো—১. হক ও ২. বাতিল এবং ৩. বৈধ ও ৪. অবৈধের মাঝে পার্থক্য করার চিন্তা-ফিকির।

আর অনুসন্ধান ও ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত চিন্তা-ফিকির হলো—৫. উপকারী ও ৬. ক্ষতিকর বস্তুর মাঝে পার্থক্য করার চিন্তা-ফিকির। এই হলো মোট ৬ প্রকার। যার সপ্তম কোনো প্রকার নেই। আর এগুলোই হলো জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের ভাবনার ক্ষেত্র।

৩. দূরদর্শিতা

চিন্তা-ফিকির যদি সঠিক হয়, তা হলে তা ব্যক্তির মাঝে বাসীরাত বা দূরদর্শিতার সৃষ্টি করে। দূরদর্শিতা হলো অন্তরের একটি নূর; যার দ্বারা ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি, ভীতিপ্রদর্শন, জান্নাত, জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁর বন্ধুদের জন্য কী কী নিয়ামাত তৈরি করে রেখেছেন, আর জাহান্নামে তাঁর শত্রুদের জন্য কী কী শাস্তি মজুদ রেখেছেন, তাও সে দেখতে পায়। সে দেখতে পায় সমস্ত মানুষ কবর থেকে বের হয়ে আল্লাহর আহ্বানের দিকে ছুটছে, আসমানের সব ফেরেশতা নেমে এসে তাদের বেষ্টন করে রাখছে, আল্লাহ তাআলাও সামনে চলে এসেছেন, আর বিচার-ফায়সালা করার জন্য তাঁর কুরসি স্থাপন করা হয়েছে;

ফলে তাঁর আলোয় পুরো পৃথিবী আলোকিত হয়ে গেছে, সবার আমলনামা সামনে আনা হয়েছে, (সে দেখতে পায়) নবি-রাসূলগণ ও সাক্ষীদের হাজির করা হয়েছে, একদিকে দাঁড়িপাল্লা দাঁড় করানো হয়েছে; যা দিয়ে সবার আমলনামা মাপা হবে, বিবাদকারীরা এসে সমবেত হয়েছে, প্রত্যেক পাওনাদার তার দেনাদারকে ধরে রেখেছে, হাউজে কাওসার ও তার অসংখ্য পানপাত্র তার সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে, সে অনেককেই পিপাসার্ত দেখতে পাচ্ছে কিন্তু, সেখান থেকে পান করছে মাত্র অল্পসংখ্যক কিছু মানুষ, অতিক্রম করার জন্য পুলসিরাত স্থাপন করা হয়েছে, মানুষকে সে দিকে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, পুলসিরাতের নিচে জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, এর মধ্যে যারা গড়িয়ে পড়ছে তাদের সংখ্যা শত শতগুণ বেশি, যারা এর থেকে বেঁচে যাচ্ছে তাদের তুলনায়।

তার অন্তরে একটি চোখ উন্মুক্ত হয়; যার মাধ্যমে সে এই সব দৃশ্য দেখতে পায়। তার অন্তরে আখিরাতের প্রমাণসমূহের মধ্য থেকে একটি প্রমাণ নিযুক্ত থাকে (এবং এ কারণে একটি প্রভাব সৃষ্টি হয়), যা তাকে আখিরাতের স্থায়িত্ব এবং দুনিয়া তাড়াতাড়ি-ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া দেখিয়ে দেয়।

দূরদর্শিতা বা বাসীরাতের তিনটি স্তর রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে পরিপূর্ণ করবে, তার দূরদর্শিতাও পূর্ণতা পাবে।

এক. আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণসমূহের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা : এটি হলো আল্লাহ তাআলা নিজের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন আর তাঁর সম্পর্কে তাঁর রাসূল যে বর্ণনা দিয়েছেন—এ দুয়ের ব্যাপারে কোনো সংশয়-সন্দেহ আপনার ঈমানে কোনো প্রকার প্রভাব ফেলবে না। বরং এ বিষয়গুলোতে কোনো ধরনের সংশয় আপনার নিকট আল্লাহর অস্তিত্বে সংশয়-সন্দেহের মতোই কঠিন বলে মনে হবে। আর দূরদর্শী সম্প্রদায়ের কাছে এ দুটি বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে সমান।

এই দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তার কারণ হলো—তাদের মধ্যে নববি দলীল-প্রমাণ জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় যে বিভ্রান্তিমূলক, তা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়া।

দুই. আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা : আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা হলো ব্যাখ্যা (জানতে চাওয়া), এবং নিজ চেষ্টার দ্বারা যেকোনো বিপরীতমুখী (সন্দেহ-সংশয়) দূর করা। এর ফলে বান্দার অন্তরে এমন কোনো সংশয় বাকি থাকে না, যা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি করে, কোনো অবহেলা ও খাহেশাতও থাকে না, যা আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করা, তা মেনে চলা এবং গ্রহণ করাকে বাধা দেয়। আবার কারও এমন তাকলীদ বা অনুসরণও থাকে না, যা তাকে সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে হুকুম-আহকাম অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করা থেকে বিরত রাখে।

তিন. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা : আপনি প্রত্যক্ষ করবেন আল্লাহ তাআলাই সবকিছু পরিচালনা করছেন; বান্দা ভালো-মন্দ যা কিছু করছে, বর্তমানের-ভবিষ্যতের, দুনিয়া-আখিরাতের সবকিছুর পরিচালনা করছেন কেবল আল্লাহ তাআলা। এটি হলো তাঁর ইলাহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত, ইনসাফ ও হিকমতের দাবি। এ ক্ষেত্রে সংশয় মানে আল্লাহর ইলাহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাত সম্পর্কেই সংশয়; বরং এটি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কেই সংশয়। কারণ এর বিপরীত বিষয় তাঁর জন্য অসম্ভব। আর এটিও তাঁর উপযুক্ত নয় যে, তিনি সৃষ্টিজগৎকে বেকার ও কর্মহীন করে রেখেছেন এবং এমনি এমনি ছেড়ে দিয়েছেন। এই ধারণা থেকে আল্লাহ অতি ঊর্ধ্বে।

সুতরাং আকল বা বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রতিদান দেওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করা, আল্লাহ তাআলা যে একক, অদ্বিতীয় তা উপলব্ধি করার মতোই। এ কারণেই সঠিক অভিমত হলো—আখিরাতের বিষয়টি আকল দ্বারাই জানা যায়, তবে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে ওহির মাধ্যমে।

***

দূরদর্শিতা বা বাসীরাতের দরুন ব্যক্তির অন্তরে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝরনা প্রবাহিত হয়; যা চেষ্টা-মেহনত করে বা অধ্যয়ন করে অর্জন করা সম্ভব নয়। এটি আল্লাহ তাআলার কিতাব ও দ্বীন বোঝার সেই উপলব্ধি, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে দান করে থাকেন। এই দান হয় ব্যক্তির দূরদর্শিতার পরিমাণ অনুসারে।

এই দূরদর্শিতার কারণে ব্যক্তির অন্তর-ভূমিতে ফিরাসাতে সাদিকাহ বা সত্য অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টি হয়। এটি হলো একটি আলো; যা আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন, ফলে সে এর দ্বারা হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

"এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"[৪৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

"তোমরা মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকো। কারণ সে আল্লাহর নূরের সাহায্যে দেখে।"

এরপর নবি ﷺ তিলাওয়াত করলেন,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

"এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা হিজর, ১৫ : ৭৫)[৪৪]

দূরদর্শিতার সবলতা ও দূরদর্শিতার দুর্বলতার ভিত্তিতে ফিরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টি হয়। এটি দুই প্রকার :

১. **মর্যাদাপূর্ণ সুউচ্চ অন্তর্দৃষ্টি;** এটি কেবল মুমিনদের জন্যই খাছ।

২. **সস্তা ও নিম্নমুখী অন্তর্দৃষ্টি;** যা মুমিন ও কাফির সবার মধ্যেই পাওয়া যায়। এটি হলো সাধনাকারী, ক্ষুধার্ত, নিদ্রাহীন, নির্জনতা অবলম্বনকারী, সব রকমের ব্যস্ততা থেকে নিজের অন্তরকে মুক্ত রেখে রিয়াযত-মুজাহাদা বা পরিশ্রমকারী ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি। এই সমস্ত ব্যক্তিরা বস্তুসমূহের আকার-আকৃতির ব্যাপারে অবগত হতে

---

[৪৩] সূরা হিজর, ১৫ : ৭৫।

[৪৪] তিরমিযি, ৩১২৭।

পারে, হয়তো নিম্নস্তরের অদৃশ্য কিছু সংবাদও তারা দিতে পারে; কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে তাদেরর নফসের কোনো পরিপূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা আসে না, তাদের ঈমান ও মা'রিফাতেরও কোনো বৃদ্ধি ঘটে না।

আর সত্যবাদী এবং আল্লাহ ও তাঁর আদেশ সম্পর্কে যারা জ্ঞানী, তাদের অন্তর্দৃষ্টি হলো—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে জানা, নিজের নফসের দোষত্রুটি, মুসলমানদের পথে চলার ক্ষেত্রে আমলের কী কী প্রতিবন্ধকতা ও বিপদ সামনে আসে ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

এটি হলো সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ফিরাসাত ও বাসীরাত এবং বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে বেশি উপকারী।

৪. সুদৃঢ় সংকল্প

ব্যক্তি যখন জাগ্রত হবে এবং দূরদর্শিতা অর্জন করবে, তখন তার মধ্যে ইচ্ছা ও সত্যসংকল্পের সৃষ্টি হবে। সে নিজের ইচ্ছা ও নিয়তকে আল্লাহ তাআলার দিকে সফরের জন্য দৃঢ় করে নেবে। সে জানতে পারবে এবং তার ইয়াকীন হয়ে যাবে যে, আল্লাহ ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। ফলে সে আখিরাতের দিনের জন্য সফরের উপকরণ ও পাথেয় জোগাড় করতে সচেষ্ট হবে। আর সফরের প্রতিবন্ধকতা, বিপদাপদ যেগুলো তাকে সফরে বের হতে বাধা প্রদান করবে, সেগুলো থেকে মুক্ত হতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

যখন তার এই ইচ্ছা-সংকল্প মজবুত হয়ে যায়, তখন তা দৃঢ়তায় (اَلْعَزْمُ) রূপ নেয় এবং তা তাকে আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে সফর শুরু করতে বাধ্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

> "অতঃপর যখন আপনি (কোনো কাজের) স্থিরসংকল্প করে ফেলেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।"[৪৫]

---

[৪৫] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৫৯।

আয্‌ম বা দৃঢ় সংকল্প হলো কাজের সাথে সম্পর্কিত মজবুত ইচ্ছা। এ কারণেই বলা হয়, দৃঢ় সংকল্প হলো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বাস্তবে সশরীরে কাজ শুরু করা।

তবে সঠিক কথা হলো দৃঢ় সংকল্প থেকেই বাস্তবে কাজ শুরু করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়; হুবহু কাজ শুরু করা নয়। কিন্তু যেহেতু কোনো ব্যবধান ছাড়াই এ দুটি একসাথে মিলিত; তাই মনে হয় কাজ শুরু করাটাই হলো আয্‌ম বা দৃঢ় সংকল্প। অথচ তা হলো মূলকাজ শুরু করার তীব্র ও শক্তিশালী ইচ্ছা।

সুদৃঢ় সংকল্প (اَلْعَزْمُ) দুই প্রকার :

১. পথ চলতে শুরু করার সময় মুরীদ বা আল্লাহকে-চিনতে-ইচ্ছুক ব্যক্তির মজবুত ইচ্ছা; এটি হলো শুরুর অবস্থা।

২. পথ-চলা অবস্থায় শেষ পর্যন্ত অটল-অবিচল থাকার দৃঢ় ইচ্ছা। এটি প্রথমটির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি মাকামসমূহের মধ্যে একটি মাকাম। অচিরেই আমরা যথাস্থানে তা বর্ণনা করব, ইন শা আল্লাহ।

এই মানযিলে পথিকের প্রয়োজন হয় এটা জানার যে, কী আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব আর কী অর্জন করা তার দায়িত্ব। যাতে সে যা দরকার, তা অর্জন করতে পারে আর যা আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব, তাও আদায় করতে পারে। এটাই হলো নিজেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা বা মুহাসাবা। এই মানযিলটির অবস্থান ক্রমানুসারে তাওবার পূর্বে। কারণ যখন সে জানতে পারবে তার জন্য কী মর্যাদা অপেক্ষা করছে এবং কী কী হক ও দায়িত্ব তার ওপর রয়েছে, তখন সে সেই দায়িত্ব ও হকগুলো আদায় করার চেষ্টা করবে এবং দোষত্রুটি থেকে বের হতে চাইবে—আর এর নামই তাওবা।

মুহাসাবা ও সফরের সূচনা

আমরা إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর চারটি মানযিল—১. জাগরণ/সতর্কতা, ২. চিন্তা-ফিকির, ৩. দূরদর্শিতা এবং ৪. সুদৃঢ় সংকল্প—সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

এই চারটি মানযিল হলো অন্যান্য সমস্ত মানযিলের জন্য ভিত্তিস্বরূপ। আল্লাহ-

অভিমুখে সফরের সমস্ত মানযিল এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আর নিশ্চিতভাবেই এগুলোতে অবতরণ করা ব্যতীত আল্লাহর দিকে সফর করার কল্পনাও করা যায় না। সেই সফর আমাদের সশরীরে করা কোনো ভ্রমণের মতোই। কারণ নিজ দেশে অবস্থানকারী কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য দেশে ভ্রমণ করতে পারে না, যতক্ষণ-না সে ভ্রমণসংক্রান্ত অমনোযোগিতা ও গাফলত থেকে জেগে ওঠে; এরপর ভ্রমণের ব্যাপারে দৃষ্টি দেয় যে, এর মধ্যে কী লাভ ও উপকার রয়েছে; এরপর সফরের জন্য উপাদান ও পাথেয় জোগাড়ে চিন্তা-ফিকির করে; এরপর দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প করে। দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প যখন করে, তখন সে মুহাসাবার মানযিলে স্থানান্তরিত হয়। মুহাসাবা হলো—তার প্রয়োজন কী আর তার ওপর কী হক ও দায়িত্ব তা পার্থক্য করা। যাতে সে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সাথে নিতে পারে আর হক ও দায়িত্বগুলো আদায় করে যেতে পারে। কারণ সে এমন মুসাফির যে আর কখনো ফিরবে না।

সালিক বা আল্লাহর-পথের-পথিক মুহাসাবার মানযিল থেকে তাওবার মানযিলে অবতরণ করে। কারণ সে যখন নিজের নফসের হিসাব নেয়, তখন সে জানতে পারে তার ওপর কী হক ও দায়িত্ব রয়েছে; ফলে সে সেখান থেকে বের হতে চেষ্টা করে, কারও হক নষ্ট করলে তার হক আদায় করার জন্য তার নিকট পৌঁছে যায়। আর এটিই হলো প্রকৃত তাওবা। সুতরাং তাওবার মানযিলের আগে মুহাসাবা বা নিজের হিসাব নেওয়ার মানযিল হওয়াই যথাযথ।

আবার মুহাসাবাকে তাওবার পরে আনারও একটি কারণ রয়েছে। আর তা হলো মুহাসাবা করা তখনই সম্ভব হয়, যখন তাওবা সহীহ হয়। (সুতরাং আগে তাওবা পরে মুহাসাবা।)

তবে সঠিক অভিমত হলো তাওবা আসলে দুটি মুহাসাবার মধ্যবর্তী একটি মানযিল। একটি মুহাসাবা তাওবার পূর্বে; যা জোরালোভাবে তাওবা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। আর একটি মুহাসাবা হলো তাওবার পরে; যা তাওবাকে সংরক্ষণের দাবি করে। সুতরাং তাওবা দুই মুহাসাবা দ্বারা পরিবেষ্টিত। মুহাসাবা বা নিজের হিসাব নেওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ তাআলার এই বাণী দ্বারা প্রমাণিত—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকো। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে যে, আগামীকালের জন্য সে কী পাঠিয়েছে।"[৪৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে হুকুম দিয়েছেন, সে যেন আখিরাতের জন্য কী পাঠিয়েছে তার প্রতি লক্ষ রাখে। আর এটি নিজের মুহাসাবা বা হিসাব নেওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, যা প্রেরণ করছে তা নিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করা যাবে কি না বা তা বিশুদ্ধ হচ্ছে কি না?

এই চিন্তাভাবনা বা হিসাব নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারে, যাতে সে আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে যেতে পারে এবং আল্লাহর নিকট নিজের চেহারা উজ্জ্বল করতে পারে।

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেছেন,

حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا

"তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগেই তোমরা নিজেদের হিসাব নাও এবং মহাসমাবেশের জন্য নিজেকে সুসজ্জিত করো। কিয়ামাতের দিন সেই ব্যক্তির হিসাব অত্যন্ত হালকা ও সহজ হবে, যে দুনিয়াতেই নিজের হিসাব নিতে থাকে।"[৪৭]

একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহাসাবা বা আত্মসমালোচনা হলো—নিজের ভালো আমল ও খারাপ আমলের মাঝে তুলনা করা। এই তুলনা করার দ্বারা আপনি জানতে পারবেন মানে ও পরিমাণে কোন দিকটি বেশি ও অগ্রগামী।

তখন আপনার সামনে প্রকৃত তারতম্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে; আপনি বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও করুণা ছাড়া তাঁর আযাব ও বিপদ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

---

[৪৬] সূরা হাশর, ৫৯ : ১৮।

[৪৭] তিরমিযি, ২৪৫৯।

মুহাসাবা নির্ভর করে হিকমতের নূরের ওপর। এটি হলো সেই নূর, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলগণের অনুসারীদের অন্তরকে আলোকিত করে দেন। আর এর অনুপাতেই আপনি প্রকৃত পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারবেন এবং মুহাসাবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

কোনো একজন মা'রিফাতপ্রাপ্ত আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি বলেছেন, 'আপনি যখন আল্লাহ তাআলার জন্য আপনার নফস ও আমলের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হন, তখন মনে রাখবেন, এতে সন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই। আসলে যে ব্যক্তি জানে, তার নফস হলো সমস্ত মন্দ ও খারাপ বিষয়ের আশ্রয়স্থল এবং ক্ষতিকর বিষয়সমূহ তার আমলকে লক্ষ্যস্থল বানায় (যেন তার আমল ত্রুটিযুক্ত হয়), সেই ব্যক্তি কীভাবে আল্লাহর জন্য নিজের নফস ও আমলের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারে?'

শাইখ আবূ ইয়াযীদ ﷺ-এর মেধা আল্লাহরই দান; তিনি কত চমৎকারই-না বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে পরিপূর্ণ দাসত্বে বিলিয়ে দেয়; সে তার কাজকর্মকে দেখে রিয়ার চোখে, তার অবস্থাকে দেখে অভিযোগের চোখে এবং তার কথাবার্তাকে দেখে সমালোচকের চোখে। যখনই আপনার অন্তরে কোনো কামনা বড়ো হয়ে দেখা দেয়, তখনই আপনার কাছে আপনার নফসের দাবি ছোটো হয়ে আসে; তা অর্জনে আপনি যে অর্থ ব্যয় করেন, তা সামান্য মনে হয়। আর যখনই আপনি রুবূবিয়্যাত ও দাসত্বের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন, আল্লাহর সম্পর্কে ও নিজের সম্পর্কে অবগত হবেন, এবং আপনার সামনে এটা স্পষ্ট হবে যে, আপনি যে সম্বল সংগ্রহ করেছেন, তা আল্লাহ তাআলার জন্য উপযুক্ত নয়; যদিও আপনি মানব ও জিনজাতির সমস্ত আমল নিয়ে উপস্থিত হন—তখনই আপনি আপনার শেষ পরিণতি নিয়ে আতঙ্কিত থাকবেন, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠবেন। আর এটা উপলব্ধি করবেন যে, আল্লাহ তাআলা কেবল নিজ দয়া, অনুগ্রহ ও করুণায় তা কবুল করেন এবং এর ওপর সাওয়াবও দেন নিজ দয়া, অনুগ্রহ ও করুণায়।'[৪৮]

***

[৪৮] ইয়াফিয়ি, মিরআতুল জিনান, ৩/৩৫৫।

যখন মুহাসাবার মাকাম সঠিক হয় এবং আল্লাহর-পথের-পথিক যখন এই মানযিলে অবতরণ করে, তখন সে এখান থেকে অগ্রসর হয় তাওবার মানযিলে।

*****

১ নং মানযিল

তাওবা (اَلتَّوْبَةُ)

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর একটি মানযিল হলো—তাওবার মানযিল।]

তাওবাই হলো প্রথম ও শেষ মানযিল

(জীবনের) শুরুতে, মাঝে এবং শেষে (যে মানযিল প্রয়োজন) তা হচ্ছে তাওবার মানযিল। সুতরাং আল্লাহর-পথের-পথিক কখনো তাওবা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সে মৃত্যু পর্যন্ত এর মধ্যেই থাকে। যদি অন্য মানযিলে যায়, তবে তাওবাকে সাথে নিয়েই যায়, তাওবা হলো তার সবসময়ের সঙ্গী। এটিই বান্দার পথের শুরু, এটিই শেষ। (জীবনের) শুরুর সময়ের ন্যায় শেষ পর্যায়েও তাওবার প্রয়োজন হয় তীব্রভাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٣١

> "হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[৪৯]

এটি সূরা নূরের একটি আয়াত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির সেরা মুমিন বান্দাদের সম্বোধন করে বলেছেন যে, তারা যেন তাঁর নিকট তাওবা করে। অথচ তারা ঈমান এনেছে, কাফিরদের দেওয়া অনেক কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করেছে, তাঁর পথে হিজরত করেছে এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সফলতাকে তাওবার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন;

---

[৪৯] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।

যেমন উপকরণকে উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। আল্লাহ তাআলা এখানে لَعَلَّ (আশা করা যায়) শব্দটি ব্যবহার করেছেন—এটি বুঝানোর জন্য যে, তোমরা যখন তাওবা করবে, তখন তোমাদের সফলতার আশা করা যায়। সুতরাং কেবল তাওবাকারী ব্যক্তিই সফলতার আশা করতে পারে, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

"যারা তাওবা করে না তারাই জালিম বা অত্যাচারী।"[৫০]

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন : ১. তাওবাকারী ও ২. জালিম; এখানে তৃতীয় কোনো শ্রেণি নেই। যারা তাওবা করে না তাদেরকে তিনি জালিম বলেছেন। আসলে তার চেয়ে জালিম আর কেউ নেই। কারণ সে তার রব সম্পর্কে, রবের হক সম্পর্কে, নফসের দোষত্রুটি সম্পর্কে এবং তার আমলের কমতি ও বিপদাপদ সম্পর্কে অজ্ঞ।

'সহীহ মুসলিম'-এ এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"ওহে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো। আমি তো আল্লাহর নিকট প্রতিদিন একশ বার তাওবা করি।"[৫১]

তাওবা এবং সূরা ফাতিহা

যেহেতু তাওবা হলো আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং গজবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে বেঁচে থাকা; আর এটি কেবল সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে আল্লাহ তাআলার হিদায়াত প্রদানের মাধ্যমেই অর্জিত হয়; আর আল্লাহর হিদায়াত পাওয়া যাবে কেবল তাঁর সাহায্য ও তাওহীদের দ্বারা। সেই বিবেচনায় সূরা ফাতিহা সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতিতে এবং সর্বোত্তম বিন্যাসে তাওবাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ,

[৫০] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১।

[৫১] মুসলিম, ২৭০২।

জ্ঞানগত ও প্রজ্ঞাগতভাবে সূরা ফাতিহাকে পরিপূর্ণ হক প্রদান করবে, সে জানতে পারবে যে, খাঁটি তাওবা করা ছাড়া ইবাদাতের দিক থেকে সূরা ফাতিহার অধ্যয়ন বিশুদ্ধ (ও উপকারী) হয় না। কেননা গুনাহ সম্পর্কে গাফিল থেকে, গুনাহের ওপর অটল থেকে সিরাতে মুস্তাকীমের পরিপূর্ণ হিদায়াত পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রথমত মূর্খতা হলো হিদায়াতের প্রজ্ঞার বিপরীত। দ্বিতীয়ত মূর্খতা ব্যক্তির ইচ্ছা ও ইরাদাকে বিলুপ্ত করে দেয়; এর দরুন হিদায়াতের পথে চলার সংকল্প ও ইচ্ছা তার জন্মায় না। আর এই কারণে তাওবা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন ব্যক্তি তার গুনাহ সম্পর্কে জানবে, গুনাহকে স্বীকার করবে এবং এর সব ধরনের ক্ষতিকর পরিণতি থেকে বাঁচার পথ খুঁজবে।

তাওবার শর্তসমূহ

গুনাহে লিপ্ত হয়ে মুমিন কখনো পরিপূর্ণ স্বাদ ও আনন্দ পেতে পারে না, এর দ্বারা সে কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না। বরং যখন সে গুনাহে জড়িয়ে যায়, তখনো তার অন্তরে পেরেশানি ও অস্থিরতা বিরাজ করে। কিন্তু নফস ও কুপ্রবৃত্তির খাহেশাত আর চাহিদা তাকে (গুনাহে জড়ানোর) পেরেশানি থেকে ভুলিয়ে দেয়, (ফলে সে গুনাহ করতে থাকে।) অন্তর যখন এই পেরেশানি ও অস্থিরতা থেকে শূন্য হয় এবং গুনাহ ও পাপাচারের দরুন তার আনন্দ-খুশি বেড়ে যায়, তখন সে যেন তার ঈমানের খবর নেয় এবং সে যেন তার অন্তরের মৃত্যুর জন্য কান্নাকাটি করে; কেননা তার অন্তর যদি জীবিত থাকত, তা হলে অবশ্যই গুনাহে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি তাকে পেরেশান ও অস্থির করে তুলত, সে চিন্তিত হয়ে পড়ত। অথচ অন্তর কিছুই টের পায় না। আসলে আঘাতের দরুন মৃত ব্যক্তি কোনো ব্যথা অনুভব করে না।

গুনাহের এই বেপরোয়া অবস্থা থেকে অল্পসংখ্যক মানুষই পথ খুঁজে পায় কিংবা এ ব্যাপারে সতর্ক হয়। এটি অত্যন্ত ভয়ংকর একটি ক্ষেত্র। তিনটি বিষয় দ্বারা যদি এর প্রতিকার না করা হয়, তা হলে এটি ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। বিষয় তিনটি হলো : ১. তাওবার পূর্বেই মৃত্যু এসে যাওয়ার ভয় করা, ২. আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে আল্লাহর যে নিয়ামাত হারিয়েছে, তার জন্য অনুশোচনা করা এবং ৩. গুনাহের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

সুতরাং তাওবার হাকীকত হলো—

১. অতীতে যা হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া,

২. বর্তমানে তাৎক্ষণিকভাবে তা থেকে বিরত থাকা এবং

৩. ভবিষ্যতে তাতে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

আর এই তিনটি বিষয় সেই সময় একত্রিত হয়, যখন খাঁটি তাওবা সংঘটিত হয়। কেননা সেই সময় ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়, গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং গুনাহে না জড়ানোর দৃঢ় সংকল্প করে। ফলে যে দাসত্বের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে তার দিকে ফিরে আসে। এই ফিরে আসাটাই হলো প্রকৃত তাওবা। এই বিষয়টি যেহেতু ওই তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, তাই সেগুলোকে তাওবার শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া তাওবা সংঘটিত হয় না। কারণ যে ব্যক্তি গুনাহ ও মন্দ বিষয়ে লিপ্ত হয়েও কোনো অনুশোচনা করে না; সেটাই এর দলীল যে, সে তাতে সন্তুষ্ট এবং অনড়। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, "অনুতপ্ত হওয়াই হলো তাওবা।"[৫২]

আর **গুনাহ থেকে তাৎক্ষণিক বিরত থাকা**র বিষয়টিও জরুরি। কারণ গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তাওবা করা অসম্ভব।

গুনাহের ওপর অটল থাকা ভিন্ন আরেকটি গুনাহ। গুনাহের ক্ষতিপূরণে সচেষ্ট না হয়ে বসে থাকার মানে হলো ধারাবাহিকভাবে গুনাহে লিপ্ত থাকা, এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং এতে নিশ্চিন্ত থাকা। আর এটি হলো ধ্বংসের আলামত।

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হলো : আরশের ওপর থেকে আল্লাহ তাআলা দেখছেন এই বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত হওয়া। সুতরাং কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন, তা সত্ত্বেও প্রকাশ্য গুনাহে পা বাড়ায়; তা হলে তো তা অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। আর আল্লাহ তাকে দেখছেন, তিনি সবকিছু অবগত আছেন—এই বিশ্বাস যদি না রাখে; তা হলে তো তা কুফর। এবং ইসলাম থেকে পরিপূর্ণভাবে বের হয়ে যাওয়া। এই দুইটির মধ্যেই গুনাহ করার

---

[৫২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩৫৬৭; ইবনু মাজাহ, ৪২৫২।

বিষয়টি আবর্তিত হয়।

এ কারণেই তাওবা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো : এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তাকে সবসময় দেখছেন, তার সমস্ত বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সময়ও তিনি তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকেন। কারণ তাওবা সহীহ হয় কেবল মুসলিম থেকেই। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পূর্বে আল্লাহকে অস্বীকার করার সাথে সাথে আল্লাহ যে তাকে দেখছেন এটাও অস্বীকার করত, তার তাওবাও সহীহ হবে; তার তাওবা হবে ইসলামে প্রবেশ করা এবং আল্লাহ তাআলাকে তাঁর গুণাবলিসহ স্বীকার করে নেওয়া।

মাকবূল তাওবার কিছু আলামত

আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ তাওবার কিছু আলামত বা নিদর্শন রয়েছে :

এক. তাওবা করার পরের অবস্থা, তাওবা করার আগের অবস্থার চেয়ে উত্তম হবে।

দুই. সবসময় ভয় করবে, আল্লাহ তাআলার পাকড়াও থেকে সে নিজেকে কখনো নিরাপদ মনে করবে না। আসলে তার ভয় ও আশঙ্কা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত-না মৃত্যুর ফেরেশতাদের নিকট সে এই সুসংবাদ শোনে—

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

> "তোমরা ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে।"[৫৩]

সুতরাং ভয়ভীতির আশঙ্কা কেবল তখনই দূর হবে, এর আগে নয়।

তিন. অনুতাপ, অনুশোচনা আর ভয়ে অন্তর চৌচির হয়ে যাওয়া। এই অবস্থার সৃষ্টি হয় অপরাধের ছোটো-বড়ো বিবেচনায়। এটি হলো ইবনু উয়াইনা ﷺ-এর ব্যাখ্যা। তিনি আল্লাহ তাআলার এই আয়াত থেকে তা গ্রহণ করেছেন—

---

[৫৩] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০।

إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝١١٠

"যে পর্যন্ত-না তাদের অন্তরগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ।"[৫৪]

ইবনু উয়াইনা ﷺ বলেন, 'অর্থাৎ যে পর্যন্ত-না তাদের অন্তরগুলো তাওবার দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।'[৫৫] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মহাশাস্তির চরম ভয় অন্তরকে চৌচির করে দেয়। আর এটিই হলো অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করা। প্রকৃত তাওবা একেই বলে। কারণ নিজের অপকর্মের দরুন আফসোস ও অনুশোচনা এবং এর খারাপ পরিণতির ভয়, তার অন্তরকে টুকরো টুকরো করে দেয়। যে ব্যক্তির অন্তর দুনিয়ার জীবনে গুনাহের অনুতাপে চৌচির হবে না, আখিরাতে যখন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হবে, আনুগত্যশীল বান্দাদের পুরস্কার আর অবাধ্য-পাপীদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ঠিকই তার অন্তর চৌচির হয়ে যাবে। আসলে অন্তর ছিন্নভিন্ন ও চৌচির হবেই; হয়তো দুনিয়াতে নয়তো আখিরাতে।

বিশুদ্ধ তাওবার একটি বিশেষ দিক হলো : তাওবার দ্বারা অন্তরে বিশেষ ভাঙনের সৃষ্টি হয়; যার ব্যথা-বেদনা আর কোনোকিছুর সাথেই মেলে না। গুনাহগার আর পাপী ব্যক্তিরই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, পরিশ্রম-সাধনা কিংবা খাঁটি ভালোবাসার মাধ্যমেও অর্জন করা যায় না। এ সবগুলো থেকে ভিন্ন একটি বিষয় এটি। রবের সামনে অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে ভেঙে ফেলা; যার ব্যাপ্তি চতুর্দিকে ছড়ানো। এটি আল্লাহর সামনে তাকে অত্যন্ত বিনয়ী, লাঞ্ছিত, অপদস্থ করে নিক্ষেপ করে। যেমন, গুরুতর অপরাধে অপরাধী কোনো গোলাম, যে তার মনিব থেকে পালিয়ে গেছে। অতঃপর তাকে ধরা হয়েছে এবং তাকে তার মনিবের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তাকে উদ্ধার করার মতো কেউ নেই, আবার মনিব ছাড়া তার কোনো উপায়ও নেই, তার থেকে পালাবার কোনো পথও নেই। সে জানে, তার জীবন-সৌভাগ্য-সফলতা-মুক্তি সবই রয়েছে কেবল মনিবের সন্তুষ্টির মধ্যে। সে এ-ও জানে যে, তার সব রকমের পাপাচার সম্পর্কে তার মনিব খুব ভালোভাবেই অবগত। এর সাথে সাথে মনিবের প্রতি তার ভালোবাসা ও তীব্র প্রয়োজনও বিদ্যমান থাকে, এবং সে খুব ভালো করেই জানে, তার নিজের দুর্বলতা

---

[৫৪] সূরা তাওবা, ৯ : ১১০।

[৫৫] ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর, ৬/১৮৮৬।

ও অসহায়ত্ব আর তার মনিবের বিপুল ক্ষমতা ও শক্তি।

সুতরাং এই সমস্ত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয় ভাঙন, বিনম্রতা ও অপদস্থতা; যা তার জন্য কত-না উপকারী! এ রকম অবস্থা নিয়ে যে ফিরে আসে, সে কত-না অধিক প্রতিদানের উপযুক্ত! এর দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা কত-না মহান! এর মাধ্যমে গোলাম তার মনিবের কত-না নৈকট্য হাসিল করে! তার মনিবের নিকট এই বিনম্রতা, অপদস্থতা, রোনাজারি, তার সামনে নিজেকে সমর্পণ করার চেয়ে পছন্দনীয় আর কিছু নেই।

আল্লাহর শপথ! এই অবস্থায় তার এই কথা কতই-না মধুর—

أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ وَذُلِّيْ لَكَ إِلَّا رَحِمْتَنِيْ. أَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَضُعْفِيْ، وَبِغِنَاكَ عَنِّيْ وَفَقْرِيْ إِلَيْكَ. هٰذِهِ نَاصِيَتِيْ الْكَاذِبَةُ الْخَاطِئَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ. عَبِيْدُكَ سِوَايَ كَثِيْرٌ، وَلَيْسَ لِيْ سَيِّدٌ سِوَاكَ. لَا مَلْجَأَ وَلَامَنْجٰى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْخَاضِعِ الذَّلِيْلِ، وَأَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ، سُؤَالَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، وَذَلَّ لَكَ قَلْبُهُ

'আমি আপনার ইজ্জত ও আপনার প্রতি আমার অপদস্থতার দোহাই দিয়ে কেবল এই প্রার্থনাই করছি যে, আপনি আমার ওপর দয়া করুন। আমি আপনার কাছে চাচ্ছি আপনার ক্ষমতা ও আমার দুর্বলতার ওসীলায়, আমার থেকে আপনার অমুখাপেক্ষিতা ও আপনার প্রতি আমার মুখাপেক্ষিতার ওসীলায়, আমার এই মিথ্যা, ভুলে-ভরা কপাল আপনার কবজায়, আমাকে বাদে আপনার অসংখ্য বান্দা রয়েছে, কিন্তু আপনি ছাড়া আমার আর কোনো মালিক নেই, আপনি ব্যতীত আপনার কাছ থেকে মুক্তি ও আশ্রয় পাবার আর কোনো জায়গা নেই। আমি আপনার নিকট মিসকীন ও অসহায়ের ন্যায় ভিক্ষা চাচ্ছি, বিনয়ী ও অপদস্থ ব্যক্তির মতো আমি আপনার দিকে ধাবিত হচ্ছি, আমি আপনাকে ডাকছি ভীত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মতো এবং সেই ব্যক্তির চাওয়ার মতো আমি আপনার নিকট চাচ্ছি; যে নিজের ঘাড়কে আপনার সামনে নত করে দিয়েছে, আপন নাককে যে ধূলি ধূসরিত করেছে, আপনার কাছে যার দুচোখ

অঝোর ধারায় অশ্রু ছেড়ে দিয়েছে এবং যে নিজের অন্তরকে কেবল আপনার জন্যই বিনীত করেছে।'

এই অবস্থা এবং এর অনুরূপ অন্যান্য অবস্থা হলো আল্লাহর কাছে মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য তাওবার প্রভাব। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অন্তরে এ রকম অবস্থা পাবে না, সে যেন নিজের তাওবাকে ত্রুটিযুক্ত মনে করে এবং তা সংশোধন করার প্রতি মনোযোগী হয়। প্রকৃতপক্ষে খাঁটি তাওবা বেশ কঠিন, কিন্তু মুখের কথায় ও উচ্চারণে কত-না সহজ! সত্যবাদী ব্যক্তি খাঁটি ও সত্য তাওবা অর্জনের চেয়ে কঠিন কোনোকিছুর জন্য পরিশ্রম করেনি। গুনাহ থেকে বাঁচার আর নেককাজ করার শক্তি কেবল আল্লাহ তাআলারই দান।

ইবাদাতের অহংকার থেকে বাঁচুন

তাওবার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে দূরে থাকা, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা, তাঁর আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষেধগুলো থেকে বেঁচে থাকা। এর ফলে বান্দা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নূরের ভিত্তিতে আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে এবং তাঁর নিকট প্রতিদানের আশা করে। এমনিভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নূরের ভিত্তিতে অবাধ্যতা ও নাফরমানি পরিত্যাগ করে, তাঁর শাস্তির ভয় করে এবং এর মাধ্যমে ইবাদাত ও আনুগত্যের গৌরব করে না। আসলে ইবাদাত ও তাওবার মাঝে প্রকাশ্য ও গোপন অহংকার আছে। সুতরাং গর্ব-অহংকার করা তার উদ্দেশ্য হয় না। যদিও সে জানে যে, তাওবা ও ইবাদাতের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি সম্মান অর্জনের জন্য ও গর্ব-অহংকার করার জন্য তাওবা করে, তার তাওবা বেশ ত্রুটিপূর্ণ।

একটি হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিদের মধ্য থেকে একজন নবির নিকট ওহি পাঠিয়েছেন যে, 'আপনি অমুক দুনিয়াবিমুখ বান্দাকে বলুন, 'তোমার দুনিয়াবিমুখতার দ্বারা তো তুমি নিজেরই আরাম-আয়েশকে ত্বরান্বিত করলে। আবার আমার দিকে ধাবিত হয়ে তো তুমি তোমার জন্যই ইজ্জত-সম্মান অর্জন করে নিলে। তা হলে আমার জন্য তুমি কী আমল করলে?' যাহিদ ব্যক্তি বলল, 'হে আমার রব, এগুলোর পরেও কী আমার ওপর আপনার কোনো হক রয়েছে?' আল্লাহ বললেন, 'তুমি কি আমার সন্তুষ্টির জন্য আমার কোনো বন্ধুকে ভালোবেসেছিলে

কিংবা আমার সন্তুষ্টির আশায় আমার কোনো শত্রুকে শত্রু হিসেবে নিয়েছিলে?'[৫৬]

অর্থাৎ শান্তি ও সম্মান তোমার অংশ। আর দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদাত-বন্দেগির দ্বারা তুমি তা অর্জনও করে নিয়েছ। কিন্তু আমার হক আদায়ের বিষয়টি কোথায়, আর তা হলো আমার সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব করা এবং আমার সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা করা? আসলে ইলম ও অবস্থার দিক দিয়ে আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নিজের অংশ ও রবের অংশ পৃথক করাই কাম্য।

অনেক সাদিক বা সত্যবাদী এমন রয়েছে, যারা কেবল নিজের অংশ অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকে। নিজের অংশ ও রবের অংশের মাঝে পার্থক্য করে কেবল তারাই, তাদের মধ্যে যারা বিচক্ষণ। সত্যবাদীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা খুবই অল্প; যেমন মানুষের মধ্যে সত্যবাদীদের সংখ্যা অনেক কম।

প্রকাশ্য-কবীরা গুনাহ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা ঠিক সেই রকম (আত্মিক) অনেক কবীরা গুনাহ বা সেগুলোর চেয়ে বড়ো অথবা তার চেয়ে কম বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত। অথচ তাদের অন্তরে এই ধারণাও আসে না যে, তা গুনাহ, এর থেকে তাওবা করা প্রয়োজন। কিন্তু কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের তারা ঠিকই ঘৃণা করে, তুচ্ছ ভাবে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় তাদের আনুগত্য-ইবাদাতের ক্ষমতা ও অনুগ্রহ সমগ্র সৃষ্টির ওপর ছড়ানো। তাদের ভেতরগত চাহিদা হলো সবাই তাদের নেককাজের জন্য তাদের সম্মান করুক; এটি এমন এক চাহিদা যা কারও নিকট গোপন থাকে না। এমনিভাবে এ সংশ্লিষ্ট আরও অনেক বিষয়ে তারা আচ্ছন্ন; যা আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত, তারা তাঁর দরজা থেকে প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহকারীদের চেয়েও বেশি দূরে। আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত করান, যার মাধ্যমে বান্দা নিজের নফসকে ভেঙে ফেলে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, নিজের মর্যাদা ও পরিচয় উপলব্ধি করে, নিজেকে বিনয়ী করে এবং ইবাদাতের অহংকার থেকে বের হয়—তা হলে এটি তার জন্য রহমতস্বরূপ। যেমন আল্লাহ তাআলা যখন কবীরা গুনাহকারীদের পরিশোধন করেন খাঁটি তাওবা ও তাঁর প্রতি তাদের অন্তর ধাবিত করার মাধ্যমে, তখন তা তাদের জন্য রহমতস্বরূপ হয়। সুতরাং এর বিপরীত হলে দুদলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

---

[৫৬] সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ৪৯২৪, দঈফ।

বান্দাকে গুনাহ করতে ছেড়ে দেওয়ার রহস্য

জেনে রাখুন, বিচক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে যখন কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তখন কয়েকটি বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে—

১. আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি ও ভীতিপ্রদর্শনের দিকে সে দৃষ্টি দেয়। ফলে এটি তার মাঝে ভয় সৃষ্টি করে; যা তাকে তাওবা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

২. তার প্রতি আল্লাহ তাআলার কী আদেশ ও নিষেধ রয়েছে সেদিকে সে দৃষ্টি দেয়। ফলে তার কৃতকাজটি যে গুনাহ তার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা তার মধ্যে তৈরি করে এবং সে যে গুনাহ করেছে তা স্বীকার করে নেয়।

৩. সে এদিকেও দৃষ্টি ফেরায় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে গুনাহের কাজটি করার অবকাশ দিয়েছেন এবং এর মাঝের সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে এর থেকে নিরাপদ রাখতে পারতেন, আবার গুনাহ করার মাঝে ও তার মাঝে বাধাও সৃষ্টি করে দিতে পারতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সে আল্লাহ তাআলার সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি, হিকমত, রহমত, মাগফিরাত, ক্ষমা, সহনশীলতা ও দয়া সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রজ্ঞা ও মা'রিফাত জানতে পারবে। আল্লাহ সম্পর্কে এই প্রজ্ঞা ও মা'রিফাত তাঁর নামসমূহের প্রতি দাসত্বকে আবশ্যক করবে; যা এই পরিস্থিতি ব্যতীত কখনো হাসিল হতো না। সে আরও জানতে পারবে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও আদেশ, প্রতিদান, প্রতিশ্রুতি ও ভীতিপ্রদর্শনের সাথে তাঁর নাম ও গুণাবলির সম্পর্ক কী এবং বাস্তবে সেগুলো আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলিরই বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ তাআলার প্রতিটি নাম ও গুণের প্রভাব ও কার্যক্ষমতা রয়েছে।

তার এই দর্শন তাকে মা'রিফাত, ঈমান, তাকদীর ও হিকমতের রহস্য সম্পর্কে অনেকগুলো মনোরম বাগানের সন্ধান দেবে; যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। (এরপরও কিছু উল্লেখ করা হলো—)

⦿ এর মাধ্যমে বান্দা ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শক্তিমত্তা সম্পর্কে জানতে পারবে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন তা-ই সংঘটিত

করেন; তিনি পরিপূর্ণ ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় বান্দার ওপর নিজ হুকুম বাস্তবায়ন করে থাকেন।

যখন বান্দা তার মনিবের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং অন্তর দিয়ে তা অবলোকন করবে, তখন গুনাহের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে আল্লাহর প্রতিই মনোযোগী হবে; যা তার জন্য অতি উত্তম ও উপকারী। কারণ তখন (চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে) সে নিজের নফসের সাথে নয়, স্বয়ং আল্লাহর সাথে অবস্থান করে।

ফায়সালা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও শক্তির পরিচয় পাওয়ার মধ্যে এটাও শামিল : ব্যক্তি জানতে পারবে যে, তাকে পরিচালিত করা হয়, তার সম্পর্কে আল্লাহর সব সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সে বাধ্য, তার কপাল রয়েছে অপরের হাতে, সে নিজে নিজে কোনোকিছু থেকে বাঁচতে পারে না; তিনি তাকে না বাঁচালে এবং তাঁর সাহায্য ব্যতীত কিছুই করার ক্ষমতা তার নেই। সে প্রশংসার প্রতিদান দানকারী, মহাপরাক্রমশালী এক সত্তার কবজায় লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ।

⊙ সে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারবে যে, গুনাহে লিপ্ত হওয়া অবস্থায় তিনি তা ঢেকে রেখেছেন। পরিপূর্ণভাবে অবগত থাকা সত্ত্বেও তিনি তা প্রকাশ করে দেননি। তিনি যদি চাইতেন, তা হলে সবার সামনে তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করতে পারতেন; ফলে সবাই তার থেকে দূরে থাকত। এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড়ো মেহেরবানি ও দয়া। এ কারণেই আল্লাহ তাআলার একটি নাম الْبَرُّ 'পরম দানশীল'। বান্দার থেকে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও বান্দার প্রতি তিনি এই দান ও অনুগ্রহ করেছেন। অথচ বান্দা তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে মুখাপেক্ষী। এই কারণে বান্দা এই অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে এবং আল্লাহর এই মেহেরবানি, করুণা ও দয়া প্রত্যক্ষ করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ফলে গুনাহের নীচতা থেকে বেরিয়ে এবং তা ভুলে গিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে অবস্থান করবে। আর এটি গুনাহ নিয়ে ব্যস্ত থাকা ও এর লাঞ্ছনার দিকে দৃষ্টিপাত করার চেয়ে বেশি উপকারী ও লাভজনক।

⊙ সে এটাও প্রত্যক্ষ করবে যে, গুনাহ ও পাপে লিপ্ত থাকার কারণেও আল্লাহ তাকে শাস্তি না দিয়ে ধৈর্য ধরে আছেন। তিনি যদি চাইতেন, তা হলে গুনাহের শাস্তি দ্রুতই দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাড়াহুড়ো না করে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই বিষয়টি বান্দাকে আল্লাহ তাআলার اَلْحَلِيْمُ 'পরম সহিষ্ণু' নামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে, আল্লাহর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ সম্পর্কে তাকে অবগত করাবে এবং এই নামের প্রতি ভক্তি ও দাসত্বের মনোভাব তৈরি করবে।

⊙ সে এটাও জানবে, আল্লাহ তাআলা তাকে যে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তা হলো তাঁর অফুরন্ত দয়ার একটি অংশ। কারণ ক্ষমা করা আল্লাহ তাআলার অনেক বড়ো একটি অনুগ্রহ ও দয়া। অন্যথায় আল্লাহ যদি আপনাকে পাকড়াও করেন, তা হলেও তিনি ইনসাফকারী ও প্রশংসিত। ক্ষমা করা কেবল তার দয়া ও মেহেরবানি; আপনার কোনো হকের কারণে তিনি ক্ষমা করতে বাধ্য; বিষয়টি এমন নয়।

⊙ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার বিনয়, বশ্যতা, নম্রতা, অপদস্থতা ও তাঁর সামনে রোনাজারি করাকে বাড়িয়ে দেন। কারণ মানুষের নফস এইসব ক্ষেত্রে রুবূবিয়্যাতের সমকক্ষ হতে চায়। যদি সে ক্ষমতা পেত, তা হলে নিশ্চয়ই ফিরআউনের মতো কথা বলত। ফিরআউন ক্ষমতা পেয়েছিল বলে সে তা প্রকাশ করেছিল আর অন্যরা ক্ষমতা-শক্তি পায়নি, তাই তা গোপন রেখেছে। এই সমকক্ষতার প্রত্যাশা করা থেকে মুক্তি দেবে দাসত্বের বিনম্রতা ও অপদস্থতা। এর চারটি স্তর রয়েছে—

প্রথম স্তর : পুরা সৃষ্টিজগৎই এর অন্তর্ভুক্ত। আর তা হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি মুখাপেক্ষিতার অপদস্থতা। সমস্ত আসমানবাসী ও জমিনবাসী তাঁর দিকে মুখাপেক্ষী ও অভাবী। আর তিনি একাই সবার থেকে অমুখাপেক্ষী। আসমান ও জমিনের প্রত্যেকেই তাঁর নিকট চায়; কিন্তু তিনি কারও কাছেই চান না।

দ্বিতীয় স্তর : ইবাদাত ও দাসত্বের বিনম্রতা। এটা হলো ইখতিয়ার বা পছন্দ করার বিনম্রতা। এটি কেবল অনুগত বান্দাদের সাথেই খাছ। আর ইবাদাত বা দাসত্বের রহস্য এখানেই নিহিত রয়েছে।

তৃতীয় স্তর : মহাব্বতের বিনয় ও নমনীয়তা। আসলে মহাব্বতকারী তার মাহবূব বা প্রিয় মানুষের প্রতি সত্তাগতভাবেই বিনয়ী ও দুর্বল থাকে। মহাব্বতের অনুপাতে এর কমবেশ হয়। প্রিয় মানুষের প্রতি নম্রতার ওপরই মহাব্বতের ভিত্তি স্থাপিত।

চতুর্থ স্তর : পাপাচার ও অপরাধের দরুন নম্রতা ও অপদস্থতা।

সুতরাং এই চারটি স্তর যখন একত্রিত হয়, তখন আল্লাহর জন্য নম্রতা ও বশ্যতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। কেননা তখন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভয়ভীতি, মহাব্বত, ইনাবাত, আনুগত্য ও মুখাপেক্ষিতার কারণে আরও বেশি অপদস্থতা স্বীকার করে নেয়।

◉ আল্লাহ তাআলার নামসমূহের মাঝে যে প্রভাব রয়েছে, তা তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে দাবি করে। যেমন পরিপূর্ণ উপকরণ লক্ষ্য অর্জন হওয়াকে দাবি করে। (বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হবে।) যেমন : اَلسَّمِيْعُ (সর্বশ্রোতা) ও اَلْبَصِيْرُ (সর্বদ্রষ্টা) আল্লাহ তাআলার এই নাম দুটি দাবি করে শোনার ও দেখার বস্তুসমূহকে। এমনিভাবে اَلرَّازِقُ (রিয্‌কদানকারী) নামটি রিয্‌ক দেওয়া মতো কাউকে দাবি করে; اَلرَّحِيْمُ (পরম দয়ালু) নামটি দয়া করা যায় এমন কাউকে দাবি করে। অনুরূপভাবে اَلْغَفُوْرُ (অতি ক্ষমাপরায়ণ), اَلْعَفُوُّ (পরম ক্ষমাশীল), اَلتَّوَّابُ (তাওবা কবুলকারী), اَلْحَلِيْمُ (পরম সহিষ্ণু) এই নামগুলো এমন কাউকে দাবি করে যাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন, যার তাওবা কবুল করবেন এবং যার প্রতি তিনি সহনশীল হবেন। এই নামগুলো গুণহীন ও অকেজো হওয়া অসম্ভব। কারণ এগুলো হলো সর্বোত্তম নাম ও পরিপূর্ণতার গুণাবলি, সম্মান ও বড়োত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি, প্রজ্ঞা, করুণা ও দানশীলতার কার্যক্রম। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই সেগুলোর প্রভাব দুনিয়াতে প্রকাশ পাবে। আর এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন আল্লাহ সম্পর্কে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী—আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

"সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তা হলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে এমন সম্প্রদায় নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত, অতঃপর ক্ষমা চাইত আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।"[৫৭]

◉ আরেকটি হিকমাহ হলো : সবচেয়ে বড়ো রহস্য—যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, যার কথা কেউ ইশারা-ইঙ্গিতেও বলার সাহস দেখায় না, এ দিকে ঈমানের

---

[৫৭] মুসলিম, ২৭৪৯।

আহ্বানকারীও প্রকাশ্যে আহ্বান করে না। বরং বিশেষ বান্দাদের অন্তর তা প্রত্যক্ষ করে; ফলে রবের প্রতি তাদের মা'রিফাত ও মহাব্বত, নিশ্চিন্ততা ও তাঁর প্রতি আগ্রহ, তাঁর অবিরাম স্মরণ, তাঁর দয়া, করুণা, অনুগ্রহ ও মেহেরবানির উপলব্ধি, দাসত্ব ও প্রভুত্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আরও বেড়ে যায়; আর তা হলো যা *'সহীহ বুখারি'* ও *'সহীহ মুসলিম'*-এ বর্ণিত আনাস ইবনু মালিক ﵁-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ . أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

"বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তার তাওবার কারণে ওই লোকের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে মরুভূমিতে তার বাহনে চড়ে আরোহন করছিল। অতঃপর বাহনটি তার নিকট হতে পালিয়ে গেল। আর সেই বাহনের ওপরই ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। একসময় বাহনটি পাওয়ার ব্যাপারে সে আশা ছেড়ে দিলো। এরপর নিরাশ মনে একটি গাছের নিচে এসে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। সে সেভাবেই সেখানে পড়ে থাকে; এমতাবস্থায় হঠাৎ বাহন জন্তুটি তার কাছে এসে দাঁড়ায়। ফলে দ্রুতই সে তার লাগাম ধরে ফেলে। এরপর আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, 'হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা আর আমিই তোমার রব!' আনন্দ ও খুশির তীব্রতায় সে এমন ভুল করে বসে!"[৫৮]

শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচুন

মানুষকে গুনাহের আদেশ-দানকারী, গুনাহকে সুসজ্জিত করে সামনে উপস্থাপনকারী এবং গুনাহ ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধকারী হলো তার সাথে নিযুক্ত-থাকা-শয়তান।

সুতরাং শয়তানের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং তার বিষয়টি আমলে নেওয়া, তাকে

---

[৫৮] বুখারি, ৬৩০৯; মুসলিম, ২৭৪৭।

শত্রু হিসেবে গ্রহণ করতে, তার থেকে পরিপূর্ণরূপে বাঁচতে এবং নিজের অজান্তেই সে যেন তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে না পারে, সে জন্য সতর্ক হতে সাহায্য করে। কারণ শয়তান চায় তার সাতটি ফাঁদের মধ্যে যেকোনো একটিতে মানুষকে লিপ্ত করাতে; যার একটি অপরটির চেয়ে বেশি কঠিন ও ভয়ানক। শয়তান তার সবচেয়ে কঠিন ফাঁদ থেকে নিম্নমানের ফাঁদে তখনই নামে, যখন তাতে লিপ্ত করাতে সে ব্যর্থ ও অক্ষম হয়ে পড়ে। তার সাতটি ফাঁদ হলো—

প্রথম ফাঁদ : কুফরের ফাঁদ; আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করানো, তাঁর দ্বীনকে, তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে, তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলিকে এবং তাঁর সম্পর্কে তাঁর রাসূলগণ যে সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলোকে অস্বীকার করানো এবং কুফরের পথ অবলম্বন করানো। শয়তান যদি কারও সাথে এই উদ্দেশ্যে সফল হয়, তা হলে তার শত্রুতার আগুন ঠান্ডা হয়ে যায়, সে তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদিকে মনোযোগ দেয়। আর যদি বান্দা শয়তানের এই ধোঁকাকে ব্যর্থ করে দেয়, যদি সে তার হিদায়াতের বিচক্ষণতার মাধ্যমে এর থেকে মুক্তি পায় এবং তার ঈমানের নূর অক্ষুণ্ণ থাকে, তা হলে শয়তান তখন তার দ্বিতীয় ফাঁদ সফল করার ষড়যন্ত্র আঁটে।

দ্বিতীয় ফাঁদ : বিদআতের ফাঁদ; ১. হকের বিপরীত বিশ্বাস করানোর মাধ্যমে; যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন (তার বিপরীত)। বা ২. এমন কিছুকে ইবাদাত বানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে; আল্লাহ তাআলা যার অনুমতি দেননি, যেমন : দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন রীতি ও প্রথা সৃষ্টি করা; যা আল্লাহ তাআলা কখনো কবুল করবেন না। অধিকাংশ সময়ই এই দুই বিদআত একত্রে অবস্থান করে। খুব কমই এ দুটি পরস্পর থেকে পৃথক হয়। যেমন একজন মনীষী বলেছেন, 'আমলি বিদআতের সঙ্গে কওলি বিদআতের বিবাহ হয়। অতঃপর তারা বাসর করে। যার ফলে তাদের থেকে কেবল কুসন্তানই জন্ম নেয়, যারা ইসলামি শহরগুলোতে বেড়ে উঠতে থাকে। অবশেষে তাদেরকে নিয়েই লোকজন আল্লাহর নিকট হইচই শুরু করে দেয়।' (অর্থাৎ সে বিদআতগুলোকেই উত্তম ইবাদাত হিসেবে গণ্য করে!)

কেউ যদি শয়তানের এই ধোঁকাকেও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, সুন্নাহর আলোর মাধ্যমে এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, রাসূল ﷺ এবং যে সমস্ত সর্বোত্তম পূর্বসূরিগণ—

যেমন : সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়িগণ—গত হয়েছেন তারা যেসব বিধিবিধানের ওপর আমল করেছেন, সেগুলোর যথাযথ অনুসরণ করে সেই ধোঁকা থেকে বেঁচে যায়। যদিও তাঁদের একজনের অনুসরণ করা থেকেও পরবর্তী যুগের ব্যক্তিরা রয়েছে অনেক দূরে। এর পরেও যদি কেউ তাঁদের অনুসরণ শুরু করে, তবে বিদআতিরা তাকে বাধা দেয় এবং বলে ওঠে, 'এটা বিদআত, নব উদ্ভূত'!

আল্লাহ্ তাআলার তাওফীকে বান্দা যখন শয়তানের এই ষড়যন্ত্রকেও কেটে সামনে এগিয়ে যায়, তখন শয়তান তার তৃতীয় ফাঁদের দিকে মনোযোগী হয়।

আসলে বিদআতের ফাঁদে সফল হওয়া শয়তানের নিকট অনেক বেশি পছন্দনীয়। কারণ এর দ্বারা দ্বীন নষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলা যা দিয়ে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, তা বাতিল করে দেওয়া যায়; যারা বিদআত করে, তারা এর থেকে কখনো তাওবা করে না এবং এর থেকে কখনো ফিরে আসে না। বরং অন্যান্য লোকদেরও এর দিকে দাওয়াত দেয়। (বিদআত শয়তানের অতি পছন্দনীয় হওয়ার আরও একটি কারণ হলো) বিদআতের মাধ্যমে ইলম ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে কথা বলা হয়, সুস্পষ্ট সুন্নাহর বিরোধিতা করা হয়, সুন্নাহপন্থিদের সাথে শত্রুতা করা হয় ও সুন্নাহর আলোকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

বিদআত মানুষকে ছোটো অপরাধ থেকে ধীরে ধীরে বড়ো অপরাধের দিকে নিয়ে যায়। একসময় বিদআতকারী দ্বীন থেকেই বেরিয়ে যায়। ময়দা থেকে যেমন চুল বেরিয়ে যায়। আসলে বিদআতের ভয়ংকর ভয়ংকর ক্ষতি সম্পর্কে কেবল বিচক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারে। আর অন্ধরা থাকে এ সম্পর্কে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত।

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

"আল্লাহ যাকে আলো দেন না, তার জন্য আর কোনো আলো নেই।"[৫৯]

তৃতীয় ফাঁদ : কবীরা গুনাহের ফাঁদ; যদি এই উদ্দেশ্যে শয়তান সফল হয়, তা হলে কবীরা গুনাহগুলোকে ব্যক্তির চোখে সুসজ্জিত ও উত্তমরূপে উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে সে তার মনে কল্পনা ও আশার দুয়ার খুলে দেয়। শয়তান তাকে বলে, ঈমান

---

[৫৯] সূরা নূর, ২৪ : ৪০।

তো শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম। সুতরাং আমল তাতে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কখনো কখনো সে তার জবানে ও কানে এমন কথা জারি করে দেয়, যার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকেই সে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সেই কথাটি হলো—

لَا يَضُرُّ مَعَ التَّوْحِيْدِ ذَنْبٌ، كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ حَسَنَةٌ

'তাওহীদ ঠিক থাকলে গুনাহ কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যেমন শির্কের সাথে নেক আমল কোনো উপকারে আসে না।'

কেউ যদি আল্লাহ তাআলার তাওফীকে বা খাঁটি তাওবা করার মাধ্যমে শয়তানের এই কবীরা গুনাহের ষড়যন্ত্রকেও ভেঙে দেয়, তখন শয়তান তার পরের ফাঁদকে সফল করার দিকে অগ্রসর হয়।

চতুর্থ ফাঁদ : সগীরা বা ছোটো ছোটো গুনাহের ফাঁদ; সে এগুলোকে খুব তুচ্ছ করে দেখায়। সে বলে, 'তোমার কোনো ক্ষতি নেই, যখন তুমি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। তুমি কি জানো না যে, কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে আর নেক আমল করতে থাকলে, ছোটো ছোটো গুনাহগুলোকে এমনিতেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়!' এভাবে সে সগীরা গুনাহের বিষয়টিকে খুব সামান্য করেই উপস্থাপন করতে থাকে। যতক্ষণ-না ব্যক্তি এতে অভ্যস্ত ও ধারাবাহিক হয়। ফলে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, যে তার গুনাহের কারণে ভয়ে ভয়ে থাকে এবং অনুশোচনা করে, সে-ও ধারাবাহিক সগীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির তুলনায় উত্তম অবস্থানে থাকে।

কেননা গুনাহের ওপর ধারাবাহিক হওয়া নিকৃষ্ট ও ভয়ংকর বিষয়। তাওবা-ইস্তিগফার করতে থাকলে কবীরা গুনাহ আর কবীরা থাকে না। অপরদিকে সগীরা গুনাহে অনড় থাকলে তা আর সগীরা থাকে না। নবি ﷺ বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوْا فِيْ بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ وَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ، حَتَّى أَنْضَجُوْا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ

"তোমরা গুনাহকে তুচ্ছ ভাবা থেকে দূরে থাকো। গুনাহকে তুচ্ছ মনে করার উপমা হলো সেই সম্প্রদায়ের মতো; যারা একটি উপত্যকায়

> অবতরণ করেছে; অতঃপর একজন একটি কাঠ আনে, আরেকজন আরেকটি কাঠ আনে। (এভাবে অনেক কাঠ জমা হয়ে যায়) ফলে তারা তাদের রুটি পাকিয়ে ফেলে। গুনাহকে তুচ্ছ-জ্ঞানকারীকে যখন পাকড়াও করা হবে, তখন তার সেই ছোটো ছোটো গুনাহগুলোই তাকে ধ্বংস করে দেবে।"[৬০]

যদি বান্দা সতর্কতা, সচেতনতা, সবসময় তাওবা, ইস্তিগফার ও গুনাহের পরে নেককাজ করার মাধ্যমে শয়তানের এই চক্রান্ত থেকেও মুক্তি পেয়ে যায়, তা হলে শয়তান তার পঞ্চম ফাঁদের দিকে ধাবিত হয়।

পঞ্চম ফাঁদ : বৈধ বিষয়াদির ফাঁদ; যা করতে সমস্যা নেই সেগুলোতে লিপ্ত করিয়ে দিয়ে বেশি বেশি ইবাদাত-বন্দেগি করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং আখিরাতের পাথেয় অর্জনে পরিশ্রম করা থেকে বিরত রাখে। এরপর শয়তান তাকে আস্তে আস্তে বৈধ বিষয় থেকে সুন্নাহ পরিত্যাগ করার দিকে নিয়ে যায়। তারপর সুন্নাহ ত্যাগ করা থেকে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার দিকে ধাবিত করে। সর্বনিম্ন যে বিষয়টি শয়তান তার থেকে লাভ করে তা হলো : লাভজনক অর্জন, সুউচ্চ মর্যাদা ও মানযিল থেকে ব্যক্তিকে বঞ্চিত রাখে। আসলে বান্দা যদি সেগুলোর মূল্য বুঝত ও উপলব্ধি করত, তা হলে সে কিছুতেই নৈকট্যলাভের একটি মাধ্যমও হাতছাড়া করত না। কিন্তু সে প্রকৃত অর্থে এর মূল্য জানে না!

এখন যদি কেউ শয়তানের এই চক্রান্ত থেকেও পরিপূর্ণ বিচক্ষণতা, হিদায়াত ও মা'রিফাতের নূর—যা ইবাদাত ও আনুগত্য অনুপাতে অর্জিত হয়—এর মাধ্যমে মুক্তি পায়; পরিণতিতে সে তার প্রতিটি মুহূর্তকেই লাভজনক কাজে ব্যয় করতে থাকে, তখন শয়তান তার পরের ফাঁদ সফল করার দিকে মনোযোগী হয়।

ষষ্ঠ ফাঁদ : অনুত্তম আমলের ফাঁদ; যে আমলগুলো অনুত্তম, অনাগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেগুলোতে লিপ্ত হবার প্ররোচনা দেয়, তার চোখে সেগুলোকে সুসজ্জিত করে তোলে। তাতে কী কী উপকার আছে, তা দেখিয়ে দেয়; যাতে সে উত্তম ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আমল থেকে দূরে সরে যায়। কারণ যখন শয়তান মূল সাওয়াব থেকে বিরত রাখতে পারে না, তখন সে এই ফন্দি আঁটে যাতে সাওয়াব কম হয়

[৬০] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২২৮০৮; ইবনু আবিদ দুনইয়া, আত-তাওবা, ৩।

এবং সুউচ্চ মর্যাদা ও মর্তবা থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং তাকে বেশি মর্যাদার আমল থেকে কম মর্যাদার আমলের দিকে, উত্তম থেকে অনুত্তমের দিকে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট বেশি পছন্দনীয় আমল থেকে সাধারণ আমলের দিকে ব্যস্ত করে রাখে।

কিন্তু এই স্তরের মানুষজন কোথায়? পুরা পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা একেবারে হাতেগোনা। আসলে অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে শয়তান তার প্রথম ফাঁদেই ভরপুর সফল ও কামিয়াব হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার আমল ও আল্লাহর নিকট এর কী মর্যাদা, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে, শ্রেষ্ঠত্বের মানযিলসমূহ সম্পর্কে জানার মাধ্যমে এবং উঁচু ও নিচু, ভালো ও মন্দ, নেতা ও প্রজা, সর্দার ও অধীনস্থ ইত্যাদির মাঝে পার্থক্য করার দ্বারা বান্দা যদি এই ফাঁদ থেকেও মুক্তি পেয়ে যায়, তা হলে শয়তান তার সর্বশেষ ফাঁদের দিকে ধাবিত হয়। আসলে আমল ও কথার মধ্যেও সর্দার ও অধীনস্থ, নেতা ও প্রজা, সর্বোচ্চ চূড়া ও সর্বনিম্ন চূড়া রয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে[৬১] এসেছে,

‘ইস্‌তিগফারদের সর্দার (سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ) হলো, বান্দা বলবে : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .....

আরেকটি হাদীসে এসেছে, اَلْجِهَادُ ذِرْوَةُ سَنَامِ الْأَمْرِ "জিহাদ হলো সববিষয়ের সর্বোচ্চ চূড়া।"[৬২]

সপ্তম ফাঁদ : শয়তানের আক্রমণের ফাঁদ; এই ফাঁদটি ছাড়া শত্রুপক্ষ শয়তানের আর কোনো ফাঁদ অবশিষ্ট থাকে না। এই ধোঁকা থেকে যদি কেউ মুক্তি পেয়ে থাকে, তা হলে তা পেয়েছেন কেবল নবি-রাসূলগণ এবং সৃষ্টির সর্বোত্তম বান্দারা। ফাঁদটি হলো শয়তান বান্দাকে হাত, জবান ও অন্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দেওয়ার জন্য তার সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণে পাঠায়। কল্যাণ ও নেককাজে ব্যক্তির স্তর অনুসারে তারা তাদের আক্রমণ সাজায়। ফলে যখনই কেউ উঁচু স্তরে ওঠে, তখনই শয়তান তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার চক্রান্ত সফল করতে তার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে।

---

[৬১] বুখারি, ৬৩০৬।

[৬২] তিরমিযি, ২৬১৬; ইবনু মাজাহ, ৩৯৭৩।

এই ফাঁদ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। কারণ কেউ যখন দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকতে, আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম-আহকাম মেনে চলতে চেষ্টা করে, তখন শয়তানও পুরাদমে তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং তার মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে।

***

তাওবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু বিষয় এখানে আলোচনা করলাম; এটাকে অবহেলা ও তুচ্ছ ভাবার কোনো কারণ নেই। হয়তো এ সম্পর্কে আলোচনা আপনি আর কোনো রচনায় খুঁজে পাবেন না। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ তাআলার জন্য। আর তিনিই তাওফীকদাতা।

বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য কি বিশেষ কোনো তাওবা রয়েছে?[৬৩]

'মানাযিলুস সায়িরীন' (مَنَازِلُ السَّائِرِيْنَ)–গ্রন্থের লেখক আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ হারাবি ﷺ বলেছেন, 'কারও তাওবার মাকাম ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত-না সে এই স্তরে পৌঁছে যে, সে আল্লাহ ছাড়া বাকিদের থেকে তাওবা করবে; এরপর তাওবা করার কারণ দেখবে; এরপর তাওবা করার সেই কারণ দেখা থেকেও তাওবা করবে।'[৬৪]

আল্লাহ ছাড়া বাকিদের থেকে তাওবা করার অর্থ হলো : আল্লাহ ছাড়া অন্তরে অন্য কারও ইচ্ছা লালন করা থেকে বান্দা বিরত থাকবে। বান্দা কেবল একক, লা শরীক আল্লাহর হুকুম মোতাবিক চলা এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে তাঁর ইবাদাত করবে। ফলে বান্দার সবকিছুই হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে এবং আল্লাহর হুকুম অনুসারে। এই বিষয়টি কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই সহীহ হবে, আল্লাহর জন্য যার অন্তরে থাকে পরিপূর্ণ ভালোবাসা, সম্মান-শ্রদ্ধা, বিনয়, বশ্যতা, তাঁর সামনে

---

[৬৩] 'মানযিলুস সায়িরীন'-গ্রন্থের লেখক প্রতিটি মানযিলকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন : ১. সাধারণ ব্যক্তিদের মানযিল, ২. বিশেষ ব্যক্তিদের মানযিল এবং ৩. অতি বিশেষ ব্যক্তিদের মানযিল; যা ফানার মানযিলে পৌঁছে দেবে। ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ এই পদ্ধতি ও প্রকারভেদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই আলোচনাটিই হলো তার নমুনা। এটার ওপরই বাকিগুলোকে ধারণা করে নিন। কারণ এই গ্রন্থে এই বিষয়ে আর কোথাও আলোচনা করা হয়নি।

[৬৪] সাধারণ ও মধ্যম শ্রেণির তাওবার উল্লেখের পর এটি অতি বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিদের তাওবার আলোচনা।

বিনীত হওয়া এবং সবসময় তাঁর দিকেই মুখাপেক্ষী থাকা।

এই তাওবা যখন বান্দার জন্য বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়, তখন তার ওপর আরেকটি বিষয় অবশিষ্ট থেকে যায়। আর তা হলো তার তাওবা করার কারণ উপলব্ধি করা, তা দেখা এবং তা থেকে পুরোপুরি দৃষ্টি ফিরিয়ে না নেওয়া। আর এই বিষয়টি বান্দার মর্যাদা ও মর্তবা অনুসারে গুনাহের শামিল। সুতরাং তাকে তার এই উপলব্ধি, দেখা এবং তা থেকে ফানা বা পুরোপুরি দৃষ্টি ফিরিয়ে না নেওয়া থেকেও তাওবা করতে হবে।

এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে :

১. আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছু থেকে তাওবা করা,

২. এই তাওবা দেখতে পাওয়া এবং

৩. এই দেখতে পাওয়া থেকেও তাওবা করা (অর্থাৎ বান্দার অন্তরে কেবল আল্লাহই স্থান পাবে, অন্য কোনোকিছু নয়; এমনকি সে যে তাওবা করে, নেক আমল করে সেগুলোও তার অন্তরে স্থান পাবে না।)

সূফিয়ায়ে কেরামের নিকট এটি হলো চূড়ান্ত গন্তব্য; এর পরে আর কিছু নেই। এটিই আল্লাহর-পথের-পথিকদের সর্বশেষ মানযিল, যাতে কেবল অতি বিশেষ ব্যক্তিরাই সফর করে থাকে। আল্লাহর শপথ! বান্দার নিজের কাজসমূহ দেখতে পাওয়া, এর মাধ্যমে রব থেকে আড়াল হওয়া এবং তার চলার পথে বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করা তাওবাকে আবশ্যক করে। (এটি হলো মানাযিলুস সায়িরীন গ্রন্থের লেখকের অভিমত)

(ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন) সঠিক কথা হলো আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামাত, দয়া-অনুগ্রহ, শক্তি-সামর্থ্য ও সাহায্য দেখতে না পাওয়ার চেয়ে, দেখতে পাওয়াই হলো উত্তম ও পরিপূর্ণ। তারা যে মাকামের কথা বলে, তার চেয়েও এটি উঁচু স্তরের এবং খাঁটি মহাব্বত ও দাসত্বের পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ। আসলে দয়া ও অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করাই হলো অধিক যুক্তিসংগত। কারণ প্রত্যক্ষকারীর উপলব্ধি না থাকলে সে কীভাবে তার ওপর আল্লাহ তাআলার যে দয়া ও অনুগ্রহ, তা অনুভব করবে! (এটি তো অসম্ভব।)

আসলে তাদেরকে এ দিকে পরিচালিত করেছে প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে ফানা বা নিজেকে বিলীন করার উপত্যকায় চলার অনুপ্রেরণা। ফলে তারা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কোনো কারণ, মাধ্যম ও রীতিনীতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করার বিপক্ষে। আমরা এই মাকামের স্বাদ ও আনন্দকে অস্বীকার করি না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর-পথের-পথিক এ স্তরে পৌঁছে এমন স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করেন, যা আর কেউ করতে পারে না। আমাদের বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই অবস্থার চেয়ে সেই ব্যক্তির অবস্থা আরও বেশি উত্তম ও পরিপূর্ণ, যে নিজের কাজকর্ম ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং এর বিস্তারিত অবস্থাসমূহ দেখে আবার এটিও প্রত্যক্ষ করে যে, সেগুলো কেবল আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সাহায্যেই সে সম্পাদন করতে পেরেছে। এই ব্যক্তি তার দাসত্ব ও ইবাদাতের সাথে সাথে দাসত্বের তাওফীক দানকারী সত্তার প্রতিও দৃষ্টি দেয়। দুদিকেই সমান দৃষ্টি থাকে তার। (অনেকেই আছে শুধু আল্লাহর দিকে দৃষ্টি রাখে, আবার কেউ আছে কেবল ইবাদাত আর নিয়ামাতের দিকেই দৃষ্টি রাখে।) এই দুটি অবস্থাই অসম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থা হলো ব্যক্তি এটি প্রত্যক্ষ করবে যে, তার ইবাদাত-বন্দেগি সবই অর্জিত হয়েছে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, অনুগ্রহ, করুণা ও দয়ার বদৌলতে। সুতরাং আপনি যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপস্থিত থাকেন, তা হলে আপনার মাকাম হবে তাওবার মাকাম। আসলে দাসত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, ব্যক্তিকে কেবল ক্ষতির মুখেই ঠেলে দেয়।

এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো, এ বিষয়ের সঠিক জ্ঞান জানার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বারস্থ হওয়া এবং ঈমানের হাকীকতের নিকট নিজেকে পেশ করা, কারও রুচি বা পছন্দের নিকট নয়। তবে আমরা এই অবস্থার যে স্বাদ ও আনন্দ তা অস্বীকার করি না, আমরা অস্বীকার করি এই বিষয়টিকে যে, এই অবস্থাটা অন্যদের চেয়ে পরিপূর্ণ। কুরআন-সুন্নাহর কোথাও কি এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে? অথবা সাহাবা-তাবিয়ীনের কথাবার্তার কোথাও কি এই ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ রকম ফানা হয়ে যেতে হবে আর এটিই হলো পূর্ণাঙ্গতা? কিংবা কোথাও এ রকম কথা রয়েছে যে, বান্দা যদি তার কাজকে আল্লাহর সাহায্য, শক্তি ও অনুগ্রহের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে বলে দেখতে পায় এবং এর কারণ যদি সে প্রত্যক্ষ করে, তা হলে এর থেকে তাওবা করা ওয়াজিব? এই বিষয়টুকু অস্বীকার করা তাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে। তারা এর অস্বীকারকারীকে ছুঁড়ে ফেলবে এবং বলবে, সে এ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং সে এই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি, যদি এ পর্যন্ত পৌঁছত, তা হলে সে

এটিকে অস্বীকার করতে পারত না। আসলে এগুলো এমন কোনো দলীল না যে, এগুলোর সাহায্যে তাদের দাবি সহীহ বলে প্রমাণিত হয়। আবার এগুলো সঠিক কোনো জবাবও নয়। এই অজ্ঞ ব্যক্তি আপনাদের কাছে একটি শারঈ মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছে আর আপনারা এর যে উত্তর দিচ্ছেন, তা তো সেটার কোনো জবাব নয়।

আল্লাহর কসম! নিশ্চয় সেই ব্যক্তি আপনাদেরকে এর চেয়ে আরও বড়ো মর্যাদা ও উচ্চ মাকাম থেকে বঞ্চিত হিসেবেই দেখছে। শুধুমাত্র ফানা, আল্লাহর পরিচালনাগত বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করা থেকে বিরত থাকা, উপকরণ, কারণ আর মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মধ্যেই ভূরি ভূরি জ্ঞানের ভান্ডার, মা'রিফাত আর দাসত্ব নিহিত নেই। পূর্ণাঙ্গ মা'রিফাত, দাসত্ব আর ইবাদাত-বন্দেগি কি কেবল এই সমস্ত বস্তুর মধ্যেই রয়েছে? অথচ পুরা কুরআনই আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা, সৃষ্টিজগতের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, মানুষের নিজের শরীর ও তার বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদির আলোচনায় ভরপুর। এর চেয়েও বিশেষ ব্যাপার হলো সেসব বিষয়, যা বান্দা আখিরাতের জন্য অগ্রীম পাঠিয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ঈমান, নেককাজ করার তাওফীক ও হিদায়াতের দ্বারা যে নিয়ামাত দান করেছেন তা স্মরণ করা, তাতে চিন্তা-ফিকির করা, এর জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা। এগুলো ফানা ও ফানা-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সাথে কখনো অর্জন করা সম্ভব নয়।

তারপর কথা হলো আপনাদের বক্তব্য সত্যিকারার্থে বাস্তবায়ন করা একটি অসম্ভব ব্যাপার—আপনারা বলেছেন তাওবার বিষয়টি দেখতে পাওয়া একটি ইল্লত বা দোষ, এ থেকে আবার তাওবা করা জরুরি। এটি অসম্ভব হওয়ার কারণ হিসেবে বলব, তার সেই প্রত্যক্ষ করাকে প্রত্যক্ষ করাও তো একটি দোষের ব্যাপার; যা থেকে তাওবা করা আবশ্যক। এমনিভাবে সেই দেখতে পাওয়াও একটি দোষ; তা থেকেও তাওবা করা জরুরি। এ রকমভাবে বিষয়টি একের পর এক অবিরামভাবে চলতেই থাকবে। সার্বিকভাবে এর প্রতি কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ না করার মাধ্যমেই কেবল এটি শেষ হতে পারে। এই রকম পাগলামি আর বিলুপ্তি তো দাসত্বেরই বিপরীত ও বিরোধী, সুতরাং এগুলো ইবাদাত-বন্দেগি আর দাসত্বের চূড়ান্ত গন্তব্য হয় কীভাবে?

সুতরাং এখন আপনি সালাতের ভেতরের বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে চিন্তা-ফিকির করলে বুঝতে পারবেন যে, সেগুলো প্রত্যক্ষ না করলে তা পরিপূর্ণ হয় না। (যেগুলো থেকে আপনি অনুপস্থিত থাকলে দাসত্বের ক্ষেত্রে তা ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।) দেখুন, সালাত আদায়কারী সালাত আদায়ের শুরুতে বলবে,

إِنِّىٓ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا

"আমি একনিষ্ঠভাবে নিজের চেহারা সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিলাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।"[৬৫]

এই কথার দাসত্ব হবে : তার চেহারার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা আর তা হলো তার ইচ্ছা ও নিয়ত। এমনিভাবে হানাফিয়্যাতও প্রত্যক্ষ করবে আর তা হলো আল্লাহর প্রতি তার একনিষ্ঠতা। এরপর সে বলবে,

إِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"[৬৬]

এই কথার দাসত্ব হলো : সে তার সালাত ও অন্যান্য ইবাদাত যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই নিবেদিত তা প্রত্যক্ষ করবে। এখন যদি সে তা থেকে অনুপস্থিত থাকে, তা হলে সে আল্লাহর কাছে মুখে এমন কথা বলছে; যা থেকে তার অন্তর শূন্য, সুতরাং কীভাবে এটা সেই ব্যক্তির চেয়ে পরিপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে, যে তার অন্তরকে কাজকর্ম ও দাসত্বের সাথে নিবেদিত রাখে, সেগুলোকে সে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করে এবং এটাও প্রত্যক্ষ করে যে, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই জন্য?! (সত্যিকারার্থেই এই দুইজনের মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যবধান।)

তবে ফানার অধিকারী ব্যক্তির পরিণতি ও চূড়ান্ত অবস্থা হিসেবে বলা যায় সে অক্ষম; তার মাকাম সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ তা কশ্চিনকালেও নয়। এমনিভাবে যখন সে তিলাওয়াত করবে,

---

[৬৫] সূরা আনআম, ৬ : ৭৯।

[৬৬] সূরা আনআম, ৬ : ১৬২।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"[৬৭]

এই কথার দাসত্ব হবে : ইবাদাত করা ও সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, এ দুটি বিষয়কে অন্তরে উপস্থিত রাখা, তা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদন করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সবার থেকে প্রত্যাখ্যান করা। এই বিষয়টি অন্তর অনুপস্থিত রেখে, শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে পরিপূর্ণ।

এমনিভাবে যখন সে তার রুকূতে গিয়ে বলবে,

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمَيَّ

"হে আল্লাহ, তোমার উদ্দেশ্যে রুকূ করলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম এবং তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমার কান, চোখ, মগজ, হাড়, স্নায়ুতন্ত্র এবং আমার দু'পা যা বহন করে—সবই তোমার কাছে বিনত হলো।"[৬৮]

সুতরাং এই কথাগুলোর দাসত্ব কীভাবে আদায় করবে সেই ব্যক্তি, যে তার কাজকর্ম থেকে অনুপস্থিত, যে রয়েছে তার ফানার মধ্যে নিমজ্জিত? এগুলো তা হলে তার মুখে উচ্চারিত কিছু আওয়াজ ব্যতীত আর কী? যদি অপারগতা ও ওজর না থাকত, তা হলে এগুলো দাসত্ব ও ইবাদাত হিসেবেই গণ্য হতো না। (পরিপূর্ণ অবস্থা হওয়া তো দূরের কথা!)

তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বান্দার নিজের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করা, সেখানেই থেমে থাকা, সেগুলোর কারণে প্রকৃত নিয়ামাতদাতা, তাওফীকদাতা ও অনুগ্রহকারী সত্তা থেকে দূরে থাকা অনেক বড়ো ত্রুটি এবং দাসত্বের পথে অনেক বড়ো প্রতিবন্ধক। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

[৬৭] সূরা ফাতিহা, ১ : ৫।

[৬৮] মুসলিম, ৭৭১।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

"তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে। আপনি বলুন, 'তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ বলে মনে কোরো না; ঈমানের পথে পরিচালিত করে বরং আল্লাহ তোমাদেরকেই ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো।"[৬৯]

সুতরাং আরিফ বা আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাদের দাসত্বকে প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা যে দয়া ও অনুগ্রহ তাদের প্রতি করেছেন, তাতে তারা নিমগ্ন থাকেন। জাহিল-মূর্খরা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে গাফিল ও অন্যমনস্ক থাকে। আর ফানার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি নিমগ্ন থাকেন শুধু আল্লাহর প্রতি, (সে আর কিছু দেখে না) অথচ তা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুসারেই অসম্পূর্ণ। কারণ আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি আদর্শ ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিমাণ নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

তাওবার কতিপয় আহকাম

এখন তাওবার সাথে সম্পর্কিত কিছু আহকাম নিয়ে আলোচনা করব; যার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি; যার থেকে অজ্ঞ থাকা বান্দার পক্ষে শোভনীয় নয়।

এক. খুব দ্রুত গুনাহ থেকে তাওবার দিকে ধাবিত হওয়া বান্দার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে ফরজ; তাওবা করতে বিলম্ব করা জায়িয নয়।

যে ব্যক্তি তাওবা করতে দেরি করে, তার জন্য দেরি করার আলাদা একটি গুনাহ লেখা হয়। সুতরাং যখন সে গুনাহ থেকে তাওবা করে, তখন তার ওপর আরেকটি তাওবা অবশিষ্ট থেকে যায়; সেটি হলো তাওবা করতে দেরি করার কারণে তাওবা। তাওবাকারীর অন্তরে এই বিষয়টি খুব কমই আসে। বরং সে মনে করে গুনাহ থেকে তাওবা করলে তার ওপর আর কিছুই বাকি থাকে না; অথচ বিলম্বে তাওবা করার গুনাহটি তার নামে থেকেই যায়।

---

[৬৯] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৭।

এর থেকে কেবল তখনই মুক্তি মিলবে, যখন জানা-অজানা সব ধরনের গুনাহ থেকে ব্যাপকভাবে তাওবা করবে। কারণ বান্দার জানা গুনাহের থেকে অজানা গুনাহের পরিমাণই বেশি। আর যখন জানার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ অজ্ঞ থাকে, তখন তার সেই অজ্ঞতা তাকে শাস্তির মুখোমুখি হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না। কারণ জ্ঞান অর্জন না করা এবং সে অনুযায়ী আমল না করার অপরাধে সে অপরাধী। ফলে মূর্খ ব্যক্তির ক্ষেত্রে গুনাহের পরিমাণ যেমন বেশি, তেমনি ভয়াবহ। একটি হাদীসে এসেছে, আবূ বকর ﵁-কে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ

"হে আবূ বকর, নিশ্চয় শির্ক পিঁপড়ার হেঁটে চলা থেকেও বেশি গোপনে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।"

আবূ বকর ﵁ বললেন, 'আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ্ সাব্যস্ত করা ছাড়াও কি শির্ক আছে?'

নবি ﷺ তার জবাবে বললেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শির্ক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেবো না, যা বললে তোমার থেকে অল্পবেশি সব শির্কই দূর হয়ে যাবে?" তিনি বললেন, 'তা হলে তুমি এই দুআ পাঠ কোরো,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

"হে আল্লাহ, আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজানা তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই।"[৭০]

[৭০] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭২১।

এটি হলো সেই বিষয় থেকে ক্ষমা প্রার্থনা, যা আল্লাহ্ জানে যে সেটা গুনাহ্ কিন্তু বান্দা তা জানে না।

দুই. কোনো গুনাহে অটল থাকাবস্থায় আরেকটি গুনাহ্ থেকে তাওবা করলে তা কি বিশুদ্ধ হবে?

এ ব্যাপারে আলিমদের দুটি মতামত রয়েছে; যা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ-এর দুটি রিওয়ায়াত।

মাসআলাটির মূলকথা হলো : তাওবা গুনাহের মতো খণ্ড খণ্ড হয় কি না; ফলে এক দিক থেকে তাওবাকারী বলে গণ্য হবে, আবার অন্য দিক থেকে হবে না; নাকি ঈমান ও ইসলামের মতো অখণ্ডনীয়? অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হলো তাওবা খণ্ড খণ্ড হয়; যেমন তা গুণগত মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন রকম হয়, তেমনি পরিমাণের দিক দিয়েও কমবেশ হয়। বান্দা যদি একটি ফরজ আমল আদায় করে আর অন্য একটি ছাড়ে, তা হলে সে যা পরিত্যাগ করে তার জন্য শাস্তির মুখোমুখি হবে; যা আদায় করেছে তার জন্য নয়। ঠিক তেমনি যখন একটি গুনাহ্ থেকে তাওবা করে এবং অন্য একটি গুনাহে অটল থাকে। কারণ দুটি গুনাহ্ থেকেই তাওবা করা ফরজ। সে এর একটি আদায় করেছে এবং একটি ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং যা ছেড়ে দিয়েছে তার কারণে যা আদায় করেছে তা বাতিল হবে না; যেমন কেউ হাজ্জের ফরজ আদায় করেনি; কিন্তু সালাত, সিয়াম ও যাকাত ঠিকমতো পালন করেছে।

এই মাসআলার ক্ষেত্রে আমার অভিমত হলো : অনুরূপ গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় সেরকম কোনো একটি গুনাহ্ থেকে তাওবা করলে, সে তাওবা সহীহ্ হবে না। আর কোনো গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় সেই গুনাহের সাথে সম্পর্কহীন ভিন্ন কোনো একটি গুনাহ্ থেকে তাওবা করলে, সে তাওবা সহীহ্ বলে গণ্য হবে। যেমন : কেউ যদি সুদ থেকে তাওবা করে, কিন্তু মদপান থেকে তাওবা না করে; তা হলে তার সুদ থেকে তাওবা সহীহ্ ও বিশুদ্ধ। অপরদিকে কেউ যদি নগদসুদ থেকে তাওবা করে, কিন্তু বাকিসুদ থেকে তাওবা না করে অথবা গাঁজা খাওয়া থেকে তাওবা করে, কিন্তু মদপান থেকে তাওবা না করে, অথবা এর উল্টোটা করে, তা হলে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তিন. তাওবা সহীহ হওয়ার জন্য কি এটাও শর্ত যে, সেই গুনাহে আর কোনো দিন কখনো লিপ্ত হতে পারবে না, নাকি এটা তাওবার শর্ত নয়?

কেউ কেউ সেই গুনাহে অভ্যস্ত না হওয়াকে শর্ত করেছেন। তারা বলেছেন, যদি আবার তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে বোঝা যাবে তার আগের তাওবা বাতিল ছিল, সহীহ ছিল না।

আর অধিকাংশের মত হলো : এটি তাওবা সহীহ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নয়। কারণ তাওবার শুদ্ধতা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর—

১. তাৎক্ষণিকভাবে সেই গুনাহ পরিত্যাগ করা,

২. তার ওপর অনুতপ্ত হওয়া এবং

৩. পরবর্তীকালে তাতে আর লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা।

চার. অপরাধকারীর মাঝে ও অপরাধ সংঘটনের কারণসমূহের মাঝে যখন কোনো প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি হয় এবং সে তাতে লিপ্ত হওয়ার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে যে, তার থেকে অপরাধ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে; এমতাবস্থায় কি তার তাওবা সহীহ হবে? এই ব্যক্তির অবস্থা হয় ঠিক তেমনই, যেমন কোনো মিথ্যাবাদী, অপবাদ-দানকারী বা মিথ্যা-সাক্ষ্যদানকারীর জিহ্বা নষ্ট হয়ে যায়, কোনো ব্যভিচারকারীর গোপনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়, কোনো চোরের চার হাত-পা অকেজো হয়ে যায়, কোনো জালকারীর হাত অবশ হয়ে যায়, কোনো ব্যক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার আর গুনাহে জড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থা থাকে না।

এই ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে :

একদল বলেছেন, তার তাওবা সহীহ হবে না। কারণ তাওবা তো সেই ব্যক্তির কাছ থেকেই সহীহ হবে, যে গুনাহও করতে পারে আবার তা থেকে বেঁচেও থাকতে পারে। সুতরাং তাওবা সম্ভাবনাময় স্থান থেকে হতে হবে, অসম্ভব কিছু থেকে নয়। আর এ কারণেই পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া, সমুদ্র শুকিয়ে ফেলা, আকাশে উড়া এবং এ রকম বিভিন্ন বিষয় থেকে তাওবা করার কল্পনাও করা হয় না।

তারা বলে, এর আরেকটি কারণ হলো, তাওবা হচ্ছে নফসের আহ্বানের বিরোধিতা করা আর সত্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তো নফসের কোনো

আহ্বানই থাকে না। কারণ এখানে কোনো কার্যসম্পাদন করা নফসের পক্ষে সম্ভবই নয়।

দ্বিতীয় মতটি হলো—আর এটিই সঠিক মত—এ রকম ব্যক্তির তাওবা সহীহ ও সম্ভব; বরং বাস্তবসম্মত। কারণ তাওবার সবকটি ভিত্তিই এখানে উপস্থিত আর সে যেটার ওপর সক্ষম, তা হলো অনুতাপ-অনুশোচনা করা। কারণ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ "অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা।"[৭১] সুতরাং গুনাহের ওপর যখন তার অনুশোচনা এবং নফসের ওপর যখন তার তিরস্কার পাওয়া গেল, তখন এটাই হলো তার তাওবা। আর কীভাবেই-বা তার থেকে তাওবাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে, যখন সে গুনাহের ওপর প্রচণ্ড অনুতপ্ত হয় এবং এ কারণে নিজের নফসকে বেশ তিরস্কার করে। বিশেষ করে যখন এর সাথে কান্নাকাটি, পেরেশানি, ভয়, দৃঢ় ইচ্ছা এবং তার এই নিয়ত যুক্ত হয় যে, সে যদি সুস্থ থাকত এবং কাজটি করার সক্ষমতা থাকত, তা হলেও অবশ্যই সে তা থেকে বিরত থাকত। (এমন অবস্থাতে তার তাওবা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।)

আবার নবি ﷺ নিয়ত সহীহ থাকার কারণে নেককাজে অক্ষম ব্যক্তিকেও সক্ষম ও নেককাজ সম্পাদনকারীর সমান গণ্য করেছেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

> "যখন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য সে নিজগৃহে সুস্থ থাকাবস্থায় যে আমল করত, তার অনুরূপ আমলের সাওয়াবই লেখা হয়।"[৭২]

এমনিভাবে *'সহীহ মুসলিম'*-এর আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ যুদ্ধরত সাহাবিদের বলেছেন,

إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ

---

[৭১] ইবনু মাজাহ, ৪২৫২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩৫৬৮।

[৭২] বুখারি, ২৯৯৬।

"মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যে পথই পাড়ি দাও আর যে উপত্যকাই অতিক্রম করো, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। কেবল রোগব্যাধিই তাদের বাধা দিয়ে রেখেছে।"[৭৩]

হাদীসে এ রকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি গুনাহ করতে অক্ষম, বাধ্য হয়েই তা পরিত্যাগ করছে—কিন্তু সে এই নিয়ত রাখে যে, সক্ষম হলেও ইচ্ছা করেই গুনাহ থেকে বিরত থাকবে—এমন ব্যক্তিকে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় গুনাহ পরিত্যাগকারী ব্যক্তিদের স্তরে গণ্য করাই উত্তম।

পাঁচ : মানুষের হক নষ্ট করে কেউ যদি তা থেকে তাওবা করে, তা হলে তার জন্য জরুরি হলো : সেই হক থেকে নিজেকে মুক্ত করা; হয়তো সরাসরি হক আদায় করার মাধ্যমে অথবা সেই ব্যক্তিকে জানিয়ে তার থেকে হালাল করে নেওয়ার মাধ্যমে। যদিও তা অর্থসংক্রান্ত বা কারও শরীরে আঘাত দেওয়া বা কারও ওয়ারিশের শরীরে আঘাত দেওয়া হোক না কেন। যেমন নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্মান অথবা অন্য কোনো বিষয়ে জুলুম করে, সে যেন আজই তার নিকট হতে সে ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নেয়, সেদিন আসার পূর্বেই, যেদিন তার না কোনো দীনার থাকবে আর না কোনো দিরহাম। সেদিন যদি তার কোনো নেক আমল থাকে, তা হলে তার জুলুমের সমপরিমাণ তার নিকট হতে তা নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কোনো নেক আমল না থাকে, তা হলে তার সেই সঙ্গীর পাপরাশি হতে সেই পরিমাণ পাপ নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"[৭৪]

যদি কারও সম্মানহানি, গীবত বা অপবাদ দেওয়ার মাধ্যমে জুলুম করা হয়, তা হলে এর থেকে তাওবা করার জন্য কি এই শর্ত রয়েছে যে, সে ব্যক্তিকে সেই সব

---

[৭৩] মুসলিম, ১৯১১।

[৭৪] বুখারি, ২৪৪৯।

গুনাহের নাম ধরে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে এবং তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে? নাকি নির্দিষ্ট না করে তাকে জানিয়ে দেওয়া যে, তার সম্মানে আঘাত করা হয়েছে? নাকি এ দুটোর কোনোটাই শর্ত নয়; বরং কোনো প্রকার জানানো ব্যতীত আল্লাহর নিকট তাওবা করাই যথেষ্ট হবে?

ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক ﵏-এর মাযহাবে প্রসিদ্ধ মত হলো—জানানো ও ক্ষমা চাওয়া তাওবার শর্তের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সঙ্গীসাথিরা তাদের কিতাবে এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

যারা এটিকে শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, তারা দলীল দেন যে, এই গুনাহটি হলো বান্দার হকসম্পর্কিত। সুতরাং তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তা রহিত হবে না।

আরেকটি মত হলো—সম্মানহানি করা, গীবত করা, অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া তাওবা করার জন্য শর্ত নয়। বরং বান্দা ও আল্লাহর মাঝে তাওবাই যথেষ্ট। তবে যে সমস্ত জায়গায় ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে এবং অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে সমস্ত জায়গায় তার প্রশংসা করবে, তার ভালো গুণসমূহের আলোচনা করবে, তার পবিত্রতা ও নির্দোষিতা বর্ণনা করবে এবং যে পরিমাণ গীবত ও অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তার জন্য সে পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলার নিকট ইস্তিগফার করবে। এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন আমাদের শাইখ আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়্যা ﵀।

এই মতাবলম্বীগণ প্রমাণ পেশ করেন যে, তাকে জানিয়ে দেওয়া কেবল অনিষ্ট ও ক্ষতিই ডেকে আনবে, কোনো উপকার বয়ে আনবে না। কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তি নতুন করে কষ্ট পাবে, অন্তরে অশান্তি ও অস্থিরতার সৃষ্টি হবে। অথচ তা শোনার পূর্বে সে নির্ভাবনায় ছিল। অনেক সময় যখন সে তার সম্মানহানি, অপবাদের কথা শুনবে, তখন হয়তো তা সহ্য করতে পারবে না; ফলে তার মানসিক বা শারীরিক কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

ছয়. যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে, পরে তার জন্য তা আদায় করা দুষ্কর ও কঠিন হয়ে পড়ে এবং এর প্রতিকার করাও সম্ভব হয় না; অতঃপর সে

তাওবা করে, তা হলে তার তাওবার হুকুম কী এবং কীভাবে সে তাওবা করবে? এটি আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে।

আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে : যেমন : কেউ সালাত আদায় করা ফরজ জানা সত্ত্বেও কোনো ওজর ছাড়া ইচ্ছা করেই সালাত ছেড়ে দিলো, তার পর তাওবা করল এবং অনুতপ্ত হলো। সালাফগণ এই মাসআলার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ করেছেন।

একদল বলেছেন, তার তাওবা হবে অনুশোচনা ও লজ্জিত হওয়া, ভবিষ্যতের ফরজগুলো আদায় করা এবং যেগুলো ছেড়ে দিয়েছে, সেগুলোর কাযা আদায় করার মাধ্যমে। **চার ইমামসহ আরও অনেক ইমামের অভিমত এমনই।**

আরেকদল বলেছেন, তার তাওবা হবে ভবিষ্যতের ফরজ সালাতগুলো আদায় করার মাধ্যমে। আর যা পরিত্যাগ করেছে, তা কাযা আদায় করার দ্বারা কোনো উপকার হবে না এবং তা কবুলও করা হবে না। সুতরাং কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। এটি হলো **যাহিরি মাযহাব অবলম্বীদের অভিমত।** এটি সালাফের অনেকের নিকট থেকেই বর্ণিত হয়েছে।

যারা কাযাকে ওয়াজিব বলেছেন তাদের দলীল হলো নবি ﷺ-এর বাণী—

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ

"কেউ কোনো সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে যখন তা স্মরণ হবে, তখনই সে যেন তা আদায় করে নেয়। এর কাফফারা কেবল এটিই।"[৭৫]

তারা বলেন, ঘুমন্ত ও ভুলে যাওয়া ব্যক্তির কোনো সীমালঙ্ঘন না থাকা সত্ত্বেও হাদীসে যখন তাদের ওপর কাযা আদায় করা ওয়াজিব করা হয়েছে, তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে স্বেচ্ছায় সালাত ছেড়ে দেয়, তার ওপর ওয়াজিব হওয়া তো বাস্তবসম্মত ও যুক্তির দাবি।

প্রথম মতাবলম্বীরা বলেন, কোনো ইবাদাত সম্পর্কে যখন কোনো নির্দিষ্ট সিফাতের ওপর বা নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করার আদেশ করা হয়, তখন আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেবল তখনই পরিপূর্ণরূপে সেই আদেশ পালন করতে পারবে, যখন যেভাবে যে

---

[৭৫] বুখারি, ৫৯৭; মুসলিম, ৬৮৪।

সিফাতের সাথে যে সময়ে তা পালন করার আদেশ করা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই সে তা আদায় করে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময় না থাকার মানে শর্ত ও সিফাতও না থাকা। তাই বলা যায়, নির্দিষ্ট সময়ে আদায় না করলে যথাযথভাবে তা আদায় হয় না।

তারা বলেন, সালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে বের করা, কিবলা-অভিমুখী হওয়া থেকে বের করার মতোই।

বান্দার হকের ক্ষেত্রে : যেমন : কেউ কারও অনেকগুলো অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করল, তারপরে এক সময় গিয়ে তাওবা করল, কিন্তু এখন সেগুলোর প্রকৃত মালিক বা তাদের ওয়ারিশদের বের করা তার জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাদের না চেনার কারণে বা তাদের কেউ মারা যাওয়ার কারণে বা অন্য কোনো কারণে। এই ব্যক্তির মতো পরিস্থিতি যাদের, তাদের তাওবার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

একদল বলেছেন, প্রকৃত মালিকের নিকট এই অর্থকড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত তার কোনো তাওবা নেই। যখন তা অসম্ভব হয়ে যাবে, তখন তার তাওবাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর থেকে মুক্তি মিলবে কেবল কিয়ামাতের দিন; পূণ্য-পাপের অদলবদলে।

আরেকদল বলেছেন, এই ব্যক্তির জন্যও তাওবার দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তির জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করেননি এবং অন্যান্য গুনাহগারদের জন্যও না। এই ব্যক্তির তাওবা হলো—সে তার আত্মসাৎকৃত মাল-সম্পদগুলো প্রকৃত মালিকের নামে আল্লাহর রাস্তায় সদাকা করে দেবে। ফলে যখন সমস্ত হক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করার দিন (কিয়ামাতের দিন) আসবে, তখন তাদের ইখতিয়ার থাকবে যে, তারা চাইলে এই ব্যক্তি যে কাজ করেছে, তার অনুমোদন দিয়ে সদাকার যে সাওয়াব হয়েছে তার অধিকারী হবে আবার চাইলে অনুমোদন না দিয়ে তাদের সম্পদের সমপরিমাণ সাওয়াব সেই ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে নেবে আর সেই ব্যক্তি এই দান-সদাকার সাওয়াব পেয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা কোনো নেক আমলের সাওয়াব নস্যাৎ করে দেন না। আবার সম্পদের মালিকদের জন্য সম্পদ দান করার সাওয়াব এবং ওই ব্যক্তির কাছ থেকে নেক আমল নিয়ে নেওয়া—এই দুই প্রতিদানকেও একত্রিত করবেন না। তারা দুটোর যেকোনো একটি পাবে।

অনেক সাহাবি ﵃-ও এই মত পোষণ করেছেন।

ইস্‌তিগফার ও তাওবার প্রকৃত মর্ম

তাওবার আলোচনা

অধিকাংশ মানুষ তাওবার তাফসীর করে থাকে তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে—গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা, তাৎক্ষণিকভাবে তা থেকে বিরত থাকা এবং অতীতের করা-গুনাহের ওপর অনুতপ্ত হওয়া। আর যদি বান্দার হকসংক্রান্ত হয়, তা হলে চতুর্থ আরেকটি বিষয় জরুরি তা হলো : বান্দার কাছ থেকে বৈধ করে নেওয়া।

তারা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করে থাকেন, তা হলো তাওবার কিছু অংশ বা শর্ত। অন্যথায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীতে এগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকার সাথে সাথে আরেকটি বিষয়ও রয়েছে। তা হলো—সেই গুনাহের বিপরীতে যে বিষয়ের আদেশ করা হয়েছে, তা করার সুদৃঢ় ইচ্ছা ও তা পালন করাকে নিজের ওপর অপরিহার্য করে নেওয়া। সুতরাং শুধু গুনাহ থেকে বিরত থাকা, পুনরায় তাতে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা এবং অনুশোচনার মাধ্যমে কেউ তাওবাকারী বলে গণ্য হয় না; যতক্ষণ-না যা করতে আদেশ করা হয়েছে, তা পালন করতে তার কাছ থেকে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা পাওয়া যায়। এটিই হলো তাওবার প্রকৃত মর্ম। তাওবা হলো এই দুটি বিষয়ের সম্মিলিত নাম। তবে যদি আদেশকৃত বিষয়টি এর সাথে সংযুক্ত থাকে, তা হলে তারা যা উল্লেখ করেন, তা-ই উদ্দেশ্য হবে। আর যদি সংযুক্ত না হয়ে আলাদাভাবে আসে, তা হলে দুটি বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

এটি হলো 'তাকওয়া' (اَلتَّقْوٰى) শব্দটির মতো; যখন তা আলাদাভাবে আসে, তখন তা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা—এ দুটিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর যদি আদেশকৃত বিষয়ের সাথে তাকওয়া যুক্ত হয়ে আসে, তা হলে তা হারাম থেকে বেঁচে থাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কারণ তাওবার মূল অর্থ হলো : আল্লাহর দিকে ফিরে আসা; তিনি যা ওয়াজিব করেছেন, তা আদায় করার মাধ্যমে এবং তিনি যা অপছন্দ ও নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। সুতরাং অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে সংযমে রেখে, পছন্দনীয় বিষয়াদির দিকে ধাবিত হওয়ার নামই তাওবা। এখানে দুটি বিষয়

রয়েছে; একটি হলো মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিষয় থেকে নিজেকে বিরত রাখা। আরেকটি হলো মাহবূব বা পছন্দনীয় বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়া। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আদেশকৃত কাজগুলো পালন করা এবং নিষেধকৃত কাজগুলো পরিত্যাগ করার সাথে সফলতাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[৭৬]

সুতরাং প্রত্যেক তাওবাকারী ব্যক্তিই সফল; তবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত-না তাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা আদায় করে এবং তাকে যা নিষেধ করা হয়েছে, তা পরিত্যাগ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

"আর যারা তাওবা করে না, তারাই জালিম বা অত্যাচারী।"[৭৭]

হারামে-লিপ্ত-ব্যক্তির মতো আল্লাহর আদেশ-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিও জালিম। সুতরাং জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে হলে দুটি বিষয়েই তাওবা করতে হবে। উপরিউক্ত আয়াত অনুসারে সমস্ত মানুষ দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ—১. তাওবাকারী, ২. জালিম। তাওবাকারী ব্যতীত সবাই জালিম। আর তাওবাকারী ব্যক্তিরা হলেন নিম্নোক্ত আয়াতের গুণে গুণান্বিত—

اَلْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللهِ

"ইবাদাতকারী, শোকরগুজার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকূ ও সাজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী, মন্দকাজ থেকে

[৭৬] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।

[৭৭] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১।

নিষেধকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাজতকারী।”[৭৮]

আল্লাহর-দেওয়া-সীমারেখা হেফাজত করা হলো তাওবার একটি অংশ। আর তাওবা হলো এই সবগুলো বিষয়ের সমষ্টির নাম। তাওবাকারীকে 'তায়িব' এ কারণেই বলা হয় যে, সে আল্লাহর নিষেধকৃত বস্তুসমূহ থেকে আল্লাহর আদেশকৃত বস্তুর দিকে এবং গুনাহ ছেড়ে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে। যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং তাওবাই হলো দ্বীন-ইসলামের হাকীকত। দ্বীনের পুরাটাই তাওবার অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা তাওবাকারী আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়। কারণ আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন এবং সেই ব্যক্তিদেরও তিনি ভালোবাসেন, যারা তাঁর দেওয়া আদেশগুলো পালন করে আর নিষেধগুলো থেকে বেঁচে থাকে।

তা হলে বুঝা যায়, তাওবা হলো প্রকাশ্যভাবে ও অপ্রকাশ্যভাবে আল্লাহ তাআলা যা অপছন্দ করেন, তা থেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে তিনি যা পছন্দ করেন সে দিকে ফিরে আসা।

তাওবার মধ্যে ইসলাম, ঈমান, ইহ্সান—সবই শামিল এবং তা সমস্ত মানযিল ও মাকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এ কারণেই প্রতিটি মুমিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শুরু ও শেষ হলো তাওবা। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এটি হলো সেই উদ্দেশ্য, যার জন্য সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে অস্তিত্বে আনা হয়েছে। আদেশ ও তাওহীদ হলো এর একটি অংশ। বরং বলা যায় সবেচেয়ে বড়ো অংশ; যার ওপর এর ভিত্তি।

অধিকাংশ মানুষ তাওবার মর্যাদা ও প্রকৃত মর্মই বোঝে না; ইলমি, আমলি, অবস্থাগতভাবে তা আদায় করা তো অনেক দূরের কথা। আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবাকারীদের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান আছে বলেই তিনি তাদের অনেক ভালোবাসেন।

তাওবা যদি পুরা ইসলামি শারীআতকে এবং ঈমানের হাকীকতকে অন্তর্ভুক্ত না করত, তা হলে আল্লাহ তাআলা বান্দার তাওবার কারণে অত বেশি খুশি হতেন

---

[৭৮] সূরা তাওবা, ৯ : ১১২।

না। আসলে সূফিয়ায়ে কেরাম সে সমস্ত মানযিল, মাকাম ও অন্তরের বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন, তা তাওবারই বিস্তারিত বিবরণ ও প্রভাব।

ইস্তিগফারের আলোচনা

ইস্তিগফার দুই প্রকার : ১. আলাদাভাবে উল্লেখকৃত ও ২. তাওবার সাথে যুক্ত করে উল্লেখকৃত।

১. আলাদাভাবে উল্লেখকৃত ইস্তিগফার : যেমন : আপন কওমকে উদ্দেশ্য করে নূহ ﷺ-এর বক্তব্য—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۝١١

"অতঃপর আমি বলেছি, 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তা হলে তিনি তোমাদের ওপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন।"[৭৯]

যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝٣٣

"অথচ আল্লাহ কখনই তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তা ছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আল্লাহ কখনো তাদের ওপর আযাব দেবেন না।"[৮০]

২. তাওবার সাথে যুক্ত করে উল্লেখকৃত : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ

"তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর নিকট তাওবা করো, তা হলে তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবন-

[৭৯] সূরা নূহ, ৭১ : ১০-১১।
[৮০] সূরা আনফাল, ৮ : ৩৩।

সামগ্রী দেবেন এবং অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অনুগ্রহ দান করবেন।"[৮১]

যেমন সালিহ ﷺ তার সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

"কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁর নিকটই তাওবা করো। নিশ্চয়ই আমার রব নিকটে আছেন, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।"[৮২]

আলাদাভাবে উল্লেখকৃত ইস্‌তিগফার তাওবার ন্যায়। বরং তা হুবহু তাওবাই; তবে এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাকেও তা অন্তর্ভুক্ত করে। ক্ষমা প্রার্থনা হলো গুনাহকে মিটিয়ে দেওয়া, এর প্রভাব দূর করা এবং এর ক্ষতি থেকে বাঁচা। কিছু মানুষ যেমন ধারণা করে, বিষয়টি সেরকম নয় যে, তা হলো সতর বা পর্দা; অর্থাৎ গুনাহকে ঢেকে রাখা। কারণ আল্লাহ তাআলা তার গুনাহও ঢেকে রাখেন, যাকে তিনি ক্ষমা করেন আবার তার গুনাহও ঢেকে রাখেন, যাকে তিনি ক্ষমা করেন না। তবে হ্যাঁ ক্ষমার অংশ বা অপরিহার্য ব্যাপার হলো গুনাহকে পর্দায় রাখা বা ঢেকে রাখা। সুতরাং পর্দার বিষয়টি পরোক্ষভাবে সাব্যস্ত হয়।

তবে ইস্‌তিগফারের হাকীকত বা প্রকৃত মর্ম হলো : গুনাহের ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত থাকা। এই শব্দমূল থেকেই اَلْمِغْفَرُ শব্দের উৎপত্তি; এর অর্থ হলো : যা মাথাকে আঘাত পাওয়া থেকে সংরক্ষিত রাখে, শিরস্ত্রাণ। আর ঢেকে রাখা বা পর্দার বিষয়টি অপরিহার্যভাবে এর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এটিই মূল না। আর এ কারণেই পাগড়িকে 'মিগফার' বলা হয় না, টুপিকেও না। মিগফার শব্দের মধ্যে সংরক্ষণ করার অর্থ থাকা জরুরি।

এই ইস্‌তিগফারই আযাবকে প্রতিহত করে, শাস্তি থেকে সংরক্ষিত রাখে; যেমন আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে তা লক্ষ করা যায়—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾

---

[৮১] সূরা হূদ, ১১ : ৩।

[৮২] সূরা হূদ, ১১ : ৬১।

> “অথচ আল্লাহ কখনই তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তা ছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আল্লাহ্ কখনো তাদের ওপর আযাব দেবেন না।”[৮৩]

কারণ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে শাস্তি দেন না, তাদেরকে শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখেন।

আর যে ব্যক্তি অবিরাম গুনাহ্ করতে থাকে আবার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাও প্রার্থনা করে, তা হলে এটা তার কোনো ক্ষমা প্রার্থনাই নয়। আর এই কারণে সে আযাব ও শাস্তি থেকে সংরক্ষিতও থাকবে না।

ইস্তিগফার তাওবাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর তাওবা ইস্তিগফারকে। সাধারণভাবে একটি অপরটির মধ্যে শামিল।

আর যখন ইস্তিগফার ও তাওবা একসাথে আসে, তখন **ইস্তিগফার** দ্বারা উদ্দেশ্য হয় : অতীতে যা অতিবাহিত হয়েছে, তার ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য প্রার্থনা করা; আর **তাওবা** দ্বারা উদ্দেশ্য হয় : গুনাহ্ থেকে ফেরা এবং ভবিষ্যতে মন্দ আমলের ক্ষতির আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়ার কামনা করা।

এখানে দুটি গুনাহ : একটি গুনাহ্ যা অতীতে হয়ে গেছে; এর থেকে ইস্তিগফারের অর্থ হবে : এর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করা; আরেকটি গুনাহ্ যা সামনে সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা আছে; এর থেকে তাওবা করার অর্থ হবে : তা না করার দৃঢ় সংকল্প করা। আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা এই দুই প্রকারকেই শামিল করে—তাঁর দিকে ফেরা; যাতে তিনি অতীতে যা অতিবাহিত হয়েছে, তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং যাতে তিনি ভবিষ্যতে নফসের ও মন্দ আমলের ক্ষতি থেকেও বাঁচিয়ে দেন।

গুনাহ্গার ব্যক্তির উদাহরণ হলো সেই পথিকের ন্যায়; যে একটি পথ ধরে হেঁটে চলেছে, যা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, তার গন্তব্যে তাকে পৌঁছাবে না। এখন তার জন্য জরুরি হলো : সে তার যাত্রা থামিয়ে দিয়ে পেছন ফিরবে এবং এমন পথ

---

[৮৩] সূরা আনফাল, ৮ : ৩৩।

অবলম্বন করবে, যা তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে এবং সেখানে নিয়ে যাবে, যেখানে রয়েছে তার সফলতা।

এখানে দুটি বিষয় জরুরি : যে পথে সে চলছিল, তা থেকে পৃথক হওয়া এবং অন্য পথ ধরে গন্তব্যে ফেরা। সুতরাং তাওবা হলো এই ফিরে আসা আর ইস্‌তিগফার হলো (বাতিল থেকে) পৃথক হয়ে যাওয়া। যখন আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়, তখন প্রত্যকটিই এই দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এ কারণেই—আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন—আগে ইস্‌তিগফারের হুকুম দেওয়া হয়েছে, পরে তাওবার :

فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ

"কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁর নিকটই তাওবা করো।"[৮৪]

কারণ বাতিল থেকে পৃথক হওয়ার পরেই তো সত্য পথে ফিরে আসা।

এমনিভাবে ইস্‌তিগফার হলো : ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা আর তাওবা হলো : উপকার ও কল্যাণ লাভের জন্য প্রার্থনা। সুতরাং মাগফিরাত মানে গুনাহের ক্ষতি থেকে যেন তাকে রক্ষা করা হয়। আর তাওবা মানে এই রক্ষার পর আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা যেন তার হাসিল হয়। আর পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলে প্রতিটিই একটি অপরটিকে শামিল করে। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

খাঁটি তাওবা বা আন্তরিক অনুশোচনা (اَلتَّوْبَةُ النَّصُوْحُ)

উপরিউক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে, যখন খাঁটি তাওবা ও এর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো—খাঁটি তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দকর্মসমূহ দূর করে

[৮৪] সূরা হূদ, ১১ : ৬১।

দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে রয়েছে প্রবাহিত নদী।”[৮৫]

আল্লাহ তাআলা এখানে গুনাহ ও মন্দকর্মসমূহের ক্ষতি থেকে রক্ষা করাকে, বান্দা যা অপছন্দ করে সেগুলোকে দূর করে দেওয়াকে; এবং বান্দা যা পছন্দ করে, সেই জান্নাতে প্রবেশ করানোকে—খাঁটি তাওবা (اَلتَّوْبَةُ النَّصُوْحُ) হাসিল হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

اَلنَّصُوْحُ শব্দটি فَعُوْلٌ-এর গঠন অনুযায়ী হয়েছে; যা فَاعِلٌ থেকে উৎসারিত। শব্দকে এই আকৃতিতে গঠন করার কারণ হলো : যাতে শব্দটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণতার অর্থ দেয়। যেমন : اَلشَّكُوْرُ (পরম প্রতিদানদাতা), اَلصَّبُوْرُ (পরম ধৈর্যশীল)। (ن ص ح)-এই শব্দমূলের আসল অর্থ হলো : কোনোকিছু ভেজাল ও দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া। نَصَحَ মানে খাঁটি হওয়া, নির্ভেজাল হওয়া। তাওবা, ইবাদাত ও পরামর্শের ক্ষেত্রে اَلنُّصْحُ-এর অর্থ হলো : সব ধরনের ধোঁকাবাজি, ঘাটতি ও ফাসাদ থেকে মুক্ত হওয়া এবং সর্বোত্তম পন্থায় তা বাস্তবায়িত করা। اَلنُّصْحُ-এর বিপরীত হলো اَلْغِشُّ ধোঁকা বা প্রতারণা।

এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সালাফদের ভাষা ও শব্দের তারতম্য হয়েছে; কিন্তু সবার মূল কথা ছিল একই।

উমর ইবনুল খাত্তাব ও উবাই ইবনু কা'ব ﷺ বলেছেন, ‘اَلتَّوْبَةُ النَّصُوْحُ বা খাঁটি তাওবা হলো : গুনাহ থেকে তাওবা করবে, অতঃপর আর সে দিকে ফিরে যাবে না; যেমন দুধ আর ওলানে ফিরে যায় না।’[৮৬]

হাসান বাস্‌রি ﷺ বলেছেন, ‘তা হলো : যা হয়েছে বান্দা তার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে এবং পুনরায় তাতে লিপ্ত না হবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে।’[৮৭]

কালবি ﷺ বলেছেন, ‘জবানে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অন্তরে অনুতপ্ত হবে এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা থেকে বিরত থাকবে।’[৮৮]

---

[৮৫] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৮।

[৮৬] সা'লাবি, আত-তাফসীর, ৯/৩৫০।

[৮৭] বাগাবি, আত-তাফসীর, ৮/১৬৯।

[৮৮] বাগাবি, আত-তাফসীর, ৮/১৬৯।

আমি বলি, 'খাঁটি তাওবা তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে—

১. এটি সব রকমের গুনাহ ও পাপকে অন্তর্ভুক্ত করবে; কোনো একটিকেও বাদ দেবে না।

২. এতে সব ধরনের গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সত্যবাদিতা থাকবে; সামান্যতম দ্বিধা ও বিলম্ব করার বিষয়ও থাকবে না। বরং তাৎক্ষণিকভাবে নিজের সাধ্যমতো সেগুলো থেকে বিরত থাকবে।

৩. একনিষ্ঠতার মধ্যে কোনো রকম কমতি ও ঘাটতি থাকবে না। এগুলো থেকে বেঁচে থাকবে একমাত্র আল্লাহর ভয়ভীতির কারণে, তাঁর কাছে যে নিয়ামাত রয়েছে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে এবং তাঁর কাছে যে শাস্তি রয়েছে তাঁর ভয়ে; সেই ব্যক্তির মতো নয় যে নিজের মান-সম্মান, পদ-পদবি, কর্তৃত্ব-ক্ষমতা, ধনসম্পদ ইত্যাদি রক্ষার্থে তাওবা করে; কিংবা মানুষের প্রশংসা কুড়াতে বা তাদের নিন্দা থেকে বাঁচতে বা যাতে মূর্খ কেউ তার ওপর কর্তৃত্ব না পায় সে জন্য বা নিজের দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বা অক্ষমতা ও অর্থশূন্যের ভয়ে বা এ জাতীয় বিভিন্ন কারণ সামনে রেখে তাওবা করে; যেসব কারণে তাওবার বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি বিনষ্ট হয়।

সুতরাং ১ নং বিষয়টি যেসব গুনাহ থেকে তাওবা করবে, তার সাথে সম্পর্কিত; ৩ নং বিষয়টি কার জন্য তাওবা করবে, তার সাথে সম্পর্কিত। আর ২ নং বিষয়টি তাওবাকারীর নিজসত্তার সাথে সম্পর্কিত। আসলে খাঁটি তাওবা সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতা, সমস্ত গুনাহ ও পাপকে শামিল করে। আর তাওবা যে ইস্‌তিগফারকে অন্তর্ভুক্ত করে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এই তাওবা সমস্ত গুনাহ ও পাপকে মিটিয়ে দেয়। তাওবার সবচেয়ে পরিপূর্ণ রূপটিই হলো اَلتَّوْبَةُ النَّصُوْحُ. আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সাহায্যকারী এবং ভরসা কেবল তাঁরই ওপর। আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতীত কেউ কোনো নেককাজ করতে পারে না এবং কোনো গুনাহ থেকে বেঁচেও থাকতে পারে না।

سَيِّئَةٌ ও ذَنْبٌ-এর মাঝে পার্থক্য[৮৯]

আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালামে এ দুটি শব্দ কোথাও একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে আবার কোথাও পরস্পরকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন : আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা দুআ করে—

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দাও এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিয়ো।"[৯০]

আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন : আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

"আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দকর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন।"[৯১]

আর মাগফিরাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ

"সেখানে তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা।"[৯২]

---

[৮৯] বাংলাতে দুটোর অর্থই গুনাহ বা পাপ। আসলে আরবি ভাষার ব্যাপকতা ও প্রাচুর্যতা অনেক থাকার কারণে এই দুটোর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

[৯০] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৯৩।

[৯১] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২।

[৯২] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৫।

এখানে চারটি বিষয় সামনে আসে, তা হলো : যুনূব(ذُنُوبٌ), সায়্যিআত (سَيِّئَاتٌ), মাগফিরাত (مَغْفِرَةٌ) ও তাকফীর (تَكْفِيرٌ)।

যুনূব (ذُنُوبٌ) : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : কবীরা গুনাহ।

সায়্যিআত (سَيِّئَاتٌ) : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : সগীরা গুনাহ; যেগুলোর ক্ষেত্রে কাফফারা প্রয়োগ হয়। যেমন : ছোটো ছোটো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা এ রকম অন্যান্য বিষয়াদি। এ কারণেই সায়্যিআতের বেলায় কাফফারা প্রযোজ্য হয়।

সায়্যিআত দ্বারা যে সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য এবং এতে যে কাফফারা প্রযোজ্য হয়, তার দলীল হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী—

> إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾
>
> "যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তোমরা যদি তার বড়ো বড়ো গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকো, তা হলে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।"[৯৩]

'*সহীহ মুসলিম*'-এর বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

> اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ
>
> "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান তার মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত (ছোটো ছোটো) গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেবে, যদি কবীরা বা বড়ো বড়ো গুনাহগুলো পরিত্যাগ করে চলে।"[৯৪]

---

[৯৩] সূরা নিসা, ৪ : ৩১।

[৯৪] মুসলিম, ২৩৩।

'মাগফিরাত' শব্দটি 'তাকফীর' শব্দটির চেয়ে বেশি পরিপূর্ণ। এই কারণে মাগফিরাতকে কবীরা গুনাহের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর তাকফীরকে সগীরা গুনাহের সাথে। কারণ মাগফিরাত শব্দটি (বান্দাকে গুনাহের ভয়াবহতা থেকে) রক্ষা করা ও হেফাজত করার বিষয়টি শামিল করে। আর তাকফীর শব্দটি ছোটো ছোটো গুনাহকে ক্ষমা করা ও গোপন রাখার অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করলে একটি অপরটি মধ্যে দাখিল হয়ে যায়; যেমনটি আগে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

"আল্লাহ তাদের মন্দকর্মসমূহ মার্জনা করেন।"[৯৫]

আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে—ছোটোবড়ো সব গুনাহ, গুনাহকে মিটিয়ে দেওয়া, এর ক্ষতি থেকে বাঁচানো সবই এর মধ্যে শামিল রয়েছে। এমনিভাবে পৃথকভাবে উল্লেখকৃত তাকফীর সবচেয়ে খারাপ ও মন্দ আমলকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِىْ عَمِلُوْا

"যাতে আল্লাহ তাদের সবচেয়ে মন্দকর্মসমূহ মার্জনা করেন।"[৯৬]

যখন এটা বোঝা গেল, তখন এই রহস্যও বোঝা সহজ হবে যে, আল্লাহ তাআলা বিপদাপদ, রোগব্যাধি, চিন্তা, পেরেশানি, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাকফীর বা সগীরা গুনাহ মাফের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; মাগফিরাত বা কবীরা গুনাহ মাফের নয়। যেমন, সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا أَذًى وَّلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়,

---

[৯৫] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২।

[৯৬] সূরা যুমার, ৩৯ : ৩৫।

এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ দূর করে দেন।"[৯৭]

কারণ বিপদ-মুসীবত গুনাহ মাফের ক্ষেত্রে এককভাবে যথেষ্ট নয়; আবার তাওবা ব্যতীত সমস্ত গুনাহ মাফও হয় না। সুতরাং গুনাহগারদের জন্য দুনিয়াতে তিনটি বড়ো বড়ো নদী রয়েছে, যার দ্বারা সে এখানে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে—যদি এর দ্বারাও পরিপূর্ণ পবিত্র না হতে পারে, তা হলে কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের নদীতে নামিয়ে তা অর্জন করবে। দুনিয়ার বড়ো বড়ো তিনটি নদী হলো: ১. খাঁটি তাওবার নদী, ২. এমন নেক আমলের নদী; যা সমস্ত গুনাহকে বেষ্টন করে নেয় এবং ৩. গুনাহ-দূরকারী বড়ো বড়ো বিপদাপদের নদী। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার ব্যাপারে কল্যাণ ও মঙ্গলের ফায়সালা করেন, তখন তাকে এই তিন নদীর কোনো একটিতে প্রবেশ করান; ফলে সে কিয়ামাতের দিন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে; চতুর্থ কোনো নদীর আর প্রয়োজন হবে না।

বান্দার তাওবা আল্লাহর দুই রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত

আল্লাহর দিকে বান্দার ফিরে আসা বা তাওবা করার পূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রহমত এবং পরে একটি রহমত দ্বারা বান্দার তাওবা পরিবেষ্টিত থাকে। বান্দার তাওবা থাকে আল্লাহর দুই রহমতের মাঝে; আগে একটা, পরে একটা। কারণ প্রথমে তিনি তাকে তাওবা করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন, তার অন্তরে অনুপ্রেরণা জোগান এবং তাওফীক দান করেন। এরপর বান্দা তাওবা করলে তা কবুল করতে এবং এর প্রতিদান দিতে আল্লাহ তাআলা দ্বিতীয়বার তার দিকে মনোযোগী হন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

"আল্লাহ দয়াশীল হয়েছেন নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবির সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি পুনরায় দয়াশীল হন

---

[৯৭] বুখারি, ৫৬৪১; মুসলিম, ২৫৭৩।

তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।”[৯৮]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ তাদের তাওবার চেয়ে অগ্রগামী ছিল; যার কারণে তারা তাওবা করতে পেরেছে। আল্লাহর রহমতই তাদের তাওবা করার কারণ। সুতরাং বোঝা যায়, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াশীল না হলে, তারা তাওবা করতে পারত না। কেননা কারণ না থাকলে হুকুমও থাকে না।

তাওবার শুরু ও শেষ রয়েছে। এর শুরুটা হলো আল্লাহ তাআলার দিকে ফেরা, তাঁর দেওয়া সরল-সোজা পথে চলা; যে পথ তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছার জন্য এবং বান্দাদের সে পথে চলার আদেশও করেছেন—

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

“নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ; অতএব এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চলো না।”[৯৯]

আর তাওবার শেষ হলো আখিরাতে তাঁর দিকে ফেরা এবং তাঁর সে পথে চলা; যা তিনি জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য বানিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরবে, আল্লাহ তাআলাও আখিরাতে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে তার দিকে ফিরবেন।

গুনাহের প্রকারভেদ

যুনূব বা গুনাহ হলো দুই প্রকার : ১. সগীরা গুনাহ ও ২. কবীরা গুনাহ। কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাতের ইজমা দ্বারা এটি প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ

“যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তার বড়ো

[৯৮] সূরা তাওবা, ৯ : ১১৭।
[৯৯] সূরা আনআম, ৬ : ১১৩।

বড়ো গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকো, তা হলে আমি তোমাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবো।"[১০০]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

"যারা বড়ো বড়ো গুনাহ এবং প্রকাশ্য ও সর্বজনবিদিত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে; তবে ছোটোখাটো ক্রটি-বিচ্যুতি হওয়া ভিন্ন কথা।"[১০১]

'সহীহ মুসলিম'-এর বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَّا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

"পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান তার মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত (ছোটো ছোটো) গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেবে; যদি কবীরা বা বড়ো বড়ো গুনাহগুলো পরিত্যাগ করে চলে।"[১০২]

ইমামগণ দুটি বিষয়ে ইখতিলাফ করেছেন, একটি হলো : উপরিউক্ত আয়াতে ব্যবহৃত اَللَّمَمُ-এর অর্থ নিয়ে, আরেকটি হলো : কবীরা গুনাহের ব্যাপারে; এর কী নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা আছে কি না অথবা এর নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা রয়েছে কি না? আমরা এই দুটি বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

اَللَّمَمُ সম্পর্কে আলোচনা : অনেক সালাফ থেকে বর্ণিত আছে যে, ' 'লামাম' হলো একবার গুনাহে লিপ্ত হওয়া, অতঃপর আর সে দিকে ফিরে না যাওয়া; যদিও তা কবীরা গুনাহ হয়।' বাগাবি ﵀ বলেছেন, 'এটি আবূ হুরায়রা, মুজাহিদ ও হাসান বাসরির মত এবং ইবনু আব্বাস থেকে আতার বর্ণনা।' তিনি আরও বলেছেন,

---

[১০০] সূরা নিসা, ৪ : ৩১।

[১০১] সূরা নাজম, ৫৩ : ৩২।

[১০২] মুসলিম, ২৩৩।

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﷺ বলেন, 'اَللَّمَمُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহ।' সুদ্দি ﷺ বলেছেন, 'আবূ সালিহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলার বাণীতে إِلَّا اللَّمَمَ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো।' আমি জবাব দিলাম, 'সেই ব্যক্তি যে গুনাহে একবার জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু পরবর্তীকালে তাতে আর লিপ্ত হয় না।' অতঃপর এই বিষয়টি আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি বলেন, 'দয়াময় অধিপতি আল্লাহ তোমাকে এর ওপর সাহায্য করেছেন।'

আর অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত : اَللَّمَمُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কবীরা গুনাহ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-এর দুটি রিওয়ায়াতের মধ্যে এটিই অধিক বিশুদ্ধ। যেমন *'সহীহ বুখারি'*-র বর্ণনায় তার থেকে তাউস ﷺ বর্ণনা করেন, 'ইবনু আব্বাস বলেন, 'লামাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে : নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের ওপর যিনার একটা অংশ লিখে রেখেছেন। সে অবশ্যই তা পাবে। চোখের যিনা দেখা, জিহ্বার যিনা কথা বলা, নফস কামনা সৃষ্টি করে আর সবশেষে যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।"[১০৩]

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ﷺ বলেছেন, 'অন্তরের দ্বারা বান্দা যে গুনাহে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ যা সে চিন্তাভাবনা করে।'

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তই হলো সঠিক অভিমত যে, লামাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সগীরা গুনাহ। যেমন : দৃষ্টি দেওয়া, স্পর্শ করা, চুম্বন করা ইত্যাদি। এটি হলো অধিকাংশ সাহাবি ও তাবিয়িদের মত। আবূ হুরায়রা, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস, মাসরূক ও শা'বি ﷺ-এর অভিমত।

[১০৩] বুখারি, ৬২৪৩; মুসলিম, ২৬৫৭।

এই অভিমত আবার আবূ হুরায়রা ও ইবনু আব্বাস ﵄-এর অপর বর্ণনার বিপরীত নয়—'একবার কবীরা গুনাহে জড়িয়ে পড়া; অতঃপর আর তাতে অভ্যস্ত না হওয়া।' কারণ লামাম হয়তো এই দুটোকেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং তা দুভাবেই হতে পারে; যেমন কালবি ﵀ বলেছেন। অথবা আবূ হুরায়রা ও ইবনু আব্বাস ﵄ সেই ব্যক্তিকেও লামামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যে কবীরা গুনাহে মাত্র একবার লিপ্ত হয়েছে এবং তার ওপর অটল থাকেনি; বরং তার সারাজীবনে আকস্মিকভাবে কেবল ওই একবারই ঘটেছে। তবে তাঁরা সে ব্যক্তির ব্যাপারে অনেক কঠোর অবস্থানে রয়েছেন, যে কবীরা গুনাহে অটল ও ধারাবাহিকভাবে লিপ্ত। এটি আসলে তাঁদের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও ইলমের গভীরতা।

কবীরা গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা : সালাফগণ এ ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন; তবে তা একেবারেই বিপরীতমুখী বা সাংঘর্ষিক নয়; বরং সেগুলো প্রায় কাছাকাছি অর্থের।

'সহীহ বুখারি'-তে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵄ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

اَلْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

> "কবীরা গুনাহসমূহ (-এর অন্যতম) হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।"[১০৪]

'সহীহ বুখারি' ও *'সহীহ মুসলিম'*-এর বর্ণনায় এসেছে, আবূ বাকরা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ একবার বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড়ো বড়ো কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জানিয়ে দেবো না?" এই কথাটি তিনি তিনবার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার সাথে শির্‌ক করা ও মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া।" তিনি হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন, "আর মনে রেখো, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" এই কথাটি তিনি বারবার বলতেই থাকেন; এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, 'যদি

---

[১০৪] বুখারি, ৬৬৭৫।

তিনি থেমে যেতেন!'[১০৫]

'সহীহ বুখারি' ও *'সহীহ মুসলিম'*-এর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম,

أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ

'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কোনটি?'

তিনি জবাব দিলেন,

أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ

"তুমি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই এটি সবচেয়ে বড়ো। এরপর কোনটি?'

তিনি বললেন,

أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ

"তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে খাবার খাবে।"

আমি বললাম, 'এরপর কোনটি?'

তিনি বললেন,

أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ

"তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।"

আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-এর এই বাণীর সত্যায়নে এই আয়াত নাযিল করেন—

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

---

[১০৫] বুখারি, ২৬৫৪; মুসলিম, ৮৭।

يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

"এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদাত করে না, আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজগুলো করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।"(সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮)[১০৬]

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ

"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থেকো।"

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেগুলো কী?'

নবি ﷺ জবাব দিলেন,

اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

১. আল্লাহর সাথে শির্‌ক করা,

২. জাদু করা,

৩. সঙ্গত কারণ ছাড়া আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করা,

৪ ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা,

৫. সুদ খাওয়া,

৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং

৭ পবিত্র, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর ওপর অপবাদ দেওয়া।"[১০৭]

---

[১০৬] বুখারি, ৪৪৭৭; মুসলিম, ৮৬।

[১০৭] বুখারি, ২৭৬৬; মুসলিম, ৮৯।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

"কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হলো নিজের পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়া।"

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীভাবে ব্যক্তি তার নিজের পিতামাতাকেই অভিশাপ দেবে?'

তিনি জবাব দিলেন,

يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

"সে অন্যের পিতাকে গালি দেবে, তখন সেই ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেবে এবং সে অন্যের মাকে গালি দেবে, তখন সেই ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেবে। (আর এভাবে সে যেন তার নিজের পিতামাতাকেই গালি দিলো)"[১০৮]

সাঈদ ইবনু জুবাইর ﵀ বলেন, 'একব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবীরা গুনাহ কি সাতটি?' তিনি উত্তর দেন, 'কবীরা গুনাহ প্রায় সাতশ'র কাছাকাছি। ইস্তিগফার করতে থাকলে কবীরা গুনাহ আর কবীরা থাকে না, এমনিভাবে সগীরা গুনাহও বারবার করতে থাকলে তা আর সগীরা থাকে না।' তিনি আরও বলেন, 'যে বস্তুর দ্বারাই আল্লাহর নাফরমানি করা হয়, তা-ই কবীরা; যে ব্যক্তি এর মধ্যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়ে, তার উচিত ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা আল্লাহ তাআলা এই উম্মাতের কোনো ব্যক্তিকেই চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের ফায়সালা করবেন না, কয়েক শ্রেণি ব্যতীত; তা হলো— যে ইসলাম থেকে ফিরে যায় বা কোনো ফরজবিধানকে অস্বীকার করে অথবা তাকদীরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।'[১০৯]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার শুরু থেকে নিয়ে

---

[১০৮] বুখারি, ৫৯৭৩; মুসলিম, ৯০।

[১০৯] সা'লাবি, তাফসীর, ১০/২৬১-২৬৪।

এই আয়াত পর্যন্ত যে গুনাহের আলোচনা করেছেন, তার সবই কবীরা—

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

"যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তোমরা যদি তার বড়ো বড়ো গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকো, তা হলে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবো।"[১১০]

আলি ইবনু আবী তালহা ﷺ বলেছেন, 'কবীরা গুনাহ হলো : এমন প্রতিটি গুনাহ, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম, গজব, লা'নত অথবা আযাবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'[১১১]

দাহ্হাক ﷺ বলেছেন, 'কবীরা গুনাহ হলো : যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে হদ বা আখিরাতে শাস্তি দেওয়া কথা বলেছেন।'[১১২]

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা জানা জরুরি : সেটি হলো কবীরা গুনাহের সাথে যা যুক্ত হয়, কখনো কখনো তা সগীরা গুনাহের সাথেও যুক্ত হয়; যেমন : লজ্জা, ভয়, সেই গুনাহকে অনেক বড়ো মনে করা ইত্যাদি। আবার সগীরা গুনাহের সাথে যা যুক্ত হয়, কখনো কখনো তা কবীরা গুনাহের সাথেও যুক্ত হয়; যেমন : লজ্জাহীনতা, বেপরোয়া ভাব, ভয়ডর না থাকা, গুনাহকে তুচ্ছ করে দেখা, ছোটো ভাবা ইত্যাদি। এভাবে ব্যক্তি সগীরা গুনাহকে কবীরা গুনাহের চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে নিয়ে যায়।

এটি পুরোপুরিভাবে অন্তরের একটি বিষয়। গুনাহে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অতিরিক্ত একটি বিষয়; যা মানুষ নিজের ব্যাপারে ভালো করে জানে আর কখনো কখনো অন্যের ব্যাপারেও জানতে পারে।

আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যাকে পছন্দ করা হয় ও যার অনেক বড়ো অনুগ্রহ রয়েছে, এমন ব্যক্তিকে অনেক ব্যাপারে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যা অন্যদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। এমনিভাবে তাকে অনেক ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়, যা অন্যদের দেওয়া হয় না।

---

[১১০] সূরা নিসা, ৪ : ৩১।

[১১১] বাগাবি, তাফসীর, ২/২০২।

[১১২] বাগাবি, তাফসীর, ২/২০৩।

বান্দার আমলসমূহ তার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। যখন সে বিপদে পড়বে, তখন তাকে উদ্ধার করবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইউনুস ﷺ সম্পর্কে বলেছেন,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾

"যদি তিনি আল্লাহর তাসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হতো।"[১১৩]

ফিরআউন মৃত্যুর পূর্বে কোনো নেক আমল পাঠায়নি; যা তার জন্য সুপারিশ করবে। মৃত্যুর সময় ফিরআউন বলে উঠে,

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

"এবার আমি বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোনো মা'বূদ নেই তিনি ছাড়া যাঁর ওপর ঈমান এনেছে ইসরাঈলের বংশধররা। বস্তুত আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"[১১৪]

প্রতিউত্তরে জিবরীল ﷺ বলেন,

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

"এখন একথা বলছো! অথচ তুমি ইতঃপূর্বে নাফরমানি করছিলে এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।"[১১৫]

যে সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে

বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তায়িব বা তাওবাকারী হিসেবে পরিচয় পাবে না, যতক্ষণ-না সে ১২টি বিষয় থেকে মুক্ত থাকছে; যেগুলো আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হারামেরই বিভিন্ন প্রকার—

[১১৩] সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৪৩-১৪৪।

[১১৪] সূরা সূরা ইউনুস, ১০ : ৯০।

[১১৫] সূরা ইউনুস, ১০ : ৯১।

১. কুফর (অস্বীকার করা),

২. শির্‌ক (আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা),

৩. নিফাক (কপটতা),

৪. ফুসূক (পাপাচার),

৫. ইসইয়ান (অবাধ্যতা),

৬. ইছ্‌ম (গুনাহ),

৭. উদওয়ান (সীমালঙ্ঘন),

৮. ফাহ্‌শা (অশ্লীল কাজ),

৯. মুনকার (মন্দ কাজ),

১০. বাগইয়ু (অত্যাচার),

১১. আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা এবং

১২. আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করা।

আল্লাহ তাআলা যা কিছু হারাম করেছেন, এই বারোটি প্রকারই হলো তার ভিত্তি। সৃষ্টিজগতের সবাই এতে লিপ্ত; কেবল নবি-রাসূলদের অনুসারীরা ব্যতীত। কারও মধ্যে অনেকগুলো পাওয়া যায়, কারও মধ্যে অনেক কম আবার কারও মধ্যে একটি পাওয়া যায়; কেউ তা টের পায় আর কেউ পায় না।

আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব এবং এই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও বর্ণনা করব; যাতে এর সীমা-পরিসীমা ও বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফীকদাতা; যেভাবে তিনি এ পর্যন্ত তাওফীক দিয়েছেন। গুনাহ থেকে বাঁচার আর নেক কাজ করার সামর্থ্য কেবল আল্লাহ তাআলারই দান।

এই পরিচ্ছেদটি এই বইয়ের সবচেয়ে বেশি উপকারী এবং বান্দা এর প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী।

***

১. কুফর : কুফর দুই প্রকার : বড়ো কুফর ও ছোটো কুফর।

বড়ো কুফর চিরস্থায়ী জাহান্নামকে আবশ্যক করে।

ছোটো কুফর শাস্তি পাওয়াকে আবশ্যক করে; চিরস্থায়ী জাহান্নামকে নয়। যেমন : আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে রয়েছে—যা একসময় পাঠ করা হতো, অতঃপর যার শব্দ রহিত করা হয়েছে—

لَا تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ

> "তোমরা তোমাদের পিতাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। কেননা যে ব্যক্তি নিজের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে কুফরি নীতি অবলম্বন করল।"[১১৬]

সহীহ হাদীসে এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

"মানুষের মাঝে দুটি স্বভাব রয়েছে, যা কুফর বলে গণ্য—

১. বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং

২. মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চঃস্বরে বিলাপ করা।"[১১৭]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

> "যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করল অথবা স্ত্রীর পেছনপথে সঙ্গম করল অথবা গণকের নিকট গেল এবং সে যা বলল, তা বিশ্বাসও করল, তা হলে সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা অস্বীকার করল।"[১১৮]

---

[১১৬] বুখারি, ৬৭৬৮; মুসলিম, ৬২।

[১১৭] মুসলিম, ৬৭।

[১১৮] ইবনু মাজাহ, ৭৩৯; তিরমিযি, ১৩৫; আবূ দাউদ, ৩৯০৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৯৫৩৬।

'সহীহ বুখারি' ও *'সহীহ মুসলিম'*-এ বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"আমার পরে তোমরা পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিণত হোয়ো না।"[১১৯]

বড়ো কুফর : পাঁচ প্রকার :

ক. মিথ্যা বিশ্বাস করার কুফর,

খ. সত্যায়ন থাকা সত্ত্বেও অহংকার ও দাম্ভিকতার কুফর,

গ. উপেক্ষা করার কুফর,

ঘ. সংশয়-সন্দেহের কুফর এবং

ঙ. কপটতা বা নিফাকের কুফর।

ক. মিথ্যা বিশ্বাস করার কুফর : রাসূলকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করা। এই প্রকারটি কাফিরদের মধ্যে খুব কম পাওয়া যায়। কারণ আল্লাহ তাআলা রাসূলদের শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁদের সত্যাবাদিতার ওপর অকাট্য প্রমাণাদি ও অনেক (অলৌকিক) নিদর্শন বা মু'জিযা প্রদান করেছেন; যার দ্বারা তাঁরা দলীল স্থাপন করেন এবং সব ধরনের ওজর-আপত্তি দূর করে দেন।

ফিরআউনের সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

"তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিল।"[১২০]

আর আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে বলেন,

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

[১১৯] বুখারি, ৭০৭৭; মুসলিম, ৬৬।

[১২০] সূরা নাম্‌ল, ২৭ : ১৪।

> “আসলে তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; জালিমরা বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলিকেই অস্বীকার করে।”[১২১]

যদি এটিকে ‘মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফর’ বলে অভিহিত করা হয়, তা হলেও তা সহীহ। কারণ এটি হলো মৌখিকভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করা।

খ. সত্যায়ন থাকা সত্ত্বেও অহংকার ও দাম্ভিকতার কুফর : যেমন : ইবলীস শয়তানের কুফর। কেননা সে আল্লাহ তাআলার কোনো হুকুমকে অস্বীকার করেনি এবং প্রত্যাখ্যানও করেনি; বরং সে আল্লাহর সামনে অহংকার ও দম্ভ করেছিল। এই প্রকার কুফরের মধ্যে ওই ব্যক্তির কুফরও শামিল, যে রাসূলের সত্যতা সম্পর্কে জানে এবং এটাও জানে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যসহ আগমন করেছেন, এরপরও অহংকার ও গর্বের কারণে তাঁর অনুসরণ করে না এবং তাঁকে মেনে নেয় না। অধিকাংশ কাফিরদের অবস্থাই এমন। ইয়াহূদিদের কুফরও ছিল এই প্রকারের। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ

> “যখন সেই জিনিসটি এসে গেছে এবং তারা তাকে চিনতেও পেরেছে, তখন তারা তাকে অস্বীকার করেছে।”[১২২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ

“তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদের।”[১২৩]

আবূ তালিবের কুফরও ছিল এই প্রকারের। কারণ তিনি নবি ﷺ-কে সত্যবাদী হিসেবেই জানতেন এবং এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতেন না। কিন্তু তাকে পেয়ে বসেছিল আত্ম-অহংকার এবং পিতৃপুরুষদের অন্ধভক্তি যে, তিনি তাদের রীতিনীতি থেকে সরবেন না এবং তাদেরকে কাফির প্রমাণিত হতে দেবেন না।

---

[১২১] সূরা আনআম, ৬ : ৩৩।

[১২২] সূরা বাকারা, ২ : ৮৯।

[১২৩] সূরা বাকারা, ২ : ১৪৬।

গ. উপেক্ষা করার কুফর : রাসূল ﷺ-এর কথা শোনা, বোঝা ও উপলব্ধি করা থেকে দূরে থাকা। তাঁকে সত্যায়নও না করা, আবার মিথ্যা সাব্যস্তও না করা। তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও না রাখা, আবার শত্রুতা পোষণও না করা। তিনি যা নিয়ে এসেছেন সে দিকে কর্ণপাতই না করা এবং সম্পূর্ণরূপে তা উপেক্ষা করা। যেমন আবদু ইয়ালীলের বংশধরদের একজন নবি ﷺ-কে বলেছিল,

> وَاللهِ أَقُوْلُ لَكَ كَلِمَةً، إِنْ كُنتَ صَادِقًا، فَأَنْتَ أَجَلُّ فِيْ عَيْنِيْ مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَأَنْتَ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ أُكَلِّمَكَ
>
> 'আল্লাহর শপথ! আপনাকে আমি একটি কথা বলছি (মনে রাখবেন,) আপনি যদি সত্যবাদী হন, তা হলে আমি আপনার নিকট আসার চেয়েও আপনি অনেক বেশি মর্যাদাবান। আর আপনি যদি মিথ্যুক হন, তা হলে আমি আপনার সাথে কথা বলার চেয়েও আপনি অধিক নিকৃষ্ট।'

ঘ. সংশয়-সন্দেহের কুফর : (সন্দেহের কারণেও কুফর হয়।) কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি রাসূলকে দৃঢ়ভাবে সত্যায়নও করে না, আবার মিথ্যাও বলে না; বরং সে তাঁর ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। এমন ব্যক্তির সংশয় তখনই দীর্ঘস্থায়ী হয়, যখন সে রাসূল ﷺ-এর সত্যাবাদিতার নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়। ফলে সে তা শোনেও না এবং সে দিকে মনোযোগও দেয় না। যদি সে সেদিকে মনোযোগ দিত এবং সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত, তা হলে তার কোনো সন্দেহ-সংশয় বাকি থাকত না। কারণ এটি রাসূল ﷺ-এর সত্যতাকে আবশ্যক করে। বিশেষ করে তাঁর সমস্ত নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করার দ্বারা। কারণ সেগুলো তাঁর সত্যতার ওপর এমন প্রমাণ বহন করে, যেমন সূর্য দিন হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে।

ঙ. কপটতা বা নিফাকের কুফর : মুখে মুখে ঈমান আনার কথা বলে, আর অন্তরে তা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। এটি সবচেয়ে বড়ো নিফাক। শীঘ্রই এর প্রকারভেদ-সহ আলোচনা আসবে, ইন শা আল্লাহ।

***

২. শির্ক : শির্কও দুই প্রকার : বড়ো শির্ক ও ছোটো শির্ক।

বড়ো শির্ক : এই শির্ক থেকে তাওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করবেন না। আর এটি হলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা এবং তাকে আল্লাহর মতো ভালোবাসা। মুশরিকরা তাদের বিভিন্ন উপাস্যকে মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, তা এই বড়ো শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই জাহান্নামে তারা তাদের উপাস্যদের বলবে,

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿٩٨﴾

"আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম; যখন আমরা তোমাদেরকে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের সমতুল্য গণ্য করতাম!"[১২৪]

আল্লাহ তাআলা একক অদ্বিতীয়, তিনি প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও মালিক; আর তাদের উপাস্যগুলো কোনোকিছু সৃষ্টি করতে পারে না, রিয্ক দিতে পারে না, মৃত্যু ও জীবন দিতে পারে না—এটা স্বীকার করা সত্ত্বেও, আল্লাহর সাথে তাদের সমকক্ষতা ছিল ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ইবাদাত-উপাসনার ক্ষেত্রে। যেমন দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিকদের অবস্থাই এ রকম; বরং বলা যায় সবাই এমন। তারা আল্লাহর চেয়েও তাদের মা'বূদদের বেশি ভালোবাসে, সম্মান করে এবং তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। তাদের অধিকাংশের অবস্থাই এমন। তারা এক আল্লাহ তাআলার আলোচনা শোনার চেয়ে তাদের উপাস্যদের আলোচনা শুনলে বেশি খুশি হয়।

ছোটো শির্ক : যেমন : মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা, কোনো সৃষ্ট বস্তুর জন্য আমল করা, আল্লাহ বাদে অন্য কারও নামে কসম করা। যেমন নবি ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করল, সে যেন শির্ক করল।"[১২৫]

---

[১২৪] সূরা শুআরা, ২৬ : ৯৭-৯৮।

[১২৫] আবূ দাউদ, ৩২৫১; তিরমিযি, ১৫৩৫।

আবার কাউকে এই কথা বলাও ছোটো শির্কের অন্তর্ভুক্ত যে, 'আল্লাহ ও আপনি যা চান' অথবা 'এটি আল্লাহ ও আপনার পক্ষ থেকে' অথবা 'আমি আল্লাহর সাথে ও আপনার সাথে রয়েছি' অথবা 'আল্লাহ ও আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই' অথবা 'আল্লাহ ও আপনার ওপর আমি ভরসা করছি' অথবা 'আপনি যদি না থাকতেন, তা হলে এমনটা হতো না' ইত্যাদি। কখনো কখনো ব্যক্তির অবস্থা ও উদ্দেশ্য অনুসারে এটি বড়ো শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার একব্যক্তি নবি ﷺ-কে লক্ষ করে বললেন, 'আল্লাহ ও আপনি যা চান'। (তৎক্ষণাৎ এর জবাবে) নবি ﷺ বললেন,

جَعَلْتَ لِلّٰهِ نِدًّا، مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ.

"তুমি তো (আমাকে) আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে! (এ রকমটা না বলে; বরং বলো,) 'একমাত্র আল্লাহ যা চান।'"[১২৬] এই শব্দচয়নটি হলো অন্যান্য শব্দের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শব্দ।

এই প্রকার শির্কের মধ্যে অন্যতম হলো—মৃত ব্যক্তিদের নিকট নিজের কোনো প্রয়োজন প্রার্থনা করা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া এবং তাদের দিকে মনোযোগী হওয়া।

এটি হলো পৃথিবীবাসীর শির্কের মূল। কারণ মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সে তো নিজের জন্যই কোনো প্রকার লাভ-ক্ষতির মালিক নয়, এটি তো অনেক দূরের ব্যাপার যে, তার নিকট সাহায্য চাওয়া হবে, নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার কাছে প্রার্থনা করা হবে অথবা প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে তার কাছে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার কথা বলা হবে!

উপরিউক্ত বিষয়গুলো হলো—সুপারিশকারী, যার জন্য সুপারিশ করা হয় এবং যার নিকট সুপারিশ করা হয় সে সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার ফল।

***

[১২৬] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭৮৮।

৩. নিফাক : এটি ভেতরগত এমন দুরারোগ্য ব্যাধি, যার দ্বারা ব্যক্তি পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু সে টেরও পায় না। কারণ এটি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। যাদের সাথে সে মেলামেশা করে, তাদের অনেকের কাছেই এটি অপ্রকাশিত ও গোপনীয় থাকে। ফলে তারা তাকে মুসলিহ বা সংশোধনকারী ভাবতে থাকে; অথচ সে হলো মুফসিদ বা ফাসাদ-সৃষ্টিকারী। নিফাকও দুই প্রকার : বড়ো নিফাক ও ছোটো নিফাক।[১২৭]

বড়ো নিফাক : এটি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন তলায় অবস্থানকে আবশ্যক করে। এটি হলো মুসলিমদের সামনে আল্লাহর ওপর, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, রাসূল ও আখিরাত দিবসের ওপর ঈমান প্রকাশ করা আর ভেতরে ভেতরে এর সবগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করা। মুনাফিক এটিও বিশ্বাস করে না যে, আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন আবার কোনো মানুষকে অন্যান্য সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল বানিয়ে তার ওপর তা অবতীর্ণ করেছেন; যিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে মানুষদের পথ দেখাবেন, তাঁর শাস্তি ও আযাবের ভীতি প্রদর্শন করবেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে মুনাফিকদের লুকায়িত চরিত্র ও গোপন রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। তাঁর বান্দাদের সামনে তাদের অবস্থা প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন; যাতে তারা সেগুলোর ব্যাপারে ও মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক হয়। সমগ্র দুনিয়াবাসীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে সূরা বাকারার শুরুতে আলোচনা করেছেন : ১. মুমিন, ২. কাফির আর ৩. মুনাফিক। মুমিনদের ব্যাপারে চারটি আয়াত, কাফিরদের ব্যাপারে দুটি আয়াত আর মুনাফিকদের ব্যাপারে তেরোটি আয়াত বর্ণনা করেছেন। তাদের সম্পর্কে এত বেশি আয়াত বর্ণনা করার কারণ হলো : তাদের সংখ্যাধিক্য, মুসলমান ও ইসলামের ওপর তাদের ব্যাপক ক্ষতি ও অনিষ্ট। তারা ইসলামের সাথে, এর সাহায্য-সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাদের মাধ্যমে

---

[১২৭] মুসান্নিফ ﷺ ছোটো নিফাক সম্পর্কে আলোচনা করেননি। ছোটো নিফাক হলো উলামায়ে কেরাম যার নাম দিয়েছেন 'আমলি নিফাক'(النِّفَاقُ الْعَمَلِيُّ)। সুতরাং নিফাক দুই ধরনের : ১. বিশ্বাসগত নিফাক—মুসান্নিফ ﷺ এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন—এবং ২. আমলি বা কার্যগত নিফাক; এর উদাহরণ হলো যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"মুনাফিকের আলামত তিনটি :

১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে,

২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং

৩. যদি তার নিকট আমানত রাখা হয়, তা হলে তার খিয়ানত করে।"—বুখারি, ৩৩; মুসলিম, ৫৯।

ইসলামের ওপর তীব্র আঘাত এসেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা হলো ইসলামের শত্রু। সুযোগ পেলেই তারা তাদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র সামনে আনে; মূর্খ ব্যক্তিরা যা বিচক্ষণতা ও সংশোধনকরণ বলে জ্ঞান করে, অথচ সেগুলো তাদের ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার কৌশল।

পুরা কুরআন জুড়েই তাদের ব্যাপারে আলোচনা হওয়া কাম্য ছিল; পৃথিবীর বুকে ও কবরের পেটে তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে। পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডই তাদের থেকে মুক্ত নয়, (সবখানেই রয়েছে তাদের বিচরণ। এতে বরং সুবিধাই হয়েছে;) ফলে মুমিনরা পথ চলতে একাকিত্ব অনুভব করে না, তাদের জীবিকা ও জীবনোপকরণ (অনুসন্ধানে কোনো) সংকীর্ণতা আসে না এবং মরুভূমিতে তাদেরকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারে না।

হুযাইফা ﵁ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, তিনি বলছেন, 'হে আল্লাহ, মুনাফিকদের ধ্বংস করে দিন।' তখন তিনি তাকে বললেন, 'ওহে ভাতিজা, যদি মুনাফিকরা ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে এই পরিমাণ পথিক কমে যাবে যে, তোমরা পথ চলতে নিঃসঙ্গ বোধ করবে।'[১২৮]

আল্লাহর শপথ! নিফাকের ভয় পূর্ববর্তী যুগের অগ্রগামী ব্যক্তিদের অন্তর টুকরো টুকরো করে দিত; কারণ তারা এর সূক্ষ্মতা, ভয়াবহতা ও ক্ষতিকর দিকগুলো বিস্তারিতভাবে জানতেন। ফলে নিজের ব্যাপারে তারা খারাপ ধারণা পোষণ করতেন, এমনকি এই ভয়ও করতেন যে, তারা মুনাফিকদের দলভুক্ত। উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ হুযাইফা ﵁-কে বলেছেন, 'হে হুযাইফা, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মুনাফিকদের দলে আমার নাম নিয়েছেন?' হুযাইফা ﵁ এই কসমের জবাবে বলেন, 'না। আপনার পরে আর কাউকে (নিফাক থেকে) পবিত্র বলে ঘোষণা করব না।'[১২৯]

ইবনু আবী মুলাইকা ﵀ বলেছেন, 'আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর তিরিশজন সাহাবিকে পেয়েছি; তাদের প্রত্যেকেই নিজের ওপর নিফাকের আশঙ্কা করতেন। তাদের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না যিনি বলেছেন যে, তার ঈমান জিবরীল ও মীকাঈল ﵉-এর

---

[১২৮] খারায়িতি, ই'তিলালুল কুলূব, ৩৭৭।

[১২৯] যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/৩৬৪।
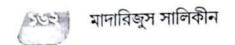
ঈমানের মতো।'[১৩০]

হাসান বাস্‌রি ﷺ বলেছেন, 'কেবল মুনাফিকই নিফাকের ভয় থেকে নিশ্চিন্ত থাকে। আর মুমিন মাত্রই থাকে নিফাকের ভয়ে ভীত।'[১৩১]

কোনো এক সাহাবি[১৩২] ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি তার দুআয় বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে নিফাক মিশ্রিত খুশুখুজু থেকে আশ্রয় চাই।' তাকে প্রশ্ন করা হলো, নিফাক মিশ্রিত খুশুখুজু কী?' তিনি জবাব দিলেন, 'বাহ্যিক শরীরে খুশুখুজু থাকা আর অন্তর আল্লাহ থেকে দূরে থাকা।'[১৩৩]

তাদের অন্তর ঈমান ও ইয়াকীনে পরিপূর্ণ ছিল আবার তাদের নিফাকের ভয়ও ছিল অনেক বেশি। আর এ কারণে তাদের অস্থিরতা ও পেরেশানিও ছিল বেশ ভারী। অপরদিকে অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালীও অতিক্রম করে না; অথচ তারা দাবি করে যে, তাদের ঈমান জিবরীল ও মীকাঈল ﷺ-এর ঈমানের মতো!

***

৪ ও ৫. ফুসূক ও ইসইয়ান : ফুসূক শব্দটি কুরআনে দুইভাবে এসেছে : এককভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসইয়ানের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে।

এককভাবে যে ফুসূক উল্লেখ করা হয়েছে, তা আবার দুই প্রকার : ১. এমন কুফরি ফুসূক, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের দেয় এবং ২. এমন ফুসূক, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

ফুসূককে ইসইয়ানের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন : আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ

---

[১৩০] বুখারি, কিতাবুল ঈমান, ৩৬ নং পরিচ্ছেদ।

[১৩১] বুখারি, কিতাবুল ঈমান, ৩৬ নং পরিচ্ছেদ।

[১৩২] সাহাবিটি ছিলেন আবুদ দারদা ﷺ।

[১৩৩] আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আয-যুহ্‌দ, ৭৬২; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩৫৭১১।

وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ ۞

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই হলো প্রকৃত সৎপথ অবলম্বনকারী।"[১৩৪]

এককভাবে উল্লেখকৃত এমন কুফরি ফুসূক, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়; যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهِ كَثِيْرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ۞

"এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি এর দ্বারা কেবল ফাসিকদেরই বিপথগামী করেন; যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পরও তা ভঙ্গ করে, যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে এবং তারা পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়। প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[১৩৫]

এই প্রকার ফুসূক হলো কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

আর সেই ফুসূক বা পাপাচার, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না; যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ

"কোনো লেখক ও সাক্ষীকে যেন হয়রানি না করা হয়। যদি তোমরা এরূপ করো, তবে তা তোমাদের পাপ বলে গণ্য হবে।"[১৩৬]

---

[১৩৪] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৭।

[১৩৫] সূরা বাকারা, ২ : ২৬-২৭।

[১৩৬] সূরা বাকারা, ২ : ২৮২।

আমাদের আলোচনা চলছে কোন ফিস্‌ক বা পাপাচার থেকে তাওবা করা ওয়াজিব; তা হলো দুই প্রকার : ১. আমলগত ফিস্‌ক এবং ২. বিশ্বাসগত ফিস্‌ক।

আমলগত ফিস্‌ক আবার দুই প্রকার : ১. ইসইয়ানের সাথে যুক্ত এবং ২. পৃথকভাবে উল্লেখকৃত।

ইসইয়ানের সাথে যুক্ত ফিস্‌ক : এটি হলো আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, তাতে লিপ্ত হওয়া। আর ইসইয়ান হলো আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

"আল্লাহ যা আদেশ করেন, তারা তার অবাধ্য হয় না এবং তাদের যা করতে আদেশ করা হয়, তারা তা-ই করে।"[১৩৭]

মূসা ﷺ তাঁর ভাই হারূন ﷺ-কে বলেছিলেন,

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ۝٩٢ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيْ ۝٩٣

"তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন আমার পথে চলা থেকে তোমাকে কীসে বিরত রেখেছিল? তবে তুমি কি আমার আদেশের অবাধ্য হয়েছ?"[১৩৮]

সুতরাং ফিস্‌ক হলো আল্লাহ তাআলা যা করতে নিষেধ করেছেন, তাতে লিপ্ত হওয়ার সাথে খাছ। এ কারণে অনেক জায়গায় এমন ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ

"কোনো লেখক ও সাক্ষীকে যেন হয়রানি না করা হয়। যদি তোমরা এরূপ করো, তবে তা তোমাদের পাপ বলে গণ্য হবে।"[১৩৯]

---

[১৩৭] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬।
[১৩৮] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৯২।
[১৩৯] সূরা বাকারা, ২ : ২৮২।

আর ইসইয়ান বা মা'সিয়াত হলো আদেশের অবাধ্য হওয়া বা অমান্য করার সাথে খাছ। তবে উভয়েই একটি অপরটির অর্থের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

"আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সাজদা করো', তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সাজদা করল। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল।"[১৪০]

এখানে আদেশ অমান্য করাকে ফিস্ক বলা হচ্ছে। আবার এই আয়াতে—

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾

"আদম তার রবের নাফরমানি করল, ফলে সে সঠিক পথ থেকে সরে গেল।"[১৪১]

এখানে নিষেধকৃত বিষয়ে লিপ্ত হওয়াকে মা'সিয়াত বলা হয়েছে। এ রকমটি হয় যখন আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়। আর যখন একসাথে মিলে আসে, তখন ইস্ইয়ানের অর্থ হয় আদেশ অমান্য করা, আর ফিস্কের অর্থ হয় নিষেধকৃত বিষয়ে লিপ্ত হওয়া।

তাকওয়া এই দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকাকেই শামিল করে। আর এটা বাস্তবায়ন হলেই কেবল ফুসূক ও ইসইয়ান থেকে তাওবা সহীহ হয়। তা এভাবে যে, বান্দা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নূরের ভিত্তিতে তাঁর আনুগত্য করবে, তাঁর সাওয়াবের আশা রাখবে, আল্লাহর নাফরমানি পরিত্যাগ করে চলবে এবং তাঁর শাস্তির ভয় করবে।

বিশ্বাসগত ফিস্ক : যেমন : বিদআতিদের ফিস্ক; যারা আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের দিবসের ওপর ঈমান রাখে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হারাম

---

[১৪০] সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ৫০।

[১৪১] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১২১।

মানে এবং যা আবশ্যক করেছেন, তা পালন করে চলে; কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা সাব্যস্ত করেছেন, তারা তার অনেক কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করে; মূর্খতা ও অপব্যাখ্যার কারণে, বা তাদের শাইখদের তাকলীদ করতে গিয়ে। আবার তারা এমন অনেক কিছুও সাব্যস্ত করে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাব্যস্ত করেননি।

এই সমস্ত ব্যক্তিরা হলেন খাওয়ারিজদের মতো এবং অনেক রাফিজি, কাদিরি ও মু'তাযিলাদের মতো এবং জাহমিয়্যাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে না, তাদের মতো। আর জাহমিয়্যাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে, তারা হলো রাফিজিদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের মতো। ইসলামে এ দুদলেরই কোনো অংশ নেই। আর এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেকেই তাদেরকে পথভ্রষ্ট বাহাত্তর দলের মধ্যে গণ্য করেছেন। এরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত থেকে বহির্ভূত।

আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য তাদের হুকুম বর্ণনা করা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই সমস্ত গুনাহ থেকে সহীহ তাওবা কীভাবে করা যায়। সুতরাং এই ধরনের ফিস্‌ক থেকে তাওবার পদ্ধতি হলো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত বিষয়াদি আল্লাহর সত্তার জন্য সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে কোনো প্রকার উপমা ও উদাহরণ ব্যতীতই সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত বিষয়াদি থেকে আল্লাহর সত্তাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, সে বিষয়গুলোকে কোনো রকম বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করা ছাড়াই মেনে নেওয়া। দ্বীনের কোনো বিষয় প্রত্যাখান করা ও প্রমাণ করা একমাত্র ওহির আলোকেই হতে হবে; কারও সিদ্ধান্ত, যুক্তি বা গবেষণার আলোকে নয়। কারণ এগুলো হচ্ছে বিদআত ও গোমরাহির মূল উৎস।

যারা এই বিশ্বাসগত ফিস্‌ক বা বিদআতে জড়িত, তাদের তাওবার একমাত্র পথ হলো: সুন্নাহর অনুসরণ করা, আর শুধু এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ-না তারা যে বিদআতের ওপর রয়েছে, তার অসারতা ও বিভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে (এবং তা পরিত্যাগ করে।)

***

৬ ও ৭. ইছ্‌ম ও উদওয়ান : এই দুটি হলো একে অপরের সঙ্গী। যেমন আল্লাহ

তাআলা বলেছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

"সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সহযোগিতা করো। আর গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করো না।"[১৪২]

এ দুটিকে যখন আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন একটি অপরটিকে শামিল করে নেয়। সুতরাং প্রতিটি ইছ্‌ম বা গুনাহই হলো উদওয়ান বা সীমালঙ্ঘন। কারণ ইছ্‌ম হলো আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, তাতে লিপ্ত হওয়া বা যা আদেশ করেছেন তা পরিত্যাগ করা। আর এটিই হলো আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে উদওয়ান বা সীমালঙ্ঘন। আবার প্রতিটি উদওয়ানই হলো ইছ্‌ম। কারণ এর দ্বারা ব্যক্তি গুনাহগার সাব্যস্ত হয়। কিন্তু যখন একসাথে যুক্ত হয়ে আসে, তখন অবস্থা ও প্রাসাঙ্গিকতা ভেদে এ দুটি আলাদা আলাদা অর্থ প্রদান করে।

ইছ্‌ম (اَلْإِثْمُ) হলো যার মূল বিষয়টিই হারাম। যেমন : মিথ্যা, ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি। আর উদওয়ান (اَلْعُدْوَانُ) হলো যার বাড়াবাড়ি ও অতিরিক্ত করা হারাম। এটি হলো বৈধ কোনো বিষয়ে সীমা অতিক্রম করে হারামে পৌঁছে যাওয়া। যেমন : কারও নিকট পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা; হয়তো তার অর্থসম্পদে বা শারীরিকভাবে অথবা মানসম্মানে আঘাত করা, বাড়াবাড়ি করা; অথবা কেউ যদি কারও একটি কাঠ বা গাছের ডাল নিয়ে যায় আর এর বিনিময়ে সে তার পুরা বাড়িটাই দখলে নেয়; অথবা কেউ কারও একটি জিনিস নষ্ট করল আর এর পরিবর্তে সে তার অনেকগুলো জিনিস নষ্ট করে দিলো; অথবা কেউ কাউকে একটি কটু কথা বলল আর এর পরিবর্তে সে তাকে অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দিলো—এর সবগুলোই উদওয়ান বা সীমালঙ্ঘন এবং ইনসাফ বহির্ভূত।

এই সীমালঙ্ঘন দুই প্রকার : ১. আল্লাহ তাআলার হকের ক্ষেত্রে এবং ২. বান্দার হকের ক্ষেত্রে।

---

[১৪২] সূরা মায়িদা, ৭ : ২।

১. আল্লাহ্ তাআলার হকের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন : যেমন : আল্লাহ্ তাআলা বান্দার জন্য তার স্ত্রী ও দাসীদের সাথে যে যৌন-সম্পর্ক বৈধ করেছেন, তা অতিক্রম করে তাদের বাদ দিয়ে ভিন্ন জায়গায় হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া; (এই সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে) আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ۝ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۝

"এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে, তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে।"[১৪৩]

এমনিভাবে স্ত্রী ও দাসীদের ক্ষেত্রে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলো বাদ দিয়ে তাদের সাথে অন্য হারামে লিপ্ত হওয়া; যেমন : হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় তাদের সাথে সঙ্গম করা অথবা পেছনপথে অথবা হাজ্জের ইহ্‌রামরত অবস্থায় অথবা ওয়াজিব সিয়াম পালন অবস্থায় সহবাস করা।

অনুরূপভাবে বান্দার জন্য সুনির্দিষ্ট যে পরিমাণ বৈধ করা হয়েছে, তার চেয়েও বেশিতে লিপ্ত হওয়া; যেমন : কারও জন্য এক চামচ মদ পান বৈধ, কিন্তু সে এক গ্লাস পান করে ফেলল; অথবা বান্দার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া, দরদাম করা, সাক্ষ্য দেওয়া, লেনদেন করা, চিকিৎসা করা ইত্যাদি কাজের সময় নারীর দিকে তাকানো বৈধ করা হয়েছে; কিন্তু এ সময় সে তার সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানগুলো দেখতে আরম্ভ করল। উদওয়ান বা সীমালঙ্ঘনের আরও কিছু উদাহরণ : তীব্র প্রয়োজনে মৃত বস্তু খাওয়া যে পরিমাণ বৈধ করা হয়েছে, তৃপ্তিসহকারে তার চেয়েও বেশি পরিমাণ খাওয়া, অথচ তার জন্য কেবল জীবন-বাঁচানো-পরিমাণ খাওয়া বৈধ ছিল।

---

[১৪৩] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৫-৭।

সূরা আ'রাফে[১৪৪] বর্ণিত ইছ্‌ম ও বাগইয়ু (اَلْبَغْيُ) -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই ইছ্‌ম ও উদওয়ান। তবে বাগইয়ু শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়—বান্দার হকের ক্ষেত্রে এবং তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচারের ব্যাপারে।[১৪৫]

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, বাগইয়ু যখন উদওয়ানের সাথে মিলে আসে, তখন বাগইয়ু দ্বারা উদ্দেশ্য হয় : মৌলিকভাবে হারাম এমন বিষয়ের মাধ্যমে বান্দার জুলুম-অত্যাচার; যেমন : চুরি করা, মিথ্যা বলা, অপবাদ দেওয়া, অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি। আর উদওয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য হয় হক আদায়ে সীমালঙ্ঘন করা, পাওনার চেয়ে বেশি উসূল করা। বান্দার হকের ক্ষেত্রে বাগইয়ু ও উদওয়ান হলো আল্লাহর সীমার ক্ষেত্রে ইছ্‌ম ও উদওয়ানের মতো।

***

৮ ও ৯. ফাহ্‌শা ও মুনকার : ফাহ্‌শা (অশ্লীলতা) হলো একটি সিফাত বা গুণ। আর এর মাওসূফ হলো কাজ বা বৈশিষ্ট্য। যেমন : ফাহ্‌শা বা অশ্লীল কাজ, ফাহ্‌শা বৈশিষ্ট্য। এটি হলো যার কদর্যতা ও অশ্লীলতা সবার সামনেই সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

ফাহ্‌শা কাজকে প্রতিটি সুস্থবোধসম্পন্ন ব্যক্তিই খারাপ ও ঘৃণ্য মনে করে। আর এ কারণেই এর ব্যাখ্যা করা হয় ব্যভিচার ও সমকামিতার দ্বারা। আল্লাহ তাআলা এ দুটির চূড়ান্ত অশ্লীলতা ও কদর্যতার কারণে এ দুটিকে فَاحِشَةٌ বলেছেন। এমনিভাবে মন্দ, খারাপ ও অশ্লীল কথাবার্তাকেও ফাহ্‌শা বলা হয়; যার কদর্যতা খুবই প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। যেমন : গালি দেওয়া, অপবাদ দেওয়া প্রভৃতি।

আর মুনকার (اَلْمُنْكَرُ) শব্দটিও একটি উহ্য মাওসূফের সিফাত। যেমন : মুনকার বা মন্দ কাজ। এটি হলো আকল ও ফিতরাত যাকে মন্দ মনে করে।

---

[১৪৪] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই আয়াত :

...قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"আপনি বলে দিন, 'আমার পালনকর্তা অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন; যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ, সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি...।"—সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৩।

[১৪৫] এটি হলো দ্বিতীয় প্রকার : বান্দার হকের ক্ষেত্রে উদওয়ান।

বুদ্ধি ও ফিতরাতের সাথে ফাহিশার সম্পর্ক ঠিক নাকের সাথে দুর্গন্ধের যেমন সম্পর্ক, চোখের সাথে খারাপ কোনো দৃশ্যের সম্পর্ক, মুখের সাথে তিক্ত কোনো খাবারের সম্পর্ক, কানের সাথে বিকট কোনো শব্দের সম্পর্ক। সুতরাং বোঝা গেল আকল ও ফিতরাত যে বস্তুকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং ঘৃণা করে তা-ই ফাহিশা। আর মুনকার হলো যাকে আকল ও ফিতরাত মেনে নেয় না এবং মন্দ মনে করে।

এ কারণেই ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'ফাহিশা হলো : যিনা বা ব্যভিচার; আর মুনকার হলো : শারীআত ও সুন্নাহর মধ্যে যার কোনো সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না।'[১৪৬] এখানে গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, যার কোনো ভালো দিক জানা যায় না (তা মুনকার) এবং যার অশ্লীলতা সুস্পষ্ট (তা ফাহ্‌শা)—এ দুটির মাঝে তিনি কীভাবে পার্থক্য করেছেন?

***

১১. আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা : উপরিউক্ত সবগুলো হারামের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা হচ্ছে, সবচেয়ে ভয়াবহ এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর এ কারণেই এটিকে হারামসমূহের এমন স্তরে উল্লেখ করা হয়েছে; যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত শারীআত ও দ্বীন একমত, কোনো অবস্থাতেই যার বৈধতা দেওয়া হয়নি; বরং এটি সর্বাবস্থাতেই হারাম। এটি মৃত প্রাণী, রক্ত বা শূকরের মাংসের মতো নয় যে, কিছু অবস্থায় হালাল আর কিছু অবস্থায় হারাম।

কারণ মুহাররমাত বা হারাম বস্তুসমূহ দুই প্রকার : ১. যা সত্তাগতভাবেই হারাম, কোনো অবস্থাতেই যা হালাল নয় এবং ২. যা কোনো সময় হারাম আর কোনো সময় হারাম নয়। সত্তাগতভাবে হারাম বস্তুর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

"আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব অশ্লীল

[১৪৬] সা'লাবি, তাফসীর, ১৬/১০৭।

বিষয়সমূহ হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়-অত্যাচার এবং আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।”[১৪৭]

এখানে আল্লাহ তাআলা একের পর এক বড়ো বড়ো গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন। সবশেষে যা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা—এটি সবচেয়ে মারাত্মক হারাম এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। কারণ এটি আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যা বলা, যার উপযুক্ত তিনি নন, তাঁকে সে দিকে সম্পৃক্ত করা, তাঁর দ্বীনকে পরিবর্তন করা ও বিকৃত করা, তিনি যা সাব্যস্ত করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করা, তিনি যা প্রত্যাখ্যান করেছেন তা সাব্যস্ত করা, তিনি যা বাতিল বলেছেন তা সঠিক বলে মনে করা, তিনি যা সঠিক বলেছেন তা বাতিল করে দেওয়া, তিনি যাকে বন্ধু করে নিয়েছেন তার সাথে শত্রুতা করা, তিনি যাকে নিজের শত্রু বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাকে বন্ধু বানানো, তিনি যা ঘৃণা করেছেন তা পছন্দ করা, তিনি যা অপছন্দ করেছেন তা ভালোবাসা, তাঁর সত্তা, গুণাবলি, কাজকর্ম, কথাবার্তা সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা, তিনি যার উপযুক্ত নন ইত্যাদি বিষয়াদিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

হারাম বস্তুসমূহের মধ্যে এর চেয়ে বড়ো আর কোনো হারাম নেই এবং এর চেয়ে ভয়াবহ আর কোনো গুনাহ নেই। এটিই হলো শির্ক ও কুফরের মূল। এর ওপরই রয়েছে বিদআত ও গোমরাহির ভিত্তি। আসলে দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিটি পথভ্রষ্টকারী বিদআতের শিকড় হলো—আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা।

এ কারণেই সালাফগণ ও ইমামগণ এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের ভ্রান্তি ধরিয়ে দিয়েছেন, তাদের ফিতনার ব্যাপারে মানুষদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাখ্যান ছিল অন্যান্য উদওয়ান, জুলুম ও ফাহ্‌শার চেয়ে অনেক বেশি।[১৪৮]

---

[১৪৭] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৩।

[১৪৮] মুসান্নিফ ﵀ দুটি বিষয় নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেননি—বাগইয়ু এবং আল্লাহর পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করা। যদিও শুরুতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

গুনাহের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

মানুষজন যে বিপদাপদে আক্রান্ত হয়, সেগুলো সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য ও উপকরণের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে অনেক ব্যবধান। এই ক্ষেত্রে মোট আট ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে—

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি : জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি। এ স্তরে ব্যক্তির দৃষ্টি কেবল তার আনন্দ-ফুর্তি আর উদরপূর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ ক্ষেত্রে সে পশুর সদৃশ হয়ে যায়। অধিক বিলাসিতা আর খাহেশাত পূরণ করতে গিয়ে কখনো কখনো সে জন্তু-জানোয়ারদেরও ছাড়িয়ে যায়।

এই শ্রেণির মানুষ ও প্রাণী-পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; কেবল নিজের চাহিদা পূরণের পদ্ধতির ভিন্নতা ছাড়া। তাদের একমাত্র ভাবনা হলো কীভাবে কোন পন্থায় আনন্দ আর স্বাদ লাভ করা যায়। তাদের নফস জন্তু-জানোয়ারের নফসের মতো হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : জাবরিয়্যাদের দৃষ্টিভঙ্গি; আর তা হলো : মানুষ বাধ্য হয়েই সবকিছু করছে, তার কাজকর্ম অন্য কেউ করে দিচ্ছে, সে কেবল তার মাধ্যম। ফলে এই শ্রেণির ব্যক্তিরা মনে করে, তাদের কোনো গুনাহ নেই। কারণ কাজ তো তারা করছে না, তাদের দিয়ে করানো হচ্ছে।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো : তারা তাদের কাজকর্মের ওপর বাধ্য, যা সংঘটিত হচ্ছে তাতে তাদের কোনো সক্ষমতা নেই। বরং তারা এটাই বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, যে কাজগুলো তারা করছে, সেগুলো তাদের কর্ম নয়।

এটি হলো মুশরিক ও রাসূলের শত্রুদের দৃষ্টিভঙ্গি; যারা আল্লাহর প্রকৃত শত্রু এবং ইবলীসের বন্ধু।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : কাদরিয়্যাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তারা মনে করে যে সমস্ত গুনাহে তারা লিপ্ত, তা কেবল তাদের ইচ্ছা ও চাওয়াতেই সংঘটিত হয়, এতে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার কোনো দখল নেই। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, তাদের কাজকর্মের ওপর আল্লাহর কোনো ক্ষমতা নেই, তিনি তা পূর্বে লিখেও রাখেননি এবং তাদের এই কাজকর্ম তাঁর সৃষ্টিও নয়; (বরং তারাই সেগুলোর স্রষ্টা।)

এটি হলো মাজূসি কাদরিয়্যাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গি : আলিম ও ঈমানদারদের দৃষ্টিভঙ্গি। তা হলো তাকদীর ও শারীআতের দৃষ্টিভঙ্গি। এ ক্ষেত্রে গুনাহগার বান্দা তার নিজের কর্ম যেমন দেখে, তেমনি দেখে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা ও ক্ষমতা।

পঞ্চম দৃষ্টিভঙ্গি : অভাবগ্রস্ততা, অক্ষমতা ও দুর্বলতার দৃষ্টিভঙ্গি। যেখানে গুনাহগার দেখে যদি আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য না করেন, তাকে সরল পথে অটল না রাখেন এবং তাওফীক না দেন, তা হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি : তাওহীদ ও আদেশ-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি দেখে সবকিছু কেবল আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও ইচ্ছারই বাস্তবায়ন, অস্তিত্বশীল সমগ্র বস্তু কেবল তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত, সবকিছু একমাত্র তাঁর হুকুমেই চলমান এবং তাঁর ইলমে যা রয়েছে ও তাঁর কলমে যা লেখা হয়েছে, শুধু তা-ই ঘটে।

এর সাথে সাথে সে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ, পুরস্কার-শাস্তি, আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া, জরুরি উপকরণের সাথে মূল কাজের সম্পর্ক ইত্যাদিও প্রত্যক্ষ করে।

সপ্তম দৃষ্টিভঙ্গি : নাম ও গুণাবলি-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এটি হলো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির সাথে তাঁর সৃষ্টি, আদেশ, ফায়সালা ও ক্ষমতার নিগূঢ় সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করে এবং এটিও বিশ্বাস করে যে, এগুলো হলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলির আবশ্যকীয় দাবি। কারণ তাঁর উত্তম নামসমূহ তা দাবি করে। আল্লাহ তাআলার اَلْغَفَّارُ، اَلتَّوَّابُ، اَلْعَفُوُّ، اَلْحَلِيْمُ—এই নামগুলো অপরিহার্যভাবে তার বাস্তব প্রভাবকে কামনা করে। যেমন হাদীসে এসেছে,

> وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُّذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ
>
> "সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তা হলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে এমন সম্প্রদায় নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত, অতঃপর ক্ষমা চাইত

আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।"[১৪৯]

অষ্টম দৃষ্টিভঙ্গি : আল্লাহ তাআলার হিকমাহ বা প্রজ্ঞা-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এটি হলো আল্লাহ তাআলার ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর হিকমাহ প্রত্যক্ষ করা। বান্দার মাঝে ও গুনাহের মাঝের সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেওয়া এবং তা সংঘটন করার শক্তি-সামর্থ্য দান করার ক্ষেত্রেও বান্দা আল্লাহর বিশেষ হিকমাহ ও প্রজ্ঞা দেখতে পায়। কারণ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তা হলে তাকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখতেন কিংবা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা না করে, বান্দা ও তার গুনাহ করার মাঝে সুযোগ করে দিয়েছেন; এই কাজের পেছনে বিরাট হিকমাহ রয়েছে; যা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, এ ব্যাপারটিকে বুঝতে আকল-বুদ্ধি চূড়ান্তভাবে অক্ষম।

সপ্তম ও অষ্টম দৃষ্টিভঙ্গি দুটি অন্যান্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্তরের, সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি।

*****

[১৪৯] মুসলিম, ২৭৪৯।

২ নং মানযিল

আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া (اَلْإِنَابَةُ)

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার মানযিল।]

যখন তাওবার মানযিলে বান্দার পা স্থির হয়ে যায়, তখন সে ইনাবাত বা আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার মানযিলে অবতরণ করে।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে এর আদেশ করেছেন এবং এই গুণের কারণে তিনি তাঁর খলীল ইবরাহীম ﷺ-এর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও।"[১৫০]

তিনি আরও বলেন,

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ ۝٧٥

"নিশ্চয় ইবরাহীম বড়োই ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় ও আল্লাহ-অভিমুখী ছিল।"[১৫১]

আল্লাহ্ তাআলা আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেবল আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তিরাই তাঁর নিদর্শনাদি যথাযথভাবে উপলব্ধি করে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তিনি বলেন,

---

[১৫০] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৪।

[১৫১] সূরা হূদ, ১১ : ৭৫।

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ آيَاتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

"তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখান এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিয্ক নাযিল করেন। (কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে) কেবল তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে, যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"[১৫২]

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ-অভিমুখীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। তিনি বলেন,

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ

"যারা তাগূত বা শয়তানি শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ-অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।"[১৫৩]

ইনাবাত বা আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া দুই প্রকার :

একটি হলো আল্লাহ তাআলার রুবূবিয়্যাতের দিকে ধাবিত হওয়া : এটি সমস্ত মাখলূকাতের ইনাবাত; যাতে মুমিন-কাফির, ভালো-মন্দ সবাই শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ

"মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের রবকে আহ্বান করে, তাঁরই অভিমুখী হয়ে।"[১৫৪]

আসলে এটি প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য। এই ধাবমানতার জন্য ইসলাম গ্রহণ করা জরুরি নয়; কাফির-মুশরিকরাও দুর্যোগ-দুর্দশায় পড়লে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার ইনাবাত হলো আল্লাহর ওলিদের ইনাবাত। এটি হলো আল্লাহর ইলাহিয়্যাতের প্রতি দাসত্ব ও মহাব্বতের সাথে তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া। এটি

---

[১৫২] সূরা গাফির, ৪০ : ১৩।

[১৫৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ১৭।

[১৫৪] সূরা রূম, ৩০ : ৩৩।

চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে :

১. আল্লাহর ভালোবাসা,

২. আল্লাহর সামনে বিনয়ী হওয়া,

৩. আল্লাহর অভিমুখী হওয়া এবং

৪. আল্লাহকে ছাড়া সবকিছুকে উপেক্ষা করা।

সুতরাং কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ-অভিমুখী (اَلْمُنِيْبُ) বলে সাব্যস্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত-না সে এই চারটি গুণে গুণান্বিত হয়।

সালাফগণ ইনাবাতের যে তাফসীর করে থাকেন, তা এই চারটি বিষয়ের মধ্যেই আবর্তিত হয়। ইনাবাতের অর্থের মধ্যে দ্রুততা, ফিরে আসা ও অগ্রসর হওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং মুনীব বা আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তি হলো : যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, সবসময় তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর পছন্দনীয় বিষয়াদির দিকে অগ্রসর হয়।

আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার কিছু আলামত

গাফিলদেরকে তুচ্ছ ভাবা এবং তাদের ব্যাপারে শাস্তির আশঙ্কা করা থেকে বিরত থাকা। নিজের ব্যাপারে আশার দরজা উন্মুক্ত মনে করা এবং নিজেকে রহমতের যোগ্য ভাবা অনুচিত। আর অসচেতন ও গাফিল লোকদের ব্যাপারে আযাবের ভয় করা এবং তারা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে মনে করা যাবে না। বরং তাদের ব্যাপারেই রহমতের আশা করা আর নিজের ব্যাপারে শাস্তির ভয়ে ভীত হওয়া। আর যদি তাদের ভেতরগত অবস্থা ও হালাত জানা থাকার কারণে তাদের প্রতি ঘৃণা জন্মে, তা হলে আপনি নিজের নফসকেই তাদের চেয়ে বেশি ঘৃণা করবেন এবং নিজের চেয়ে তাদের ব্যাপারে রহমতের আশা বেশি করবেন।

পূর্ববর্তী মনীষীদের কোনো একজন বলেছেন, 'তুমি (ঈমানকে) ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত-না আল্লাহর ব্যাপারে (মানুষজনের কাজকর্মের কারণে) তাদেরকে ঘৃণা করবে; তারপর নিজের নফসের দিকে দৃষ্টি ফেরাবে এবং পরিশেষে কেবল নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতে

থাকবে।'[১৫৫]

এই কথার অর্থ কেবল সেই ব্যক্তিই বুঝতে পারবে, যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করেছে। কারণ সৃষ্টিজগতের প্রকৃত অবস্থা, তাদের অক্ষমতা, দুর্বলতা, বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি, আল্লাহর হক বিনষ্ট করা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরের প্রতি ধাবিত হওয়া, আল্লাহর অংশ ও আখিরাতকে এই ধ্বংসশীল দুনিয়ার সামান্য অর্থকড়ির জন্য বিকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি পাপাচার ও অনাচার যে প্রত্যক্ষ করে, সে আবশ্যকীয়ভাবেই মানুষদের ঘৃণা করবে, এ ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোনো পথ থাকে না। কিন্তু যখন সে নিজের নফস, সার্বিক অবস্থা ও নিজের শিথিলতার দিকে দৃষ্টি ফেরাবে এবং বিচক্ষণ থাকবে, তখন সে নিজের নফসকেই সবার চেয়ে বেশি ঘৃণা করবে এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে। আর এই ব্যক্তিই হলো প্রকৃত ফকীহ বা দ্বীনের গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ-অভিমুখীদের আরেকটি আলামত : নিজের আমল নিয়ে নিরাশ হওয়া। এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

প্রথম ব্যাখ্যা : বান্দা যখন হাকীকতের দৃষ্টিতে আমলসমূহের প্রকৃত কর্তা ও পরিচালনাকারী আল্লাহর দিকে তাকাবে এবং এটি উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহর যদি ইচ্ছা না থাকত, তা হলে কোনো আমল করাই সম্ভব হতো না, আসলে নিজের ইচ্ছায় নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছাতেই আমল অস্তিত্বে এসেছে, তখন সে তার নিজের কোনো আমল ও কাজ দেখতে পাবে না, সে দেখবে আমলশূন্য তার অস্তিত্বই কেবল অবশিষ্ট রয়েছে। কারও জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হওয়া, তার আমল নজরে পড়ার চেয়ে উত্তম।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : আপনি আপনার নিজের আমলের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়ার আশা করা থেকে নিরাশ হয়ে পড়বেন। আপনি এটা দেখবেন যে, মুক্তি মিলবে কেবল তখনই, যখন আল্লাহ তাআলার রহমত, ক্ষমা ও অনুগ্রহ থাকবে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِّنكُمْ عَمَلُهُ

[১৫৫] মা'মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি', ২০৪৮৩। আবুদ দারদা -এর বাণী।

"তোমাদের আমল কখনো তোমাদের কাউকে নাজাত দিতে পারবে না।"

তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকেও না, ইয়া রাসূলাল্লাহ?'

তিনি জবাব দিলেন,

وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ

"না, আমাকেও না। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর রহমত দিয়ে আবৃত করে নিয়েছেন।"[১৫৬]

এখানে প্রথম অর্থ (অর্থাৎ নিজের আমল দ্বারা নাজাত না পাওয়া) হলো শুরুর পর্যায়ে, আর দ্বিতীয় অর্থ (আল্লাহর রহমতে নাজাত পাওয়া) হলো শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে।

কেউ যখন শুরুতে নিজের আমল নিয়ে হতাশা ও নিরাশায় ভুগবে এবং শেষেও এর দ্বারা নাজাত পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকবে, তখন সে উপলব্ধি করতে পারবে আল্লাহর নিকট তার প্রয়োজনীয়তা; বরং সে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পরিপূর্ণ সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভের অনুভব করবে। একদিক থেকে নয়; বরং সে চতুর্দিক থেকে তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। কোনো সংখ্যা নয়, বরং প্রতিটি মুহূর্তে সত্তাগতভাবেই সে আল্লাহ তাআলার প্রতি মুখাপেক্ষী ও অভাবী হয়ে পড়বে। যেমন আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবেই ধনী ও বিপুল প্রাচুর্যের অধিকারী, ঠিক তেমনি বান্দা হলো সত্তাগতভাবেই ফকীর ও নিঃস্ব।

যখন তাঁর সামনে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়বে, যখন সে নিজের আমলের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া থেকে নিরাশ হয়ে যাবে, তখন সে তার রবের অনুগ্রহ ও দয়ার দিকে দৃষ্টি দেবে এবং জানতে পারবে যে, যে গুণাবলি তার মধ্যে রয়েছে, যা কিছুর আশা সে করছে এবং যেসব আমল সে করেছে, তা-ও আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ, করুণা ও নিয়ামাত ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তিনিই হলেন উপকরণ ও সাফল্য দানকারী, আগে-পরের সবকিছু কেবল তাঁরই, তিনিই প্রথম তিনিই শেষ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং তিনি ছাড়া আর কোনো রব নেই।

---

[১৫৬] বুখারি, ৬৪৬৩; মুসলিম, ২৮১৬।

৩ নং মানযিল

শিক্ষা গ্রহণ করা (اَلتَّذَكُّرُ)

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—শিক্ষা গ্রহণ করার মানযিল।]

তাযাক্কুর বা শিক্ষা গ্রহণ করার মানযিলের ব্যাখ্যা

ইনাবাত বা আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার মানযিলের পরে অন্তর তাযাক্কুর বা শিক্ষা গ্রহণ করার মানযিলে অবতরণ করে। এটি আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার মানযিলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

"কেবল আল্লাহ-অভিমুখীরাই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।"[১৫৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾

"এসব জিনিসের সবগুলোই দৃষ্টি উন্মুক্তকারী এবং শিক্ষাদানকারী ওই সব বান্দার জন্য, যারা আল্লাহ-অভিমুখে ধাবিত হয়।"[১৫৮]

তাযাক্কুর বা শিক্ষা গ্রহণ করা হলো জ্ঞানী বা উলুল আলবাবদের বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

---

[১৫৭] সূরা গাফির, ৪০ : ১৩।

[১৫৮] সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৮।

"উপদেশ তো শুধু বিবেকবান জ্ঞানী লোকেরাই গ্রহণ করে থাকে।"[১৫৯]

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

"শিক্ষা তো কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।"[১৬০]

তাযাক্কুর (শিক্ষা গ্রহণ করা) ও তাফাক্কুর (চিন্তাভাবনা করা) এই দুটি মানযিল অন্তরে প্রজ্ঞা সৃষ্টি করে এবং ঈমান ও ইহ্সানের হাকীকত উন্মুক্ত করে। আরিফ বা আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তি সবসময় তার তাফাক্কুর বা চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তার তাযাক্কুর বা শিক্ষা লাভের ওপর এবং তার তাযাক্কুরের মাধ্যমে তার তাফাক্কুরের ওপর ফিরে আসে। অবশেষে প্রকৃত-উন্মুক্তকারী মহাজ্ঞানী আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার অন্তরের তালা উন্মুক্ত হয়ে যায়। হাসান বাস্রি ﷺ বলেছেন, 'ইলমের অধিকারী ব্যক্তিরা তাযাক্কুরের মাধ্যমে তাফাক্কুরের ওপর এবং তাফাক্কুরের মাধ্যমে তাযাক্কুরের ওপর ফিরে আসতে থাকে এবং তারা তাদের অন্তরের সাথে কথা বলতে থাকে, অবশেষে অন্তর কথা বলা আরম্ভ করে।'[১৬১]

তাযাক্কুর বা শিক্ষা গ্রহণ করা হলো নিসইয়ান বা ভুলে যাওয়ার বিপরীত একটি গুণ। এটি হলো উল্লেখকৃত বস্তুর জ্ঞানগত আকৃতি অন্তরে উপস্থিত হওয়া। এই শব্দটিকে বাবুত তাফাউউল(بَابُ التَّفَعُّلِ) থেকে নেওয়া হয়েছে, যাতে কোনোকিছু বিলম্বের পর অর্জিত হওয়ার অর্থ প্রদান করে। যেমন : তাবাস্সুর (কোনোকিছু সম্পর্কে গভীরদৃষ্টি), তাফাহহুম (কোনোকিছু বুঝতে পারা), তাআল্লুম (কোনোকিছু শেখা) ইত্যাদি। (এর সবগুলোতেই কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, এরপরই প্রকৃত বিষয়টি অর্জিত হয়।)

সুতরাং চিন্তাভাবনা করার মানযিল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মানযিল হলো কোনো বস্তু তালাশ করার পর তা অর্জিত হওয়ার মানযিল।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলার কিতাব কুরআন এবং মহাবিশ্বে ছড়ানো নিদর্শনসমূহ হলো, শিক্ষা গ্রহণ করার অন্যতম মাধ্যম। যেমন কিতাবের নিদর্শন সম্পর্কে আল্লাহ

---

[১৫৯] সূরা রা'দ, ১৩ : ১৯।

[১৬০] সূরা বাকারা, ২ : ২৬৯।

[১৬১] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৬/৫১৯।

৩ নং মানযিল

শিক্ষা গ্রহণ করা (اَلتَّذَكُّرُ)

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—শিক্ষা গ্রহণ করার মানযিল।]

তাযাক্কুর বা শিক্ষা গ্রহণ করার মানযিলের ব্যাখ্যা

ইনাবাত বা আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার মানযিলের পরে অন্তর তাযাক্কুর বা শিক্ষা গ্রহণ করার মানযিলে অবতরণ করে। এটি আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার মানযিলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

"কেবল আল্লাহ-অভিমুখীরাই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।"[১৫৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾

"এসব জিনিসের সবগুলোই দৃষ্টি উন্মুক্তকারী এবং শিক্ষাদানকারী ওই সব বান্দার জন্য, যারা আল্লাহ-অভিমুখে ধাবিত হয়।"[১৫৮]

তাযাক্কুর বা শিক্ষা গ্রহণ করা হলো জ্ঞানী বা উলুল আলবাবদের বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

---

[১৫৭] সূরা গাফির, ৪০ : ১৩।

[১৫৮] সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৮।

"উপদেশ তো শুধু বিবেকবান জ্ঞানী লোকেরাই গ্রহণ করে থাকে।"[১৫৯]

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝٢٦٩

"শিক্ষা তো কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।"[১৬০]

তাযাক্কুর (শিক্ষা গ্রহণ করা) ও তাফাক্কুর (চিন্তাভাবনা করা) এই দুটি মানযিল অন্তরে প্রজ্ঞা সৃষ্টি করে এবং ঈমান ও ইহ্সানের হাকীকত উন্মুক্ত করে। আরিফ বা আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তি সবসময় তার তাফাক্কুর বা চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তার তাযাক্কুর বা শিক্ষা লাভের ওপর এবং তার তাযাক্কুরের মাধ্যমে তার তাফাক্কুরের ওপর ফিরে আসে। অবশেষে প্রকৃত-উন্মুক্তকারী মহাজ্ঞানী আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার অন্তরের তালা উন্মুক্ত হয়ে যায়। হাসান বাস্‌রি ﷺ বলেছেন, 'ইলমের অধিকারী ব্যক্তিরা তাযাক্কুরের মাধ্যমে তাফাক্কুরের ওপর এবং তাফাক্কুরের মাধ্যমে তাযাক্কুরের ওপর ফিরে আসতে থাকে এবং তারা তাদের অন্তরের সাথে কথা বলতে থাকে, অবশেষে অন্তর কথা বলা আরম্ভ করে।'[১৬১]

তাযাক্কুর বা শিক্ষা গ্রহণ করা হলো নিসইয়ান বা ভুলে যাওয়ার বিপরীত একটি গুণ। এটি হলো উল্লেখকৃত বস্তুর জ্ঞানগত আকৃতি অন্তরে উপস্থিত হওয়া। এই শব্দটিকে বাবুত তাফাউউল(بَابُ التَّفَعُّلِ) থেকে নেওয়া হয়েছে, যাতে কোনোকিছু বিলম্বের পর অর্জিত হওয়ার অর্থ প্রদান করে। যেমন : তাবাস্‌সুর (কোনোকিছু সম্পর্কে গভীরদৃষ্টি), তাফাহহুম (কোনোকিছু বুঝতে পারা), তাআল্লুম (কোনোকিছু শেখা) ইত্যাদি। (এর সবগুলোতেই কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, এরপরই প্রকৃত বিষয়টি অর্জিত হয়।)

সুতরাং চিন্তাভাবনা করার মানযিল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মানযিল হলো কোনো বস্তু তালাশ করার পর তা অর্জিত হওয়ার মানযিল।

এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলার কিতাব কুরআন এবং মহাবিশ্বে ছড়ানো নিদর্শনসমূহ হলো, শিক্ষা গ্রহণ করার অন্যতম মাধ্যম। যেমন কিতাবের নিদর্শন সম্পর্কে আল্লাহ

---

[১৫৯] সূরা রা'দ, ১৩ : ১৯।

[১৬০] সূরা বাকারা, ২ : ২৬৯।

[১৬১] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৬/৫১৯।

তাআলা বলেছেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِيْ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ۝٥٣ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝٥٤

"নিশ্চয় আমি মূসাকে হিদায়াত দান করেছিলাম এবং বানী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। বুদ্ধিমানদের জন্য যা ছিল উপদেশ ও হিদায়াতস্বরূপ।"[১৬২]

কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝٤٨

"অবশ্যই এটা খোদাভীরুদের জন্য একটি উপদেশ।"[১৬৩]

মহাবিশ্বে ছড়ানো নিদর্শনাদি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝٦ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٨

"আচ্ছা, এরা কি কখনো এদের মাথার ওপরের আকাশের দিকে তাকায়নি? আমি কীভাবে তা তৈরি করেছি এবং সুসজ্জিত করেছি? তাতে কোথাও কোনো ফাটল নেই। ভূপৃষ্ঠকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি, তাতে পাহাড় স্থাপন করেছি এবং তার মধ্যে সব রকম সুদৃশ্য উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করেছি। এসব জিনিসের সবগুলোই দৃষ্টি লাভ করার ও শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যম, ওই সব বান্দার জন্য যারা আল্লাহ-অভিমুখে ধাবিত হয়।"[১৬৪]

---

[১৬২] সূরা গাফির, ৪০ : ৫৩-৫৪।

[১৬৩] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৪৫।

[১৬৪] সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৬-৮।

'তাবসিরা' অর্থ : অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার মাধ্যম, আর 'তাযকিরা' অর্থ : শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যম। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এ দুটিকে একত্রে উল্লেখ করেছেন এবং তা আল্লাহ্-অভিমুখীদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। কারণ বান্দা যখন আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, তখন সে নিদর্শনাদি ও উপদেশ লাভের স্থানসমূহ্ প্রত্যক্ষ করে। ফলে সে এর মাধ্যমে তার নিজের জন্য কী করণীয় তা উপলব্ধি করতে পারে।

পরিণতিতে ১. আল্লাহর দিকে অভিমুখী হওয়ার মাধ্যমে তার থেকে অমনোযোগিতা দূর হয়, ২. অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অন্ধত্ব দূর হয় এবং ৩. শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে গাফলত দূর হয়ে যায়। তাবসিরা বা অন্তর্দৃষ্টি বস্তু সম্পর্কে গাফিল থাকার পর তা সম্পর্কে জানা আবশ্যক করে। আর এভাবে তিনটি মানযিলেরই একটি সুন্দর তারতীব হয়ে যায়। তার পর এর প্রত্যেকটিকে বান্দা নিজ প্রচেষ্টা ও আমলের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করতে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা প্রকাশ্য নিদর্শনাদি সম্পর্কে আরও বলেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾

"আমি তাদের আগে আরও বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি; তারা ওদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল এবং তারা সারা দুনিয়ার দেশগুলো তন্ন তন্ন করে ঘুরেছে। অথচ তারা কি কোনো আশ্রয়স্থল পেল? যাদের অন্তর আছে কিংবা যারা একাগ্রচিত্তে কথা শোনে, তাদের জন্য এতে অনেক শিক্ষা রয়েছে।"[১৬৫]

মানুষ তিন প্রকার :

এক. মৃত অন্তরের অধিকারী, যার কোনো অন্তর নেই। এই শ্রেণির ব্যক্তিদের জন্য এই আয়াতে শিক্ষার কোনো উপকরণ নেই।

দুই. জীবিত ও (নেককাজের জন্য) প্রস্তুত অন্তরের অধিকারী, তবে কুরআনের যেসকল আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাদি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন, তারা সেগুলো শোনে না; হয়তো তাদের নিকট না পৌঁছার

---

[১৬৫] সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৩৬-৩৭।

কারণে কিংবা তাদের পর্যন্ত পৌঁছে ঠিকই, কিন্তু তাদের মনোযোগ অন্য দিকে মশগুল থাকে বলে। এই শ্রেণির ব্যক্তির অন্তর থাকে অনুপস্থিত ও অসতর্ক। তাদের জন্যও এই আয়াত শিক্ষণীয় হয় না; যদিও তাদের অন্তর জীবিত ও প্রস্তুত থাকে।

তিন. জীবিত ও সদাপ্রস্তুত হৃদয়ের অধিকারী, তার সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হলে, অন্তর উপস্থিত রেখে কান লাগিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে সে তা শ্রবণ করে এবং যা শোনে তা উপলব্ধি করা ও অনুধাবন করা ছাড়া আর কোনো দিকে মন দেয় না। অন্তর হাজির রেখে কান লাগিয়ে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করে, তারাই আল্লাহ তাআলার আয়াত ও নিদর্শনাদির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়।

সুতরাং প্রথম প্রকারের ব্যক্তিরা হলো অন্ধতুল্য, যারা কিছুই দেখে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিরা হলো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, তবে তারা কাঙ্ক্ষিত বস্তুর ওপর চোখ না রেখে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। ফলে এই দুই প্রকারের কেউই উপকারী কিছু দেখতে পায় না।

তৃতীয় প্রকারের ব্যক্তিরা হলো প্রকৃত দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, যারা লক্ষ্যবস্তুর ওপর চোখ রাখে এবং অন্য সবদিক থেকে বিরত থেকে কেবল মূল বস্তুতেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। এই শ্রেণির ব্যক্তিরাই উপকৃত হয় এবং প্রকৃতবস্তু দেখতে পায়।

সুতরাং পবিত্র ওই সত্তা যিনি তাঁর কালামকে অন্তরের আরোগ্য বানিয়েছেন।

তাযাক্কুর বা শিক্ষাগ্রহণ সে সমস্ত বিষয়কেও শামিল করে, যে সমস্ত বিষয় উপদেশগ্রহণের স্থান ও বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে হাসিল হয়। অর্থাৎ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা সহজ হয় এবং এর মাধ্যমে চিন্তা-ফিকিরও তীক্ষ্ণ ও ধারালো হয়। এতে করে ব্যক্তি পথ চলতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়। তবে এটি হয় তার অন্তর্দৃষ্টির শক্তি অনুপাতে। কারণ এটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিকে প্রখর করে। আসলে লক্ষ্যে পৌঁছার তৎপরতা হলো অনুভূতির একটি অংশ। প্রিয় মানুষের প্রতি অনুভূতি যত শক্তিশালী হবে, অন্তর তার প্রতি তত বেশি ধাবিত হতে চাইবে। আর যখনই তাকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে, তখনই তার প্রতি অনুভূতি গাঢ় হবে, তার ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি ও তার স্মরণ বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপদেশের প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষিতা

উপদেশের প্রতি বান্দা তখনই মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, যখন আল্লাহর প্রতি ধাবমানতা ও শিক্ষা গ্রহণে তার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। অন্যথায় যখন তার আল্লাহ-অভিমুখিতা ও শিক্ষা গ্রহণ প্রবণতা শক্তিশালী থাকবে, তখন উপদেশ, উৎসাহ ও ভীতিপ্রদর্শনের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। তখন তার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয় আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধগুলো জানার।

উপদেশ দ্বারা দুইটি বিষয় উদ্দেশ্য নেওয়া হয় : এমন আদেশ ও নিষেধ যেগুলোর মধ্যে ১. আগ্রহ-উদ্দীপনা ও ২. ভয়ভীতির কথা বেশি আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ-অভিমুখী শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য বেশি প্রয়োজন হলো : দ্বীনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানা। আর গাফিল ও উপেক্ষাকারীদের জন্য বেশি প্রয়োজন হলো : তারগীব ও তারহীব অর্থাৎ জান্নাতের উৎসাহ ও জাহান্নামের ভীতিপ্রদর্শন। আপত্তিকারী ও অস্বীকারকারীদের জন্য বেশি প্রয়োজন হলো : উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক করা, দলীলের মাধ্যমে প্রকৃত বিষয় জানার চেষ্টা করা।

এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা এই আয়াতে এসেছে—

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

"আপনার রবের পথে আহ্বান করুন হিকমত ও সদুপদেশ সহকারে এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।"[১৬৬]

এখানে হিকমতের সিফাত 'হাসানা' আনা হয়নি; কারণ এর পুরাটাই হাসানা বা উত্তম। হিকমত সত্তাগতভাবেই হাসান।

আর মাওইযাহ বা উপদেশের ক্ষেত্রে 'হাসানা বা উত্তম' সিফাত আনা হয়েছে। কারণ সব উপদেশই উত্তম ও উপকারী নয়।

এমনিভাবে জিদাল বা বিতর্ক করাও উত্তম পদ্ধতিতে হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এই বিষয়টি বিতর্ককারীর অবস্থা, তার কঠোরতা, কোমলতা, তীক্ষ্ণতা ও নম্রতার ওপর নির্ভর করে। তাই তাঁকে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন সর্বোত্তম

[১৬৬] সূরা নাহ্ল, ১৬ : ১২৫।

পন্থায় বিতর্ক করেন।

আবার এটিও হতে পারে যে, এই আদেশ হলো এই প্রেক্ষাপটে যে, যে ব্যাপারে বিতর্ক করা হবে, তা যেন সর্বোত্তম হয় অর্থাৎ দলীল-প্রমাণ, কথাবার্তা, তথ্যাবলি ইত্যাদি যেন সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হয় এবং বিষয়বস্তুর ওপর পরিপূর্ণরূপে আলোকপাত করে এবং ভ্রান্ত বিষয়ের বিভ্রান্তি যেন সহজেই প্রকাশিত হয়ে যায়। সঠিক অভিমত হলো আয়াতটি এই দুটি বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

উপদেশদানকারীর দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। কারণ কেউ যখন এ দিকে দৃষ্টি ফেরাবে, তখন সে তার উপদেশ থেকে উপকৃত হতে পারবে না। কেননা মানুষের স্বভাবই এমন যে, সেই ব্যক্তির কথার মাধ্যমে সে উপকার লাভ করে না, যে তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না এবং নিজে উপকৃত হয় না।

পূর্ববর্তী মনীষীদের কোনো একজন বলেছেন, 'তুমি যদি চাও যে, লোকজন তোমার নিকট থেকে আদেশ-নিষেধ গ্রহণ করুক, তা হলে তুমি যখন কোনোকিছুর আদেশ করবে, তখন তুমিই তার প্রথম পালনকারী হোয়ো, আর যখন কোনোকিছু থেকে নিষেধ করবে, তখন তুমিই হোয়ো তার প্রথম পরিত্যাগকারী।'[১৬৭]

ফিকিরের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের উপকারিতা

কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা অর্থাৎ কুরআনের অর্থ বুঝতে অন্তরের দৃষ্টিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করা, কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে ও তা বুঝতে নিজের মন ও ফিকিরকে জমিয়ে রাখা—এটিই হলো কুরআন নাযিল করার মূল উদ্দেশ্য; চিন্তাভাবনা ছাড়া, না বুঝে শুধু তিলাওয়াত[১৬৮] করাই উদ্দেশ্য নয়।

---

[১৬৭] আহমাদ, আয-যুহ্দ, ৩১৮; হাসান বাসরি ﷺ-এর কথা।

[১৬৮] তবে অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করা অনর্থক কিছু নয়, এর দ্বারাও বান্দা সাওয়াবের অধিকারী হয়। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য এর সাওয়াব রয়েছে। আর একটি সাওয়াব হবে দশ গুণ। আমি বলি না যে, আলিফ, লাম, মীম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।" (তিরমিযি, ২৯১০)

এই হাদীসটি তো সুস্পষ্ট যে, অর্থ না বুঝে কুরআন পাঠ করলেও সাওয়াব পাওয়া যাবে; কারণ আলিফ, লাম, মীম হলো আল-হুরূফুল মুকাত্তাআতের অন্তর্ভুক্ত; যার অর্থ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানে না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

"এটি অত্যন্ত বরকতময় একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়।"[১৬৯]

আল্লাহ তাআলা আরেক জায়গায় বলেছেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"[১৭০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ

"তারা কি কখনো এ কালাম সম্পর্কে চিন্তা করেনি?"[১৭১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾

"আমি একে আরবি ভাষার কুরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো।"[১৭২]

হাসান ﵀ বলেছেন, 'কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয় এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়। সুতরাং কুরআন তিলাওয়াত করাকে আমল হিসাবে গ্রহণ করো।' সুতরাং কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর করা, দীর্ঘ সময় ধরে তাতে ধ্যান করা এবং এর অর্থ বোঝার জন্য চিন্তা-ফিকির করার চেয়ে

---

[১৬৯] সূরা সা দ, ৩৮ : ২৯।

[১৭০] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪।

[১৭১] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৬৮।

[১৭২] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩।

বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী ও তার মুক্তির নিকটবর্তী আর কোনো আমল নেই। কারণ এটি বান্দাকে ভালো ও মন্দের নিদর্শনাদি, এর পথসমূহ, এর উপকরণ, উদ্দেশ্য, পরিণতি ও ফলাফল, ভালো ও মন্দ লোকের শেষ ঠিকানা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করে, এবং সৌভাগ্যের ও উপকারী ইলম-ভান্ডারের চাবি তার হাতে তুলে দেয়, তার অন্তরে ঈমানের শেকড় মজবুতভাবে সাব্যস্ত করে, এর ভিত্তি সুদৃঢ় করে, তার অন্তরে দুনিয়া-আখিরাত ও জান্নাত-জাহান্নামের সঠিক চিত্র তুলে ধরে, অন্যান্য উম্মাহর অবস্থা, তাদের থেকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময় কী কী পরীক্ষা নিয়েছেন, সে সম্পর্কে জানিয়ে দেয় এবং তাকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের স্থানসমূহ দেখিয়ে দেয়।

কুরআন আল্লাহ তাআলার ইনসাফ, দয়া ও অনুগ্রহ দেখিয়ে দেয়, তাঁর সত্তা, নাম, গুণাবলি ও কার্যাবলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, তিনি কী পছন্দ করেন, কী অপছন্দ করেন, তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা, পথচলার পাথেয় এবং পথের বিভিন্ন বিপদাপদ ইত্যাদির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

এমনিভাবে নফস ও নফসের গুণাবলি, আমল বিনষ্টকারী ও বিশুদ্ধকারী বিষয় সম্পর্কেও জানিয়ে দেয়।

কুরআন মানুষকে জান্নাতি ও জাহান্নামিদের পথ সম্পর্কে, তাদের আমল, অবস্থা, আলামত, সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগাদের বিভিন্ন স্তর, মানুষের প্রকারভেদ, তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ও অবহিত করে।

মোটকথা কুরআনের তাদাব্বুর বা চিন্তাভাবনা ব্যক্তিকে (তিনটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে) ১. তার রবের পরিচয়, ২. তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার পথ এবং ৩. সে পথ পাড়ি দিলে তার জন্য কী সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, সে সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। আবার এর বিপরীতে তাকে আরও তিনটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে, তা হলো: ১. শয়তান যেদিকে ডাকে, ২. শয়তানের পথ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা এবং ৩. তার পথে পা বাড়ালে এবং সেখানে পৌঁছে গেলে কী শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভাগ্যে জুটবে তা।

ওপরের এই ছয়টি বিষয় জানা, বোঝা ও প্রত্যক্ষ করা বান্দার জন্য অতীব জরুরি। এগুলো তাকে আখিরাতের দৃশ্যাবলি প্রত্যক্ষ করাবে; যেন সে সেখানকারই বাসিন্দা এবং দুনিয়া থেকে তাকে নিয়ে যাবে যেন সে কখনোই এখানে ছিল না। পৃথিবীবাসী

যে বিষয়গুলোতে মতভেদ করে থাকে, তার সামনে সেগুলোর ব্যাপারে কোনটা হক আর কোনটা বাতিল তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবে। সত্যকে সত্য বলে আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলে চেনাবে। তাকে ফুরকান ও এমন নূর দান করবে, যার দ্বারা সে হিদায়াত ও গোমরাহি, আলো ও অন্ধকারের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে, তার অন্তরে শক্তি, প্রাণবন্ততা, প্রশস্ততা, আনন্দ ও উজ্জ্বলতা আনয়ন করবে; যার ফলে সে থাকবে এক অবস্থায় আর অন্যান্য মানুষ থাকবে আরেক অবস্থায়।

কারণ কুরআনের অর্থ বান্দাকে যেসব বিষয়ে জানিয়ে দেয় তা হলো : তাওহীদ, দলীল-প্রমাণ, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান ও তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলি, সব ধরনের দোষত্রুটি থেকে তাঁর পবিত্রতা, তাঁর রাসূলদের ওপর ঈমান, তাঁদের সত্যবাদিতার দলীল, তাঁদের নুবুওয়াতের বিশুদ্ধতার নিদর্শন, তাঁদের অধিকার সম্পর্কে পরিচয়, ফেরেশতাদের ওপর ঈমান, যারা সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর আদেশ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাঁর দূত, আল্লাহর ইচ্ছায় ও হুকুমে ফেরেশতাদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করা, ঊর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগতে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম, ফেরেশতাদের মধ্যে আবার অনেকেই মানবজাতির সাথে তাদের মায়ের পেটে অবস্থান করা থেকে শুরু করে সেই দিন পর্যন্ত সংযুক্ত থাকে, যেদিন তাদের রব তাদেরকে সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব ও প্রতিদান দেবেন।

এমনিভাবে আখিরাতের দিনের ওপর ঈমান, আল্লাহ তাআলা তাতে তাঁর ওলিদের জন্য যে সুখময় আবাস জান্নাত নির্মাণ করে রেখেছেন, যেখানে তারা কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ও কমতি অনুভব করবে না, আবার তিনি তাঁর শত্রুদের জন্য যে অফুরন্ত শাস্তির ঘর জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন, যেখানে কোনো রকমের সুখশান্তি-আরাম-আয়েশ থাকবে না—এসব বিষয়ে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট আলোচনা রয়েছে পবিত্র কুরআনে।

এমনিভাবে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে আদেশ, নিষেধ, শারীআহ, তাকদীর, হালাল, হারাম, শিক্ষা ও উপদেশ, ঘটনা, উদাহরণ, কারণ, হিকমাহ, সৃষ্টির সূচনা-শেষ-উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে।

আসলে কুরআনের অর্থসমূহ বান্দাকে উত্তম প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তার রবের দিকে ধাবিত করে, আল্লাহর ওয়াদাকৃত কঠিন শাস্তি ও আযাবের মাধ্যমে তাকে

ভীতিপ্রদর্শন করে ও সতর্ক করে, কঠিন ও ভারী দিনের সাক্ষাতের জন্য তাকে হালকা ও ভারহীন হতে উদ্‌বুদ্ধ করে, বিভিন্ন যুক্তি, মতবাদ ও দলের অন্ধকার থেকে তাকে সঠিক পথের দিশা দেয়, তাকে হরেকরকমের বিদআত ও গোমরাহিতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে, রবের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে নিয়ামাত বৃদ্ধি করতে উৎসাহ জোগায়, হালাল-হারামের সীমারেখা দেখিয়ে দেয়, তাকে সেই সীমারেখায় অবস্থান করায় যাতে সে সীমালঙ্ঘন না করে, ফলে দীর্ঘ কষ্টে পড়তে না হয়, তার অন্তরকে সত্য ও হক হতে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া থেকে দৃঢ় রাখে, কঠিন কঠিন বিষয়গুলোকে তার জন্য বেশ সহজ করে দেয়, যখনই তার সংকল্প দুর্বল হয়ে যায়, চলার অনুপ্রেরণা নিথর হয়ে পড়ে, তখনই তাকে আহ্বান করে : কাফেলা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে, অনেক মূল্যবান জিনিস তুমি হারিয়ে ফেলেছ, সুতরাং (তাদের সাথে গিয়ে) মিলিত হও, মিলিত হও! যাত্রা অব্যাহত রাখো, যাত্রা অব্যহত রাখো এবং তাদের আগে চলে যাও!' আবার যখনই শত্রুপক্ষের কোনো গোপন ফাঁদে সে আটকে যাবার উপক্রম হয়, বা কোনো পথদস্যুদের কবলে পড়তে যায়, তখনই তাকে ডেকে বলে ওঠে, 'সাবধান হও, সাবধান হও, আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো, তাঁর কাছেই সাহায্য চাও এবং বলো, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট আর উত্তম অভিভাবক (حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ)'

কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা, তাদাব্বুর-তাফাক্কুর করা এবং তা বোঝার চেষ্টা করার মাঝে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তার চেয়েও অনেক অনেকগুণ বেশি কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

স্বল্প আশা শিক্ষা গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করে

আশার স্বল্পতা হলো : এটা জানা যে, মৃত্যু খুবই নিকটবর্তী এবং জীবনের সময়কাল খুব দ্রুতই ফুরিয়ে যাবে। এটি অন্তরের জন্য সবচেয়ে উপকারী বিষয়। কেননা এটি তাকে দুঃখ-দুর্দশায় ও কঠিন সময়ে নিজেকে সামলে রাখতে ও সময়কে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। আর সময় তো মেঘমালার উড়ে যাওয়ার মতোই দ্রুত অতিবাহিত হয়। এমনিভাবে তার আমলনামাকে নেক আমল দ্বারা ভারী করতে, নিজের চাওয়া ও ইচ্ছাকে চিরস্থায়ী আবাসের দিকে ফেরাতে উদ্‌বুদ্ধ করে। তাকে তার সফরের পাথেয় জোগাড় করতে এবং কমতি ও ঘাটতিগুলোকে পূরণ করতে

উৎসাহিত করে। দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহী বানায়। ধারাবাহিকভাবে অল্প আশার ওপরে অভ্যস্ত হলে ইয়াকীনের প্রহরীগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রহরী তার অন্তরে নিযুক্ত হয়; যে তাকে দেখিয়ে দেয় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব, এর দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া, এর মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে তার স্বল্পতা। দুনিয়া কেবল পেছন দিকেই যাচ্ছে, এর ওটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে, যেটুকু পাতিলের তলায় সামান্য খাবার অবশিষ্ট থাকে, যা ব্যক্তি চেঁচেমুছে তুলে নেয়, অথবা এর আর বাকি আছে কেবল সেই সময়টুকু, যেটুকু বাকি থাকে সেই দিনের অংশ; যার সূর্য হেলতে হেলতে অবস্থান নিয়েছে পাহাড়ের চূড়ায়। তাকে এটিও দেখিয়ে দেয় যে, আখিরাত চিরস্থায়ী ও অনন্তকালব্যাপী বিস্তৃত এবং তা ক্রমশ সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

কিয়ামাতের শর্ত ও আলামত চলে এসেছে। আখিরাতের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি সেই মুসাফিরের ন্যায়, যার সাথে সাক্ষাতের জন্য আরেকজন বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছে; এদের প্রত্যেকেই একজন অপরজনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, হয়তো খুব দ্রুতই তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে।

আশা ছোটো রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার এই বাণীটিই যথেষ্ট—

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ ۝٢٠٥ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝٢٠٦ مَا أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ۝٢٠٧

> “আপনি ভেবে দেখুন তো, আমি যদি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাস করতে দিই, অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হতো, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগবিলাস কি তাদের কোনো উপকারে আসবে?”[১৭৩]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আমাদের একটি কুঁড়েঘর মেরামত করছিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, مَا هٰذَا “এটা কী?”

আমরা বললাম, ‘এটা নড়বড়ে হয়ে গেছে, তাই তা ঠিকঠাক করছি।’

---

[১৭৩] সূরা শুআরা, ২৬ : ২০৫-২০৭।

তিনি এর জবাবে বললেন,

مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ

"আমি তো দেখছি মৃত্যু এর চেয়েও দ্রুত ধাবমান।"[১৭৪]

আশার স্বল্পতার ভিত্তি হলো দুটি বিষয়ের ওপর : ১. দুনিয়া ধ্বংস হওয়া ও তা ছেড়ে যাওয়ার বিশ্বাস এবং ২. আখিরাতের সাক্ষাৎ পাওয়া ও তার চিরস্থায়ী হওয়ার বিশ্বাস। এখন আপনি দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন এবং যেটা উত্তম ও কল্যাণকর সেটাকে প্রাধান্য দিন।

*****

[১৭৪] তিরমিযি, ২৩৩৫; আবূ দাউদ, ৫২৩৬।

৪ নং মানযিল

দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা (اَلْاِعْتِصَامُ)

[اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মানযিল।]

তাযাক্কুর বা শিক্ষা গ্রহণের মানযিলের পর অন্তর দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মানযিলে অবতরণ করে।

দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা দুই প্রকার :

১. আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা (اَلْاِعْتِصَامُ بِاللهِ) এবং

২. আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা (اَلْاِعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ)।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা সবাই আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[১৭৫]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

"আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো; তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়োই ভালো অভিভাবক এবং বড়োই ভালো সাহায্যকারী তিনি।"[১৭৬]

---

[১৭৫] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১০৩।

[১৭৬] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৮।

اَلْاِعْتِصَامُ হলো اَلْعِصْمَةُ থেকে বাবুল ইফতিআলের সীগাহ। এর অর্থ হলো : এমন বিষয়কে আঁকড়ে ধরা, যা আপনাকে ভীতিকর ও নিষিদ্ধ বস্তু থেকে রক্ষা করবে এবং নিরাপত্তা দেবে। 'ইসমত' অর্থ হলো রক্ষা করা আর 'ই'তিসাম' অর্থ হলো আত্মরক্ষা করা। এই শব্দ থেকেই দুর্গকে 'আওয়াসিম'(اَلْعَوَاصِمُ) বলা হয়, কেননা তা সুরক্ষা দান করে এবং নিরাপত্তা দেয়।

দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যের ভিত্তি হলো : আল্লাহ তাআলাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর রশিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। এ দুটিকে ধারণ করা ব্যতীত কারও মুক্তি মিলবে না।

আল্লাহর রশি আঁকড়ে ধরার দ্বারা সে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আর আল্লাহকে আঁকড়ে ধরার কারণে সে ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। কারণ আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তি সেই লোকের মতো, যে নিজ গন্তব্যের দিকে পথ চলছে; এখন সে সঠিক পথ চেনার মুখাপেক্ষী এবং নিরাপদে পথ পাড়ি দেওয়ারও মুখাপেক্ষী। এ দুটি বিষয় হাসিল না হলে সে কিছুতেই ঠিকমতো তার গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে না। দলীল-প্রমাণ তাকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে এবং তাকে সঠিক পথ, পাথেয়, শক্তি ও হাতিয়ারের প্রতি দিক্‌নির্দেশনা দেয়; যার ফলে সে পথদস্যু ও পথের বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা হিদায়াত ও দলীলের অনুসরণ করাকে আবশ্যক করে। আর আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা শক্তি-সামর্থ্য, পাথেয়, হাতিয়ার আর বিভিন্ন উপকরণ অবলম্বন করাকে আবশ্যক করে; যা তার পথচলা নির্বিঘ্ন করে। এ কারণেই আল্লাহর রশি আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে সালাফগণ সবাই এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন, যদিও তাদের মতামতের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পাওয়া যায়।

ইবনু আব্বাস ﵁ বলেছেন, 'অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরো।'

ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন, 'এটি হলো জামাআত।' তিনি আরও বলেছেন, 'জামাআতবদ্ধভাবে অবস্থান করাকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও। কারণ এটি হলো আল্লাহ তাআলার রশি, যা আঁকড়ে ধরার আদেশ তিনি দিয়েছেন। তোমরা একাকী যা পছন্দ করো, তার চেয়ে উত্তম হলো জামাআতে ও আনুগত্যে থাকার

সময় তোমরা যা অপছন্দ করো।'[১৭৭]

মুজাহিদ ও আতা ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর রশি হলো আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার।' কাতাদা, সুদ্দিসহ আরও অনেক মুফাসসির ﷺ-এর অভিমত হচ্ছে, 'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন।'

ইবনু মাসঊদ ﷺ নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللهِ، وَهُوَ النُّوْرُ الْمُبِيْنُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، وَعِصْمَةُ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةُ مَنْ تَبِعَهُ

'নিশ্চয় এই কুরআন হলো আল্লাহ তাআলার রশি, সুস্পষ্ট আলো, উপকারী ওষুধ, যে তা আঁকড়ে ধরবে, তা তাকে রক্ষা করবে এবং যে তা অনুসরণ করবে, তাকে তা নাজাত দান করবে।'[১৭৮]

আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ কুরআন সম্পর্কে নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,

هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ، وَهُوَ الَّذِىْ لَا تَزِيْغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ

'এটি হলো আল্লাহ তাআলার মজবুত রশি, প্রজ্ঞাময় যিক্‌র, সরল-সোজা পথ, এর দ্বারা চিন্তাভাবনা কখনো বিকৃত হয় না, অনেক ব্যবহার করলেও কোনোদিন তা পুরাতন হয় না, কোনো ভাষা-ই এর (শুদ্ধতার) ব্যাপারে মতবিরোধ করে না এবং বিদ্বানরা এর থেকে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না।'[১৭৯]

মুকাতিল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর আদেশ ও আনুগত্যে অবিচল থেকো। ইয়াহূদি-নাসারারা যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তোমরা সেরকম করে বিচ্ছিন্ন হোয়ো না।'[১৮০]

---

[১৭৭] বাগাবি, তাফসীর, ২/৭৮।

[১৭৮] ইবনু কাসীর, ফাদাইলুল কুরআন, ১/৪৭; বাগাবি, তাফসীর, ২/৭৮।

[১৭৯] তিরমিযি, ২৯০৬; ইবনু আবী শাইবা, ৩০৬২৯।

[১৮০] বাগাবি, তাফসীর, ১/৪৮১।

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

"আল্লাহ তাআলা তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তোমাদের জন্য তিনি যা পছন্দ করেন, তা হলো :

১. তোমরা তাঁরই ইবাদাত করবে,

২. তাঁর সঙ্গে কোনোকিছু শরীক করবে না এবং

৩. তোমরা সবাই আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।

আর যেসকল বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন, তা হলো :

১. অর্থহীন কথাবার্তা বলা,

২. অধিক প্রশ্ন করা এবং

৩. সম্পদ নষ্ট করা।"[১৮১]

আল্লাহ তাআলাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার অর্থ হলো : তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁর নিকট নিরাপত্তা চাওয়া, তাঁর মাধ্যমে নিজের আত্মরক্ষা করা, সাথে এই প্রার্থনা করা যে, তিনি যেন বান্দাকে হেফাজত করেন, সুরক্ষা দান করেন এবং সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে বাঁচান। কারণ আল্লাহকে আঁকড়ে ধরার ফল হলো বান্দা থেকে ক্ষতি দূর করা। আর আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। যখন মুমিন বান্দা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চায় এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরে, তখন আল্লাহ তার থেকে সব ধরনের ধ্বংসাত্মক ও অনিষ্টকর বস্তু দূর করে দিয়ে তাকে সুরক্ষিত করেন। তার যত সন্দেহ-সংশয়, মন্দ চাহিদা, শত্রুর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ষড়যন্ত্র, কুপ্রবৃত্তির খারাবি, মন্দ ও অসৎ উপকরণের আবশ্যকীয় ক্ষতি—সবকিছু থেকে তাকে হেফাজত করেন। তবে এটি হয় ব্যক্তির আল্লাহকে আঁকড়ে ধরার ও তাঁর

[১৮১] মুসলিম, ১৭১৫।

দিকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি অনুপাতে। আল্লাহকে আঁকড়ে ধরা ও অগ্রসর হওয়া বান্দার পক্ষ থেকে যেমন হয়, বান্দার থেকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহ দূর করা এবং তা থেকে তাকে রক্ষা করাও তেমনই হয়।

*****

৫ নং মানযিল

পলায়ন করা (اَلْفِرَارُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর একটি মানযিল হলো—পলায়ন করার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَفِرُّوْا إِلَى اللهِ

"অতএব, তোমরা আল্লাহর দিকে পালাও।"[১৮২]

'ফিরার' বা পলায়ন করার প্রকৃত অর্থ হলো : এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর দিকে ছোটা। এটি দুই প্রকার : ১. সৌভাগ্যবানদের পলায়ন এবং ২. দুর্ভাগ্যবানদের পলায়ন।

১. সৌভাগ্যবানদের পলায়ন : আল্লাহর দিকে পলায়ন করা।

২. দুর্ভাগ্যবানদের পলায়ন : আল্লাহর দিকে নয়, বরং আল্লাহ থেকে পলায়ন করা।

আর আল্লাহর থেকে পালিয়ে আল্লাহর দিকেই যাওয়া—এটি হলো তাঁর নৈকট্যশীল ওলিদের পলায়ন।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ ওপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে আল্লাহর দিকেই ছুটে যাও এবং তাঁর আনুগত্য করতে থাকো।'[১৮৩]

সাহ্ল ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর সবার কাছ থেকে পালিয়ে তোমরা আল্লাহর দিকেই যাও।'[১৮৪]

---

[১৮২] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫০।

[১৮৩] সা'লাবি, তাফসীর, ২৪/৫৬২।

[১৮৪] কুরতুবি, তাফসীর, ১৭/৫৪।

অন্যান্যরা বলেছেন, 'আল্লাহর শাস্তি থেকে পালিয়ে ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সাওয়াবের দিকে ধাবিত হও।'

মূর্খতা থেকে জ্ঞানের দিকে ধাবিত হওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। জাহ্ল বা মূর্খতা দুই প্রকার : ১. উপকারী ও সত্য ইলম সম্পর্কে না জানা এবং ২. সেই ইলম অনুযায়ী আমল না করা। শাব্দিক, পারিভাষিক, শারঈ ও প্রকৃত অবস্থার বিচারে উভয়টিই মূর্খতা।

মূসা ﷺ বলেছেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾

"মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[১৮৫]

মূসা ﷺ এই কথা বলেছিলেন তখন, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল,

أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا

"তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছো?"[১৮৬]

ইউসুফ ﷺ বলেছেন,

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾

"আপনি যদি তাদের চক্রান্ত আমার থেকে প্রতিহত না করেন, তা হলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[১৮৭]

অর্থাৎ তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, যারা হারাম কাজে লিপ্ত হয়।

---

[১৮৫] সূরা বাকারা, ২ : ৬৭।
[১৮৬] সূরা বাকারা, ২ : ৬৭।
[১৮৭] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা মূর্খতাবশত মন্দ কাজ করে।"[১৮৮]

কাতাদা ﷺ বলেছেন, 'সাহাবায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন যে, যার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানি করা হয়, তা-ই মূর্খতা।'[১৮৯]

অনেকেই বলেছেন, 'সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে, সে-ই মূর্খ বা জাহিল।'

ইলমের মূল্যায়ন না করাকে মূর্খতা বলে নামকরণ করা হয়েছে; ১. ইলম দ্বারা উপকৃত না হওয়ার কারণে অথবা ২. বান্দা তার কৃত পাপকাজের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে।

উল্লেখিত পলায়ন বা ফিরার এই দুই প্রকার মূর্খতা থেকে পলায়নকেও শামিল করে। অর্থাৎ ইলম সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে বিশ্বাস, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে ইলম হাসিল করার দিকে পলায়ন করা। এমনিভাবে আমল না করার মূর্খতা থেকে স্বেচ্ছায় ও চেষ্টার মাধ্যমে উপকারী পরিশ্রম ও নেক আমল করার দিকে পলায়ন করা।

এমনিভাবে অলসতার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে আমল ও পরিশ্রমের ডাকে সাড়া দেওয়াও পালিয়ে যাওয়া বা ফিরারের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে পরিশ্রম বলতে সংকল্পের সততা এবং ঝিমিয়ে না পড়া এবং কোনো আমলকে ছোটো করে দেখা থেকে ও তা দেরি করে আদায় করা থেকে বেঁচে থাকা। 'শীঘ্রই করব', 'অচিরেই করব', 'দেখা যাক', 'আশা আছে'—এই রকম অজুহাত না দেওয়া। এটি হলো বান্দার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এটি এমন একটি গাছ, যার ফল কেবল ক্ষতি ও আফসোস।

এই দুনিয়াতে বিভিন্ন চিন্তা, পেরেশানি ও ভয়ভীতি বান্দাকে যে কষ্ট দেয় এবং

[১৮৮] সূরা নিসা, ৪ : ১৭।
[১৮৯] বাগাবি, তাফসীর, ১/৫৮৬।

ধনসম্পদ, শরীর, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি ক্ষেত্রে বান্দা যে কষ্ট পায়, সে কারণে তার হৃদয়ে যে সংকীর্ণতা আসে, তা থেকে আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরতার প্রশস্ত ময়দানের দিকে, তাঁর ওপর প্রকৃত তাওয়াক্কুল, তাঁর প্রতি উত্তম আশা, তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও করুণা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করার দিকে অগ্রসর হওয়াও ফিরার বা পলায়নের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মানুষের এই কথাটি অনেক উত্তম, 'আল্লাহ সাথে থাকলে কোনো চিন্তা নেই!'

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

> "যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিয্ক দান করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"[১৯০]

রবী' ইবনু খুসাইম ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'মানুষের ওপর যত ধরনের সংকীর্ণতা আসতে পারে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তিনি সৃষ্টি করে দেবেন।'[১৯১]

আবুল আলিয়া ﷺ বলেছেন, 'প্রতিটি বিপদাপদ থেকে তিনি নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন।'[১৯২]

'যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন'— এই প্রতিশ্রুতিটি দুনিয়া ও আখিরাতের সব ধরনের বিপদাপদ ও সংকীর্ণতা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী খোদাভীরুদের জন্য দুনিয়া কিংবা আখিরাত কোনোটিকে নির্দিষ্ট করে এই প্রতিশ্রুতি দেননি। (বরং ব্যাপকভাবেই এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।)

বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার প্রতি উত্তম ধারণা রাখবে, তাঁর নিকট উত্তম আশা পোষণ করবে এবং সততার সাথে তাঁর ওপর ভরসা করবে, তখন নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ তাআলা তার আশা-ভরসাকে বিফল হতে দেবেন না। কারণ আল্লাহ কোনো

---

[১৯০] সূরা তালাক, ৬৫ : ২-৩।

[১৯১] তাবারি, তাফসীর, ২৩/৪৬।

[১৯২] সা'লাবি, তাফসীর, ২৬/৫৬১।

আশাপোষণকারীর আশাকে নিরাশায় পরিণত করেন না এবং কোনো আমলকারীর আমলকে নষ্ট করেন না। তাঁর ওপর নির্ভরতা ও তাঁর প্রতি উত্তম ধারণাকে তিনি প্রশস্ততা বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা ঈমান আনার পর তাঁর ওপর নির্ভর করা, তাঁর নিকট ভালো আশা করা এবং তাঁর প্রতি উত্তম ধারণা রাখার চেয়ে হৃদয়ের জন্য অধিক প্রশস্ত আর কোনোকিছু নেই।

*****

৬ নং মানযিল

সাধনা করা (اَلرِّيَاضَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—সাধনা করার মানযিল। এটি হলো নফসকে সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতার ওপরে উঠানোর অনুশীলন করা।

সাধনা করার দ্বারা দুটি বিষয় উদ্দেশ্য নেওয়া হয় :

এক. কোনো কথা, কাজ ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে যখন সত্য পেশ করা হয়, তখন অন্তরকে সত্য গ্রহণে অভ্যস্ত করে তোলা। যখন তার কাছে সত্য উপস্থিত হয়, তখন সে যেন তা কবুল করে নেয়, তা মানে এবং তার প্রতি বিনয়ী হয়।

দুই. হক ও ন্যায় যে-ই বলুক, তা গ্রহণ করে নেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾

> "যারা সত্য নিয়ে এসেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে; তারাই প্রকৃত খোদাভীরু।"[১৯৩]

অর্থাৎ আপনার শুধু সত্যবাদী হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সত্যবাদিতার সাথে সাথে সত্যবাদীদের সত্যায়ন করা এবং স্বীকৃতি দেওয়াও জরুরি। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা সত্য কথা বলে; কিন্তু অহংকার, হিংসা বা অন্য কোনো কারণে অপরের বলা-সত্যকে স্বীকার করতে চান না, তা সত্যায়ন করেন না।

১. সাধনার অন্যতম একটি দিক হলো : ইলমের মাধ্যমে নিজের স্বভাব-চরিত্রকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে তোলা। যাতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যে কাজই করুক না কেন, তা ইলম অনুযায়ী হয়। প্রকাশ্য-গোপন প্রতিটি নড়াচড়া যেন শারঈ মানদণ্ডে

---

[১৯৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ৩৩।

উত্তীর্ণ হয়।

২. এর আরেকটি দিক হলো : নিজের সমস্ত আমলকে ইখলাসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করা। আল্লাহ্ তাআলার জন্য এমনভাবে তা নিবেদন করা যে, গাইরুল্লাহর কোনো মিশ্রণ যেন না থাকে।

৩. রিয়াযত বা সাধনার আরেকটি দিক হলো : মুআমালা-লেনদেনের ক্ষেত্রে সব ধরনের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করা। তা এভাবে যে, আপনাকে আল্লাহর হকের ব্যাপারে ও বান্দার হকের ব্যাপারে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করবেন। যার সাথে লেনদেন করছেন, তার কল্যাণ কামনা করা, তাকে ধোঁকা না দেওয়া এবং তাকে সাধ্যমতো খুশি রাখার চেষ্টা করা। এর ফলে আপনিও তার প্রশংসায় ও কৃতজ্ঞতায় ধন্য হবেন।

যখন এই তিনটি বিষয় পালন করতে নফসের জন্য কঠিন হয়ে যায়, তখন এগুলো অর্জন করতে কঠোর সাধনা করতে হয়। ফলে যখন তা অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন তা স্বভাব-চরিত্রের উত্তম গুণে রূপান্তরিত হয়।

*****

৭ নং মানযিল

শ্রবণ করা (اَلسَّمَاعُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -এর আরেকটি মানযিল হলো—শ্রবণ করার মানযিল।

اَلسَّمَاعُ হলো ইসমু মাসদার, যেমন : اَلنَّبَاتُ (ঘাস, তৃণ)। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে শ্রবণ করার আদেশ করেছেন, যারা তা করে তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا

"আল্লাহকে ভয় করো এবং শোনো।"[১৯৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا

"শোনো এবং আনুগত্য করো।"[১৯৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ ۖ وَأُولٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

"অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদের; যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শোনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ

---

[১৯৪] সূরা মায়িদা, ৫ : ১০৮।

[১৯৫] সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৬।

সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।”[১৯৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٢٠٤﴾

“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো; যাতে তোমাদের ওপর রহম করা হয়।”[১৯৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾

“আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শোনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করে নিন।”[১৯৮]

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (উপদেশ) শোনানো আর তা শুনে (করণীয়-বর্জনীয়) মেনে চলা—এই বিষয়টিকে তিনি কল্যাণ থাকার দলীল সাব্যস্ত করেছেন। আর এর বিপরীত বিষয়কে কল্যাণ না থাকার দলীল সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُم مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

“আল্লাহ যদি জানতেন, এদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও কল্যাণ আছে, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। (কিন্তু কল্যাণ ছাড়া) যদি তিনি তাদের শুনাতেন, তা হলে তারা মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যেত।”[১৯৯]

---

[১৯৬] সূরা যুমার, ৩৯ : ১৭-১৮।

[১৯৭] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৪।

[১৯৮] সূরা মায়িদা, ৫ : ৮৩।

[১৯৯] সূরা আনফাল, ৮ : ২৩।

আল্লাহ তাআলা তাঁর শত্রুদের সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরা শোনে না এবং অন্যকে শুনতে নিষেধ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ

> "কাফিররা বলে, 'এ কুরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শোনানো হবে, তখন হট্টগোল বাধিয়ে দেবে'।"[২০০]

শ্রবণ করা হলো কল্‌বের জন্য ঈমানের দূত, ঈমানের আহ্বানকারী এবং ঈমানের শিক্ষাদানকারী। কুরআনের অসংখ্য জায়গায় এই ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾

> "তবে কি তারা জমিনে ভ্রমণ করেনি, তা হলে তাদের এমন অন্তর হতো, যার দ্বারা তারা বুঝত অথবা এমন কর্ণ হতো, যার দ্বারা তারা শুনত? বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় অন্তর, যা আছে বুকের ভেতর।"[২০১]

শ্রবণ হলো আকল বা বুদ্ধির মূল। এর ওপরেই ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। শ্রবণ হলো ঈমানের নেতা, সঙ্গী ও সাহায্যকারী। কিন্তু যা শোনা হয়, তার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত ব্যাপার। সেখানেই লোকজনের ভুল-ত্রুটি-মতভেদ ধরা পড়ে।

অর্জন করা বা দূরে থাকা, ভালোবাসা বা ঘৃণা করার দিক দিয়ে শ্রবণ বা সামা'র প্রকৃত অর্থ হলো : যা শোনা হয়, তা বোঝার জন্য অন্তরকে জাগ্রত করা। শ্রবণ হলো আহ্বানকারী, যা প্রত্যেককে তার ঘর ও পছন্দনীয় বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

---

[২০০] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২৬।

[২০১] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৬।

শ্রোতার প্রকারভেদ

এক প্রকার শ্রোতা হলো : যে তার স্বভাব, নফস ও প্রবৃত্তি অনুসারে শোনে। এই শ্রেণির ব্যক্তিদের স্বভাবের সাথে যা মিলে, শোনা-বিষয় থেকে কেবল ততটুকুই তাদের অংশ। (তারা কেবল ওইটুকুই শোনে।)

আরেক প্রকার হলো : যে তার অবস্থা, ঈমান, মা'রিফাত ও বুদ্ধি অনুসারে শোনে। এই শ্রেণির ব্যক্তিরা তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে শ্রুতবিষয় থেকে জ্ঞান ও উপকারিতা লাভ করে থাকে।

শ্রোতাদের মধ্যে আরেক প্রকার হলো : যারা কেবল আল্লাহ-সম্পর্কিত বিষয়াদিই শোনে, এ ছাড়া আর কিছুই শোনে না। যেমন হাদীসে কুদসিতে এসেছে—

فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ،

> "অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় বানিয়ে নিই; আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে।"[২০২]

এটি হলো সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সর্বোচ্চ স্তরের শ্রবণ।

শ্রবণের হুকুম; যা শোনা হয় তার সাথে সম্পর্কিত

সামা' বা শ্রবণ করার প্রশংসা ও নিন্দার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে হলে, যা শোনা হয় তার পরিচয়, প্রকৃত অবস্থা, তার কারণ, এর প্রতি উদ্‌বুদ্ধকারী বস্তুটি কী, এর ফলাফল ও পরিণতি কী ইত্যাদি বিষয়ে জানা জরুরি।

পরবর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে শ্রবণের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং এর উপকারিতা ও অপকারিতা, হক ও বাতিল, প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় বিষয়গুলোর মাঝে পার্থক্য হয়ে যাবে।

---

[২০২] বুখারি, ৬৫০২।

যা শোনা হয় তা তিন প্রকার :

এক. যা আল্লাহ্ তাআলা ভালোবাসেন, যাতে তিনি সন্তুষ্ট, যার আদেশ তিনি তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন, যার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের তিনি প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

দুই. এমন বিষয়বস্তুর শ্রবণ; যা তিনি ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন, যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন এবং যারা তা থেকে বিরত থাকে তাদের প্রশংসা করেছেন।

তিন. যা মুবাহ্ বা বৈধ, যার অনুমতি রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তা পছন্দও করেন না আবার অপছন্দও করেন না, যারা তা করে তাদের প্রশংসাও করেন না, তাদের নিন্দাও করেন না। এর হুকুম হলো অন্যান্য বৈধ বিষয়ের মতো। যেমন : বৈধ দর্শন, ঘ্রাণ, খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি। যারা এই তৃতীয় প্রকারকে হারাম বলে, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে না জেনেই কথা বলে এবং আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, তাকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়। আর যে এই মুবাহ্ শ্রবণকেই দ্বীন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানিয়ে নেয়, সে তো আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করে এবং নতুন একটি শারীআত আবিষ্কার করে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি। এর দ্বারা সে মুশরিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।

আল্লাহ্ তাআলা যে শ্রবণের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন

প্রথম প্রকার শ্রবণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে প্রশংসা করেছেন, এর আদেশ দিয়েছেন, যারা তাতে লিপ্ত তাদের প্রশংসা করেছেন, যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের নিন্দা করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদেরকে প্রাণী-পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন, তারা জাহান্নামের আগুনের ভেতরে জ্বলতে থাকবে আর বলবে,

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ ۝

"যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তা হলে আমরা এ জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।"[২০৩]

---

[২০৩] সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১০।

এটি হলো সেই সমস্ত আয়াত শ্রবণ করা, যা আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন।

এই শ্রবণই হলো ঈমানের ভিত্তি, যার ওপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত। এটি তিন প্রকার :

১. বাহ্যিকভাবে কানের মাধ্যমে শ্রবণ,

২. বোঝা ও উপলব্ধির জন্য শ্রবণ এবং

৩. সাড়া দেওয়া ও কবুল করার জন্য শ্রবণ।

কুরআনে এই তিন প্রকার শ্রবণের আলোচনাই রয়েছে।

১. বাহ্যিকভাবে কানের মাধ্যমে শ্রবণ : জিনদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ

"আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি; যা সত্য ও সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়, তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি।"[২০৪]

এটি হলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শ্রবণ; যার সাথে ঈমান ও সাড়া দেওয়াও যুক্ত হয়েছে।

২. বোঝা ও উপলব্ধি করার জন্য শ্রবণ : এটি উপেক্ষাকারী ও গাফিলদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝٥٢

"আপনি মৃতদের শুনাতে পারবেন না এবং এমন বধিরদেরও নিজের আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়।"[২০৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝٢٢

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনান, কিন্তু আপনি তাদেরকে শুনাতে পারবেন

---

[২০৪] সূরা জিন, ৭২ : ১-২।

[২০৫] সূরা রূম, ৩০ : ৫২।

না, যারা কবরে রয়েছে।"[২০৬]

এখানে আল্লাহ তাআলার বিশেষত্ব হলো : বুঝানো ও উপলব্ধি করানোর জন্য শুনানো। অন্যথায় যে ব্যাপক শ্রবণের দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত[২০৭] হয়, তাতে কোনো বিশেষত্ব নেই। (তা আল্লাহও যেমন শুনাতে পারেন, নবি ﷺ-ও শুনাতে পারেন।) এই প্রকার শ্রবণের ব্যাপারে আরেকটি আয়াত হলো :

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۗ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

"আল্লাহ যদি জানতেন, এদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও কল্যাণ আছে, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। (কিন্তু কল্যাণ ছাড়া) তিনি যদি তাদের শুনাতেন, তা হলে তারা মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যেত।"[২০৮]

অর্থাৎ সেই কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যদি জানতেন যে, তারা কবুল করবে ও মানবে, তা হলে অবশ্যই তিনি তাদের তা বুঝিয়ে দিতেন। নতুবা তারা তো বাহ্যিকভাবে তা শুনেছেই।

وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

"তিনি যদি তাদেরকে শুনাতেন, তা হলে তারা মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যেত।"

অর্থাৎ যদি তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন, তা হলে তারা তা মানত না এবং যা বুঝেছে, তার দ্বারা উপকৃত হতো না। কারণ তাদের অন্তরে উপেক্ষা করা ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা প্রকট; যা শোনা বিষয় থেকে তাদেরকে উপকৃত হতে বাধা দেয়।

৩. সাড়া দেওয়া ও কবুল করা জন্য শ্রবণ : মুমিন বান্দাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ

---

[২০৬] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২২।

[২০৭] অর্থাৎ কেউ এটা বলতে পারবে না যে, আমি শুনিনি, আমি জানিনি, আমাকে শুনানো হয়নি। আসলে শোনা এক জিনিস আর তা বোঝা ও উপলব্ধি করা আরেক জিনিস।

[২০৮] সূরা আনফাল, ৮ : ২৩।

"আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং অনুগত হয়েছি।"[২০৯]

এটি হলো সাড়া দেওয়া ও গ্রহণ করার জন্য শ্রবণ করা, যা আনুগত্যের ফল।

তবে সঠিক কথা হলো : এই আয়াতটি শ্রবণের তিনটি প্রকারকেই শামিল করে, তারা এই খবর দিয়েছে যে, তাদের যা বলা হয়েছে তারা তা শুনেছে, উপলব্ধি করেছে এবং তা মেনে নিয়েছে।

মূলকথা : নৈকট্যশীল অতি বিশেষ ব্যক্তিদের শ্রবণ হলো : এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কুরআন শ্রবণ করা—নিজ কানে শোনা, উপলব্ধি করা এবং তা মেনে নেওয়া। পবিত্র কুরআনে যে শ্রবণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা প্রশংসা করেছেন, যা শোনার জন্য তাঁর ওলিদের আদেশ করেছেন এবং শ্রবণের অধিকারী ব্যক্তিদের যে সুসংবাদ দিয়েছেন, তার প্রতিটিই হলো এই প্রকারের শ্রবণের অন্তর্ভুক্ত।

এটি হলো আয়াত শ্রবণ, কবিতা শ্রবণ নয়। কুরআন শ্রবণ, শয়তানের আওয়াজ (গান-মিউজিক) শ্রবণ নয়। সত্য কথা ও হিদায়াতের বাণী শ্রবণ, কোনো ছন্দ শ্রবণ নয়। নবি, রাসূল ও মুমিনদের কথা শ্রবণ, গায়ক ও বাদকদের সুর শ্রবণ নয়। আসমান-জমিনের প্রতিপালকের কালাম শ্রবণ, কবিদের কাব্য ও কবিতা শ্রবণ নয়। এই সমস্ত শ্রবণ অন্তরকে চালিত করে অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়, রূহকে খুশি ও আনন্দের জগতে টেনে নেয়, এটি দমে-যাওয়া-ইচ্ছেগুলোকে সুউচ্চ মর্যাদা ও মর্তবা অর্জনের জন্য জাগ্রত করে, ঈমানের প্রতি আহ্বান করে, জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে, সকাল-সন্ধ্যা অন্তরকে ডাকতে থাকে, ভোর হওয়ার আগে বলে উঠে,

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

'কল্যাণের পথে আসুন, কল্যাণের পথে আসুন।'

যে ব্যক্তি এই প্রকার শ্রবণে অভ্যস্ত হয় দলীল উপস্থাপন করা, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উপদেশ দেওয়া, কোনো প্রজ্ঞার স্মরণ, কোনো আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, ভালো কাজের জন্য পথ দেখানো, কোনো গোমরাহিকে প্রতিহত করা, পথভোলা কাউকে

[২০৯] সূরা বাকারা, ২ : ২৮৫।

পথ দেখানো, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা, কোনো কল্যাণকর কাজের আদেশ করা, কোনো ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর বস্তু থেকে নিষেধ করা ইত্যাদি থেকে সে কখনো অনুপস্থিত থাকে না। (সে গভীর ধ্যানে শ্রবণ করার কারণে সবকিছু তার সামনে উপস্থিত থাকে।)

এমনিভাবে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া, অন্ধকার থেকে বের করা, কুপ্রবৃত্তির চাহিদাকে দমিয়ে রাখা, তাকওয়া অবলম্বন করতে উদ্‌বুদ্ধ করা, বিচক্ষণতা শাণিত হওয়া, প্রাণবন্ত হওয়া, শক্তিশালী হওয়া, সুস্থ থাকা, নিরাপদ থাকা, মুক্তি পাওয়া, সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত করা, দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট করা, হককে হক হিসেবে আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রকাশিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো থেকেও সে বঞ্চিত থাকে না।

যে শ্রবণকে আল্লাহ তাআলা ঘৃণা করেন

শ্রবণের দ্বিতীয় প্রকার : এই প্রকারের শ্রবণকে আল্লাহ তাআলা ঘৃণা করেছেন, অপছন্দ করেছেন এবং যারা এই প্রকার থেকে বেঁচে থাকে, তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো—প্রত্যেক ওই শ্রবণ, যা ব্যক্তির অন্তর ও দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতি সাধন করে। যেমন : সব ধরনের বাতিল বিষয়বস্তু শ্রবণ করা; তবে তা প্রতিহত করার জন্য বা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য বা তার বিপরীত বিষয়ের সৌন্দর্য ও উপকারিতা জানিয়ে দেওয়ার জন্য হলে ভিন্ন কথা। কারণ কোনো বস্তু খারাপ হলে তার বিপরীত দিকটি ভালো হয়।

এই প্রকার শ্রবণের একটি উদাহরণ হলো : অনর্থক কিছু শোনা; আল্লাহ তাআলা যার পরিত্যাগকারী ও উপেক্ষাকারীর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ

> "তারা যখন অনর্থক কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"[২১০]

---

[২১০] সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৫।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

> "যখন তারা খেল-তামাশার নিকট দিয়ে যায়, তখন ভদ্রভাবে চলে যায়।"[২১১]

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা ﵀ বলেছেন, 'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গানবাজনা।'

হাসান বাস্‌রি ﵀ ও অন্যান্যরা বলেছেন, 'তারা তা শোনা থেকে নিজেদেরকে সম্মানিত মনে করে।'[২১২]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন,

اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ

> 'গানবাজনা অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে, যেমন পানি উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।'[২১৩]

এটি সেই ব্যক্তির কথা, যিনি গানবাজনার প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন। কারণ যে এতে অভ্যস্ত হয়, তার অন্তরে নিফাক সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে টেরও পায় না। যদি সে নিফাকের প্রকৃত অর্থ ও চূড়ান্ত পরিণতি জানত, তা হলে তার অন্তরে সে তা অবশ্যই দেখতে পেত। কেননা কোনো ব্যক্তির অন্তরে গানবাজনার প্রতি ভালোবাসা এবং কুরআনের প্রতি ভালোবাসা কখনো একসাথে অবস্থান করতে পারে না। একটি অপরটিকে বিদায় করে দেয়। আমি নিজে এবং আরও অনেকেই এটা প্রত্যক্ষ করেছেন যে, যারা গানবাজনা শোনে, তাদের নিকট কুরআন পাঠ ও তা শ্রবণ করা অনেক ভারী হয়ে যায়, কুরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে, (সালাতে) বেশিক্ষণ তিলাওয়াত করলে বিরক্তিতে তারা তিলাওয়াতকারীর ওপর চেঁচামেচি শুরু করে, যা তিলাওয়াত করা হয়, তা তাদের অন্তরে কোনো উপকার পৌঁছায় না। ফলে তা প্রাণবন্ত হয় না, আনন্দিতও

---

[২১১] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭২।

[২১২] বাগাবি, তাফসীর, ৬/৯৮-৯৯।

[২১৩] 'কাশফুল খফা' গ্রন্থকার বলেন, 'ইমাম নববি ﵀ বলেছেন, 'এটি সহীহ নয়'।'

হয় না এবং কুরআনের বিভিন্ন সুসংবাদ ও কঠিন শাস্তির ভীতিপ্রদর্শনও তাদের মাঝে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। অপরদিকে যখন তারা শয়তানের সুর (গানবাজনা, মিউজিক) শ্রবণ করে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! তখন কীভাবে তাদের আওয়াজগুলো থেমে যায়, সমস্ত কাজকর্ম থেকে তারা অবসর হয়, তাদের অন্তর প্রশান্তি পায়, এতে তাদের প্রাণচাঞ্চল্য বেড়ে যায়, তাদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, তারা এতে কতটা নিমগ্ন, এর জন্য তারা পয়সা খরচ করতে সামান্যতম দ্বিধা অনুভব করে না, রাতের পর রাত জেগে থাকে, দীর্ঘ সময় ব্যয়েও তাদের কোনো বিরক্তি, ক্লান্তি কিংবা অবসাদ আসে না। তারা রাত আরও দীর্ঘ হওয়ার কামনা করে! আসলে এগুলো যদি নিফাক না হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই তা নিফাক সৃষ্টির ভিত্তি ও বুনিয়াদ।

যারা গানবাজনাকে বৈধ বলে তাদের দলীলসমূহ

সবচেয়ে আশ্চর্যের হলো : অনেকেই দলীল পেশ করে যে, এই প্রকারের শ্রবণ হলো সূফিয়ায়ে কেরামের রীতিনীতি এবং এটি বৈধ; কারণ তা সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী, এর দ্বারা অন্তর স্বাদ অনুভব করে এবং আরাম পায়। ছোটো বাচ্চাও সুন্দর সুর শুনে শান্ত হয়ে যায়। গীত গাওয়ার ফলে উটও তার হাঁটার ক্লান্তি এবং বোঝা বহন করার কষ্ট সহ্য করে নেয়, তার জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়।। আবার সুন্দর সুর ও কণ্ঠস্বর হলো আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামাত এবং সৃষ্টি-অবয়বের অতিরিক্ত একটি দান। আরেকটি কারণ হলো আল্লাহ তাআলা কর্কশ আওয়াজের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

"নিঃসন্দেহে সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।"[২১৪]

তাদের আরেকটি দলীল হলো : আল্লাহ তাআলা জান্নাতের নিয়ামাতের বর্ণনায় বলেছেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

[২১৪] সূরা লোকমান, ৩১ : ১৯।

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারা একটি বাগানে আনন্দে থাকবে।"[২১৫]

আর আনন্দে থাকার অর্থ হলো : উত্তম শ্রবণ অর্থাৎ সঙ্গীতময় আবহে থাকা। সুতরাং তা কীভাবে হারাম হতে পারে অথচ তা জান্নাতে রয়েছে?!

তাদের আরেকটি দলীল হলো : নবি ﷺ বলেছেন,

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَّا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَّتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

"নবির সুমিষ্ট স্বরে কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ যেভাবে শোনেন, অন্য কিছু সেভাবে শোনেন না।"[২১৬]

তাদের আরেকটি দলীল হলো : নবি ﷺ একবার আবূ মূসা আশআরি ﵁-এর সুন্দর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেন, তারপর তার সুমিষ্ট আওয়াজের প্রশংসা করে তাকে বলেন,

يَا أَبَا مُوْسَى لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِّنْ مَّزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ

"হে আবূ মূসা, দাউদ ﵇-এর সুমধুর কণ্ঠস্বর থেকে তোমাকেও কিছুটা দান করা হয়েছে।"[২১৭]

জবাবে আবূ মূসা ﵁ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি জানতে পারতাম যে, আপনি তা শুনেছেন, তা হলে আপনার জন্য আরও সুন্দর করে তিলাওয়াত করতাম!'[২১৮]

তাদের আরেকটি দলীল হলো : নবি ﷺ বলেছেন,

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

"তোমরা সুমিষ্ট আওয়াজ দ্বারা কুরআনকে সুসজ্জিত করো।"[২১৯]

---

[২১৫] সূরা রূম, ৩০ : ১৫।

[২১৬] বুখারি, ৫০২৩; মুসলিম, ৭৯২।

[২১৭] বুখারি, ৫০৪৮; মুসলিম, ৭৯৩।

[২১৮] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ৭১৯৭।

[২১৯] আবূ দাউদ, ১৪৬৮।

তাদের আরেকটি দলীল হলো : আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

> "যে ব্যক্তি সুন্দর ও মিষ্টি আওয়াজে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[২২০]

সহীহ মত হলো : اَلتَّغَنِّيْ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আওয়াজকে সুন্দর করা। ইমাম আহমাদ ؒ-ও এই ব্যাখ্যাই করেছেন, তিনি বলেছেন, 'ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী যতটুকু পারে সুন্দর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করবে।'[২২১]

তাদের আরেকটি দলীল হলো : নবি ﷺ ঈদের দিন আয়িশা ؓ-কে আরও দুজন বালিকার সাথে গান গাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং আবূ বকর ؓ-কে বলেছিলেন,

دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا

> "ওহে আবূ বকর, ওদের দুজনকে ছেড়ে দাও। কারণ প্রত্যেক জাতির জন্য উৎসবের ব্যবস্থা আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের উৎসবের দিন।"[২২২]

আরেকটি দলীল হলো : নবি ﷺ বিয়ের ক্ষেত্রে গান গাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং একে 'লাহওয়ান' لَهْوًا বলে নামকরণ করেছেন।[২২৩]

আরেকটি দলীল হলো : নবি ﷺ উটওয়ালাদের গান শুনেছেন এবং তার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরাম ؓ-এর ছন্দ পাঠ শুনতে থাকেন, যখন তারা খন্দকের যুদ্ধের জন্য পরিখা খনন করছিলেন আর ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে গাইছিলেন,

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا

---

[২২০] বুখারি, ৭৫২৭।

[২২১] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ১২/৫৪০।

[২২২] বুখারি, ৯৪৯; মুসলিম, ৮৯২।

[২২৩] দেখুন—বুখারি, ৫১৬২।

'আমরা সেসব লোক, যারা মুহাম্মাদ-এর কাছে করেছি পণ,
(আল্লাহর পথে) জিহাদ করেই কাটিয়ে দেবো সারাটি জীবন।'

নবি ﷺ-ও এর জবাবে বলছিলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ ... فَبَارِكْ فِي الأَنْصَارِ والمُهَاجِرَهْ

"হে আল্লাহ, পরকালের কল্যাণই তো হলো আসল কল্যাণ;
তুমি আনসার ও মুহাজিরদের কাজে বরকত দাও (অফুরান)।"[২২৪]

আরেকটি দলীল হলো : নবি ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন, তখন একজন তাঁর সামনে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ-এর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন।

আরেকটি দলীল হলো : তিনি কা'ব ইবনু যুহাইর ﷺ-এর কবিতা শুনেছিলেন এবং তাকে নিজের একটি চাদরও হাদিয়া দিয়েছিলেন।[২২৫]

আরেকটি দলীল হলো : তিনি উমাইয়্যা ইবনু আবিস সাল্‌ত-এর একশটি কবিতা পাঠ করতে বলেছিলেন।[২২৬]

আরেকটি দলীল হলো : নবি ﷺ একটি শ্লোকে কবি লাবীদকে সত্যায়ন করেছিলেন। তা হলো :

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ

'জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু রয়েছে সবই বাতিল।"[২২৭]

আরেকটি দলীল হলো : তিনি হাস্‌সান ইবনু সাবিত ﷺ-এর জন্য দুআ করেছিলেন যে, আল্লাহ যেন রূহুল কুদুস (জিবরীল ﷺ-)এর মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেন, যতদিন তিনি তাঁর পক্ষে লড়াই করতে থাকবেন। নবি ﷺ তার কবিতা অনেক পছন্দ করতেন। একবার তাকে বলেছিলেন,

---

[২২৪] দেখুন—বুখারি, ৪০৯৯, ৪১০০।

[২২৫] ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ৪/১৭৭; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ৪/১৪৬।

[২২৬] মুসলিম, ২২৫৫।

[২২৭] বুখারি, ৩৮৪১; মুসলিম, ২২৫৬।

أَجِبْ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

"তুমি আমার পক্ষ হতে উত্তর দাও। হে আল্লাহ, তাকে পবিত্র আত্মা (জিবরীল)-এর দ্বারা শক্তিশালী করো।"[২২৮]

আরেকটি দলীল হলো : ইবনু উমর, আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর ও মদীনাবাসীরা এর অনুমতি দিয়েছেন।

আরেকটি দলীল হলো : এসব মজলিসে আল্লাহর অনেক বড়ো বড়ো ওলিরা উপস্থিত হতেন এবং সেগুলো শ্রবণ করতেন। এখন যে ব্যক্তি তাকে হারাম বলবে, সে তো তা হলে সেই সমস্ত বড়ো বড়ো জ্ঞানী ও অনুসরণীয় ব্যক্তিদের ব্যাপারে দুর্নাম করবে।

আরেকটি দলীল হলো : এই ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, পাখির ছন্দবদ্ধ আওয়াজ শ্রবণ করা বৈধ। সুতরাং মানুষের আওয়াজ উপভোগ করা তার চেয়েও উত্তম পন্থায় বা তার সমপর্যায়ের বৈধ বিষয় বলে গণ্য হবে।

আরেকটি দলীল হলো : শ্রবণ শ্রোতার রূহ ও কল্‌বকে তার প্রিয় মানুষের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এখন যদি তার সেই সম্পর্ক হারাম হয়, তা হলে শ্রবণ হবে হারাম কাজে তার সাহায্যকারী। আর যদি বৈধ হয়, তা হলে এ ক্ষেত্রে শ্রবণও বৈধ হবে। আর যদি তার ভালোবাসা হয় রহমানের প্রতি তা হলে সে ক্ষেত্রে তা হবে নৈকট্য ও আনুগত্য। কারণ এই শ্রবণের দ্বারা সেই ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, আরও দৃঢ় হবে এবং তার প্রতি আরও বেশি উদ্‌বুদ্ধ করবে।

তাদের আরেকটি দলীল হলো : কোনো আওয়াজ শ্রবণের মাধ্যমে স্বাদ অনুভব করা—সুন্দর কোনো দৃশ্য দেখে বা কোনো সুগন্ধি শুঁকে অথবা মজাদার কোনো খাবার খেয়ে স্বাদ অনুভব করার মতোই। সুতরাং এটি যদি হারাম হয়, তা হলে তো সেগুলোও হারাম হবে!

---

[২২৮] বুখারি, ৪৫৩; মুসলিম, ২৪৮৫।

উল্লেখিত দলীলসমূহের জবাব

জবাব : আপনারা যা বলেছেন, সেগুলো হলো মূল বিষয়বস্তুর বাইরের এবং বিতর্কের স্থান থেকে অনেক দূরের আলোচনা, যার সাথে আলোচ্যবিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ কোনো বস্তু ইন্দ্রিয়গতভাবে মজাদার ও স্বাদযুক্ত হওয়া এটা প্রমাণ করে না যে, তা বৈধ বা হারাম, আবার অপছন্দনীয় বা পছন্দনীয় হওয়াও বুঝায় না। কেননা এই স্বাদ ও সুন্দর উপলব্ধি শারীআর পাঁচটি হুকুম : হারাম, ওয়াজিব, মাকরূহ, মুস্তাহাব ও মুবাহ—সবগুলোর মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং সেই ব্যক্তি কীভাবে এগুলোর দ্বারা এর বৈধতার ওপর দলীল দিতে পারে, যে ব্যক্তি দলীলের শর্তসমূহ ও দলীল প্রয়োগ করার স্থানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে?!

এটি তো সেই ব্যক্তির অবস্থার মতো হয়ে যায়, যে ব্যক্তি যিনা-ব্যভিচার বৈধ হওয়ার ওপর দলীল পেশ করে যে, এর সম্পাদনকারী স্বাদ অনুভব করে। আসলে কোনো হারাম কাজই কি লায্যাত বা স্বাদ শূন্য হয়? বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কি এমন মজা ও স্বাদ থেকে খালি হয়, যার শ্রবণে কান প্রশান্তি পায় না? বাদ্যযন্ত্রকে নবি ﷺ হারাম বলেছেন এবং সহীহ সনদে[২২৯] প্রমাণিত আছে যে, তাঁর উম্মাতের মধ্যে একটা দল তা হালাল মনে করবে। আলিমগণ কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার ওপর একমত হয়েছেন; তবে অধিকাংশ আলিমের মত হলো সমস্ত বাদ্যযন্ত্রই হারাম। এমনিভাবে সুন্দর আওয়াজ শ্রবণের কারণে বাচ্চা শিশু বা উটের স্থির হয়ে যাওয়া কি তা হালাল বা হারাম হওয়ার দলীল হতে পারে?

গানবাজনা বৈধ করার জন্য এর চেয়েও আশ্চর্যজনক দলীল হলো—আল্লাহ তাআলা সুন্দর সুর সৃষ্টি করেছেন এবং তা ব্যক্তির জন্য অতিরিক্ত একটি নিয়ামাত। (তাই গানবাজনা বৈধ।)

সুতরাং তাকে বলা হবে : সুন্দর-সুদৃশ্য চেহারা কি অতিরিক্ত নিয়ামাত নয়? তা কী আল্লাহর সৃষ্টি ও দান নয়? এই কারণে কি কোনো শর্ত বা কানূন ছাড়াই এর দ্বারা উপভোগ করা ও স্বাদ নেওয়া বৈধ হয়ে যাবে?

আর আল্লাহ তাআলা গাধার আওয়াজকে নিকৃষ্ট বলেছেন বলে কি মিউজিকের সাথে আনন্দদায়ক ও সুরেলা সুরও বৈধ হতে পারে?

---

[২২৯] বুখারি, ৫৫৯০; আবূ দাউদ, ৪০৩৯।

এর চেয়েও আশ্চর্যজনক হলো : গান শোনা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে জান্নাতিদের শ্রবণ দ্বারা দলীল দেওয়া। তা হলে তো এর চেয়েও উপযুক্ত হলো মদ হালাল হওয়ার ব্যাপারে দলীল দেওয়া। কারণ জান্নাতে তো মদও থাকবে। এখন যদি বলেন, মদ হারাম হওয়ার ওপর ভিন্ন দলীল আছে; কিন্তু শ্রবণ হারাম হওয়ার ওপর কোনো দলীল নেই।

তা হলে বলা হবে : এটি তো এক ইস্‌তিদলাল বা দলীল উপস্থাপন। আর জান্নাতিদের জন্য বৈধ তাই দুনিয়াবাসীদের জন্যও বৈধ—এটি ভিন্ন আরেকটি ইস্‌তিদলাল। সুতরাং আপনি জান্নাতবাসীদের জন্য বৈধ বলে যে দলীল পেশ করেছেন, তা বাতিল দলীল, এতে সত্য অনুসন্ধানী কোনো ব্যক্তিই সন্তুষ্ট হবে না।

আর আপনি যে বললেন, 'শ্রবণ হারাম হওয়ার ওপর কোনো দলীল নেই' এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কী? কোন ধরনের শ্রবণ ও কোন ধরনের বিষয় উদ্দেশ্য নিয়েছেন? কারণ এগুলোর মধ্যে হারাম, মাকরূহ, মুবাহ, ওয়াজিব ও মুস্‌তাহাব বিভিন্ন শ্রেণি রয়েছে। সুতরাং আপনি একটি প্রকারকে নির্দিষ্ট করুন; যাতে বৈধ-অবৈধ প্রমাণ করা যায়। যদি আপনি বলেন, কবিতা (কাসীদা) শ্রবণ। আপনাকে বলা হবে, কোন ধরনের কবিতা আপনার উদ্দেশ্য? যার দ্বারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, দ্বীন ও কিতাবের প্রশংসা করা হয় আর তাঁর শত্রুদের জবাব দেওয়া হয়?

এ রকম বিষয় তো মুসলিমরা সবসময় বর্ণনা করেন, শ্রবণ করেন এবং পরস্পর তা নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। এটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ শ্রবণ করেছিলেন এবং এর ওপরই তিনি পুরস্কার দিয়েছিলেন, হাসসান رضي الله عنه-কে এর ওপরই উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। এই বিষয়টিতেই শয়তানি শ্রবণের অধিকারীরা ধোঁকা খেয়েছে। ফলে তারা বলতে শুরু করেছে : সেগুলো কবিতা ছিল আর আমরাও কবিতাই শুনি। হ্যাঁ তা হলে তো সুন্নাতও কথা, বিদআতও কথা, তাসবীহও কথা, গীবতও কথা, দুআও কথা আবার অপবাদ দেওয়াও কথা (এসব কি এক ও বৈধ?)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم কি আপনাদের মতো এ রকম শয়তানি শ্রবণে কখনো জড়িত হয়েছেন, যার অধিকাংশই ফাসাদ ও বিভ্রান্তিমূলক বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ?

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো : রাসূলুল্লাহ ﷺ সুমিষ্ট সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তা শ্রবণ করাকে পছন্দ করেছেন, অনুমতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা তা ভালোবাসেন—এই বিষয়টি তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। ফলে তারা এই পছন্দ করা ও প্রশংসা করার বিষয়টিকে নারী, দাড়িহীন বালক ও অন্যান্যদের আওয়াজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা শুরু করে দিয়েছে; যেগুলো বাদ্যযন্ত্রের সাথে মিশ্রিত, যাতে উল্লেখ করা হয় দেহের আকার-আকৃতি, স্তন, কোমর, চোখের বর্ণনা ও তার কারুকার্য, কালো চুল, যৌবনের সৌন্দর্য, গালের উপস্থাপনা, মিলন ও এতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, প্রেম-ভালোবাসা ও বিচ্ছেদ হওয়ার কথা এবং এ রকম আরও বিভিন্ন দিকের কথা; যা অন্তরের জন্য মদপান করার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর।

এর চেয়েও আশ্চর্যজনক হলো : যে শ্রবণ উপরিউক্ত বিষয়গুলোর সাথে মিশ্রিত, তার বৈধতার জন্য দলীল পেশ করা হয় ঈদ ও খুশি-আনন্দের দিনে ছোটো একজন মেয়ের নিকট দুজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকার গীত গাওয়ার দ্বারা; তাও আবার তারা আরবদের সাহসিকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্তম চরিত্র ও লাজুকতা সমৃদ্ধ কতিপয় শ্লোক আবৃত্তি করছিল। সেগুলো কোথায় আর (আপনারা যেগুলোর কথা উল্লেখ করেন) সেগুলো কোথায়?!

আশ্চর্যের হলো উপরিউক্ত এই হাদীসটিই তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো দলীল। কারণ আবূ বকর رضي الله عنه এটিকে বলেছিলেন, مَزْمُوْرًا مِنْ مَّزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ 'শয়তানের বাঁশিসমূহের মধ্যে একটি বাঁশি' আর রাসূল ﷺ এটিকে সমর্থন করেছেন, তবে শারীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় এমন দুজন নাবালেগা মেয়ের জন্য অনুমতি দিয়েছেন, যা গাওয়া ও শোনার মধ্যে কোনো ফাসাদ ও অনিষ্ট নেই। এটি কি কোনোভাবে তারা যে গানবাজনার কথা বলে—যাতে কত কী অন্তর্ভুক্ত থাকে—তার বৈধতার ওপর প্রমাণ বহন করে?! সুবহানাল্লাহ! কীভাবে বোধবুদ্ধি ও চিন্তাভাবনা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে?

এই সবগুলোর চেয়ে আশ্চর্যের হলো : আল্লাহর রাসূল ﷺ যে কবিতা শ্রবণ করেছেন, যাতে হক ও তাওহীদ অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার মাধ্যমে এগুলোর বৈধতার প্রমাণ দেওয়া! কেউ কি ব্যাপকভাবে কবিতা পাঠ, তা শ্রবণ করা এবং তা নিয়ে আলোচনা করাকে হারাম বলেছে? মাকড়সার ঘরের ন্যায় কত দুর্বল বিষয়কে তারা আঁকড়ে ধরে রয়েছে!

এর চেয়েও আশ্চর্যের হলো : পাখির সুন্দর ও মনোহারী আওয়াজ বৈধ হওয়ার কারণে গানবাজনাকেও হালাল বলে দলীল দেওয়া। এটি ঠিক তাদের ন্যায়, যারা সুদকে হালাল বলে আর দলীল দেয়—

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

"ব্যবসা তো সুদেরই মতো।"[২৩০]

কোথায় ডালে ডালে পাখির সুর আর কোথায় নারীসদৃশ দাড়িগোঁফহীন বালকের সুর? যা প্রত্যেক প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরকে মিলিত হতে উদ্‌বুদ্ধ করে! কোথায় এর ফিতনা আর কোথায় ঘুঘু-কবুতর আর বুলবুলির মতো পাখির আওয়াজের দরুন ফিতনা?!

*****

---

[২৩০] সূরা বাকারা, ২ : ২৭৫।

৮ নং মানযিল

আল্লাহভীতি (اَلْخَوْفُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আল্লাহভীতি।

এটি হলো সবচেয়ে সম্মানিত মানযিল এবং অন্তরের জন্য সবচেয়ে উপকারী। এটি প্রত্যেকের ওপর ফরজ। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকো।"[২৩১]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেছেন,

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

"সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় করো।"[২৩২]

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে ভয়কারীদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের গুণগান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾ أُولٰئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ ﴿٦١﴾

"নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার

---

[২৩১] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭৫।

[২৩২] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৪।

কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং তারা যা কিছুই দান করে, তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তারাই কল্যাণের কাজ দ্রুত শেষ করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।"[২৩৩]

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ "তারা যা কিছুই দান করে তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে দান করে থাকে"[২৩৪] এ ব্যাপারে আয়িশা ﵂ বললেন, 'এরা কি মদখোর ও চোর?' তিনি বললেন,

لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ أَنْ لَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ

"হে সিদ্দীকের মেয়ে, না এরা তা নয়; বরং তারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, দান-সদাকা করে এবং এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদের পক্ষ হতে এগুলো কবুল করা হবে কি না, তারাই কল্যাণের কাজে বেশ তৎপর থাকে এবং তাতে তারা অগ্রগামী হয়।"[২৩৫]

হাসান বাসরি ﵀ বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! তারা নেক আমল করে এবং তাতে কঠোর পরিশ্রম করে আবার এই ভয়ও করে যে, সেগুলো তাদের (মুখের) ওপর নিক্ষেপ করা হবে। আসলে মুমিন বান্দারা ভালো কাজ করে আবার ভয়ে ভয়ে থাকে। অপরদিকে মুনাফিকরা খারাপ কাজ করেও নির্ভাবনায় থাকে।'[২৩৬]

(اَلرَّهْبَةُ) (اَلْخَشْيَةُ) (اَلْخَوْفُ) (اَلْوَجَلُ) এই শব্দগুলো প্রায় কাছাকাছি অর্থ প্রদান করে, তবে সমার্থক নয়; (কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।)

(اَلْخَوْفُ বা আল্লাহভীতি) :

আবুল কাসিম জুনাইদ ﵀ বলেছেন, 'খাওফ বা আল্লাহভীতি হলো শাস্তির আশঙ্কা

---

[২৩৩] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৫৭-৬১।

[২৩৪] সূরা মুমিনূন ২৩ : ৬০।

[২৩৫] তিরমিযি, ৩১৭৫; ইবনু মাজাহ, ৪১৯৮।

[২৩৬] বাগাবি, তাফসীর, ৩/৩৬৮।

শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে ঢুকে যাওয়া।'[২৩৭]

কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহভীতি হলো ভয়ের বিষয় (শাস্তির কথা) স্মরণ করে অন্তর অস্থির ও পেরেশান হওয়া।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহভীতি হলো হুকুম-আহকামের প্রয়োগ সম্পর্কে মজবুত ইলম। তবে এটি আল্লাহভীতির কারণ, হুবহু এটিই আল্লাহভীতি নয়।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'খাওফ হলো মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কিছুতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা টের পাওয়ার সাথে সাথেই অন্তর সেখান থেকে পলায়ন করা।'

আর اَلْخَشْيَةُ হলো খাওফ থেকেও খাছ বা বিশিষ্ট। কারণ খাশইয়াত হলো আল্লাহ সম্পর্কে যারা গভীর জ্ঞান রাখে, তাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।"[২৩৮]

এটি এমন ভয়, যার সাথে মা'রিফাত বা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান সংযুক্ত থাকে।

নবি ﷺ বলেছেন,

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ

"আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তাঁর নাফরমানি করা থেকে তোমাদের চেয়ে বেশি বেঁচে থাকি।"[২৩৯]

সুতরাং **খাওফ হলো** নড়াচড়া করা, ভয়ে অস্থির হওয়া আর **খাশইয়াত হলো** স্থিরতা, গুটিয়ে থাকা ও ভয়ে জমে থাকা। যে ব্যক্তি শত্রু বাহিনীর আগমন দেখে বা এ রকম কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তখন তার দু রকম অবস্থা হয় :

এক. তাদের থেকে ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তার তৎপরতা। এটি হলো খাওফের অবস্থা।

---

[২৩৭] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১/২৫৪।

[২৩৮] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮।

[২৩৯] বুখারি, ৫০৬৩।

দুই. এমন স্থানে অবস্থান নেওয়া ও স্থির হয়ে থাকা, যেখানে তার নিকট শত্রুপক্ষ পৌঁছাতে পারে না। এটি হলো খাশইয়াত।

اَلرَّهْبَةُ হলো অপছন্দনীয় বস্তু থেকে ভয়ে পালানোর সময় গভীর মনোযোগী হওয়া। এটি হলো اَلرَّغْبَةُ-এর বিপরীত; রগবত-এর অর্থ হলো : আগ্রহের বস্তুর সন্ধানে অন্তর ধাবিত হওয়া।

اَلْوَجَلُ হলো যার ক্ষমতা ও শাস্তির ভয় করা হয়, তার আলোচনায় বা তাকে দেখে ভয়ে অন্তর প্রকম্পিত ও বিদীর্ণ হওয়া।

اَلْهَيْبَةُ হলো সম্মান ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা'রিফাত ও মহাব্বতের পাশাপাশি এই ভয়ের সৃষ্টি হয়। আর اَلْإِجْلَالُ হলো ভালোবাসা মিশ্রিত শ্রদ্ধা।

সুতরাং খাওফ হলো সাধারণ মুমিনদের জন্য, খাশইয়াত হলো উলামায়ে কেরামের জন্য, হাইবাত হলো মহাব্বতকারীদের জন্য, আর ইজলাল হলো নৈকট্যশীলদের জন্য। ইলম ও মা'রিফাতের পরিমাণ অনুসারে খাওফ ও খাশইয়াত সৃষ্টি হয়। যেমন নবি ﷺ বলেছেন,

فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً

"আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি জানি এবং আমি তাদের চেয়ে তাঁকে অনেক বেশি ভয় করি।"[২৪০]

ওপরের হাদীসের বর্ণনায় আরেকটি রিওয়ায়াতে خَوْفًا শব্দটি এসেছে। (শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক।)

আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ

"আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তা হলে তোমরা খুব কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে এবং স্ত্রীদের সাথে বিছানায় সুখভোগ না

[২৪০] বুখারি, ৬১০১।

করে ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে আর আল্লাহ তাআলার নিকট কাকুতি-মিনতি করতে থাকতে।”[২৪১]

সুতরাং খাওফের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি (আল্লাহর ভয়ে খারাপ কাজ থেকে) বিরত থাকে ও পালিয়ে বেড়ায়।

আর খাশইয়াতের অধিকারী ব্যক্তি ইলমকে আঁকড়ে ধরার দিকে ধাবিত হয়।

এই দুই ব্যক্তির উদাহরণ হলো সেই দুই ব্যক্তির মতো, যাদের একজন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানে না আর অপরজন সে সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ। ফলে প্রথম ব্যক্তি আশ্রয় নেয় রোগ প্রতিরোধ করার দিকে এবং যাতে রোগাক্রান্ত না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দিকে। আর অভিজ্ঞ ব্যক্তি আশ্রয় নেয় ওষুধ ও দাওয়া গ্রহণের দিকে।

আবূ হাফ্স ﵀ বলেছেন, ‘খাওফ বা ভয় হলো আল্লাহর চাবুক, এর দ্বারা তাঁর দুয়ার থেকে পলায়নকারীদের তিনি সঠিক পথে রাখেন।’[২৪২]

তিনি আরও বলেছেন, ‘খাওফ বা আল্লাহভীতি হলো অন্তরের প্রদীপ, এর দ্বারা অন্তরের ভালো-মন্দ সবকিছু দেখা যায়। তুমি যাদেরকে ভয় করো তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে পালিয়ে বেড়াও, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল আল্লাহ তাআলা। কারণ আল্লাহকে ভয় করার পরেও তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।’

আসলে আল্লাহকে ভয়কারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট থেকে পালিয়ে আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।

আবূ সুলাইমান ﵀ বলেছেন, ‘কোনো অন্তর আল্লাহর ভয় থেকে শূন্য হলে, তা ধ্বংস হয়ে যায়।’[২৪৩]

ইবরাহীম ইবনু সুফ্ইয়ান ﵀ বলেছেন, ‘অন্তরে যখন খাওফ বা আল্লাহর ভয় স্থান

---

[২৪১] তিরমিযি, ২৩১২; ইবনু মাজাহ, ৪১৯০।

[২৪২] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/২৫২।

[২৪৩] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/২৫৪।

পায়, তখন সেই ভয় তার নফস ও কুপ্রবৃত্তির চাহিদাগুলোকে জ্বালিয়ে দেয় এবং তার নিকট থেকে দুনিয়াকে দূরে রাখে।'[২৪৪]

যুন-নূন মিসরি ﷺ বলেছেন, 'মানুষ ততক্ষণ সোজা পথে চলতে থাকে, যতক্ষণ তাদের সাথে আল্লাহভীতি অবস্থান করে। আর যখন আল্লাহভীতি উধাও হয়ে যায়, তখন তারা পথ হারিয়ে ফেলে।'[২৪৫]

হাতিম আল-আসাম্ম ﷺ বলেছেন, 'কোনো উত্তম স্থান পেয়ে ধোঁকাগ্রস্ত হোয়ো না। কারণ জান্নাতের চেয়ে উত্তম কোনো স্থান নেই, অথচ আদম ﷺ সেখানে যার মুখোমুখি হবার তার মুখোমুখিই হয়েছেন! অধিক ইবাদাত দ্বারাও ধোঁকাগ্রস্ত হোয়ো না। কারণ ইবলীস দীর্ঘদিন যাবৎ ইবাদাত করার পরও যার সম্মুখীন হবার তার সম্মুখীনই হয়েছেন! অধিক ইলমের কারণেও ধোঁকাগ্রস্ত হোয়ো না। কারণ বালআম ইবনু বাউরা যা পাবার তা-ই পেয়েছে, অথচ সে ইসমে আ'যম জানত! আবার নেককার ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ লাভের কারণেও প্রতারিত হোয়ো না। কারণ নবি ﷺ-এর চেয়ে অধিক নেককার ও উত্তম মানুষ এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই, অথচ তাঁর শত্রু ও মুনাফিকরা তাঁর সাক্ষাৎ ও দর্শন লাভ করার দ্বারা কোনো উপকৃত হতে পারেনি।'[২৪৬]

খাওফ বা আল্লাহভীতি বান্দার জন্য সত্তাগতভাবে উদ্দেশ্য নয়, বরং (দুনিয়াতে) বিভিন্ন ইবাদাত ও আমলই উদ্দেশ্য। এ কারণেই যখন ভয়ের বস্তু (আখিরাতে) থাকবে না, তখন ভয়ও থাকবে না। কেননা জান্নাতের অধিবাসীদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কখনো চিন্তিতও হবে না।

খাওফের সম্পর্ক হলো কাজকর্মের সাথে আর মহাব্বতের সম্পর্ক হলো সত্তা ও গুণাবলির সাথে। এ কারণেই জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহর প্রতি ঈমানদারদের মহাব্বত বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। সেখানে তাদের কোনো ভয় থাকবে না। আর এই কারণে মহাব্বতের মানযিল খাওফের মানযিলের চেয়েও উঁচু ও মর্যাদাপূর্ণ।

---

[২৪৪] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৫/২৩৮।

[২৪৫] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/২৫৪।

[২৪৬] আবূ হামিদ গাযালি, ইহইয়াউ উলূমিদ দ্বীন, ৪/১৮৫।

ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রশংসিত আল্লাহভীতি (اَلْخَوْفُ) হলো : যা ব্যক্তির মাঝে ও আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বস্তুসমূহের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে দেয়, (তাকে পাপকাজ থেকে বিরত রাখে)। আর (ভয়ের এই ভারসাম্যপূর্ণ) সীমা যদি কেউ অতিক্রম করে, তা হলে সেই ব্যক্তির মাঝে হতাশা ও নিরাশা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অনুভূতি ও ইলম অর্জনের পরেই খাওফের সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে বিষয়ে ইলম ও অনুভূতি নেই, সে বিষয়ে মানুষের ভয় সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।

খাওফ বা ভয় সৃষ্টি হওয়ার জন্য দুটি বিষয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, **এক.** অপছন্দনীয় ও হারাম বস্তু সম্পর্কে জানা এবং **দুই.** সেই বস্তু পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পথ ও কারণ সম্পর্কে জানা। হারাম বস্তু এবং সে পর্যন্ত পৌঁছার কারণ সম্পর্কে ব্যক্তির অনুভূতি ও ইলম অনুসারে তার মাঝে ভয় সৃষ্টি হবে। এই দুটির মধ্যে যেকোনো একটি সম্পর্কে উপলব্ধি ও জ্ঞানের কমতি হলে, সে অনুপাতে খাওফ বা আল্লাহভীতিতেও কমতি আসবে।

যে ব্যক্তির এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে না যে, অমুক কারণ ও উপকরণ অমুক গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তা হলে সেই ব্যক্তি ওই কারণ ও উপকরণকে ভয় করবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো কারণ সম্পর্কে জানে যে, তা গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, কিন্তু এটা জানে না যে, তা কোন গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, তার ভয়াবহতা কেমন, তাহলেও সে একে ভয় করার মতো ভয় করবে না। আর যদি সে কারণ এবং গুনাহ উভয়টি সম্পর্কেই জ্ঞান রাখে, তা হলে তার প্রকৃত খাওফ বা ভয় হাসিল হবে।

আল্লাহর দিকে সফর করার ক্ষেত্রে অন্তর একটি পাখির মতো। মহাব্বত হলো তার মাথা, ভয় ও আশা হলো তার দুটি ডানা। সুতরাং যখন মাথা ও দুই ডানা সুস্থ থাকবে, তখন পাখি ভালোভাবে উড়তে পারবে। আর যখন মাথা কেটে ফেলা হবে, তখন পাখি মারা যাবে। আর যখন দুই ডানা নষ্ট হয়ে যাবে, তখন সে শিকারী ও হিংস্র জন্তুর শিকারে পরিণত হবে।

সালাফগণ এটা পছন্দ করেছেন যে, সুস্থ থাকাবস্থায় আশার ডানার চেয়ে ভয়ের ডানা শক্তিশালী রাখবে। আর দুনিয়া থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় (অর্থাৎ মৃত্যুর সময়) ভয়ের ডানার চেয়ে আশার ডানা শক্তিশালী রাখবে। এটি হলো আবূ সুফ্ইয়ান ﷺ ও অন্যান্যদের তরীকা। তিনি বলেছেন, 'অন্তরের জন্য উচিত হলো

(সুস্থ থাকাবস্থায়) তার ওপর ভয়েরই প্রাধান্য থাকবে আর যদি তার ওপর (সে সময়) আশা প্রাধান্য পায়, তা হলে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়।'[২৪৭]

অন্যান্যরা বলেছেন, 'অন্তরের পরিপূর্ণ অবস্থা হলো : আশা ও ভয় সমান সমান থাকা এবং মহাব্বতের প্রাধান্য থাকা। আসলে মহাব্বত হলো বাহন, আশা তাকে সামনে থেকে টানে এবং ভয় তাকে পেছন থেকে হাঁকিয়ে নিতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও করুণায় বান্দা মানযিল পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

*****

[২৪৭] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/২৫৫।

৯ নং মানযিল

ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া (اَلْإِشْفَاقُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

"তারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কিয়ামাতের ভয়ে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত।"[২৪৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالُوْا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

"তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, 'আমরা ইতঃপূর্বে আমাদের বাড়িতে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।"[২৪৯]

اَلْإِشْفَاقُ হলো সূক্ষ্ম ও কোমল ভয়। এটি হলো যাকে ভয় করা হয়, তার প্রতি দয়া মিশ্রিত কোমল ভয়। ইশফাকের সাথে খাওফের সম্পর্ক তেমন, রহমতের সাথে রা'ফাত (اَلرَّأْفَةُ)-এর সম্পর্ক যেমন। কারণ রা'ফাত হলো সূক্ষ্ম ও কোমল রহমত।

---

[২৪৮] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৪৯।

[২৪৯] সূরা তূর, ৫২ : ২৫-২৭।

ইশফাক বা সূক্ষ্ম ভয় তখনই প্রকাশিত হয়, যখন কোনো আমল নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে যে, তা সেই সমস্ত অর্থহীন আমলের মধ্যে গণ্য হবে কি না, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾

"আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো করে দেবো।"[২৫০]

এগুলো হলো সেই আমল, যা আল্লাহর জন্য করা হয়নি অথবা তাঁর হুকুমমতো বা তাঁর রাসূলের সুন্নাহ মোতাবিক করা হয়নি।

সে এই ভয়ও করে যে, ভবিষ্যতে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে; হয়তো এই আমল পরিত্যাগ করার কারণে অথবা এমন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে, যা সেই আমলকে নষ্ট করে দেবে। ফলে তা একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবে। আমল-নষ্ট-হয়ে-যাওয়া-ব্যক্তির অবস্থা হবে সেই ব্যক্তিদের মতো, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

"তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে, তার একটি সবুজ শ্যামল বাগান থাকবে, সেখানে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে, সব রকম ফলে তা পরিপূর্ণ থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছবে, তার দুর্বল সন্তানসন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন রয়েছে, ফলে বাগানটি জ্বলেপুড়ে যাবে?"[২৫১]

উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه একদিন সাহাবিদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই আয়াতটি কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী?

---

[২৫০] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৩।

[২৫১] সূরা বাকারা, ২ : ২৬৬।

তখন তারা বললেন, 'আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।'

এতে উমর ﷺ রেগে গিয়ে বললেন, 'বলো, 'আমরা জানি' অথবা 'আমরা জানি না।'

ইবনু আব্বাস ﷺ বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন, এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছুটা ধারণা আছে।'

উমর ﷺ বললেন, 'ভাতিজা, বলে দাও, নিজেকে তুচ্ছ ভেবো না।'

তখন ইবনু আব্বাস ﷺ বললেন, 'এটা কর্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

উমর ﷺ বললেন, 'কোন কর্মের?'

ইবনু আব্বাস ﷺ বললেন, 'একটি কর্মের।'

উমর ﷺ বললেন, 'এটি হচ্ছে সেই ধনী ব্যক্তির উদাহরণ, যে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করতে থাকে, এরপর আল্লাহ তাআলা তার প্রতি শয়তানকে প্রেরণ করেন। ফলে সে গুনাহে লিপ্ত হয়; অবশেষে তার সকল সৎকর্মকে বরবাদ করে দেয়।'[২৫২]

*****

[২৫২] বুখারি, ৪৫৩৮।

১০ নং মানযিল

একাগ্রতা (اَلْخُشُوْعُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—একাগ্রতার মানযিল।

একাগ্রতা বা খুশুর পরিচয়

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

"ঈমানদারদের জন্য কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার সামনে তাদের অন্তর বিগলিত হবে?"[২৫৩]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন, 'আমাদের ইসলাম গ্রহণ করা এবং এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তিরস্কার করার মাঝে ব্যবধান ছিল চার বছর।'[২৫৪]

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরকে অবকাশ দিয়েছিলেন, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার তেরো বছরের মাথায় তাদেরকে তিরস্কৃত করেছেন।'[২৫৫]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝٢

---

[২৫৩] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১৬।

[২৫৪] মুসলিম, ৩০২৭।

[২৫৫] কুরতুবি, তাফসীর, ১৭/২৪৯।

"মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে একাগ্রচিত্ত থাকে।"[২৫৬]

اَلْخُشُوْعُ-এর মূল শাব্দিক অর্থ হলো : নিচু হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা ও স্থির হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

"দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যাবে। তখন মৃদুগুঞ্জন ব্যতীত তুমি আর কিছুই শুনবে না।"[২৫৭]

অর্থাৎ সকল আওয়াজ স্থির, স্তব্ধ ও নিচু হয়ে যাবে। এই অর্থ থেকেই জমিনের বিশেষণরূপে 'খুশু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তখন এর অর্থ হয় : জমিন শুকিয়ে যাওয়া, নিচু হওয়া, উদ্ভিদ ও তৃণ দ্বারা উঁচু না হওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

"আর এটিও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি যে, তোমরা দেখতে পাও ভূমি শুষ্ক-শস্যহীন পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা শস্য-শ্যামল হয় এবং বেড়ে ওঠে।"[২৫৮]

اَلْخُشُوْعُ হলো : অন্তর আল্লাহ তাআলার সামনে একাগ্র ও বিনয়ী হয়ে অবস্থান করবে এবং তাঁর ওপরেই জমে থাকবে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'খুশু হলো হককে মেনে নেওয়া। এটি হলো খুশুর অপরিহার্য অনুষঙ্গ। সুতরাং এর একটি আলামত হচ্ছে : বান্দার সাথে যখন কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়, অতঃপর তার সামনে যখন সত্য পেশ করা হয়, তখন সে তা মেনে নেয়।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'খুশু হলো : প্রবৃত্তির চাহিদার আগুনকে নিভিয়ে দেওয়া,

---

[২৫৬] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১-২।

[২৫৭] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১০৮।

[২৫৮] সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১ : ৩৯।

বুকের ধোঁয়াশাকে দূর করা এবং অন্তরে (আল্লাহর) সম্মান ও শ্রদ্ধার নূর প্রজ্বলিত করা।'

জুনাইদ বাগদাদি ﷺ বলেছেন, 'খুশু হলো : আল্লামুল গুয়ূব (অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী) আল্লাহর সামনে অন্তরকে বিনয়ী করা।'[২৫৯]

আল্লাহর মা'রিফাতের অধিকারী সকল ব্যক্তিরা একমত হয়েছেন যে, খুশু বা একাগ্রতার স্থান হলো অন্তর আর এর ফলাফল প্রকাশ পায় বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

নবি ﷺ বলেছেন, اَلتَّقْوٰى هَاهُنَا "তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় এখানে রয়েছে।" একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন এবং নিজের বুকের দিকে ইশারা করেছেন।[২৬০]

কোনো একজন আরিফ বা আল্লাহ-সম্পর্কে-গভীর-প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তি বলেছেন, 'বাইরের উত্তম আচরণ, ভেতর পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হওয়ার শিরোনাম।'

তাদের কেউ কোনো একব্যক্তিকে দেখতে পান, সে তার দুই কাঁধ ও শরীর নিচু করে চলাফেরা করছে। তখন তিনি তাকে ডেকে বলেন, ' হে অমুক, একাগ্রতা ও বিনম্রতা এখানে থাকে।' এই কথা বলার সময় তিনি তার বুকের দিকে ইশারা করেন। (তারপর বলেন,) 'ওখানে নয়'। এটি বলার সময় তিনি তার দুই কাঁধের দিকে ইশারা করেন।

আবুদ দারদা ﷺ বলতেন, 'আমি আল্লাহর কাছে নিফাক মিশ্রিত একাগ্রতা থেকে আশ্রয় চাই।' তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'নিফাক মিশ্রিত একাগ্রতা কী?' তিনি জবাব দিলেন, 'তুমি দেখবে বাহ্যিকভাবে শরীর একাগ্র ও বিনম্র; কিন্তু অন্তর থাকবে আল্লাহ থেকে অনেক দূরে।'[২৬১]

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সালাতে তার গর্দানকে নিচু করে রেখেছে। তখন তিনি তাকে বললেন, 'হে গর্দানওয়ালা, গর্দান উঁচু করো। একাগ্রতা গর্দানের মধ্যে নেই, একাগ্রতা রয়েছে অন্তরে।'[২৬২]

---

[২৫৯] তাজুদ্দীন ইবনুস সুবকি, তবাকাতুশ-শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ২/২৬৪।

[২৬০] বুখারি, ৫১৪৩; মুসলিম, ২৫৬৩।

[২৬১] আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আয-যুহ্দ, ৭৬২; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৬৫৬৭।

[২৬২] শামসুদ্দীন যাহাবি, আল-কাবায়ির, ১৪৪।

আয়িশা ﷺ দেখেন কয়েকজন যুবক খুব আস্তে আস্তে অসুস্থদের মতো হাঁটছে। তখন তিনি তার সাথিসঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করেন, 'এরা কারা?' তারা উত্তর দেন, 'ইবাদাতগুজার একটি দল।' প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ যখন হাঁটতেন, খুব দ্রুত হাঁটতেন; যখন কথা বলতেন, সবাইকে শুনিয়ে বলতেন; যখন আঘাত করতেন, ব্যথা পাইয়ে দিতেন আর যখন খাবার খাওয়াতেন, পরিতৃপ্ত করতেন। আসলে তিনি ছিলেন প্রকৃত ইবাদাতগুজার।'

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ বলেছেন, 'এটা অপছন্দনীয় যে, কেউ তার অন্তরে যতটুকু খুশুখুজু রয়েছে, বাইরে তার চেয়েও বেশি প্রকাশ করে।'[২৬৩]

হুযাইফা ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের দ্বীন থেকে সর্বপ্রথম তোমরা যা হারিয়েছ, তা হলো একাগ্রতা। আর সর্বশেষ যা হারাবে, তা হলো সালাত। অনেক সালাত আদায়কারী রয়েছে, যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। অবস্থা এ রকম দাঁড়িয়েছে যে, তুমি জামাআতওয়ালা একটি মাসজিদে প্রবেশ করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকেও একাগ্র ও খুশুখুজুর অধিকারী পাবে না।'[২৬৪]

সাহ্ল ﷺ বলেছেন, 'যার অন্তরে একাগ্রতা থাকবে, শয়তান তার কাছে যেতে পারবে না।'[২৬৫]

সালাতে একাগ্রতা

যদি প্রশ্ন করা হয় : সেই ব্যক্তির সালাতের ব্যাপারে আপনারা কী বলেন, সালাতে যার কোনো একাগ্রতা থাকে না, তা কি গ্রহণ করা হবে নাকি হবে না?

উত্তরে বলা হবে : সাওয়াবের ক্ষেত্রে কেবল ততটুকুই গণ্য হবে, যতটুকু সে উপলব্ধি করবে এবং যে পরিমাণ তার রবের প্রতি একাগ্র থাকবে।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'সালাতে তোমার অংশ কেবল ততটুকুই, যতটুকু তুমি অনুধাবন করো।'[২৬৬]

---

[২৬৩] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ৩/২৭৭।

[২৬৪] আহমাদ, আয-যুহ্দ, ১০০৩।

[২৬৫] সা'লাবি, তাফসীর, ৪/৯৯।

[২৬৬] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ১৫/২৩৬।

আম্মার ইবনু ইয়াসীর ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

"মানুষ (সালাত আদায় করে) ফিরে যায়, অথচ তাদের (কারও কারও) জন্য লেখা হয়—সাওয়াবের দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের একভাগ, (আর কারও জন্য) অর্ধেক।"[২৬৭]

আল্লাহ্ তাআলা সালাতে একাগ্র থাকার সাথে সালাত আদায়কারীদের সফলতাকে সংযুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। ফলে তা এটাই প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি সালাতে একাগ্র থাকে না, সে সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যদি এর মাধ্যমে সে সাওয়াবের অধিকারী হতো, তা হলে অবশ্যই সে সফলদের দলভুক্ত হতো। (সুতরাং খুশুখুজু বা একাগ্রতা না থাকলে সাওয়াব পাওয়া যায় না।)

আর দুনিয়াবী হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে এবং পুনরায় আদায় করা না-করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হচ্ছে : সালাতে অধিকাংশ সময় যদি বান্দার একাগ্রতা থাকে, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে। সালাতের পর বিভিন্ন তাসবীহ, তাহলীল, যিক্‌র-আযকার, দুআ, সুন্নাত ও নফল সালাত ইত্যাদির মাধ্যমে যে ঘাটতি ছিল, তা পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

আর যদি অধিকাংশ সময় সালাতে তার একাগ্রতা না থাকে এবং তার অন্তর সালাতে উপস্থিত না থাকে, সে ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন যে, তার ওপর পুনরায় সালাত আদায় করা ওয়াজিব কি না?

হাম্বালি মাযহাবের আবূ আবদিল্লাহ ইবনু হামিদ ﷺ ইআদা করা বা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হামিদ গাযালি ﷺ তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইহ্‌ইয়াউ উলূমিদ দ্বীন'-কিতাবে তাকে সমর্থন করেছেন।[২৬৮]

---

[২৬৭] আবূ দাউদ, ৭৯৬।

[২৬৮] ইহ্‌ইয়াউ উলূমিদ দ্বীন, ১/২৮৫।

তারা দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, সেটি এমন সালাত, যার ওপর কোনো সাওয়াব দেওয়া হবে না এবং তা সফলতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে না। সুতরাং সে এই সালাতের মাধ্যমে দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না এবং তার ওপর থেকে কাযা রহিতও হবে না; যেমন : লোকদেখানো সালাত।

তারা বলেন : আরেকটি কারণ হলো, একাগ্রতা ও উপলব্ধি করা হলো সালাতের রূহ, উদ্দেশ্য ও সারাংশ। সুতরাং সেই সালাতকে কীভাবে গণনায় ধরা হবে, যার রূহ ও সারাংশ অনুপস্থিত, অবশিষ্ট রয়েছে কেবল বাহ্যিক অংশ ও অবয়ব?

তারা বলেন : বান্দা যদি সালাতের ওয়াজিবসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি ওয়াজিব ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে, তা হলে তা সালাতকে বাতিল করে দেয়। এর উদাহরণ হলো : সালাতের অংশসমূহের মধ্য থেকে একটি অংশ পরিত্যাগ করা, কাফফারা আদায় করার জন্য যে গোলাম আযাদ করা হয়; তার অঙ্গসমূহের মধ্য থেকে একটি অঙ্গ না থাকার ন্যায়। সুতরাং যখন রূহ, উদ্দেশ্য ও মজ্জাই অনুপস্থিত থাকবে, তখন কীভাবে তা পূর্ণাঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হবে। তখন তো এটি মৃত গোলামের ন্যায় হয়ে পড়ে। যখন ওয়াজিব কাফফারার ক্ষেত্রে হাতকাটা গোলাম আযাদ করা যথেষ্ট হয় না, তখন কীভাবে তা মৃত গোলাম দ্বারা যথেষ্ট হবে?

এ কারণে সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, সালাত হলো সেই দাসীর মতো, যাকে কোনো বাদশাহর নিকট উপহার দেওয়া হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বাদশাহকে একটি লুলা, টেরা, অন্ধ, হাত-পা'কাটা, অসুস্থ, অবশ বা কুৎসিত; এমনকি প্রাণহীন মৃত কোনো দাসী উপহার দেয়, সেই ব্যক্তির প্রতি তার ধারণা কেমন হবে? সালাতের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনই, বান্দা তার রবের নিকট তা হাদিয়া পাঠায় এবং এর দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভ করে থাকে! আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও উত্তম, তিনি পবিত্র ও উত্তম ছাড়া কোনোকিছু গ্রহণ করেন না। আর প্রাণহীন সালাত উত্তম আমলের মধ্যে পড়ে না। যেমন নিষ্প্রাণ মৃত গোলাম আযাদ করা উত্তম-গোলাম-আযাদের মধ্যে পড়ে না।

তারা বলেন : অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হলো অন্তরের অধীন; অন্তরের সুস্থতায় সেগুলো সুস্থ থাকে, অন্তরের অসুস্থতায় সেগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং অন্তর যখন দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকে, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকবে আরও উত্তমভাবে।

গাফলত ও ওয়াসওয়াসার কারণে যখন অন্তরের আমলই নষ্ট হয়ে যায়, তখন তার অধীনস্থ প্রজা ও সৈন্যসেনাদের আমল কীভাবে বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে, যারা তার নির্দেশেই চলে?!

তারা বলেন : *'সুনানুত-তিরমিযি'*-তে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِّنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অমনোযোগী ও উদাসীন অন্তরের দুআ কবুল করেন না।"[২৬৯]

তিনি সতর্ক করেছেন যে, দুআ যা আল্লাহ তাআলার খাঁটি হক, আল্লাহ তা গাফিল ও অমনোযোগী অন্তর থেকে কবুল করেন না।

তারা বলেন : ইআদা বা পুনারায় পড়া ওয়াজিব হওয়ার আরেকটি কারণ হলো : যার ওপর গাফলত প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে এবং অধিকাংশ সময় যে অন্যমনস্ক থাকে, ইখলাস ও একনিষ্ঠতা তার সঙ্গী হয় না। কারণ ইখলাস হলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদাত করা। আর গাফিল ব্যক্তির (ভালো) কোনো ইচ্ছাই নেই, সুতরাং তার কোনো দাসত্বও নেই।

তারা বলেন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

"সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস; যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে বেখবর থাকে।"[২৭০]

এখানে বেখবর মানে সালাত পরিত্যাগ করা নয়। কারণ এ রকমটা হলে তো তারা মুসল্লি বা সালাত আদায়কারী বলে গণ্য হতো না। তাদের বেখবর বা গাফলত হয়তো ১. সালাতের সময়ের ব্যাপারে; যেমনটি বলেছেন ইবনু মাসউদ ও অন্যান্যরা, অথবা ২. একাগ্রতা ও অন্তর-উপস্থিত রাখার ব্যাপারে।

---

[২৬৯] তিরমিযি, ৩৪৭৪।

[২৭০] সূরা মাউন, ১০৭ : ৪-৫।

তবে সঠিক অভিমত হলো আয়াতটি উভয় প্রকার গাফলতকেই শামিল করে। কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সালাতকে সাব্যস্ত করেছেন। তবে সে ব্যাপারে তাদের গাফলত ও বেখবরের কথা উল্লেখ করেছেন। সেটি হলো ওয়াজিব-ওয়াক্ত সম্পর্কে বেখবর থাকা বা ওয়াজিব-ইখলাস ও একাগ্রতা সম্পর্কে বেখবর থাকা। আর এ কারণে পরে তাদের রিয়া বা লোক-দেখানোর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যদি এর অর্থ সালাত পরিত্যাগ করা হতো, তা হলে রিয়ার কথা উল্লেখ থাকত না।

মোটকথা সালাতে ইখলাস, একাগ্রতা ও অন্তরকে আল্লাহর ওপর স্থির রাখা, শারীআত-প্রণেতার দৃষ্টিতে সালাতের অন্যান্য ওয়াজিব আমলের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহর প্রতি আপনার কেমন ধারণা যে, তিনি একটি তাকবীর পরিত্যাগ করার কারণে বা কোনো রোকনে ধীরস্থিরতা, কিরআতের ক্ষেত্রে কোনো হরফ, ওয়াজিব কোনো তাশদীদ, তাসবীহ পাঠ, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ বা রাসূল ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ ইত্যাদি পরিত্যাগ করার দরুন সালাতকে বাতিল বলে ঘোষণা করবেন আর সালাতের রূহ, মূলবিষয় ও সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য (একাগ্রতা) অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তা বিশুদ্ধ বলে গণ্য করবেন!?

যারা গাফিল ব্যক্তির সালাতকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব বলেন এগুলো হলো তাদের দলীল-প্রমাণ। এগুলো বাহ্যিকভাবে মজবুত ও শক্তিশালী আপনি যেমন দেখছেন।

আরেক দল বলেছেন, তার জন্য সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নয়। তারা বলেন : এটি নবি ﷺ থেকেই প্রমাণিত। কারণ তিনি বলেছেন,

إِذَا نُوْدِىَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ فَإِذَا قُضِىَ الأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِىْ كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

“সালাতের আযান শুরু হলে শয়তান পিঠ ফিরে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে এবং এত দূরে চলে যায় যে, সে আর আযান শুনতে পায়

না। অতঃপর আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। কিন্তু যে সময় ইকামাত দেওয়া হয়, তখন পুনরায় পিঠ ফিরে পালায়। ইকামাত শেষ হলে আবার ফিরে আসে এবং মানুষের মনে সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে বলে, 'অমুক কথা স্মরণ করো, অমুক কথা স্মরণ করো; যেসব কথা তার কখনো স্মরণ করবার মতো নয়। অবশেষে সে কত রাকাআত আদায় করল, তা স্মরণ করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় তোমাদের কেউ যখন স্মরণ করতে পারবে না যে, কত রাকাআত আদায় করেছে, তখন সে যেন বসে থাকা অবস্থাতেই দুটি সাজদা দেয়।"[২৭১]

তারা বলেন : এই সালাতে শয়তান মানুষকে এমন গাফিল বানিয়ে দেয় যে, সে স্মরণও করতে পারে না, সে কত রাকাআত আদায় করেছে। এ ক্ষেত্রে নবি ﷺ আদেশ দিয়েছেন দুটি সাজদায়ে সাহু আদায় করার জন্য, তিনি তা পুনরায় আদায় করার কথা বলেননি। যদি তা বাতিল হয়ে যেত—যেমনটি আপনারা ধারণা করে থাকেন—তা হলে অবশ্যই তিনি তা পুনরায় আদায় করার কথাই বলতেন।

তারা বলেন : আর এর মাঝেই লুকায়িত আছে দুই সাজদায়ে সাহু দেওয়ার রহস্য। বান্দাকে ওয়াসওয়াসা দেওয়া এবং বান্দার মাঝে ও সালাতে-একাগ্র-হওয়ার মাঝে শয়তান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণে তাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যেই এই সাজদায়ে সাহু দেওয়ার হুকুম।

এ কারণেই নবি ﷺ সাজদায়ে সাহুকে 'লাঞ্ছনাকারী' (اَلْمُرْغِمَتَيْنِ) বলে নামকরণ করেছেন। যে সালাতে ভুল করে, তাকে তিনি এই হুকুম দিয়েছেন। তবে ভুলের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি যে, কম হলে না বেশি হলে, ভুল প্রাধান্য পাওয়া না-পাওয়া ইত্যাদি। তিনি শুধু বলেছেন,

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ

"যেকোনো ভুলের জন্য দুটি সাজদা।"[২৭২]

তিনি এর থেকে কোনো ভুলকে ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেননি।

---

[২৭১] মুসলিম, ৩৮৯; বুখারি, ৬০৮।

[২৭২] আবূ দাউদ, ১০৩৮।

তারা বলেন : ইআদা বা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো : ইসলামের হুকুমসমূহ বাহ্যিক কার্যাবলির সাথেই সম্পর্কিত। আর ঈমানের অভ্যন্তরীণ মূল বিষয়াদির ওপর সাওয়াব ও শাস্তির সম্পর্ক। আল্লাহ তাআলার দুটি হুকুম রয়েছে : একটি হুকুম দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর তা হলো বাহ্যিক কাজকর্ম ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের ওপর। আরেকটি হুকুম হলো আখিরাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর তা হলো প্রকাশ্য-গোপন সব আমলের ওপর।

এ কারণেই নবি ﷺ মুনাফিকদের বাহ্যিক কাজকর্ম গ্রহণ করতেন আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ তাআলার ওপর ন্যস্ত করতেন। এর ফলে তারা মুমিন নারীদের বিবাহ করত, মুমিনদের ওয়ারিশ হতো, তাদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদও নেওয়া হতো, দুনিয়ার বিচারে তাদের সালাত আদায় গ্রহণযোগ্য ছিল; তারা সালাত পরিত্যাগকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কারণ তারা প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায় করত। আর সাওয়াব ও শাস্তির বিধান তো কোনো মানুষের নিকট নয়; বরং তা আল্লাহ তাআলার নিকটে ন্যস্ত। আখিরাতে তিনি এর পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন (এবং পূর্ণাঙ্গরূপে যার যা প্রাপ্য, তাকে তা প্রদান করবেন।)

তারা বলেন : সুতরাং আমরা ইসলামের বিধানাবলির হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে এই হুকুম দেবো যে, মুনাফিক ও রিয়াকারীর সালাত সহীহ; তবে এর সাথে সাথে এটাও বলব যে, তাদের থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেওয়া হবে না এবং তারা সাওয়াবেরও অধিকারী হবে না। সুতরাং অমনোযোগী মুসলিম ব্যক্তির সালাত তো আরও উত্তমভাবে সহীহ ও বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে; যদিও তার মাঝে গাফলতি ও ওয়াসওয়াসা এসে ভর করে, যার দরুন সে পরিপূর্ণ মনোযোগী হতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, এই সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে যে পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অর্জিত হয় না। কারণ অন্তরের জন্য সালাতের তাৎক্ষণিক পুরস্কার রয়েছে; অন্তর ও চিন্তাচেতনা কেবল আল্লাহর ওপর স্থির থাকলে তা অর্জিত হয়, যেমন : ঈমানের শক্তি, উজ্জলতা, প্রশস্ততা, উদারতা, ইবাদাতের স্বাদ আস্বাদন করা, আনন্দ-খুশি ইত্যাদি। এমনিভাবে এই নিয়ামাতগুলো লাভ করতে সর্বদা আল্লাহর সামনে অন্তর উপস্থিত থাকতে হয়; যেমন আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা লাভ করে থাকে; যাকে আল্লাহ তাঁর সাথে মুনাজাত করার ও অগ্রসর হওয়ার জন্য খাছ করে নেন। আল্লাহ তাআলা সুউচ্চ

ও সুমহান।

সালাতে একাগ্র থাকার দ্বারা আখিরাতে যে উঁচু মর্যাদা ও মর্তবা এবং নৈকট্যশীলদের যে সান্নিধ্য লাভ হবে, গাফিল ব্যক্তি তা-ও লাভ করবে না।

এর সবগুলো সে হারাবে শুধু একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা না থাকার কারণে। দুইজন ব্যক্তি একই কাতারে সালাতে দাঁড়ায়; অথচ তাদের দুজনের সালাতে থাকে আসমান-জমিন ব্যবধান। আমাদের আলোচনা এসব বিষয়ে নয়।

ইআদা বা সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব বলার দ্বারা যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, এই সমস্ত ফলাফল ও ফায়দা অর্জন করা; তা হলে এটি সেই ব্যক্তির ইচ্ছা; সে চাইলে তা অর্জন করতে পারে আবার চাইলে তা থেকে বঞ্চিতও থাকতে পারে। আর যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, সালাত পুনরায় আদায় করা আবশ্যক এবং তা পরিত্যাগ করার কারণে আমরা তাকে শাস্তির মুখোমুখি দাঁড় করাবো এবং সালাত পরিত্যাগকারীর দুনিয়াবি যে হুকুম রয়েছে, তার ওপর সেগুলো প্রয়োগ করব, তা হলে তা বৈধ হবে না।

দ্বিতীয় এই অভিমতটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও অধিক গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

*****

১১ নং মানযিল

নত হওয়া (اَلْإِخْبَاتُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—নত হওয়ার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾

"এবং বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও।"[২৭৩]

এর পরের আয়াতে তাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন—

اَلَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلٰى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

"যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে; যে বিপদই তাদের ওপর আসে, তার ওপর তারা সবর করে; সালাত কায়েম রাখে এবং আমি যা কিছু রিয্ক তাদেরকে দান করেছি, তা থেকে খরচ করে।"[২৭৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوْا إِلٰى رَبِّهِمْ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿٢٣﴾

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং তাদের পালনকর্তার

---

[২৭৩] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৪।

[২৭৪] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৫।

কাছে নত হয়েছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[২৭৫]

اَلْخَبْتُ-এর মূল শাব্দিক অর্থ হলো : নিম্নভূমি, জমিনের নিচু অংশ। এই অর্থানুসারেই ইবনু আব্বাস ও কাতাদা اَلْمُخْبِتِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, তারা বলেছেন, 'তারা হলেন বিনয়ী ব্যক্তিবর্গ (اَلْمُتَوَاضِعُوْنَ)।'

মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, 'মুখবিত হলো আল্লাহর প্রতি নিশ্চিন্ত বান্দা।'[২৭৬]

তিনি আরও বলেছেন, 'আল-খব্‌ত' অর্থ : নিম্নভূমি।'[২৭৭]

ইমাম আখফাশ ﷺ বলেছেন, 'তারা হলেন একাগ্রতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ।'[২৭৮]

ইবরাহীম নাখায়ি ﷺ বলেছেন, 'সালাত আদায়কারী একনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ।'[২৭৯]

কালবি ﷺ বলেছেন, 'তারা হলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারীগণ।'[২৮০]

এই সমস্ত মতামত দুইটি অর্থের সাথে সম্পর্কিত : ১. বিনয় এবং ২. আল্লাহর প্রতি নিশ্চিন্ততা। আর এ কারণেই এই শব্দটির সাথে إِلَى যুক্ত করা হয়। কারণ তা নিশ্চিন্ততা, আল্লাহমুখিতা ও আল্লাহর প্রতি স্থিরতাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

নত হওয়া বা ইখবাত হলো প্রথম মাকাম, (যা অর্জন করে নিলে) আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তি দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়, গাফলতি, অমনোযোগিতা এবং আগের অবস্থায় ফিরে যাবার প্রবণতা থেকে মুক্তি পায়। আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর দিকে পথ চলতে থাকে, যতদিন শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকবে তার পথচলা শেষ হবে না। বান্দার জন্য এই অবস্থা হাসিল হওয়াকে পানির (ঘাটের) সাথে তুলনা করা হয়েছে; দীর্ঘপথ-পাড়ি-দেওয়া-মুসাফির তার তৃষ্ণা পূরণ করতে এবং প্রয়োজন মেটাতে পানির যে ঘাটে অবতরণ করে, সেই ঘাট তাকে পরিতৃপ্তি দান করে, সফর

---

[২৭৫] সূরা হূদ, ১১ : ২৩।

[২৭৬] বাগাবি, তাফসীর, ৫/৩৮৬।

[২৭৭] বাগাবি, তাফসীর, ৫/৩৮৬।

[২৭৮] বাগাবি, তাফসীর, ৫/৩৮৬।

[২৭৯] বাগাবি, তাফসীর, ৫/৩৮৬।

[২৮০] বাগাবি, তাফসীর, ৫/৩৮৬।
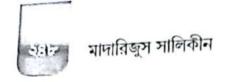
পরিপূর্ণ করার জন্য তার থেকে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং সফরের কষ্টের কারণে বাড়ি ফেরার প্রবণতা দূর করে দেয়। অতঃপর যখন সে সেই পানিতে নামে, তখন তার থেকে সব সংশয়-সন্দেহ কেটে যায় এবং ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছা দূর হয়ে যায়।

ঠিক তেমনি সালিক বা আল্লাহর-পথের-পথিক যখন ইখবাত বা নত হওয়ার ঘাটে নামে, তখন সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয় ও ফিরে যাওয়ার বাসনা থেকে সে মুক্তি পায়। ফলে পরবর্তী সফরের জন্য সে নিশ্চিন্ততার মানযিল লাভ করে এবং পূর্ণদ্যমে সফর অব্যাহত রাখে।

*****

১২ নং মানযিল
দুনিয়াবিমুখতা (اَلزُّهْدُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—দুনিয়াবিমুখতার মানযিল।

দুনিয়াবিমুখতার পরিচয়

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তা কখনো শেষ হবে না।"[২৮১]

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

اِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

"ভালোভাবে জেনে রাখো, দুনিয়ার এ জীবন একটা খেলা, হাসি-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হচ্ছে, বৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারপর সে

[২৮১] সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৯৬।

ফসল পেকে যায় এবং তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে আখিরাত এমন স্থান, যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২৮২]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"এ ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য মাত্র। আর স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার রবের কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হবার উত্তম মাধ্যম।"[২৮৩]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ﴿١٧﴾

"বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"[২৮৪]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ﴿١٣١﴾

"আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিবজীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া জীবনোপকরণই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"[২৮৫]

---

[২৮২] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২০।

[২৮৩] সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ৪৬।

[২৮৪] সূরা আ'লা, ৮৭ : ১৬-১৭।

[২৮৫] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১৩১।

দুনিয়াবিমুখতা, দুনিয়ার তুচ্ছতা, স্বল্পতা, ক্ষণস্থায়িত্ব, এর দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া, আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হওয়া, আখিরাতের মর্যাদা, স্থায়িত্ব, এর দ্রুত আগমন ইত্যাদির আলোচনায় কুরআন পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তখন তার অন্তরে একজন প্রহরী নিযুক্ত করে দেন, যার সাহায্যে সে দুনিয়া-আখিরাতের প্রকৃত অবস্থা দেখতে পায় এবং এ দুটির মধ্যে যেটি প্রাধান্য পাওয়া দরকার, সেটিকে প্রাধান্য দেয়।

অধিকাংশ মানুষ যুহ্দের ব্যাপারে নিজের পছন্দ-অপছন্দ, অবস্থা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলেছেন। তবে এর চেয়ে ইলমি আলোচনা করাই উত্তম ও ফলপ্রসূ হবে। কারণ তা হবে দলীল-প্রমাণের নিকটবর্তী।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতা হলো আখিরাতে যা উপকারে আসবে না, তা পরিত্যাগ করা। আর আল্লাহর ভয় হলো আখিরাতে যার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাতে জড়িয়ে না পড়া।'[২৮৬]

এই কথাটি দুনিয়াবিমুখতা ও ভয় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেগুলো মধ্যে সর্বোত্তম ও ব্যাপক অর্থবোধক কথা।

সুফ্ইয়ান সাওরি ﷺ বলেছেন, 'দুনিয়াবিমুখতা হচ্ছে আশাকে ছোটো রাখা। এটি মোটা খাবার খাওয়া আর মোটা জোব্বা পরিধান করার নাম নয়।'[২৮৭]

জুনাইদ বাগদাদি ﷺ বলেছেন, 'আমি সারি সাকাতি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে দুনিয়াকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, এর থেকে তাঁর অতি কাছের লোকদেরকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর মহাব্বতের অধিকারী ব্যক্তিদের অন্তর থেকে তা বের করে দিয়েছেন। কারণ তিনি তাদের জন্য এতে সন্তুষ্ট হননি।'[২৮৮]

কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহ্ তাআলার এই বাণীতে যুহ্দের প্রকৃত অর্থ নিহিত

---

[২৮৬] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ১০/৬১৫।

[২৮৭] ইবনু আবিদ দুন্ইয়া, আয-যুহ্দ, ১০৯।

[২৮৮] বাইহাকি, আয-যুহ্দুল কাবীর, ৬১।

রয়েছে—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

"যাতে তোমাদের যা হাতছাড়া হয়ে যায়, তার কারণে তোমরা দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, সে জন্য গর্বিতও না হও।"[২৮৯]

সুতরাং যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ হলো সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার কোনোকিছু পেয়ে আনন্দ-উল্লাসও করে না আবার কোনোকিছু না পেলে আফসোসও করে না।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয ﷺ বলেছেন, 'যুহ্দ নিজ মালিকানাকে দান করতে উদ্‌বুদ্ধ করে আর মহাব্বত আপন রূহকে দান করতে উদ্‌বুদ্ধ করে।'[২৯০]

ইবনুল জালা ﷺ বলেছেন, 'যুহ্দ হলো দুনিয়ার দিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকানো যে, তা ধ্বংস হয়ে যাবে, ফলে তোমার চোখে তা ছোটো ও হীন হয়ে ধরা দেবে। যার দরুন দুনিয়া থেকে দূরে থাকা তোমার জন্য সহজ হবে।'[২৯১]

ইমাম আহমাদ ﷺ বলেছেন, 'দুনিয়াবিমুখতা হলো ছোটো আশা পোষণ করা।'[২৯২]

তাঁর থেকে আরেকটি কথা বর্ণিত আছে, যুহ্দ হলো দুনিয়া কারও কাছে হাজির হলে আনন্দিত না হওয়া এবং হাতছাড়া হয়ে গেলে পেরেশানও না হওয়া। তাকে একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যার সাথে এক হাজার দীনার ছিল, সে কি দুনিয়াবিমুখ হতে পারবে? তিনি জবাব দেন, 'হ্যাঁ, একটি শর্তে হতে পারবে। তা হলো এই সম্পদের চেয়ে যদি তার আরও সম্পদ বেড়ে যায়, তা হলে সে আনন্দিত হবে না আবার যদি এর থেকে কমে যায়, তা হলে সে দুঃখও পাবে না।'[২৯৩]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ বলেছেন, 'যুহ্দ হলো অভাবের প্রতি ভালোবাসার সাথে আল্লাহর ওপর নিশ্চিন্ত নির্ভরতা।' এটি শাকীক বালখি ও ইউসুফ ইবনু আসবাত ﷺ-এরও কথা।

---

[২৮৯] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৩।

[২৯০] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/২৪০।

[২৯১] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/২৪০।

[২৯২] ইবনু রজব হাম্বালি, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/১৮৪।

[২৯৩] ইবনু আবী ইয়া'লা, তবাকাতুল হানাবিলা, ২/১৪।

আবূ সুলাইমান দারানি ﷺ বলেছেন, 'যা আল্লাহ থেকে দূরে রাখে, তা পরিত্যাগ করা।' এটি শিবলি ﷺ-এরও কথা।

রুওয়াইম ﷺ দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে জুনাইদ বাগদাদি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেন, 'দুনিয়াকে অপদস্থ, হীন ও ছোটো মনে করা এবং অন্তর থেকে এর প্রভাব মিটিয়ে দেওয়া।'[২৯৪]

একব্যক্তি ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয ﷺ-কে বললেন, 'কখন আমি তাওয়াক্কুলের ঘরে প্রবেশ করব, দুনিয়াবিমুখদের পোশাক পরিধান করব এবং তাদের সাথে বসব?' জবাবে তিনি বললেন, 'যখন তুমি তোমার অন্তরের ওপর সাধনা করতে করতে এই পর্যায়ে পৌঁছাবে যে, আল্লাহ তাআলা যদি তোমার নিকট থেকে তিন দিন রিয্ক বন্ধ করে রাখেন, তা হলেও তোমার অন্তর দুর্বল হয়ে পড়বে না। আর তুমি যদি এই স্তরে না পৌঁছেই তাদের সারিতে বসে যাও, তা হলে তা হবে তোমার মূর্খতা, তখন তোমার লাঞ্ছিত হওয়ার ব্যাপারে আমি নিরাপদ নই।'[২৯৫]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ বলেছেন, 'যুহ্দ হলো তিন প্রকার :

১. হারাম পরিত্যাগ করা; এটি হলো সাধারণ লোকদের যুহ্দ।

২. হালাল বস্তুর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার পরিত্যাগ করা; এটি হলো বিশেষ ব্যক্তিদের যুহ্দ।

৩. যা আল্লাহ থেকে বিমুখ করে, তা পরিত্যাগ করা; এটি হলো আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যুহ্দ।'[২৯৬]

ইমাম আহমাদ ﷺ-এর এই বাণী পূর্বে উল্লেখিত সালাফদের সমস্ত বাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেগুলোর পাশাপাশি এর বিস্তারিত বিবরণ ও স্তরের বর্ণনাও এতে রয়েছে। এটি হলো ব্যাপক অর্থবহ একটি কথা। এটি এ ব্যাপারেও ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তিনি এই বিষয়ে অনেক উঁচু স্তরের অধিকারী ছিলেন। ইমাম শাফিয়ি ﷺ তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি আটটি বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তার মধ্যে একটি হলো যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতা।

---

[২৯৪] বাইহাকি, আয-যুহ্দুল কাবীর, ২০।

[২৯৫] ইমাম গাযালি, ইহইয়াউ উলূমিদ-দ্বীন, ৪/২৪২।

[২৯৬] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/২৪৩।

দুনিয়াবিমুখতার প্রকৃত মর্ম এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াদি

আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যুহ্‌দ বা দুনিয়াবিমুখতা হলো দুনিয়ার আবাস থেকে আখিরাতের আবাসের দিকে আত্মিক সফর। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তীগণ অনেক কিতাব রচনা করেছেন; যেমন : আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ওয়াকী, হান্নাদ ইবনুস সারি ﷺ-সহ আরও অনেকেই। (সকলেই নিজ নিজ রচনার নাম দিয়েছেন 'কিতাবুয যুহ্‌দ'।)

যুহ্‌দ সম্পর্কিত ছয়টি বিষয় রয়েছে, যেগুলো থেকে বিমুখতা প্রদর্শন না করা পর্যন্ত কেউ যুহ্‌দ বা দুনিয়াবিমুখতার গুণে গুণান্বিত হতে পারবে না। সেগুলো হলো :

১. সম্পদ,

২. (সুন্দর) আকৃতি,

৩. কর্তৃত্ব,

৪. মানুষজন,

৫. নফস এবং

৬. আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছু।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সবকিছু একেবারে ছেড়ে দেবে। কারণ সুলাইমান ও দাঊদ ﷺ ছিলেন তাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো দুনিয়াবিমুখ। অথচ তাদের প্রাচুর্য ছিল অনেক বেশি, স্ত্রী, দাস-দাসী এবং রাজত্বও ছিল ব্যাপক। আমাদের নবি ﷺ ছিলেন সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ; অথচ তাঁরও ছিল নয়জন স্ত্রী। আলি ইবনু আবী তালিব, আবদুর রহমান ইবনু আউফ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও উসমান ইবনু আফফান ﷺ ছিলেন দুনিয়াবিমুখদের অন্যতম; এর সাথে সাথে তাদের বেশ অর্থসম্পদও ছিল। হাসান ইবনু আলি ﷺ খাঁটি যাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এর পাশাপাশি তিনি তার স্ত্রীদের প্রচণ্ড ভালোবাসতেন এবং আদর করতেন আর তিনি ধনাঢ্যদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ-এর অনেক ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী। এমনিভাবে লাইস ইবনু সা'দ ও সুফ্‌ইয়ান সাওরি ছিলেন দুনিয়াবিমুখদের ইমাম। সুফ্‌ইয়ান সাওরি ﷺ-এর অনেক ধনসম্পদ ছিল, তিনি বলতেন, 'এগুলো যদি না থাকত, তা হলে তারা (রাজা-বাদশাহরা) আমাদেরকে রুমাল হিসেবে ব্যবহার

করত। অর্থাৎ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত।'[২৯৭]

যুহ্দ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো হাসান বাসরি ﷺ-এর কথা। তিনি বলেছেন, 'হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করে নেওয়া এবং বেশি বেশি সম্পদ ব্যয় করার নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়; বরং তা হলো আপনার হাতে যা রয়েছে, তার তুলনায় আল্লাহর হাতে যা রয়েছে, তার ওপর বেশি নির্ভরশীল হওয়া, আপনার নিকট বিপদাপদ না আসার চেয়ে আপনি বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে যে সাওয়াবের অধিকারী হবেন, তার প্রতি বেশি আগ্রহী হওয়া।'[২৯৮]

এটি হলো দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যাপক ও উত্তম কথা।

দুনিয়াবিমুখতা অর্জন করার পদ্ধতি

দুনিয়াবিমুখতার সূচনা করতে হবে হারাম ছাড়ার পর সন্দেহযুক্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে; যা বান্দার মনে সংশয় সৃষ্টি করে যে, এটি হালাল নাকি হারাম?

যেমন নু'মান ইবনু বাশির ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

"নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয়, যেগুলো অনেক মানুষই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে অটুট রাখে, আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়, সে হারামে জড়িয়ে যায়। এর উদাহরণ হলো, যেমন : কোনো রাখাল

[২৯৭] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৬/৩৮১।

[২৯৮] ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল, ২৭৭০।

কারও সংরক্ষিত চারণভূমির আশপাশে পশু চরায়, আশঙ্কা রয়েছে যে, সে তার ভেতরে ঢুকে পড়বে। মনে রেখো, প্রত্যেক রাজারই একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আর মনে রেখো, আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো। মনে রেখো, দেহের মধ্যে এক টুকরো গোশত রয়েছে; যা সংশোধিত হলে পুরো দেহই সংশোধিত হয়ে যায়, আর যা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো দেহই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো, সেটা হলো কল্‌ব বা অন্তর।"[২৯৯]

আসলে সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি হলো হালাল ও হারামের মাঝে ভিন্ন একটি জগৎ।

এরপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার, পানীয়, পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ি, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি বিষয় থেকে বিমুখ হওয়া, আস্তে আস্তে এগুলোও পরিত্যাগ করা; এর মাধ্যমে যুহ্‌দ বা দুনিয়াবিমুখতা অর্জন করা যায়।

*****

[২৯৯] বুখারি, ৫২; মুসলিম, ১৫৯৯।

১৩ নং মানযিল

অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকা (اَلْوَرَعُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

"হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন, আমি তা ভালোভাবেই জানি।"[৩০০]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

"আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।"[৩০১]

কাতাদা ও মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, 'অর্থাৎ আপন সত্তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখুন। এখানে পোশাক বলে সত্তা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।' ইবরাহীম নাখায়ি, দাহ্হাক, শা'বি, যুহ্রি ﷺ-সহ আরও অনেক মুফাসসিরের অভিমত এটি।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'অর্থাৎ আপনি তা অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করার উদ্দেশ্যে পরিধান করবেন না।' অতঃপর তিনি বলেছেন, 'আপনি কি গায়লান ইবনু সালামা সাকাফির কথা শোনেননি—

---

[৩০০] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৫১।

[৩০১] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৪।

وَإِنِّي-بِحَمْدِ اللهِ-لَا ثَوْبَ غَادِرٍ... لَبِسْتُ وَلَا مِنْ غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ

আল্লাহর শোকর আমি বিশ্বাসঘাতকের পোশাক পরি না,
আবার বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশেও আবৃত থাকি না।[৩০২]

আরবরা কোনো ব্যক্তিকে আমানতদারিতা ও সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত করতে চাইলে বলে থাকে, طَاهِرُ الثِّيَابِ (পবিত্র কাপড়ের অধিকারী)। আর বিশ্বাসঘাতক ও পাপাচারীকে বলে, دَنِسُ الثِّيَابِ (নোংরা কাপড়ের অধিকারী)।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কাপড়কে নাপাকি থেকে পবিত্র রাখা, পবিত্রতার ফরজ হুকুমের মধ্যেই শামিল। কারণ এর দ্বারা আমল ও আখলাক পূর্ণতা পায়। কেননা প্রকাশ্য নাপাকি, অভ্যন্তরীণ নাপাকির সৃষ্টি করে। আর এ কারণেই আল্লাহর-সামনে-দাঁড়ানো-ব্যক্তিকে নাপাকি দূর করতে এবং তা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মূলকথা হলো : اَلْوَرَعُ অন্তরের নোংরা ও নাপাকিকে পবিত্র করে, যেমন পানি পোশাকের ময়লা ও নাপাকি পবিত্র করে। কাপড়ের মাঝে ও অন্তরের মাঝে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনেক মিল রয়েছে। এই কারণে স্বপ্নে কেউ কাপড় দেখলে, তা তার অন্তর ও আত্মিক অবস্থার প্রমাণ বহন করে। এ দুটি একটি অপরটিকে বেশ প্রভাবিত করে। এ জন্য রেশম, স্বর্ণ ও হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এগুলো দাসত্ব ও একাগ্রতার সাথে সাংঘর্ষিক। কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ময়লাযুক্ত হওয়া, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল হওয়া এবং কাপড়ের সুঘ্রাণ ও দুর্গন্ধ অন্তরে যে প্রকট প্রভাব ফেলে, তা কেবল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারে। এমনকি তারা কোনটা নেককার ব্যক্তির কাপড় আর কোনটা বদকার ব্যক্তির কাপড়, তা তাদের অনুপস্থিতেই আলাদা করে চিনে নিতে পারে।

নবি ﷺ এক বাক্যে اَلْوَرَعُ-এর সমস্ত বিষয়কে একত্রিত করে দিয়েছেন—

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

"মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক কাজকর্ম পরিত্যাগ করা।"[৩০৩]

---

[৩০২] তাবারি, তাফসীর, ২৩/৪০৫।

[৩০৩] তিরমিযি, ২৩১৭; ইবনু মাজাহ, ৩৯৭৬।

এই হাদীসটি অপ্রয়োজনীয় সবকিছু পরিত্যাগ করাকেই অন্তর্ভুক্ত করে; যেমন : কথা বলা, দৃষ্টি দেওয়া, শ্রবণ করা, ধরা, হাঁটাচলা করা, চিন্তা করা, এমনিভাবে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত কাজকর্ম। নিঃসন্দেহে এই বাক্যটি الْوَرَعْ-এর ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﷬ বলেছেন, ''ওয়ারা' হলো প্রতিটি সংশয়পূর্ণ বস্তু পরিত্যাগ করা এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তু পরিহার করা।'[৩০৪] এর অর্থ হলো অনর্থক বিষয়াদিতে নিজেকে না জড়ানো।

আল্লাহর রাসূল ﷺ আবূ হুরায়রা ﷛-কে বলেছেন,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

"হে আবূ হুরায়রা, তুমি আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকো, তা হলে সব মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদাতকারী বলে গণ্য হবে।"[৩০৫]

শিবলি ﷬ বলেছেন, 'ওয়ারা' হলো আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছু থেকে দূরে থাকা।'[৩০৬]

ইসহাক ইবনু খালাফ ﷬ বলেছেন, 'অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা, স্বর্ণ-রুপার আকাঙ্ক্ষা থেকে বেঁচে থাকার চেয়েও বেশি কঠিন। এমনিভাবে স্বর্ণ-রুপার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করার চেয়ে ক্ষমতার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করা বেশি কঠিন। কারণ স্বর্ণ-রুপা খরচ করা হয় ক্ষমতা অর্জন করার জন্য।'[৩০৭]

আবূ সুলাইমান দারানি ﷬ বলেছেন, 'অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকা হলো দুনিয়াবিমুখতার প্রথম ধাপ। যেমন অল্পেতুষ্টি হলো সন্তুষ্টির প্রথম ধাপ।'[৩০৮]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয ﷬ বলেছেন, 'ওয়ারা' হলো দুই প্রকার : একটি বাহ্যিক;

---

[৩০৪] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৩৩।

[৩০৫] ইবনু মাজাহ, ৪২১৭; তিরমিযি, ২৩০৫।

[৩০৬] বাইহাকি, আয-যুহ্দুল কাবীর, ৮৫৭।

[৩০৭] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, ৮/২০৫।

[৩০৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৫৭।

তা হলো সবকিছু আল্লাহর জন্যই করা, আরেকটি হলো অভ্যন্তরীণ; আর তা হলো আপনার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য স্থান না থাকা।'[৩০৯]

ইউনুস ইবনু উবাইদ ﷺ বলেছেন, 'اَلْوَرَعُ হলো সব ধরনের সন্দেহ-সংশয় থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং প্রতিটি মুহূর্তে নফসের হিসাব নিতে থাকা।'[৩১০]

সুফ্ইয়ান সাওরি ﷺ বলেছেন, 'ওয়ারা' এর চেয়ে সহজ কিছু আমি আর দেখিনি, অন্তরে যা খটকা সৃষ্টি করে তা পরিত্যাগ করুন।'[৩১১]

হাসান বাস্রি ﷺ একটি বালককে প্রশ্ন করলেন, 'দ্বীনের মূল কী?' সে জবাব দিলো, '(অন্তরের) অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকা (اَلْوَرَعُ)। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'এর বিপদ কী?' সে উত্তরে বলল, 'লোভ-লালসা।' এই কথা শুনে হাসান ﷺ অবাক হলেন।[৩১২]

হাসান ﷺ বলেছেন, 'সামান্য পরিমাণ ওয়ারা' হাজার (নফল) সালাত-সিয়াম থেকেও উত্তম।'[৩১৩]

আবূ হুরায়রা ﷺ বলেছেন, 'আগামীকাল আল্লাহর সঙ্গী হবে—ওয়ারা' ও যুহ্দের অধিকারী ব্যক্তিগণ।'[৩১৪]

সালাফদের কোনো একজন বলেছেন, 'কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়া বা খোদাভীতির হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত-না ক্ষতির আশঙ্কায় এমন বস্তুও পরিত্যাগ করে, যার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই।'[৩১৫]

সাহাবিদের মধ্যে একজন বলেছেন, 'আমরা হারাম বস্তুসমূহের একটি দরজায় ঢুকে পড়ার আশঙ্কায় হালাল বস্তুসমূহের সত্তরটি দরজাও পরিত্যাগ করতাম।'[৩১৬]

---

[৩০৯] বাইহাকি, আয-যুহ্দুল কাবীর, ৮৫৬।

[৩১০] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৩৫।

[৩১১] আবদুল কাদীর জীলানি, আল-গুনইয়া লি-তালিবী তরীকিল হাক্ব, ১/২৫২।

[৩১২] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৩৬।

[৩১৩] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৩৬।

[৩১৪] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৩৬।

[৩১৫] এর অনুরূপ হাদীস দেখুন—তিরমিযি, ২৪৪১; ইবনু মাজাহ, ৪২১৫।

[৩১৬] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৩৩; সাহাবিটি হলেন আবূ বকর ﷺ।

১৪ নং মানযিল
বিচ্ছিন্ন হওয়া (اَلتَّبَتُّلُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—বিচ্ছিন্ন হওয়ার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

> "আপন রবের নাম স্মরণ করতে থাকো এবং সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর জন্যই হয়ে যাও।"[৩১৭]

اَلتَّبَتُّلُ অর্থ : বিচ্ছিন্ন হওয়া। এটি হলো اَلْبَتْلُ থেকে বাবুত তাফাউউল-এর মাসদার; যার অর্থ : কর্তন করা, কেটে ফেলা। মারইয়াম ﷺ-কে اَلْبَتُوْلُ-ও বলা হতো। কারণ তিনি স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন (তার কোনো স্বামী ছিল না) এবং তিনি তার সময়কার অন্যান্য নারীদের মতো হওয়া থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের চেয়ে ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং তাদেরকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

تَبَتَّلَ ফেয়েলের মাসদার হলো اَلتَّبَتُّلُ. যেমন : اَلتَّفَهُّمُ (অনুধাবন করা), اَلتَّعَلُّمُ (শিক্ষা গ্রহণ করা)। কিন্তু কুরআনে (ওপরে বর্ণিত আয়াতে) এটি বাবুত তাফঈলের মাসদার (تَبْتِيلًا) হিসেবে এসেছে, ফেয়েল বাবুত তাফাউউলের আর মাসদার বাবুত তাফঈলের। এভাবে আনার একটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে। এখানে বাবুত তাফাউউলের ফেয়েল দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ধীরে ধীরে কাজ করা, কষ্ট করে কাজ করা, বেশি বেশি এবং পরিপূর্ণরূপে কাজ করা। আর বাবুত তাফঈল থেকে মাসদার এনে অপর আরেকটি অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য; আর তা হলো নিজে আল্লাহর প্রতি ধাবিত

---

[৩১৭] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ৮।

হওয়ার সাথে সাথে নিজের নফসকেও ধাবিত করা। যেন বলা হয়েছে, 'আপনি আপনার নফসকে আল্লাহ তাআলার দিকে পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করুন এবং আপনি নিজেও তাঁর প্রতি একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট হোন।' এ রকম ব্যবহার কুরআন মাজীদে অনেক রয়েছে। ব্যাপক অর্থ বোঝানোর জন্য এটি হলো সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

اَلتَّبَتُّلُ হলো প্রতিদানপ্রাপ্তির প্রতি লক্ষ না করে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর দিকে নিমগ্ন হওয়া; কোনো শ্রমিকের মতো না যে, পারিশ্রমিক পেলে কাজ করবে, অন্যথায় করবে না। আবার যখন পারিশ্রমিক পেয়ে যাবে, মালিকের দরজা থেকে সরে পড়বে। প্রকৃত গোলামের অবস্থা এর বিপরীত। কারণ সে তার মনিবের খেদমত করতে থাকে, কোনোকিছু পাওয়ার আশায় নয়; বরং কেবল দাসত্বের দাবিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে। সে কখনো তার মনিবের দরজা ছেড়ে যায় না। তবে পলায়নকারীর কথা ব্যতিক্রম। অনেক সময় পলাতক গোলাম গোলামির মর্যাদা থেকে বের হয়ে যায়; কিন্তু সে কোথাও পূর্ণরূপে স্বাধীনতা পায় না। আসলে বান্দার চূড়ান্ত মর্যাদা রয়েছে কেবল স্বেচ্ছায় ভালোবাসার সাথে তার মালিকের দাসত্বের শৃঙ্খলে প্রবেশ করার মধ্যে, বাধ্য হয়ে বা জোরপূর্বকভাবে প্রবেশ করার মধ্যে নয়।

اَلتَّبَتُّلُ দুটি বিষয়কে একত্রিত করে : ১. পৃথক হয়ে যাওয়া এবং ২. মিলিত হওয়া। এ দুটি ব্যতীত তা বিশুদ্ধ হয় না।

১. পৃথক হয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে : অন্তর নিজের লাভ ও স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকেও অন্তর বিচ্ছিন্ন রাখবে; আল্লাহ তাআলার ভয়ের কারণে বা তাঁর প্রতি আগ্রহের কারণে বা তাঁর দিকে মনোযোগী হয়ে বা এই কথা ভেবে যে, সেগুলো অন্তরকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে দেবে। (এই জন্য নিজের লাভ ও স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে।)

২. আর মিলিত হওয়ার বিষয়টি তখনই শুদ্ধ হবে, যখন ওপরে বর্ণিত পৃথক হওয়ার বিষয়টি অর্জিত হবে। আর এটি হলো অন্তর আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া, তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া, তাঁর প্রতি ভালোবাসা, ভয়, আশা, একাগ্রতা ও তাওয়াক্কুলকে সঙ্গী করে নিজের সত্তাকে তাঁর প্রতিই ধাবিত রাখা।

التَّبَتُّل হলো প্রথমে সৃষ্টিজগৎ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, অতঃপর নিজের নফস থেকেই পৃথক হওয়া।

মানুষের সাথে অধিক মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতাকে যে জিনিসটি বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তা হলো হাকীকত বা (দুনিয়ার) প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করা। আর তা হলো এটা দেখা যে, সমস্ত বস্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে, তাঁরই তাওফীকে এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধীনেই পরিচালিত হচ্ছে। পুরা সৃষ্টিজগতের মধ্যে একটি বস্তুও এমন নেই, যা আল্লাহর দেওয়া শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীত নড়াচড়া করে, কিংবা তাঁর অনুমতি ব্যতীত ক্ষতি বা উপকার করে। সুতরাং এই উপলব্ধির পর সৃষ্টিজগতের প্রতি ধাবিত হওয়ার কী অর্থ?

দুটি বিষয়ের মাধ্যমে নিজের নফস থেকে পৃথক হওয়ার বিষয়টি হাসিল হয় :

১. প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ না করা, এর বিরোধিতা করা এবং নফসকে তা থেকে দূরে রাখা। কারণ প্রবৃত্তির অনুসরণ আল্লাহর প্রতি মগ্ন হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়।

২. প্রবৃত্তির চাহিদার বিরোধিতা করার পর আল্লাহ তাআলার সাথে ঘনিষ্ঠতার প্রফুল্লতা অনুভব করা। রূহের জন্য প্রফুল্লতা ঠিক তেমনই জরুরি, যেমন শরীরের জন্য রূহ জরুরি। রূহের জন্য এই প্রফুল্লতা ও আরাম অর্জিত হয়, যখন সে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে সময় আল্লাহর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা সুসংগঠিত হয় এবং সে এর সুঘ্রাণ পায়। কারণ নফস আবশ্যকীয়ভাবেই যেকোনো সম্পর্কে জড়াবে। সুতরাং প্রবৃত্তির সাথে যখন তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলার সাথে তার অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হবে এবং তার ওপর সুবাতাস বইতে শুরু করবে, ফলে তাকে তা সুবাসিত করবে এবং তার মাঝে নবজীবনের সঞ্চার ঘটাবে।

*****

১৫ নং মানযিল

আশা-আকাঙ্ক্ষা (اَلرَّجَاءُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আশা-আকাঙ্ক্ষার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ

"এরা যাদেরকে ডাকে, তারা তো নিজেরাই নিজেদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত।"[৩১৮]

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করার জন্য তারা যে ওসীলা বা উপায় অনুসন্ধান করে তা হলো : মহাব্বত ও দাসত্বের মাধ্যমে তার নৈকট্য তালাশ করা। সুতরাং এই আয়াতে ঈমানের তিনটি মাকামেরই আলোচনা রয়েছে, যার ওপর ঈমানের ভিত্তি: মহাব্বত, ভয় ও আশা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।"[৩১৯]

---

[৩১৮] সূরা ইসরা, ১৭ : ৫৭।

[৩১৯] সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ১১০।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللهِ ۚ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩২০]

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন আগে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

لَا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ

"তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (অর্থাৎ সবসময় আল্লাহর প্রতি উত্তম আশা পোষণ করে।)"[৩২১]

ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ فَلْيَظُنَّ بِيْ مَا شَاءَ

"আমি বান্দার সাথে সেরকমই আচরণ করি, বান্দা আমার প্রতি যেরকম ধারণা রাখে। সুতরাং তার যেমন ইচ্ছা হয়, আমার প্রতি তেমন ধারণা রাখুক।"[৩২২]

আশা হলো চালক, যা অন্তরসমূহকে আল্লাহ তাআলার দিকে এবং আখিরাতের দিকে পরিচালিত করে আর পথচলাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে।

---

[৩২০] সূরা বাকারা, ২ : ২১৮।

[৩২১] মুসলিম, ২৮৭৭।

[৩২২] ইবনু হিব্বান, ৬৩৫; বুখারি, ৭৪০৫; মুসলিম, ২৬৭৫।

বলা হয়, 'আশা হলো আল্লাহ তাআলার (সীমাহীন) দয়া ও করুণার কারণে আনন্দিত হওয়া এবং তাঁর (অসংখ্য) অনুগ্রহ ও দানের ব্যাপারে অবগত হয়ে পুলকিত হওয়া।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'আশা হলো আল্লাহ তাআলার দানশীলতার ওপর নির্ভর করা।'

اَلرَّجَاءُ এবং اَلتَّمَنِّيْ-[৩২৩] এর মধ্যে পার্থক্য : 'তামান্নি' হয় অলসতার সাথে; এটি ব্যক্তিকে পরিশ্রম ও মেহনতের পথে পরিচালিত করে না। অপরদিকে 'রজা' হয় পরিশ্রম ও উত্তম ভরসার সাথে। প্রথম ব্যক্তির উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আশায় বুক বাঁধে যে, তার এক খণ্ড জমি হবে আর সে তাতে বীজ বুনবে এবং সেখান থেকে অনেক ফসল ঘরে তুলবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে তার ভূমিতে প্রচুর পরিশ্রম করে, হালচাষ দেয়, পানি সেঞ্চন করে, বীজ বোনে, পরিচর্যা করে; অতঃপর আশা রাখে ভালো ফসল পাওয়ার।

এ কারণে আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ একমত হয়েছেন যে, আমল ছাড়া আল্লাহর প্রতি আশা যথাযথ হয় না।

শাহ কিরমানি ﷺ বলেছেন, 'আশা বিশুদ্ধ হওয়ার আলামত হলো—উত্তম আনুগত্য।'[৩২৪]

আশা তিন প্রকার : দুটি প্রশংসিত আর একটি ধোঁকা ও নিন্দিত।

প্রথম দুটি হলো : ১. সেই ব্যক্তির আশা, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নূরের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে এবং এর সাওয়াব ও প্রতিদানপ্রাপ্তির আশা করে। ২. সেই ব্যক্তির আশা, যে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়, অতঃপর তা থেকে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং সে মাগফিরাত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করে।

---

[৩২৩] বাংলায় দুটির অর্থই হয় : আশা করা, কামনা করা; তবে আরবিতে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে।

[৩২৪] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৬০।

তৃতীয় প্রকার হলো : ৩. সেই ব্যক্তি যে গুনাহ ও পাপাচারে ডুবে থাকে আর কোনো আমল না করেই আল্লাহর নিকট আশা পোষণ করতে থাকে। এটিই হলো ধোঁকা-প্রবঞ্চনার আশা, মিথ্যা আশা।

সালিক বা আল্লাহর পথে চলতে-চাওয়া ব্যক্তির দুটি দৃষ্টি থাকে : একটি দৃষ্টি থাকে তার সত্তা, ত্রুটি-দুর্বলতা এবং আমলের ঘাটতি ও কমতির প্রতি। এর ফলে তার ভেতরে ভয়ের দরজা উন্মুক্ত হয়। আরেকটি দৃষ্টি থাকে আল্লাহ তাআলার রহমত, দয়া, করুণা ও অনুগ্রহের প্রশস্ততার প্রতি। এর ফলে তার মাঝে আশার দরজা খুলে যায়।

এই কারণে আশার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন, 'আশা হলো : আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রশস্ততার দিকে দৃষ্টিপাত করা।'

আবূ আলি রূযবারি ﷺ বলেছেন, 'ভয় ও আশা হলো পাখির দুই ডানার মতো। যখন এ দুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে, তখন পাখিও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে, তার ওড়াউড়িও পূর্ণতা পায়। আর যখন এ দুটির মধ্যে কোনো একটিতে দুর্বলতা আসে, তখন তার মাঝেও দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। আর যখন দুটি ডানাই অচল হয়ে যায়, তখন পাখির মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়।'[৩২৫]

আহমাদ ইবনু আসিম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : 'বান্দার মাঝে আশার আলামত কী?' তিনি জবাব দেন, 'যখন তাকে ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ বেষ্টন করে নেয়, তখন সে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে থাকে এই আশায় যে, দুনিয়ায় তার ওপর আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামাত যেন আরও পূর্ণতা পায় এবং আখিরাতে যেন তাকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[৩২৬]

সূফিয়ায়ে কেরাম এই বিষয়ে ইখতিলাফ করেছেন যে, কোন আশাটি পরিপূর্ণ : নেক আমলকারীর নেককাজের প্রতিদানপ্রাপ্তির আশা নাকি গুনাহগার তাওবাকারীর ক্ষমা ও মাগফিরাতপ্রাপ্তির আশা?

---

[৩২৫] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৯৯৬।

[৩২৬] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্‌ক, ৭১/২২৪।

তৃতীয় প্রকার হলো : ৩. সেই ব্যক্তি যে গুনাহ ও পাপাচারে ডুবে থাকে আর কোনো আমল না করেই আল্লাহর নিকট আশা পোষণ করতে থাকে। এটিই হলো ধোঁকা-প্রবঞ্চনার আশা, মিথ্যা আশা।

সালিক বা আল্লাহর পথে চলতে-চাওয়া ব্যক্তির দুটি দৃষ্টি থাকে : একটি দৃষ্টি থাকে তার সত্তা, ত্রুটি-দুর্বলতা এবং আমলের ঘাটতি ও কমতির প্রতি। এর ফলে তার ভেতরে ভয়ের দরজা উন্মুক্ত হয়। আরেকটি দৃষ্টি থাকে আল্লাহ তাআলার রহমত, দয়া, করুণা ও অনুগ্রহের প্রশস্ততার প্রতি। এর ফলে তার মাঝে আশার দরজা খুলে যায়।

এই কারণে আশার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন, 'আশা হলো : আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রশস্ততার দিকে দৃষ্টিপাত করা।'

আবূ আলি রূযবারি ﷺ বলেছেন, 'ভয় ও আশা হলো পাখির দুই ডানার মতো। যখন এ দুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে, তখন পাখিও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে, তার ওড়াউড়িও পূর্ণতা পায়। আর যখন এ দুটির মধ্যে কোনো একটিতে দুর্বলতা আসে, তখন তার মাঝেও দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। আর যখন দুটি ডানাই অচল হয়ে যায়, তখন পাখির মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়।'[৩২৫]

আহমাদ ইবনু আসিম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : 'বান্দার মাঝে আশার আলামত কী?' তিনি জবাব দেন, 'যখন তাকে ইহ্সান বা অনুগ্রহ বেষ্টন করে নেয়, তখন সে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে থাকে এই আশায় যে, দুনিয়ায় তার ওপর আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামাত যেন আরও পূর্ণতা পায় এবং আখিরাতে যেন তাকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[৩২৬]

সূফিয়ায়ে কেরাম এই বিষয়ে ইখতিলাফ করেছেন যে, কোন আশাটি পরিপূর্ণ : নেক আমলকারীর নেককাজের প্রতিদানপ্রাপ্তির আশা নাকি গুনাহগার তাওবাকারীর ক্ষমা ও মাগফিরাতপ্রাপ্তির আশা?

---

[৩২৫] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৯৯৬।

[৩২৬] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, ৭১/২২৪।

একদল সূফিয়ায়ে কেরাম নেক আমলকারীর আশাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা তার আশা করার শক্তিশালী কারণ রয়েছে।

আরেকদল সূফিয়ায়ে কেরাম গুনাহগার তাওবাকারীর আশাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ তার আশা হলো আমলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার গর্ব-অহংকার থেকে শূন্য এবং নিজের গুনাহ ও পাপাচারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার সাথে যুক্ত।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয ﷬ বলেছেন, '(হে আল্লাহ,) আমলের সঞ্চয় সাথে নিয়ে আপনার প্রতি আমার যে আশা, তার তুলনায় গুনাহকে সাথে নিয়ে আপনার প্রতি আমার যে আশা—তা অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ আমলের ব্যাপারে ইখলাস-সংক্রান্ত বিষয়ে আমি আমার নিজের ওপরই নির্ভর করেছি, আর কীভাবেই-বা আমি তা স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত মনে করব; অথচ আমি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত?! অপরদিকে গুনাহের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি কেবল আপনার ক্ষমার ওপর নির্ভর করেছি। আর আপনি কীভাবেই-বা তা ক্ষমা করবেন না; অথচ আপনি হলেন দানশীলতার গুণে পরিপূর্ণভাবে গুণান্বিত?!'[৩২৭]

আশা সমস্ত মানযিলের চেয়ে অধিকতর সম্মানিত মানযিল

আল্লাহ-অভিমুখীদের সমস্ত মানযিলের চেয়ে অধিকতর সম্মানিত, সুউচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ মানযিল হলো আশার মানযিল। ভয়, ভালোবাসা ও আশাই হলো আল্লাহর পথে চলার ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা আশা পোষণকারীদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের গুণগান বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"[৩২৮]

---

[৩২৭] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৬১।

[৩২৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১।

বিশুদ্ধ একটি হাদীসে কুদ্‌সিতে এসেছে, নবি ﷺ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِيْ

"হে আদম সন্তান, যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার ক্ষমা পাওয়ার আশা করতে থাকবে, তোমার গুনাহ্ যত অধিক হোক, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, এতে কারও কোনো পরোয়া করব না!"[৩২৯]

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

"আমি বান্দার সাথে সেরকমই আচরণ করি, আমার প্রতি বান্দা যেরকম ধারণা রাখে।। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে; তা হলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে জনসমাবেশে স্মরণ করে, তা হলে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, তা হলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"[৩৩০]

---

[৩২৯] তিরমিযি, ৩৫৪০।

[৩৩০] বুখারি, ৭৪০৫; মুসলিম, ২৬৭৫।

আশার কয়েকটি ফায়দা ও উপকারিতা

আশার অনেক উপকারিতা ও কল্যাণ রয়েছে। তার কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. আল্লাহ্ তাআলার নিকট দয়া, অনুগ্রহ ও ইহসানের আশা করার মাধ্যমে দাসত্ব, দরিদ্রতা ও মুখাপেক্ষিতার প্রকাশ ঘটানো হয়। কারণ বান্দা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া থেকে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও অমুখাপেক্ষী নয়।

২. আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিকট এটা পছন্দ করেন যে, তারা আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা করুক, তাঁর নিকট প্রার্থনা করুক। কারণ তিনিই তো প্রকৃত মালিক, পরম দাতা; যার নিকট সবকিছু চাওয়া যায়, যিনি সবচেয়ে বেশি দান করেন, যার দান অফুরন্ত, সবকিছুর ভান্ডার তো রয়েছে তাঁরই কাছে। আল্লাহ্‌র নিকট আশা-আকাঙ্ক্ষা করলে এবং চাইলে তিনি সর্বাধিক খুশি হন। হাদীসে এসেছে—

مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ তার ওপর রাগান্বিত হন।"[৩৩১]

আর প্রার্থনাকারী হয় (রহমতের) আশা পোষণকারী ও অনুসন্ধানী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে আশা পোষণ করে না, আল্লাহ্ তার ওপর গোসসা করেন।

আশার উপকারিতাসমূহের মধ্য থেকে এটি একটি অতিরিক্ত পাওনা যে, এর দ্বারা আল্লাহ্‌র রাগ ও গোসসা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

৩. আশা হলো এমন চালক, যার দ্বারা ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে চলার অনুপ্রেরণা পায় এবং তার পথচলা স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়, এটি তাকে ধারাবাহিকভাবে পথ চলতে উদ্‌বুদ্ধ করে। যদি আশা না থাকত, কেউ পথ চলত না। কারণ শুধু ভয় ব্যক্তির ভেতর সাড়া জাগাতে পারে না। আসলে মহাব্বত-ভালোবাসা তার ভেতরটা নাড়িয়ে দেয়, ভয় তাকে অস্থির করে তোলে আর আশা তাকে পরিচালিত করে।

---

[৩৩১] তিরমিযি, ৩৩৭৩; ইবনু মাজাহ, ৩৮২৭।

৪. আশা সর্বশ্রেষ্ঠ মাকাম অর্জন করতে সহায়তা করে; সর্বশ্রেষ্ঠ মাকামটি হলো শোকরের মাকাম, যা দাসত্বের সারাংশ ও মূল। কারণ ব্যক্তি যখন তার আশার বস্তুটি পেয়ে যায়, তখন তা তাকে শোকরগুজার হতে দৃঢ়ভাবে আহ্বান জানায়।

৫. আশা আল্লাহ তাআলার উত্তম নামসমূহের অর্থ, পরিচয় ও সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যাপারে অতিরিক্ত জানাকে আবশ্যক করে। কারণ আশা ইহ্সানের নামসমূহের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোর মাধ্যমে তার দাসত্ব প্রমাণিত হয় এবং সেগুলোর দ্বারা দুআও করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

> "আল্লাহর জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ। সুতরাং সে নাম ধরেই তাঁকে ডাকো।"[৩৩২]

তাই আল্লাহ তাআলার উত্তম নামসমূহ দ্বারা দুআ করার বিষয়টিকে বেকার ভাবা উচিত নয়। কারণ দুআকারী ব্যক্তি যেসব মাধ্যম দ্বারা দুআ করে, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ তাআলার নামসমূহই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং আশার মানযিল সঠিকভাবে অর্জন করতে না পারলে, এই সমস্ত নামসমূহের মাধ্যমে ইবাদাত করা ও দুআ করাও পরিপূর্ণ হয় না; বরং সেগুলোকে বেকার ও অর্থহীন করে দেওয়ার শামিল হয়ে যায়।

৬. ভয় আশাকে আবশ্যক করে আর আশা ভয়কে আবশ্যক করে। সুতরাং প্রতিটি আশা পোষণকারী ব্যক্তিই ভয়কারী আবার প্রতিটি ভয়কারী ব্যক্তিই আশা পোষণকারী। এ কারণেই যেখানে ভয়ের আলোচনা সুন্দর, সেখানে আশার আলোচনাও সুন্দর বলে গণ্য হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾

> "তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর বড়োত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের (কাছে কোনো) আশা করছো না?"[৩৩৩]

---

[৩৩২] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮০।

[৩৩৩] সূরা নূহ, ৭১ : ১৩।

অনেক মুফাসসির বলেছেন, 'অর্থাৎ তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে ভয় করছো না? এখানে আশার অর্থ ভয়।'

আসলে একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যেক আশা পোষণকারী ব্যক্তিই তার আশার বস্তুটি হারানোর ভয় করে থাকে। আর আশাহীন ভয় হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُل لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ أَيَّامَ اللّٰهِ

"হে নবি, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দিন, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কঠিন দিন আসার ভয় করে না, তাদের আচরণসমূহ যেন (মুমিনরা) ক্ষমা করে দেয়।"[৩৩৪]

মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'অর্থাৎ তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুঃখ-দুর্দশা আসার ভয় করে না; যেমন তিনি দুঃখ-দুর্দশা ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন করেছিলেন পূর্ববর্তী জাতিদের।' (অর্থাৎ এই আয়াতে يَرْجُوْنَ দ্বারা ভয় করা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।)

৭. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিকট দাসত্বের পরিপূর্ণতা কামনা করেন; বিনম্রতা, বিগলিত অবস্থা, তাওয়াক্কুল, সাহায্য প্রার্থনা, ভয়, আশা, সবর, শোকর, সন্তুষ্টি, তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি বান্দার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ চান। আর এ কারণেই তিনি বান্দার জন্য গুনাহ ও পাপে জড়িয়ে পড়া আবশ্যক করে দিয়েছেন। যাতে সে তাওবা করে তার দাসত্বের স্তর পরিপূর্ণ করে নিতে পারে; যা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়। এমনিভাবে ভয় ও আশার মাধ্যমে দাসত্ব পরিপূর্ণ করাও আল্লাহ তাআলার নিকট অনেক পছন্দনীয়।

৮. আশা করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের যে অপেক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যাশা রয়েছে, তা ব্যক্তির অন্তরকে সবসময় আল্লাহর স্মরণ করা এবং তাঁর নাম ও গুণসমূহের প্রতি খেয়াল রেখে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়াকে আবশ্যক করে, অন্তরকে সেই নাম ও গুণাবলির মনোরম বাগানে পৌঁছিয়ে দেয় এবং প্রতিটি নাম ও গুণ থেকে তার করণীয় ও বর্জনীয় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

[৩৩৪] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৪।

যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যখন আশা থাকে না, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া লাভের প্রত্যাশা ও অপেক্ষা থাকে না, তখন অন্তর আল্লাহ তাআলার উত্তম নামসমূহ ও গুণাবলির অর্থ অনুধাবন করতে এবং সেখান থেকে নিজের অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

এমনিভাবে আশার আরও অসংখ্য উপকারিতা ও কল্যাণ রয়েছে, কেবল সেই ব্যক্তিই এই সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হতে পারে, যে তা অনুসন্ধান করতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফীকদাতা।

*****

১৬ নং মানযিল

আগ্রহী হওয়া (اَلرَّغْبَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -এর আরেকটি মানযিল হলো—আগ্রহী হওয়ার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا

"তারা আগ্রহ ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত।"[৩৩৫]

اَلرَّغْبَةُ এবং اَلرَّجَاءُ এর মাঝে পার্থক্য : 'রজা' হচ্ছে আশা করা আর 'রগবত' হচ্ছে অনুসন্ধান করা। সুতরাং আশা করার ফল হলো অনুসন্ধান করা। কারণ কেউ কোনো জিনিস পেতে আশা করলে, তা সন্ধান করে। রগবত ও রজার সম্পর্ক হচ্ছে ভয় ও পলায়ন করার মতো। যেমন কেউ যখন কোনো বস্তুকে ভয় করে, তখন তার থেকে পলায়ন করে, ঠিক তেমনি কেউ যখন কোনোকিছু আশা করে, তখন তার প্রতি আগ্রহী হয় এবং তা পাওয়ার সন্ধান করতে থাকে।

মূলকথা : আশা-আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি অনুসন্ধান করে আর ভীত ব্যক্তি পলায়ন করে।

اَلرَّغْبَةُ হলো অদৃশ্য জিনিসের অনুসন্ধান করা; ফলে এর অর্জন নিশ্চিত নয়। কারণ মুমিন বান্দা জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়, কিন্তু তাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। আশা যখন শক্তিশালী হয়, তখন তা অনুসন্ধানে পরিণত হয়।

রগবত বা আগ্রহ তৈরি হয় ইলম থেকে; ফলে তা পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং অলসতা করা থেকে পথিককে বাঁচিয়ে রাখে।

---

[৩৩৫] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৯০।

এই আগ্রহ ও অনুসন্ধান বাড়তেই থাকে। একপর্যায়ে তা ইহসানের স্তরে উন্নীত হয়; আর তা হলো—

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

"আপনি আল্লাহ তাআলার ইবাদাত এমনভাবে করবেন, যেন তাঁকে দেখছেন।"

সুতরাং রাগিব বা অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি যে সমস্ত বিপদাপদে পতিত হয়, তার কোনো পরোয়া করে না। তার আগ্রহ-উদ্দীপনাকে (বিপদাপদের কারণে) তাকদীরের দোহাই দিয়ে দমিয়ে রাখা যায় না এবং তার সংকল্প ও উচ্চ হিম্মতে কোনো প্রকার নির্জীবতা স্থান পায় না।

*****

১৭ নং মানযিল

যত্ন নেওয়া ও সংরক্ষণ করা (اَلرِّعَايَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—যত্ন নেওয়া ও সংরক্ষণ করার মানযিল।

এটি হলো আমলের মাধ্যমে ইলমের যত্ন নেওয়া ও সংরক্ষণ করা। ইহ্সান ও ইখলাসের মাধ্যমে আমলকে সংরক্ষণ করা এবং তা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর একতাবদ্ধ হয়ে থাকা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে নিজের অবস্থাকে সংরক্ষণ করা। সুতরাং اَلرِّعَايَةُ অর্থ হলো যত্ন নেওয়া ও সংরক্ষণ করা।

ইলম ও আমলের তিনটি স্তর রয়েছে :

১. রিওয়ায়াহ (اَلرِّوَايَةُ) : এটি হলো কেবল বর্ণনা করা এবং বর্ণনাকৃত বিষয়কে (অপরের কাছে) বহন করা।

২. দিরায়াহ (اَلدِّرَايَةُ) : এটি হলো মর্ম উপলব্ধি করা।

৩. রিআয়াহ (اَلرِّعَايَةُ) : এটি হলো ইলম অনুযায়ী আমল করা ও ইলমের চাহিদা পূরণ করা।

হাদীস বর্ণনাকারীদের ব্যস্ততা রিওয়ায়াহ নিয়ে, উলামায়ে কেরামের ব্যস্ততা দিরায়াহ নিয়ে আর আরিফ বা মা'রিফাতের অধিকারী ব্যক্তিগণ মগ্ন থাকেন রিআয়াহ নিয়ে।

যারা নিজের আমলের যত্ন নেয় না, যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে না আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ

رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"তাদের পরে আমি একে একে আমার রাসূলদের পাঠিয়েছি। তাদের সবার শেষে মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, তাঁকে ইনজীল দিয়েছি এবং তাঁর অনুসারীদের মনে দয়া ও করুণার সৃষ্টি করেছি। আর বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি ওটা তাদের ওপর ফরজ করিনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা নিজেরাই এ বিদআত বানিয়ে নিয়েছে। তারপর সেটি যেভাবে মেনে চলা দরকার, সেভাবে মেনে চলেনি।"[৩৩৬]

এই আয়াতে তাদের নিন্দা করা হয়েছে, যারা নিজেদের জন্য অতিরিক্ত আমল আবশ্যক করে নিয়েছে; কিন্তু তা যথাযথভাবে পালন করেনি। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদাতসংক্রান্ত কোনোকিছুকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়, যা আল্লাহ তার ওপর আবশ্যক করেননি, তা হলে তার ওপর সেই আমল পরিপূর্ণ করা আবশ্যক হয়ে যায়।

এমনকি যে ব্যক্তি কোনো মুস্তাহাব আমল শুরু করে, তার জন্য তা পূর্ণ করাকে অনেক ফুকাহায়ে কেরাম ওয়াজিব বলে অভিমত দিয়েছেন। যেমন মান্নত করলে আমল পুরা করা আবশ্যক হয়, তেমনি আমল শুরু করার পর তা পূর্ণ করাকে তারা আবশ্যক বলেছেন। এই অভিমত দিয়েছেন ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালিক এবং একটি বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমাদ ﵀। এটির ওপর উলামায়ে কেরামের ইজমা বা ইজমার মতো ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে।

তারা বলেন : আমল শুরু করার কারণে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়া, কথার কারণে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সুতরাং (কথার মাধ্যমে) মান্নত করার কারণে বান্দা যে আমল নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়, তা যেমন সম্পন্ন করা ওয়াজিব, ঠিক তেমনি আমল শুরু করার দ্বারা বান্দা নিজের ওপর যে আমল আবশ্যক করে নেয়, তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

---

[৩৩৬] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৭।

এই আলোচনার মূলকথা হলো : আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির নিন্দা করেছেন, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য আল্লাহ আদেশ করেননি এমন কোনো ইবাদাতকে যে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়, তারপর তা যথাযথভাবে পালন করে না এবং তা সংরক্ষণ করে না। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত আমলের আদেশ করেছেন, অনুমতি দিয়েছেন এবং যেগুলো পালন করতে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলো যে ব্যক্তি যথার্থভাবে পালন করে না এবং যত্ন নেয় না, সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আচরণ কেমন হবে?!

আমলের যত্ন নেওয়া ও সংরক্ষণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : আমলকে অল্প মনে করে যথাযথভাবে তা আদায় করা এবং নিজের আখিরাতের সঞ্চয়কে বৃদ্ধি করা, আমলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে একাগ্রচিত্তে তা পালন করতে থাকা এবং ইলম অনুসারে আমল করা। শুধু ভালো লাগার ওপর ভিত্তি করে আমল করা যাবে না, শারীআহ্ সম্মত হলো কি না তা খেয়াল রাখা।

আমল যথাযথভাবে আদায় করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : দুই প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত থাকা : ১. শিথিলতাও না করা আবার ২. শারীআত নির্ধারিত সীমা, গুণাবলি, শর্ত, সময় ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও না করা।

আমলকে অল্প মনে করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : বান্দার চোখে তা তুচ্ছ ভাবা ও বেশি মনে না করা। আসলে আল্লাহ তাআলার মর্যাদা, সম্মান ও বান্দার ওপর তাঁর দাসত্ব পাওয়ার যে অধিকার, তা কোনো বান্দা পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়। আর কারও জন্য এটা সমীচীন নয় যে, সে নিজের আমলের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ও খুশি হয়ে যাবে।

কেউ কেউ বলেছেন, বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির আলামত হলো : বান্দার নিজের নফসের ওপর অসন্তুষ্ট থাকা। আর আমল কবুল হওয়ার আলামত হলো : আমলকে তুচ্ছ মনে করা, অল্প ভাবা এবং বান্দার অন্তরে তা ক্ষুদ্র বলে উপলব্ধি হওয়া। আসলে আরিফ বা আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তিরা নেককাজ করার পরপরই (তা আল্লাহর শান মোতাবিক না হওয়ার আশঙ্কায়) আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতের সালাম ফেরাতেন, তখন তিনবার

ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।[৩৩৭] আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের হাজ্জ আদায় করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছেন।[৩৩৮] শেষরাতে সালাত আদায়ের পর বান্দার ইস্তিগফার পাঠ করাকে তিনি প্রশংসা করেছেন।[৩৩৯]

আসলে যে ব্যক্তি তার রবের দেওয়া নিয়ামাত প্রত্যক্ষ করে এবং নিজের আমলের পরিমাণ ও তার দোষত্রুটি সম্পর্কে ধারণা রাখে, সেই ব্যক্তি তার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা ব্যতীত এবং নিজেকে ও নিজের আমলকে তুচ্ছ মনে করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখে না।

আমলসমূহ পালন করতে থাকার অর্থ হলো : সেগুলোর হকসহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করা এবং সেগুলো নিয়মিতভাবে পালন করা।

আমলের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ার অর্থ হলো : আমলের দিকে মনোযোগ না দেওয়া, বারবার গণনা না করা এবং স্মরণ না করা; এগুলোর মাধ্যমে অহংকার ও আত্মগর্ব আসার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ এর দ্বারা ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টি থেকে সরে যায় এবং তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়।

ইলম অনুসারে আমল করার অর্থ হলো : ইলমের দাবি অনুসারে আমল করা; যা নুবুওয়াতের উৎস থেকে গৃহীত। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে রাজি-খুশি করার জন্যই আমল করা। মানুষের নিকট উত্তম ও সুসজ্জিত হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

*****

---

[৩৩৭] মুসলিম, ৫৯১; আবূ দাউদ, ১৫১৩।

[৩৩৮] আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৯)

[৩৩৯] আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।" (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৮)

১৮ নং মানযিল

গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া (اَلْمُرَاقَبَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—(আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখছেন, এই চিন্তার প্রতি) গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيٓ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

"আর জেনে রেখো, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাকো।"[৩৪০]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾

"আল্লাহ সবকিছু দেখাশুনা করছেন।"[৩৪১]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

"তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।"[৩৪২]

---

[৩৪০] সূরা বাকারা, ২ : ২৩৫।

[৩৪১] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫২।

[৩৪২] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৪।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾

"সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন?"[৩৪৩]

এ বিষয়ে এ রকম আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

হাদীসে জিবরীলে এসেছে, জিবরীল ﷺ নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ইহ্‌সান কী?' তখন নবি ﷺ জবাবে বলেছিলেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"ইহ্‌সান হলো : তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তাঁকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখো, তা হলে (নিশ্চিতভাবে এই উপলব্ধি করবে যে,) তিনি তোমাকে দেখছেন।"[৩৪৪]

اَلْمُرَاقَبَةُ হলো : সবসময় বান্দার এই ইলম ও বিশ্বাস থাকা যে, আল্লাহ তাআলা তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত আছেন। দিন ও রাতের প্রতিটি মুহূর্ত এই জ্ঞান ও বিশ্বাস লালন করার নামই হচ্ছে 'মুরাকাবা'। এটি হলো প্রতিটি ওয়াক্তে, প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসে এবং প্রতিটি চোখের পলকে আল্লাহ তাআলা বান্দার পর্যবেক্ষক, তার প্রতি দৃষ্টিপাতকারী, তার কথার শ্রবণকারী, তার সমস্ত আমল সম্পর্কে জ্ঞাত—এই ইলমেরই ফল।

মুরাকাবা থেকে গাফিল ও অসতর্ক ব্যক্তিরা আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তিদের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই বহুদূরে অবস্থান করে। তাহলে আল্লাহকে-চিনতে-ইচ্ছুক-ব্যক্তিদের 'হাল' বা বিশেষ অবস্থা থেকে তারা কতদূরে? আর আরিফ বা আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অবস্থার সাথে তো তাদের কথা চিন্তাও করা যায় না!

জারীরি ﷺ বলেছেন, 'আমাদের এই বিষয়টি দুইটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত :

১. আপনার নফসকে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন করা এবং

---

[৩৪৩] সূরা আলাক, ৯৬ : ১৪।

[৩৪৪] বুখারি, ৫০; মুসলিম, ৮।
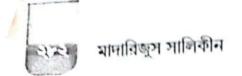
২. আপনার বাহ্যিক কাজকর্ম ইলমের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া।'[৩৪৫]

কেউ কেউ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার অন্তরের চিন্তাভাবনার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তার বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্মের ক্ষতি থেকে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে দেন।'

তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'রাখাল কখন বকরিপালকে তার লাঠির দ্বারা অনিরাপদ বিচরণক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে নেবে?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'যখন সে জানবে, তার ওপরে একজন পর্যবেক্ষণকারী রয়েছে।'[৩৪৬]

জুনাইদ বাগদাদি ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তির মুরাকাবা বা গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার মানযিল হাসিল হয়, সে তার রবের (সান্নিধ্য থেকে) এক মুহূর্ত বঞ্চিত থাকারও ভয় করে; অন্য কিছুর ভয় করে না।'[৩৪৭]

যুন-নূন মিসরি ﷺ বলেছেন, 'মুরাকাবার আলামত হলো :

১. আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন, সবকিছুর ওপর সেগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া,

২. আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়কে সম্মান দিতে বলেছেন, সেগুলোকে সম্মান দেওয়া আর

৩. আল্লাহ তাআলা যেগুলোকে ছোটো বলে গণ্য করেছেন, সেগুলোকে ছোটোই বিবেচনা করা।'[৩৪৮]

কেউ কেউ বলেছেন, 'আশা আপনাকে আনুগত্য করতে অনুপ্রেরণা দান করবে, ভয় আপনাকে গুনাহ থেকে দূরে রাখবে আর গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া আপনাকে বস্তুর হাকীকত বা প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করার রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে।'[৩৪৯]

বলা হয়েছে, 'মুরাকাবা হলো প্রতিটি চিন্তা ও পদক্ষেপে সত্যের মানদণ্ডে অন্তরকে

---

[৩৪৫] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/৩৩১।

[৩৪৬] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৮৮০।

[৩৪৭] তাজুদ্দীন ইবনুস সুবকি, তবাকাতুশ-শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ২/২৬৫।

[৩৪৮] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১৫২৮।

[৩৪৯] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/৩৩১।

যাচাই করা এবং সত্যের খেয়াল রাখা।'[৩৫০]

ইবরাহীম খাওয়াস ﵀ বলেছেন, 'মুরাকাবা হলো বান্দার বাহির ও ভেতর একমাত্র আল্লাহর জন্য আন্তরিক রাখা।'[৩৫১]

বলা হয়েছে, 'আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে মানুষ নিজের নফসের ওপর যা আবশ্যক করে নেয়, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো : নিজের হিসাব গ্রহণ করা, গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া এবং আমলকে ইলম অনুযায়ী পরিচালিত করা।'

আবূ হাফ্স ﵀ আবূ উসমান নিশাপূরি ﵀-কে বলেছেন, 'যখন তুমি মানুষের সামনে (উপদেশ দেওয়ার জন্য) বসবে, তখন নিজের কল্ব ও নফসকেই উপদেশ দেওয়ার নিয়ত রাখবে। আর তোমার কাছে লোকজনের সমবেত হওয়া যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে দেয়। কারণ তারা তো তোমার বাইরের অবস্থা দেখে আর আল্লাহ্ দেখেন তোমার ভেতরের অবস্থা।'[৩৫২]

আল্লাহর-পথের-অভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ একমত পোষণ করেছেন যে, বাহ্যিক কাজকম সুরক্ষিত থাকার মাধ্যম হলো : আল্লাহকে নিয়ে অন্তরে গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি তার গোপন অবস্থাতেও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকবে, তার বাহ্যিক কাজকর্মের অনিষ্টতা থেকে প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাকে হেফাজত করবেন।

মুরাকাবা হলো : اَلرَّقِيْبُ (পর্যবেক্ষণকারী), اَلْحَفِيْظُ (হেফাজতকারী), اَلْعَلِيْمُ (সর্বজ্ঞানী), اَلسَّمِيْعُ (সর্বশ্রোতা), اَلْبَصِيْرُ (সর্বদ্রষ্টা) আল্লাহ তাআলার এই নামগুলোর উত্তমরূপে দাসত্ব করা। যে ব্যক্তি এই নামগুলোর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবে, এগুলোর দাবি অনুযায়ী ইবাদাত করবে, কেবল তারই মুরাকাবা বা গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার মানযিল অর্জন হবে। আল্লাহ্ তাআলাই অধিক জানেন।

*****

---

[৩৫০] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/৩৩১।

[৩৫১] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/৩৩১।

[৩৫২] ইমাম গাযালি, ইহইয়াউ উলূমিদ দ্বীন, ৪/৩৯৭।

১৯ নং মানযিল

আল্লাহর সম্মানিত বস্তুসমূহকে সম্মান করা (تَعْظِيْمُ حُرُمَاتِ اللهِ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আল্লাহ তাআলার সম্মানিত বস্তুসমূহকে সম্মান করার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ

> "আর যে কেউ আল্লাহর সম্মানিত বস্তুসমূহের সম্মান করবে, তার জন্য তার রবের কাছে তা উত্তম (বলে গণ্য হবে)।"[৩৫৩]

অনেক মুফাসসির বলেছেন, 'এখানে আল্লাহর সম্মানিত বস্তুসমূহ (حُرُمَاتُ اللهِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : তাঁর অবাধ্যতা ও তাঁর নিষেধকৃত বস্তুসমূহ। আর একে সম্মান করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : সেগুলোতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা।'

লাইস ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর সম্মানিত বস্তুসমূহ হলো : যে কাজে লিপ্ত হওয়া হালাল নয়।'[৩৫৪] আরেক দল বলেছেন, 'হুরুমাতুল্লাহ হলো : আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধ।'

যাজ্জাজ ﷺ বলেছেন, 'তা হলো : যা পালন করা ওয়াজিব এবং যে ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা হারাম।'[৩৫৫] একদল বলেছেন, 'এখানে হুরুমাত দ্বারা

---

[৩৫৩] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩০।

[৩৫৪] বাগাবি, তাফসীর, ৫/৩৮৩।

[৩৫৫] বাগাবি, তাফসীর, ৫/৩৮৩।

উদ্দেশ্য হলো : সময় ও স্থান বিবেচনায় হাজ্জের পালনীয় বিধিবিধান ও নিদর্শনাদি।'

তবে সঠিক অভিমত হলো : হুরুমাতুল্লাহ এগুলোর সব কয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। حُرُمَاتٌ হলো حُرْمَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো : যা শ্রদ্ধা করা ও হেফাজত করা ওয়াজিব; যেমন : অধিকার, ব্যক্তি, সময় ও স্থান। আর এর সম্মান করার অর্থ হলো: এর হক যথাযথভাবে আদায় করা এবং তা নষ্ট না করে সংরক্ষণ করা।

শাস্তির ভয় ও সাওয়াবের আশা না করে ইবাদাত করা কি সম্মান-প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত?

এ সম্পর্কে সূফিয়ায়ে কেরামের অনেক আলোচনা রয়েছে। মানুষ এই গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের অনেক বেশি সম্মান করে এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, এটিই হলো দাসত্বের সর্বোচ্চ স্তর। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণরূপে মেনে চলবে; তবে তা তাঁর শাস্তির ভয়ে কিংবা সাওয়াব পাওয়ার আশায় নয়।

কারণ এটি হলো কেবলই নিজস্বার্থ চিন্তা ও সুবিধা ভোগ। আর মহাব্বত এই বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ ভক্ত তার প্রিয় মানুষের মহাব্বতে কোনো স্বার্থ অনুসন্ধান করে না। কেউ যদি তা স্বার্থের কারণে করে, তা হলে তার মহাব্বত ও ভালোবাসা ত্রুটিযুক্ত। আর সাওয়াবের আশা করার মাঝে এই বিষয়টি লুকায়িত রয়েছে যে, বান্দা নিজ আমলের দ্বারা আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার জন্য নিজেকে হকদার মনে করে থাকে। এর মধ্যে দুটি বিপদ রয়েছে : ১. পুরস্কার পাওয়ার কামনা এবং ২. নিজ আমল সম্পর্কে উত্তম ধারণা। কারণ তার আমলের দ্বারাই তো সে নিজেকে পুরস্কার ও প্রতিদান পাওয়ার হকদার মনে করে বসে আছে। অপরদিকে শাস্তির ভয় করা মানে নিজের নফসের সাথে ঝগড়া করা। কারণ যখনই কোনো হুকুমের বিপরীত হবে, তখনই ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে, নিজের নফসকে বলতে থাকবে, 'তুমি কি জাহান্নামের আগুনকে ভয় করো না? এর আযাব ও জাহান্নামিদের জন্য আল্লাহ কী কঠিন শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন তার কি কোনো পরোয়া করো না?' তার মাঝে ও তার নফসের মাঝে এই বাগ্‌বিতণ্ডা চলতেই থাকবে।

সে এই ঝগড়া ও বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে রেহাই পাবে না কখনো। এ থেকে মুক্তি মিলবে কেবল তখনই, যখন আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালন করবে কোনো ধরনের স্বার্থচিন্তা ছাড়াই। বরং শুধু আদেশকারী ও নিষেধকারী আল্লাহর সম্মানার্থে তা পালন করে যাবে, এই বিশ্বাস রাখবে যে, তিনিই একমাত্র ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত সত্তা, যাঁর সম্মানিত বস্তুসমূহকে (আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি) সম্মান দেখানো এবং মেনে চলা অবশ্যকর্তব্য। যদি তিনি জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি নাও করতেন, তবুও তিনি সত্তাগতভাবে ইবাদাত, সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার একচ্ছত্র অধিকার রাখতেন। সুতরাং পবিত্র ও সুউচ্চ গুণাবলির অধিকারী নফস তাঁর ইবাদাত করতে থাকে কোনোকিছু পাওয়ার আশায় কিংবা ক্ষতি থেকে বাঁচতে নয়; বরং তিনি সত্তাগতভাবেই উপযুক্ত যে, তাঁর ইবাদাত করা হবে, তাঁকে সম্মান দেখানো হবে, তাঁকে মহাব্বত করা হবে; তিনি সবকিছুর প্রকৃত মালিক এবং তিনি দাসত্ব লাভের একমাত্র সত্তা। তারা বলেন, বান্দা কখনো শ্রমিকের ন্যায় হতে পারে না যে, পারিশ্রমিক পেলে কাজ করবে আর না পেলে কাজ করবে না। সে যদি এ রকম করে, তা হলে সে হবে প্রতিদানের গোলাম; মহাব্বত ও স্বেচ্ছায় গোলাম নয়।

তারা বলেন : এ ক্ষেত্রে আমলকারীগণ দুইটি মানযিলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে : ১. প্রতিদানের মানযিল এবং ২. অনুসরণীয় সত্তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মানযিল। আল্লাহ তাআলা দাঊদ ﷺ-এর ব্যাপারে বলেছেন,

وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ۝٢٥

> “নিশ্চয়ই আমার কাছে তাঁর জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রতিদান।”[৩৫৬]

আয়াতে উল্লেখিত زُلْفَىٰ হলো : নৈকট্যের মানযিল আর حُسْنَ مَـَٔابٍ হলো : উত্তম সাওয়াব ও প্রতিদানের মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ

---

[৩৫৬] সূরা সাদ, ৩৮ : ২৫।

"যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি।"[৩৫৭]

এখানে اَلْحُسْنَىٰ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : প্রতিদান ও পুরস্কারের মানযিল। আর اَلزِّيَادَةُ হলো : নৈকট্যের মানযিল। এ কারণেই এর তাফসীর করা হয় 'আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ' বলে।

তারা বলেন : আরিফ বা আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আমল হয় নৈকট্যের মানযিল ও মর্তবাকে কেন্দ্র করে আর সাধারণ আমলকারীদের আমল হয় সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়াকে কেন্দ্র করে। এ দুয়ের মাঝে রয়েছে বিশাল ব্যবধান।

অপর একটি দল এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অপরিণামদর্শী ও চিন্তাশূন্য দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করেছেন। এর বিপক্ষে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন নবি-রাসূল-সিদ্দীকদের অবস্থা, তাঁদের দুআ, আল্লাহর নিকট তাঁদের প্রার্থনা, জাহান্নামকে ভয় করা এবং জান্নাতের প্রত্যাশা করার কারণে তাঁদের প্রশংসা ইত্যাদিকে। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা তাঁর রহমতের আশা রাখে এবং শাস্তির ভয় করে; যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি-রাসূলদের ব্যাপারে বলেছেন,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

"আর যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তাঁর রবকে ডেকে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না আর সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।' ফলে আমি তাঁর দুআ কবুল করেছিলাম এবং তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া, আর তাঁর স্ত্রীকে তাঁর জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম। তারা সৎকাজে আপ্রাণ চেষ্টা করত, আমাকে ডাকত আশা ও ভীতি সহকারে এবং আমার সামনে ছিল অবনত হয়ে।"[৩৫৮]

---

[৩৫৭] সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬।

[৩৫৮] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৯-৯০।

অর্থাৎ আমার নিকট যা রয়েছে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে এবং আমার কঠিন শাস্তির ভয়ে। এই আয়াতে إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا "তারা সৎকাজে আপ্রাণ চেষ্টা করত, আমাকে ডাকত আশা ও ভয় নিয়ে"—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই সূরাতে যেসকল নবি-রাসূলদের আলোচনা এসেছে তারা সবাই। অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত এটিই।

আর তাদের সবার নিকট اَلرَّغَبُ وَالرَّهَبُ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহর রহমতের আশা করা এবং জাহান্নামের ভয় করা।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দাদের আলোচনা করে তাদের আমলের প্রশংসা করেছেন। আর প্রশংসিত আমলের একটি হলো : তাঁর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾

"তারা দুআ করতে থাকে, 'হে আমাদের রব, জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, এর আযাব তো সর্বনাশা। আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়োই নিকৃষ্ট জায়গা।"[৩৫৯]

আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে এটিও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা তাদের ঈমানের ওসীলায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

"যারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।"[৩৬০]

তারা আল্লাহ নিকট তাদের ঈমানকে সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম বানিয়েছেন এবং এর ওসীলায় জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

---

[৩৫৯] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৫-৬৬।

[৩৬০] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৬।

নবি ﷺ তাঁর উম্মাতকে আদেশ করেছেন যে, দুআ কবুলের সময় অর্থাৎ আযানের পরপরই তারা যেন তাঁর জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ মানযিল প্রাপ্তির জন্য দুআ করে। তিনি এটিও জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা তাঁর জন্য এই দুআ করবে, তাদের জন্য তাঁর সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৩৬১]

একবার সুলাইম আনসারি ﷺ নবি ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আমি তো আল্লাহ তাআলার নিকট জান্নাতের প্রার্থনা করি আর জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই। কিন্তু আপনার ও মুআযের গুনগুনানি ভালোমতো শুনতে পারি না। (ফলে, আপনারা দুআয় কী বলেন তা বুঝি না)। তখন নবি ﷺ বলেছিলেন, "আমি আর মুআয আমরাও তোমার দুআর কাছাকাছিই গুনগুন (দুআ) করি।"[৩৬২]

আসলে কুরআন মাজীদ ও পবিত্র সুন্নাহয় আল্লাহর এমন বান্দা ও ওলিদের প্রশংসায় ভরপুর, যারা জান্নাত লাভের প্রার্থনা করে ও এর আশা রাখে এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চায় ও এর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে।

তারা বলেন : নবি ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন,

اِسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اِسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

"তোমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পানাহ চাও, তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের শাস্তি থেকে পানাহ চাও, তোমরা আল্লাহর কাছে মাসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাও, তোমরা আল্লাহর কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে পানাহ চাও।"[৩৬৩]

যেই ব্যক্তি জান্নাতে নবি ﷺ-এর সান্নিধ্য পাওয়ার কামনা করেছিল, সেই ব্যক্তিকে তিনি বলেছিলেন,

فَأَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ

[৩৬১] মুসলিম, ৩৮৪।

[৩৬২] আবূ দাউদ, ৭৯২; ইবনু মাজাহ, ৯১০।

[৩৬৩] তিরমিযি, ৩৬০৪।

"তা হলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদার মাধ্যমে (অর্থাৎ বেশি বেশি সালাত আদায় করে) তোমার নিজের জন্য আমাকে সাহায্য করো।"[৩৬৪]

তারা বলেন : উম্মাতের নিকট নবি ﷺ-এর এটা মাকসূদ বা উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা জান্নাত লাভের জন্য এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমল করবে। যাতে তারা সবসময় এ দুটিকে স্মরণে রাখে, কখনো ভুলে না যায়। এর আরেকটি কারণ হলো : আখিরাতে নাজাত পাওয়ার জন্য জান্নাত-জাহান্নামের ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। আর জান্নাত লাভের আশায় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার আগ্রহে আমল করা এটি খাঁটি ঈমানের পরিচয়। (কারণ পুরা দ্বীনের ওপর ঈমান না থাকলে কারও থেকে এমনটি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।)

তারা বলেন : নবি ﷺ তাঁর সাথিসঙ্গীদের ও পুরা উম্মাহকে জান্নাত লাভের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করতেন, জান্নাতের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিতেন, যাতে করে তারা তা পাওয়ার কামনা করে এবং সে জন্য আমল করে। তিনি বলেছেন,

أَلَا مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ الجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُوْرٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَقَصْرٌ مَشِيْدٌ وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ وَفَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ نَضِيْجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيْلَةٌ وَحُلَلٌ كَثِيْرَةٌ فِيْ مَقَامٍ أَبَدًا فِيْ حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ فِيْ دَارٍ عَالِيَةٍ سَلِيْمَةٍ بَهِيَّةٍ

"জান্নাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী কেউ কি আছে? কারণ কা'বার রবের কসম! জান্নাতের সমতুল্য আর কিছু নেই। তার এমন আলো রয়েছে, যা চারদিক ঝলমল করে তোলে। তার পুষ্পরাজি সুবাস ছড়ায়। যাতে রয়েছে সুরম্য মজবুত অট্টালিকা, অবিরাম প্রবাহমান নদী, সুমিষ্ট পাকা ফলের প্রাচুর্য, অলংকারে সুসজ্জিতা পরমা সুন্দরী স্ত্রী, সবুজ শ্যামলিমার নিয়ামাতে ভরপুর চিরস্থায়ী বাসস্থান, গগনচুম্বী নিরাপদ ও মনোরম বাড়িঘর।"

সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم জবাব দেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তার জন্য আমরাই প্রস্তুতি গ্রহণ করব।'

---

[৩৬৪] মুসলিম, ৪৮৯।

তিনি বলেন,

قُوْلُوْا إِنْ شَاءَ اللهُ

"তোমরা বলো, 'ইন শা আল্লাহ', আল্লাহ যদি চান।"[৩৬৫]

এখন যদি আমরা হাদীসে উল্লেখিত নবি ﷺ-এর এই রকম বাণী নিয়ে আলোচনা শুরু করি যে, 'যে ব্যক্তি এই এই আমল করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন', তা হলে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে বিশালাকার ধারণ করবে। আসলে এ রকম অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। তিনি এ রকম করে বলেছেন যাতে তারা জান্নাতের আশায় সেই আমল করতে উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং জান্নাতই যেন হয় তাদের আগ্রহের বিষয়।

তারা বলেন : প্রতিদানপ্রাপ্তির আশায় ও শাস্তির ভয়ে আমল করলে তা কীভাবে ত্রুটিযুক্ত বলে গণ্য হবে?! অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওপর উদ্‌বুদ্ধ করেছেন এবং এ রকমভাবে বলেছেন, যে ব্যক্তি এই আমল করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে...!

তারা বলেন : এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর নিকট জান্নাতের প্রার্থনা করে এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়। কারণ আল্লাহ তাআলার নিকট চাইলে তিনি খুশি হন এবং না চাইলে তিনি রাগান্বিত হন। আর তাঁর কাছে যা চাওয়া হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে বড়ো হলো : জান্নাত এবং যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, তার মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ও খারাপ হলো : জাহান্নাম।

সুতরাং জান্নাত লাভের আশায় এবং জাহান্নামের ভয়ে আমল করা আল্লাহ তাআলার নিকট অতি প্রিয় ও সন্তুষ্টিজনক। জান্নাত অনুসন্ধান করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়া হলো রবের দাসত্ব। আর অপূর্ণাঙ্গ দাসত্বের চেয়ে পরিপূর্ণরূপে দাসত্বের পরিচয় দেওয়াই হলো উত্তম। (যারা জান্নাতের আশা করে না এবং জাহান্নামের ভয় করে না, তাদের দাসত্ব হয় অপূর্ণাঙ্গ।)

তারা বলেন : যখন কোনো আমলকারী জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি দৃষ্টি দেবে

---

[৩৬৫] ইবনু মাজাহ, ৪৩৩২।

না, জান্নাতের আশা-আকাঙ্ক্ষা করবে না, তখন তার সংকল্প নিস্তেজ হয়ে যাবে, তার হিম্মত দুর্বল হয়ে পড়বে, চলার অনুপ্রেরণা সে হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু যখন তার জান্নাত পাওয়ার তীব্র বাসনা জন্মাবে, তখন এর জন্য আমল করার প্রতি উদ্‌বুদ্ধকারীও বেশ শক্তিশালী হবে, তার সংকল্প ও পথচলার ইচ্ছাও সুদৃঢ় হবে এবং এর জন্য তার পরিশ্রমও পূর্ণতা পাবে। আসলে এই বিষয়টি সুস্থ রুচিবোধের দ্বারাই জানা যায়।

তারা বলেন : এটি যদি শারীআহ-প্রণেতার উদ্দেশ্য না হতো, তা হলে তিনি তার বান্দাদের জন্য জান্নাতের বর্ণনা দিতেন না, তাদের সামনে তা সুসজ্জিত ও লোভনীয়রূপে ফুটিয়ে তুলতেন না, তাদের নিকট তা পেশ করতেন না এবং তাদেরকে এর বিস্তারিত বিবরণ শুনাতেন না, যে পর্যন্ত তাদের চিন্তাভাবনা কখনো পৌঁছার কথা ছিল না। এ সবগুলো তিনি করেছেন জান্নাতের প্রতি বান্দাদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য এবং তা হাসিল করতে যথাযথ প্রস্তুতি নেবার জন্য।

তারা বলেন : আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

وَاللّٰهُ يَدْعُوْ إِلٰى دَارِ السَّلَامِ

“আর আল্লাহ্ শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর(—জান্নাত)-এর দিকে আহ্বান করেন।”[৩৬৬]

এটি হলো সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা এবং জান্নাতের প্রতি তৎপর হওয়া এবং দ্রুত সেই ডাকে লাব্বাইক বলার জন্য উৎসাহ দেওয়া।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : জান্নাত শুধু গাছ-গাছালি, ফলমূল, খাবার, পানীয়, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হূর, নদী, অট্টালিকা ইত্যাদির নাম নয়। অধিকাংশ মানুষ জান্নাতের নামের ক্ষেত্রে এই ভুলটি করে থাকে। আসলে জান্নাত হলো সব নিয়ামাতে পরিপূর্ণ একটি আবাসের নাম। জান্নাতের সবচেয়ে বড়ো উপভোগ্য নিয়ামাত হলো : আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকা, তাঁর কথা শ্রবণ করা, তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য দ্বারা চক্ষু শীতল করা। প্রকৃত অর্থে জান্নাতের খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আকার-আকৃতি ইত্যাদির সাথে এই দুনিয়ার কোনোকিছুরই কোনো মিল নেই। দেখতে এক রকম

---

[৩৬৬] সূরা ইউনুস, ১০ : ২৫।

হলেও স্বাদে ও পরিপূর্ণতায় রয়েছে বিশাল ব্যবধান। পরকালে আল্লাহ তাআলার সামান্য একটু সন্তুষ্টি জান্নাত ও তার মধ্যকার সমস্ত নাজ-নিয়ামাত থেকেও উত্তম। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ

> "বস্তুত এ (নিয়ামাত) সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড়ো হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি।"[৩৬৭]

رِضْوَانٌ-কে এখানে তানবীনসহ আনা হয়েছে, ফলে তা তাকলীল বা কম বোঝানোর অর্থ প্রদান করে; যার অর্থ দাঁড়ায় : বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির সামান্যতম অংশও জান্নাতের চেয়ে অনেক বড়ো।

সহীহ হাদীসে এসেছে, যাকে حَدِيثُ الرُّؤْيَةِ (দর্শনের হাদীস) বলা হয়, নবি ﷺ বলেছেন,

فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

> "তাদেরকে আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় জিনিস আর কিছুই দান করা হয়নি।"[৩৬৮]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিষয়টি এমনই। চিন্তাভাবনা আর কল্পনায় যা আসে, তার চেয়ে এটি অধিক সম্মানিত ও মহান। বিশেষ করে মহাব্বতকারীরা যখন সেখানে মহাব্বতের প্রতিদান পাবে, তাদের প্রিয় সত্তার সান্নিধ্য লাভ করার মাধ্যমে, তখন তা বুঝে আসবে। কারণ মানুষ যাকে ভালোবাসবে, সেদিন সে তারই সঙ্গী হবে। এই হুকুমের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম নেই। বরং তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ শক্তিশালীভাবেই প্রমাণিত।

সুতরাং কোন স্বাচ্ছন্দ্য, কোন স্বাদ, চক্ষু শীতলকারী কোন বস্তু ও কোন সফলতা সেদিনের সেই নৈকট্য ও সান্নিধ্য এবং সেই স্বাদ ও চোখের শীতলতার সমান হবে?

আল্লাহর শপথ! আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও দর্শনই হলো সেই নিদর্শন, যার দিকে

---

[৩৬৭] সূরা তাওবা, ৯ : ৭২।

[৩৬৮] মুসলিম, ১৮১।

মহাব্বতকারীরা ছুটে চলে! এটিই সেই পতাকা, যার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা উদ্গ্রীব থাকে! এটিই হলো 'জান্নাত'-এর রূহ ও প্রাণ। এর কারণেই জান্নাত এত সুশোভিত ও মনোরম! এর ওপরই জান্নাতের খুঁটি!

সুতরাং কীভাবে বলা যায়, বান্দা জান্নাত লাভের আশায় এবং জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করবে না?!

জাহান্নাম থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! জাহান্নামের অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ তাআলাকে না দেখার যে কঠিন শাস্তি, তাদের ওপর তাঁর লাঞ্ছনা, রাগ ও অসন্তুষ্টি এবং আল্লাহর নিকট থেকে তাদের দূরে থাকা—জাহান্নামের আগুনে তাদের শরীর ও রূহ জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হওয়ার চেয়েও বেশি ভয়াবহ ও মারাত্মক যন্ত্রণার। আসলে আল্লাহকে না দেখার আগুনে আগে তাদের অন্তর পুড়ে যায়, এরপর সেখান থেকে পুরা শরীরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং নবি, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার ব্যক্তিগণ—সবার পরম চাওয়ার বস্তু হলো : জান্নাত অর্জন আর জাহান্নাম থেকে পলায়ন। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সাহায্যকারী। ভরসা করতে হবে শুধু তাঁরই ওপর। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কেউ না-কোনো নেককাজ করতে পারে আর না-কোনো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক।

*****

২০ নং মানযিল

আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা (اَلْإِخْلَاصُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

"তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো হুকুম দেওয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে।"[৩৬৯]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝ أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ

"আমি আপনার কাছে হকসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতএব আপনি একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর ইবাদাত করুন। আর সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদাত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য।"[৩৭০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ

---

[৩৬৯] সূরা বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ৫।

[৩৭০] সূরা যুমার, ৩৯ : ২-৩।

"কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।"[৩৭১]

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ বলেছেন, 'উত্তম আমল হলো একনিষ্ঠ এবং সঠিক আমল।' তার সাথিসঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবূ আলি, কোন আমলটি একনিষ্ঠ এবং সঠিক?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমল যখন একনিষ্ঠ হয় কিন্তু সঠিক না হয়, তখন তা কবুল করা হয় না। এমনিভাবে যখন সঠিক হয় কিন্তু ইখলাসের সাথে হয় না, তখনও তা কবুল করা হয় না; যতক্ষণ-না আমল একনিষ্ঠ ও সঠিক হয়। একনিষ্ঠ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য হওয়া আর সঠিক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : সুন্নাহ-সম্মত হওয়া। এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।"[৩৭২]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

"তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হতে পারে, যে নিজেকে আল্লাহর সামনে অনুগত করে দিয়েছে এবং সে সৎকর্মশীলও?"[৩৭৩]

'নিজেকে আল্লাহর সামনে অনুগত করে দেওয়া'র অর্থ হচ্ছে : নিয়ত ও আমলকে একমাত্র তাঁর জন্যই একনিষ্ঠ করা। আর 'সৎকর্মশীল হওয়া'র অর্থ হলো : রাসূল ﷺ-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ،

---

[৩৭১] সূরা মুলক, ৬৭ : ২।

[৩৭২] সূরা কাহফ, ১৮ : ১১০।

[৩৭৩] সূরা নিসা, ৪ : ১২৫।

وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَّرَائِهِمْ

"তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যার ব্যাপারে কোনো মুসলিমের অন্তর খিয়ানত করে না :

১. আল্লাহর জন্য আমলকে একনিষ্ঠ করা,

২. (মুসলিম) শাসকদের কল্যাণ কামনা করা এবং

৩. মুসলমানদের জামাআতকে আঁকড়ে ধরে থাকা; কারণ জামাআতবদ্ধ মুসলিমদের দুআ তাকে বেষ্টন করে রাখে।"[৩৭৪]

অর্থাৎ এগুলোতে অভ্যস্ত যে অন্তর, তাতে কোনো খিয়ানত অবশিষ্ট থাকে না। এই তিনটি গুণের সাথে খিয়ানতের সহাবস্থান অসম্ভব। বরং কেউ এই তিনটি গুণের অধিকারী হলে এগুলোই তার থেকে সব ধরনের খিয়ানত দূর করে দেবে এবং এই নোংরা প্রবণতা থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কারণ অন্তর শির্কের কারণে (আল্লাহর সাথে) সবচেয়ে বড়ো খিয়ানত করে থাকে। এমনিভাবে (মুসলিম) শাসকদের কল্যাণ কামনা না করা এবং মুসলমানদের জামাআত থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে অন্তর ধোঁকাবাজি, বিদআত ও গোমরাহির রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই বিষয়গুলো মানুষের অন্তরকে খিয়ানত, হিংসা-বিদ্বেষ ও অনিষ্ট দ্বারা পূর্ণ করে দেয়। এই খিয়ানত ও বিদ্বেষপ্রবণতা থেকে বেঁচে থাকার ওষুধ হলো—আমলে আন্তরিক হওয়া, কল্যাণকামী হওয়া এবং সুন্নাহর অনুসরণ করা।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, আর যে গোত্র-স্বার্থ রক্ষার্থে লড়াই করে। এদের মধ্যে কার লড়াই আল্লাহর পথে গণ্য হবে? নবি ﷺ জবাব দিলেন,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করার জন্য লড়াই করে, কেবল সে-ই আল্লাহর পথে রয়েছে।"[৩৭৫]

---

[৩৭৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/১৮৩; দারিমি, ২৩৫।

[৩৭৫] বুখারি, ১২৩; মুসলিম, ১৯০৪।

আল্লাহর রাসূল ﷺ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে দিয়ে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে : কুরআনের ক্বারী, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ ও ধনসম্পদ দানকারী; যারা আমলগুলো এই জন্য করেছিল যে, তাদেরকে বলা হবে, অমুক ক্বারী, অমুক মুজাহিদ, অমুক দানবীর। তাদের আমলগুলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত ও একনিষ্ঠ ছিল না।[৩৭৬]

পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইখলাস ও সিদ্ক সম্পর্কে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যে অনেক কথা বলেছেন; তবে সবার কথার মর্ম-উদ্দেশ্য এক। যেমন :

কেউ বলেছেন, 'ইখলাস হলো আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিয়তকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া।'

কেউ বলেছেন, 'সৃষ্টিজগতের মনোযোগ আকর্ষণ করা থেকে আমলকে মুক্ত রাখা।'

কেউ বলেছেন, '(আমলের ক্ষেত্রে) কোনো সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করা থেকে বেঁচে থাকা, এমনকি নিজের নফসের প্রতি মনোযোগী হওয়া থেকেও বেঁচে থাকা।'

সিদ্ক বা সত্যবাদিতা হলো নিজের নফসের চাহিদা থেকে সতর্ক থাকা। ফলে মুখলিস ব্যক্তি থাকে রিয়া বা লোক-দেখানো-প্রবণতা থেকে মুক্ত আর সাদিক ব্যক্তি থাকে আত্মদম্ভ ও অহংকার থেকে মুক্ত। সিদ্ক ব্যতীত ইখলাস পরিপূর্ণ হয় না। অনুরূপভাবে ইখলাস ব্যতীত সিদ্কও পূর্ণতা পায় না। আবার সবর ব্যতীত এ দুটিও থাকে অপূর্ণ।

বলা হয়েছে, 'সাধারণ ইখলাস হলো : প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বান্দার আমল এক রকম হওয়া। রিয়া হলো : ভেতরের অবস্থার চেয়ে বাইরের অবস্থা ভালো হওয়া। আর খাঁটি ইখলাস হলো : বাহ্যিক অবস্থা থেকে অভ্যন্তরীণ অবস্থা উত্তম ও প্রাণবন্ত হওয়া।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'ইখলাস হলো : স্রষ্টার দিকে অবিরাম নজর দেওয়ার কারণে সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করতে ভুলে যাওয়া। আর যে ব্যক্তি নিজের যা নেই, তাতে সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে মানুষের সামনে পেশ করে, সে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে সরে যায়।'

---

[৩৭৬] মুসলিম, ১৯০৫।

ফুযাইল ﷺ-এর বাণী : 'মানুষের কারণে আমল পরিত্যাগ করা রিয়া আর মানুষের জন্য আমল করা শির্‌ক। ইখলাসের কারণে এই দুই প্রকার মন্দগুণ থেকেই আল্লাহ্‌ আপনাকে মুক্ত রাখবেন।'[৩৭৭]

জুনাইদ ﷺ বলেছেন, 'ইখলাস হলো আল্লাহর মাঝে ও বান্দার মাঝে একটি গোপন বিষয়। যা ফেরেশতাও জানবে না যে, লিখে রাখবে। শয়তানও টের পাবে না যে, তা নষ্ট করার চেষ্টা করবে। এমনকি মন্দ প্রবৃত্তিরও সে সম্পর্কে খবর থাকবে না যে, সেখান থেকে তাকে বিচ্যুত করবে।'[৩৭৮]

সাহ্‌ল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, 'কোন জিনিসটি নফসের ওপর সবচেয়ে কঠিন?' তিনি জবাব দেন, 'ইখলাস। কারণ এখানে নফসের কোনো অংশ নেই।'[৩৭৯]

পূর্ববর্তী মনীষীদের কোনো একজন বলেছেন, 'ইখলাস হলো আপনি আল্লাহকে ছাড়া আপনার আমলের আর কোনো দর্শক কামনা করবেন না এবং তিনি ব্যতীত আর কেউ তার প্রতিদান দিক, সে প্রত্যাশাও রাখবেন না।'

মাকহূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইখলাসের সাথে আমল করবে, তার অন্তর থেকে তার জবানে হিকমত ও প্রজ্ঞার ঝরনাধারা প্রকাশিত হবে।'[৩৮০]

ইউসুফ ইবনুল হুসাইন ﷺ বলেছেন, 'দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টসাধ্য বস্তু হলো : ইখলাস তথা আমলে আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা বজায় রাখা। আমি অনেক পরিশ্রম ও সাধনা করেছি আমার অন্তর থেকে রিয়া দূর করতে; কিন্তু তা যেন অন্য রং ধারণ করে ভিন্ন আকারে আবার এসে হাজির হয়।'[৩৮১]

আবূ সুলাইমান দারানি ﷺ বলেছেন, 'যখন বান্দা মুখলিস হবে, তখন তার থেকে অধিকাংশ ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা ও লোক-দেখানো-প্রবণতা দূর হয়ে যাবে।'[৩৮২]

---

[৩৭৭] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৬৪৬৯।

[৩৭৮] কুরতুবি, তাফসীর, ২/১৪৬।

[৩৭৯] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৩৬১।

[৩৮০] হান্নাদ ইবনুস সারি, আয-যুহ্‌দ, ২/৩৫৭।

[৩৮১] ইবনু রজব হাম্বালি, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৮৫।

[৩৮২] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/১৫০।

ইখলাস হলো আমলের সাথে এমন কোনো ইচ্ছা ও সংকল্প মিশ্রিত না হওয়া, যা আমলকে ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড় করায়। মানুষের অন্তরে নিজেকে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করার নিয়ত করা, অথবা তাদের প্রশংসা কামনা করা এবং তাদের নিন্দা থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা রাখা, অথবা তাদের সম্মান পাওয়া বা তাদের সম্পদ লাভ করা বা তাদের থেকে সেবা নেওয়া বা তাদের মাধ্যমে নিজের কোনো প্রয়োজন পূরণ করা বা সবাই পছন্দ করুক এই ইচ্ছা রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে আমলে ঘাটতি আসে। এককথায় আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো নিয়ত করা, তা যেভাবেই হোক যে জন্যই হোক—তা ইখলাসের পরিপন্থি।

আমলকারী তার আমলের ব্যাপারে তিনটি বিপদের সম্মুখীন হয় :

১. আমলের প্রতি তৃপ্তির দৃষ্টি দেওয়া ও মনোযোগী হওয়া,
২. এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক তলব করা এবং
৩. এতেই সন্তুষ্ট থাকা ও প্রশান্তি লাভ করা।

নিজ আমলের প্রতি তৃপ্তির দৃষ্টি দেওয়া থেকে বান্দাকে মুক্তি দিতে পারে—বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার যে দান, দয়া ও নিয়ামাত তা প্রত্যক্ষ করা, আমল করার শক্তি-সামর্থ্য যে কেবল আল্লাহ তাআলারই দান তা উপলব্ধি করা এবং এটা স্মরণ রাখা যে, আমল বাস্তবে অস্তিত্ব পেয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায়, তার নিজের ইচ্ছায় নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝

"মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা (কোনোকিছুর) ইচ্ছা করার সক্ষমতা রাখো না।"[৩৮৩]

আসলে বান্দার মাঝে প্রতিটি কল্যাণকর বস্তু কেবল আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ, ইহ্সান ও নিয়ামাতের কারণেই অর্জিত হয়। আর এসব গুণাবলির কারণেই বান্দা প্রশংসিত হয়। সুতরাং আমলের দিকে বান্দার দৃষ্টি দেওয়া প্রকৃতপক্ষে কান, চোখ, উপলব্ধি, শক্তি ইত্যাদি সৃষ্টিগত গুণের প্রতি দৃষ্টিপাত করারই নামান্তর। বরং বলা যায় নিজের সুস্থতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিরাপদ থাকা এবং এ রকম বিষয়াদির প্রতি

[৩৮৩] সূরা তাকভীর, ৮১ : ২৯।

নজর দেওয়ার মতোই। এর সবগুলোই আল্লাহ তাআলার দয়া, দান, করুণা ও নিয়ামাত।

সুতরাং **নিজ আমলের প্রতি তৃপ্তির দৃষ্টি দেওয়ার এই বিপদ থেকে মুক্ত থাকার উপায় হলো :** রবের যথার্থ পরিচয় পাওয়া এবং নিজের নফস সম্পর্কে ভালোভাবে জানা।

দ্বিতীয় বিপদ; আমলের বিনিময়ে পারিশ্রমিক তলব করা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হলো—বান্দার এই উপলব্ধি করা যে, সে তো কেবল একজন গোলাম। আর গোলাম তার মালিকের সেবা-যত্ন করার কারণে কোনো বিনিময় কিংবা প্রতিদান পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। কারণ দাস হওয়ার দাবিতেই সে তার খেদমত করতে থাকবে। সুতরাং মালিকের নিকট থেকে যে প্রতিদান, পুরস্কার ও দান পাওয়া যাবে, তা কেবলই তার দয়া, অনুগ্রহ ও উদারতা; এটি কোনো বিনিময় বা পারিশ্রমিক নয়। কারণ বিনিময় লাভের অধিকারী ও উপযুক্ত হয় স্বাধীন ব্যক্তিরা অথবা অন্যের গোলাম যে তার মালিক ব্যতীত অন্যের কাজ করে দেয়। তবে নিজের গোলাম বা দাস এর হকদার হয় না।

আর **তৃতীয় বিপদ;** আমলে সন্তুষ্ট হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হলো দুইটি :

এক. নিজের দোষত্রুটি, অমনোযোগিতা, আমলে নিজের নফসের অংশ এবং শয়তানের অংশ ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়া। এমন আমল খুব কমই রয়েছে, যার মধ্যে শয়তানের কোনো অংশ নেই; অল্প হলেও প্রতিটি আমলে শয়তানের ভাগ থেকেই যায়। আবার নিজের স্বার্থও থাকে আমলে। নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'সালাতের মধ্যে কারও এদিক-সেদিক তাকানো কেমন ব্যাপার?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন,

هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

"এটা এক ধরনের ছিনতাই। এর দ্বারা শয়তান বান্দার সালাতের কিছু অংশ ছিনতাই করে নিয়ে যায়।"[৩৮৪]

---

[৩৮৪] বুখারি, ৭৫১।

এটি হলো তার এদিক-সেদিক চোখের চাহনি ও মনোযোগী হওয়ার ফল। সুতরাং অন্তর যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্যদিকে মনোযোগী হয়, তা হলে কেমন হবে? ইবাদাতের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি হলো শয়তানের সবচেয়ে বড়ো ও প্রধান অংশ।

আমলে নফসের অংশ ও নিজস্বার্থের ব্যাপারে কেবল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাই অবগত হতে পারেন।

দুই. এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা যে, দাসত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কী কী হক পাওয়ার উপযুক্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে তিনি কেমন আদব ও আন্তরিকতা পাওয়ার দাবি রাখেন। এটাও উপলব্ধি করা যে, বান্দা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার হক আদায় করতে অক্ষম, বান্দা অনেক দুর্বল এবং তার আমল খুবই নগণ্য। রবের ব্যাপারে আমলের কারণে সন্তুষ্ট ও খুশি হওয়া একেবারেই অনুচিত। আরিফ বা আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনো কোনোকিছুর মাধ্যমে আপন রবের ব্যাপারে তৃপ্তিতে ভোগে না, এক পলকের জন্যও নিজের কৃতকর্ম ও নফসের ওপর সন্তুষ্ট হয় না; বরং সে তার আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে লজ্জাবোধ করে। এর ফলে তার নিজের নফস ও আমল সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা, সেগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং তা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো তার নিজের ব্যাপারে এবং তার আমল ও নফসের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

কোনো একজন মনীষী বলেছেন, 'বান্দার বিপদ হলো : তার নফসের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি তার নফসের কোনো কাজকে উত্তম বলে বিবেচনা করে, নফস তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে। আর যে ব্যক্তি তার নফসকে দীর্ঘদিন যাবৎ অভিযুক্ত করে না, সে ধোঁকাগ্রস্ত, প্রতারণার শিকার!'

*****

২১ নং মানযিল

সংশোধন ও পরিশোধন করা (اَلتَّهْذِيْبُ وَالتَّصْفِيَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—সংশোধন ও পরিশোধন করার মানযিল।

এটি হলো ইবাদাত ও দাসত্বের মাঝে যেসব অনিষ্ট, খাদ ও ভেজাল রয়েছে, সেগুলোকে বের করে দেওয়ার আশায় আমলকে পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত করা।

এটি প্রাথমিক পর্যায়ের আল্লাহ-অভিমুখীদের জন্য বেশ কঠিন। এটি যেন তাদের জন্য একটি বিশেষ পরীক্ষা।

সংশোধন ও পরিশোধন করার মানযিল হাসিল হয় তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে :

১. মূর্খদের সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে,

২. অভ্যাসের মিশ্রণ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে এবং

৩. নিজের ইচ্ছা-সংকল্পকে শুধু ইবাদাত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

১. মূর্খদের সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকা : কারণ যখন দাসত্বের সাথে মূর্খতা মিশ্রিত হবে, তখন তা বান্দাকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করবে, অহেতুক স্থানে অবতরণ করাবে, অনর্থক কাজে জড়াবে, কল্যাণকর বিশ্বাস করে এমন অনেক কাজে লিপ্ত করাবে, যা প্রকৃতপক্ষে তার ইবাদাত ও আমলের জন্য ক্ষতিকর। কারণ হয়তো সে স্থির থাকার স্থানে নড়াচড়া করবে, বা সক্রিয় থাকার জায়গায় নিষ্ক্রিয় থাকবে, বা পেছনে থাকার স্থানে অগ্রসর হবে, বা অগ্রসর হওয়ার স্থানে পেছনে থাকবে, বা থেমে থাকার স্থানে গতি বাড়িয়ে দেবে, বা গতিশীল থাকার

স্থানে থমকে দাঁড়াবে—এ রকম আরও বিভিন্ন প্রকারের কার্যাবলি তার থেকে প্রকাশ পাবে। মূর্খদের কাজকর্মে যা প্রায়ই লক্ষ করা যায়। এই ব্যক্তির কর্মকাণ্ড মানুষের হকসমূহের ব্যাপারে অলস ও বেকুব ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের ন্যায়। (যাতে কেবল অসংগতিই ধরা পড়ে।)

আসলে যে আমলের সাথে ইলমের সংযোগ থাকে না এবং যে আমল শিষ্টাচার ও হকসমূহ থেকে শূন্য হয়, সে আমল তার সম্পাদনকারীকে ক্রমশ দূরেই নিয়ে যায়; যদিও তার উদ্দেশ্য থাকে নৈকট্য হাসিল করা। এই কারণে তার সাওয়াব ও প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয় না। তবে এটা নিশ্চিত যে, এই কারণে সে সুউচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ মানযিলসমূহে পৌঁছুতে পারে না এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা কেবল তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে, যখন আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাঁর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান হাসিল হয়, অন্তরে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ মহাব্বত থাকে এবং নিজের নফস ও দোষত্রুটি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগতি লাভ করে।

২. অভ্যাসের মিশ্রণ থেকে বেঁচে থাকা : এটি হলো ইবাদাত-বন্দেগির সাথে নফসের এমন কোনো অভ্যাস মিশ্রিত হওয়া, যা তাকে সেই ইবাদাত আদায় করতে সাহায্য করে এবং তা সহজ করে দেয়; ফলে ব্যক্তি মনে করে যে, তা আনুগত্য ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম। যেমন কোনো ব্যক্তি সাওম পালনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, খাদ্য-পানীয় না খেয়ে থাকার ওপর সে বেশ অনুশীলন করেছে, ফলে তার নফস তাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একটা সময় সাওম পালন করতে সে উদগ্রীব থাকে, (ক্ষুধার্ত না থাকলে তার ভালো লাগে না)। ফলে সে ধারণা করে তার (সাওম পালনের) এই চাহিদা ও অনুপ্রেরণাই হলো খাঁটি ইবাদাত। অথচ তা অভ্যাসের দাবি ও চাহিদা। সুতরাং এ রকম অবস্থা থেকেও বিরত থাকা জরুরি।

এটি যে নফসের দাবি তার আলামত হলো : যখন ওই আমল ব্যতীত তার নিকট তুলনামূলক সহজ ও অধিক কল্যাণকর অন্য একটি আমল পেশ করা হয়, তখন তা পালন করতে সে গড়িমসি করে এবং আগের আমলকেই প্রাধান্য দেয়। কারণ সে তাতে অভ্যস্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

৩. নিজের ইচ্ছা-সংকল্পকে শুধু ইবাদাত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা থেকে বিরত থাকা : এটি ব্যক্তির দুর্বলতার নিদর্শন। কারণ প্রকৃত গোলামের ইচ্ছা-সংকল্প কেবল তার মালিকের খেদমত করতে থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তার ইচ্ছা থাকে এর চেয়েও অনেক উঁচু। কারণ সে তার মালিকের সন্তুষ্টির সন্ধানী, সে তার খেদমত ও সেবাকে সবসময় তুচ্ছ ও অল্প মনে করে, এর মধ্যেই সে থেমে থাকে না। সব ক্ষেত্রে অল্পেতুষ্টি প্রশংসনীয়; শুধু এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ এটি বঞ্চিত থাকার কারণ। কেউ তার প্রিয় মানুষকে না পাওয়া পর্যন্ত তার কোনোকিছুর ব্যাপারে তৃপ্ত হয় না। সুতরাং বান্দার ইচ্ছা-সংকল্প শুধু আমল ও প্রতিদানপ্রাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা জরুরি; (কারণ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না করা যায়,) তবে এটি বঞ্চনা ও মাহরূম হওয়ারই মতো।

*****

২২ নং মানযিল

স্থির ও অবিচল থাকা (اَلْاِسْتِقَامَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—স্থির ও অবিচল থাকার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾
>
> “নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ’, অতঃপর তাতেই স্থির ও অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, ‘তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।”[৩৮৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾
>
> “নিশ্চয় যারা বলে, ‘আল্লাহ আমাদের রব’ অতঃপর স্থির ও অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।”[৩৮৬]

---

[৩৮৫] সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১ : ৩০।

[৩৮৬] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১৩।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে বলেছেন,

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

"কাজেই তুমি এবং তোমার সাথে যারা তাওবা করেছে, সবাই সত্যপথে স্থির ও অবিচল থাকো; যেমন তোমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা কিছু করছো, নিশ্চয় তিনি তা প্রত্যক্ষ করছেন।"[৩৮৭]

এখানে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, স্থিরতা ও অবিচলতা হলো সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতার (اَلطُّغْيَانُ) বিপরীত; যা প্রতিটি বস্তুর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করাকে বুঝায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ

"বলুন, 'আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমাকে ওহির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ্ মাত্র একজন ইলাহ্, অতএব তাঁর পথেই দৃঢ় ও স্থির থাকো এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো।"[৩৮৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ

"(আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে,) লোকেরা যদি সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, তা হলে আমি তাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম। যাতে আমি এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি।"[৩৮৯]

---

[৩৮৭] সূরা হূদ, ১১ : ১১২।

[৩৮৮] সূরা ফুস্সিলাত, ৪১ : ৬।

[৩৮৯] সূরা জিন, ৭২ : ১৬-১৭।

এই উম্মাতের সবচেয়ে বড়ো সত্যবাদী ও দ্বীনের ওপর সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থানকারী সাহাবি আবু বকর ﷺ-কে ইস্‌তিকামাত বা অবিচল থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'তুমি আল্লাহর সাথে কোনোকিছুকে শরীক করবে না।'[৩৯০] এর দ্বারা তিনি শুধু তাওহীদের ওপর ইস্‌তিকামাত উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেছেন, 'ইস্‌তিকামাত হলো : তুমি আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধের ওপর অটল থাকবে। শেয়ালের মতো ছলচাতুরির আশ্রয় নেবে না।'[৩৯১]

উসমান ইবনু আফফান ﷺ বলেছেন, 'আয়াতে বর্ণিত অবিচলতার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : যারা ইলমকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করে।'[৩৯২]

আলি ইবনু আবী তালিব ও ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'যারা ফরজ-দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে আদায় করে।'[৩৯৩]

হাসান বাস্‌রি ﷺ বলেছেন, 'যারা আল্লাহ তাআলার হুকুমের ওপর অবিচল থাকে; ফলে তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে।'[৩৯৪]

মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, 'যারা আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করার পূর্ব পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্যের ওপর স্থির থাকে।'[৩৯৫]

আমি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'তারা হলেন সেই সমস্ত ব্যক্তি, যারা আল্লাহ তাআলার মহাব্বত ও দাসত্বে অবিচল থাকে; ফলে ডানে-বামে কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না।'[৩৯৬]

---

[৩৯০] বাগাবি, তাফসীর, ৭/১৭২।

[৩৯১] বাগাবি, তাফসীর, ৭/১৭২।

[৩৯২] বাগাবি, তাফসীর, ৭/১৭২।

[৩৯৩] বাগাবি, তাফসীর, ৭/১৭২।

[৩৯৪] সা'লাবি, তাফসীর, ২৩/২৮৮।

[৩৯৫] সা'লাবি, তাফসীর, ২৩/২৮৮।

[৩৯৬] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৮/৩২।

'সহীহ মুসলিম'-এ এসেছে, সুফ্ইয়ান ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন, যেন আপনার পরে আমাকে এ সম্পর্কে আর অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়।' নবি ﷺ বললেন,

قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ

"বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর এর ওপর অবিচল থাকো।"[৩৯৭]

সাওবান ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

"তোমরা (সঠিক পথের ওপর) অবিচল থেকো, যদিও তোমরা তা আয়ত্তে রাখতে পারবে না। জেনে রেখো, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো সালাত। আর মুমিন ব্যক্তিই কেবল ওজুকে পরিপূর্ণরূপে হেফাজত করে থাকে।"[৩৯৮]

বান্দা সবসময় ইস্তিকামাত বা স্থির-অবিচলতার গুণে গুণান্বিত থাকবে এটাই কাম্য। আর তা হলো যথাযথভাবে পরিপূর্ণরূপে দ্বীনের বিধানাবলি মেনে চলা। যদি এর ওপর সক্ষম না হয়, তা হলে এর কাছাকাছি অবস্থান করবে। আর যদি এর থেকেও নিচে নামে, তা হলে তা হবে শিথিলতা ও বিনষ্ট করা। যেমন 'সহীহ মুসলিম'-এ আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّهُ لَنْ يَّنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ

"তোমরা সঠিক পথে যথাযথভাবে অবিচল থাকো এবং কমপক্ষে তার কাছাকাছি থাকো। তোমরা নিশ্চিতভাবেই জেনে রাখো যে, তোমাদের কেউ তার আমলের দ্বারা মুক্তি পাবে না।"

---

[৩৯৭] মুসলিম, ৩৮।

[৩৯৮] ইবনু মাজাহ, ২৭৭; দারিমি, ৬৬১।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, “আপনিও না, ইয়া রাসূলাল্লাহ?’

তিনি বললেন,

وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ

“আমিও না। তবে আল্লাহ তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে ঢেকে নিয়েছেন।”[৩৯৯]

এই হাদীসটিতে দ্বীনের সমস্ত মাকামকে একত্র করে দেওয়া হয়েছে। ইস্তিকামাতের ওপর থাকার আদেশ করা হয়েছে; আর তা হলো নিয়ত, কথাবার্তা ও কাজকর্মে সঠিক পথ অবলম্বন করা এবং তাতে অবিচল থাকা।

ওপরে বর্ণিত সাওবান ﷺ-এর হাদীস দ্বারা নবি ﷺ এই সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা ইস্তিকামাত বা অবিচল থাকতে পারবে না। ফলে তাদেরকে কাছাকাছি অবস্থান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর তা হলো তাদের সাধ্যানুসারে ইস্তিকামাতের নিকটে আসার চেষ্টায় থাকা। তিরন্দাজের মতো, তার ছোঁড়া তির যদি লক্ষ্যে আঘাত নাও করে, তবে লক্ষ্যের প্রায় কাছাকাছি থাকে। এ সত্ত্বেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই অবিচল থাকা এবং কাছাকাছি অবস্থান করাও কাউকে কিয়ামাতের দিন নাজাত দেবে না। সুতরাং শুধু আমলের দিকেই ঝুঁকে পড়া, আমলের কারণে গর্বিত হওয়া, এর ওপর ভরসা করা কারও জন্য উচিত হবে না। সেদিন কেবল মহান আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ ও রহমতের কারণেই ব্যক্তি নাজাত পাবে।

আসলে ‘ইস্তিকামাত বা অবিচল থাকা’ হলো একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটি দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর তা হলো আল্লাহ তাআলার সামনে একনিষ্ঠতা ও প্রকৃত সত্যবাদিতার পরিচয় দেওয়া এবং অঙ্গীকার পূরণ করা।

ইস্তিকামাতের সম্পর্ক কথা, কাজ, অবস্থা, নিয়ত সবকিছুর সাথে। এগুলোর ওপর ইস্তিকামাতের অর্থ হলো : আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে আল্লাহর দেখানো পথেই এ কাজগুলো সম্পাদন করা।

---

[৩৯৯] মুসলিম, ২৮১৬; বুখারি, .৩৯।

কোনো একজন আরিফ বা আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তি বলেছেন, 'তুমি ইস্তিকামাতের অধিকারী হতে সচেষ্ট হও, তবে কারামাত (অলৌকিক বস্তু) অন্বেষণকারী হয়ো না। কারণ তোমার নফস তোমাকে কারামাত অর্জন করতে অনুপ্রেরণা জোগাবে আর তোমার রব তোমাকে খুঁজে নেবে ইস্তিকামাতের কারণে।'

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷬-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'সবচেয়ে বড়ো কারামাত হলো সর্বদা ইস্তিকামাতের ওপর থাকা।'[৪০০]

*****

[৪০০] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ১১/২৯৮।

২৩ নং মানযিল

আল্লাহর ওপর ভরসা করা (اَلتَّوَكُّلُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আল্লাহর ওপর ভরসা করার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

"আর তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তা হলে আল্লাহর ওপর ভরসা করো।"[৪০১]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।"[৪০২]

আল্লাহ তাআলা তাঁর আউলিয়াদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা বলেন,

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٤﴾

"হে আমাদের রব, আমরা তোমার ওপরই ভরসা করেছি, আমরা তোমার প্রতিই ধাবমান আর তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।"[৪০৩]

---

[৪০১] সূরা মায়িদা, ৫ : ২৩।

[৪০২] সূরা তালাক, ৬৫ : ৩।

[৪০৩] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ৪।

আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

"কাজেই (হে নবি,) আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।"[৪০৪]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

"প্রকৃত মুমিন তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে, যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর তাদের সামনে যখন আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে।"[৪০৫]

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা করা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে অনেক আলোচনা এসেছে। এ সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত দ্বারা কুরআন ভরপুর। (আসলে আমলকারীদের জন্য একটি আয়াতই যথেষ্ট।)

'সহীহ বুখারি' ও *'সহীহ মুসলিম'*-এর একটি বর্ণনায় এসেছে, ৭০ হাজার ব্যক্তি কোনো প্রকার হিসাব দেওয়া ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের গুণাবলি হচ্ছে—

هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"তারা হলো সেসব ব্যক্তি, যারা অবৈধভাবে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করে না, ঝাড়ফুঁক করে না, আগুনে-পোড়ানো-লোহার দ্বারা দাগ লাগায় না, আর তারা কেবল তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।"[৪০৬]

---

[৪০৪] সূরা নাম্‌ল, ২৭ : ৭৯।

[৪০৫] সূরা আনফাল, ৮ : ২।

[৪০৬] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৫৭৫২; মুসলিম, ২২০।

'সহীহ বুখারি'-তে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ (এই আয়াত তিলাওয়াত করে) বলেছেন,

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আর তিনি কতই-না চমৎকার কর্মসম্পাদনকারী।"[৪০৭]

যখন ইবরাহীম ﷺ-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি এই কথাটি বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ-ও এই কথা বলেছিলেন, যখন লোকেরা তাঁকে এই সংবাদ দিয়েছিল—

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা বহু সাজসরঞ্জাম সমাবেশ করেছে; সুতরাং তাদের ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আর তিনি কতই-না চমৎকার কর্মসম্পাদনকারী।'" (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭৩)[৪০৮]

'সহীহ বুখারি' ও *'সহীহ মুসলিম'*-এ এসেছে, নবি ﷺ আল্লাহর নিকট দুআ করার সময় বলেতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ...

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছি, আপনার প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করেছি, একমাত্র আপনার ওপরই ভরসা করেছি এবং আপনার অভিমুখেই ধাবিত হয়েছি..."[৪০৯]

'সুনানুত তিরমিযি'-র এক বর্ণনায় এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন,

---

[৪০৭] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭৩।

[৪০৮] বুখারি, ৪৫৬৩।

[৪০৯] বুখারি, ৭৪৯৯; মুসলিম,২৭১৭।

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"তোমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা করার মতো ভরসা করতে, তা হলে অবশ্যই তিনি তোমাদের ভরপুর রিয্ক দান করতেন; যেমন তিনি পাখিদের রিয্ক দান করেন; সকালে খালি পেটে বের হয়, আর সন্ধ্যায় ফিরে ভরা পেটে।"[৪১০]

তাওয়াক্কুলের মর্যাদা এবং তাওয়াক্কুলকারীদের প্রকারভেদ

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা—দ্বীনের অর্ধেক। আর বাকি অর্ধেক হলো ইনাবাত বা আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া। কারণ দ্বীন হলো সাহায্য প্রার্থনা ও ইবাদাতের নাম। তাওয়াক্কুল হলো সাহায্য প্রার্থনা এবং ইনাবাত হলো ইবাদাত।

তাওয়াক্কুলের মানযিলটি হলো সবচেয়ে প্রশস্ত ও ব্যাপক। সবসময় এটি আল্লাহওয়ালাদের মাধ্যমে মুখরিত থাকে। কারণ তাওয়াক্কুলের পরিধি অনেক বিস্তৃত, সৃষ্টিজগৎ এর প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী, তাওয়াক্কুল সর্বজনীন; মুমিন-কাফির, নেককার-বদকার, পশুপাখি, জন্তু-জানোয়ারসহ সমস্ত আসমানবাসী ও জমিনবাসী এই তাওয়াক্কুলের মানযিলের অন্তর্ভুক্ত। শারীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বহির্ভূত সবাই এতে শামিল। যদিও সবার তাওয়াক্কুলের বিষয় ও উদ্দেশ্য এক থাকে না। আল্লাহ্ তাআলার ওলি ও খাছ্ বান্দাগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করে থাকে। যেমন : ঈমানের দাবি পূরণ করা, তাঁর দ্বীনের সাহায্য করা, তাঁর কালিমাকে সুউচ্চ ও বিজয়ী করা, তাঁর শত্রুদের সাথে জিহাদে দৃঢ়পদ থাকা, তাঁর প্রতি মহাব্বত, তাঁর হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং কেবল তাঁর ওপরই ভরসা করে।

এর চেয়ে যারা কম স্তরের পরহেযগার, তারা অন্যান্য মানুষের কথা চিন্তা না করে শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে; যেমন : নিজেদের ইস্তিকামাতের ক্ষেত্রে, আল্লাহর সাথে নিজেদের অবস্থানকে হেফাজত করাসহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

---

[৪১০] তিরমিযি, ২৩৪৪।

এর চেয়েও যারা নিম্নস্তরের, তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সমস্ত বস্তু লাভ করে সেগুলোর ক্ষেত্রে; যেমন : রিয্‌ক, সুস্থতা, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য, স্ত্রী-সন্তানসন্ততির ভরণপোষণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

এর চেয়েও যারা নিম্নস্তরের, তারা তাওয়াক্কুল করে সেই সব বিষয়ে সফলতা পেতে; যা আল্লাহ পছন্দ করেন না এবং যার ব্যাপারে তিনি অসন্তুষ্ট; যেমন : জুলুম-অত্যাচার, অবাধ্যতা এবং গুনাহ-পাপাচার ও অশ্লীলতায় সফল হতে। কারণ এই সমস্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ সময় আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া ও তাঁর ওপর ভরসা করা ব্যতীত সফল হয় না। বরং কখনো কখনো তাদের ভরসা, যারা নেককাজের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাদের চেয়ে শক্তিশালী হয়। আর এভাবেই তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তারা আবার আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাসও রাখে যে, তিনি তাদেরকে নিরাপদ রাখবেন এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করবেন!

সর্বোত্তম তাওয়াক্কুল হলো : ওয়াজিব বিধানাবলির ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল করা। অর্থাৎ আল্লাহ, সৃষ্টিজগৎ ও আপন সত্তা—এই তিনটি ক্ষেত্রে যে ওয়াজিব দায়িত্বসমূহ রয়েছে, তা পালনের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করা। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত ও উপকারী হলো : কল্যাণকর কোনো দ্বীনিকাজকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে তাওয়াক্কুল করা। অথবা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর কোনো বিষয়কে প্রতিহত করার জন্য তাওয়াক্কুল করা। এটি হলো আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে, জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ফাসাদকে রুখে দেওয়ার ক্ষেত্রে আম্বিয়ায়ে কেরামের তাওয়াক্কুল। এই তাওয়াক্কুল তাদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা করার ক্ষেত্রে মানুষ তাদের উচ্চ মনোবল, হিম্মত ও উদ্দেশ্য অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন কেউ আছে, রাজত্ব ও সাম্রাজ্য লাভের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আবার কেউ আছে, মাত্র একটি রুটি উপার্জনের আশায় আল্লাহর ওপর ভরসা করে থাকে।

যে ব্যক্তি কোনোকিছু অর্জন করার জন্য আল্লাহ তাআলার ওপর মনেপ্রাণে ভরসা করে, সে তা পেয়েই যায়। যদি বস্তুটি আল্লাহর প্রিয় ও সন্তুষ্টিজনক কিছু হয়, তা হলে তা প্রশংসনীয় ও তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কোনো বস্তু হয়, তা হলে তার জন্য পরিণতিতে তা ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আর যদি তা (পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় নয়, বরং) বৈধ কোনো ক্ষেত্র হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহর ওপর ভরসা করার জন্য সে সাওয়াব পাবে; যে বস্তু লাভ হয়েছে সে জন্য নয়; যদি না তা কোনো নেককাজে কাজে লাগে। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা ও মনীষীদের মন্তব্য

এখন আমরা তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা, স্তর ও এ সম্পর্কে গুণীজনদের মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করব।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀ বলেছেন, 'তাওয়াক্কুল হলো অন্তরের আমল।' এ কথার অর্থ হলো এটি অভ্যন্তরীণ কাজ, মুখের কথা বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হওয়া কোনো কাজ নয় এবং এখানে ইলম ও উপলব্ধিরও কোনো দখল নেই।

তবে অনেকেই এটিকে মা'রিফাত ও ইলমের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। তারা বলেন, বান্দার জন্য আল্লাহ যে যথেষ্ট, সে সম্পর্কে অন্তরের অবগত হওয়ার নামই তাওয়াক্কুল।

সাহ্ল ﵀ বলেছেন, 'তাওয়াক্কুল হলো : বান্দা যা করতে মনস্থ করে, তা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়া।'[৪১১]

বিশ্র হাফী ﵀ বলেছেন, 'কেউ কেউ বলে, تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ 'আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম' আসলে সে এর দ্বারা আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করে। কারণ যদি সে প্রকৃতই আল্লাহর ওপর ভরসা করত, তা হলে আল্লাহ যা ফায়সালা করেন তার ওপরই সে সন্তুষ্ট থাকত!'[৪১২]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয ﵀-কে প্রশ্ন করা হলো, 'কখন ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিল বা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী বলে গণ্য হয়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ যখন যা করেন, সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে।'[৪১৩]

---

[৪১১] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/৩০০।

[৪১২] ইবনুল মুলাক্কিন, তবাকাতুল আউলিয়া, ১১৩।

[৪১৩] আবদুল কাদীর জীলানি, আল-গুনইয়া লি-তালিবী তরীকিল হাক্ক, ২/৩২০।

পূর্ববর্তী জ্ঞানীজনদের মধ্যে অনেকেই তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, অন্তরে তাঁর প্রতি স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভ করার দ্বারা।

যুন-নূন মিসরি ﷺ বলেছেন, 'তাওয়াক্কুল হলো : নফসের পদক্ষেপগ্রহণ পরিত্যাগ করা এবং শক্তি-সামর্থ্য প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকা। বান্দার তাওয়াক্কুল বেশ শক্তিশালী হয় তখন, যখন সে এই বিষয়টি উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে সবকিছু জানেন এবং তার প্রতিটি অবস্থা দেখেন।'[৪১৪]

কেউ কেউ বলেছেন, 'তাওয়াক্কুল হলো : সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক রাখা।'

বলা হয়েছে, 'তাওয়াক্কুল হলো : মুখাপেক্ষিতার অনেক ঘাট আপনার সামনে উপস্থিত হবে আর আপনি কেবল সেই সত্তার নিকটেই তা উত্থাপন করবেন, যার নিকট রয়েছে এর প্রকৃত সমাধান।'

যুন-নূন ﷺ বলেছেন, 'ক্ষমতাশীলদের কাছে ধরনা না দেওয়া এবং উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা।'[৪১৫] এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন এগুলোর সাথে অন্তরের কোনো সম্পর্ক না রাখা। তার এই উক্তিটি বাহ্যিকভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করাকে অসমর্থন করে না।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে দুটি বা আরও বেশি বস্তুর সমন্বিত রূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

আবু তুরাব নাখশাবি ﷺ বলেছেন, 'তাওয়াক্কুল হলো শরীরকে দাসত্বে নিক্ষেপ করা, অন্তরকে রুবুবিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং আল্লাহ তাআলার প্রাচুর্যতায় নিশ্চিন্ত হওয়া। অবশেষে যদি প্রার্থিত বস্তু দেওয়া হয়, তা হলে শোকর আদায় করা আর না দেওয়া হলে ধৈর্য ধারণ করা।'[৪১৬]

তিনি তাওয়াক্কুলকে পাঁচটি উপকরণ দ্বারা গঠিত বলে উল্লেখ করেছেন—১. বাহ্যিকভাবে পরিপূর্ণরূপে বিধানসমূহ পালন করা, ২. অন্তরকে রবের সাথে

---

[৪১৪] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/৩০০।

[৪১৫] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৩৮০।

[৪১৬] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, ৪০/৩৪৫।

সম্পৃক্ত করা, ৩. আল্লাহর ফায়সালায় ও ধনাঢ্যতায় নিশ্চিন্ত থাকা, ৪. আল্লাহ দান করলে শোকর আদায় করা এবং ৫. আল্লাহ দান না করলে সবর করা।

কেউ কেউ তাওয়াক্কুলকে পথের শুরু, মেনে নেওয়াকে পথের মাঝ আর আত্মসমর্পণকে পথের শেষ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আবূ আলি দাক্কাক ﵀ বলেছেন, 'আল্লাহর ওপর ভরসা করার তিনটি স্তর রয়েছে: ১. তাওয়াক্কুল, ২. এরপর তাসলীম বা মেনে নেওয়া, ৩. এরপর তাফবীয বা আত্মসমর্পণ করা। তাওয়াক্কুলের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর নিশ্চিন্ত থাকে, তাসলীমের অধিকারী ব্যক্তি তার সম্পর্কে আল্লাহ যে ইলম রাখেন, একেই যথেষ্ট মনে করে এবং তাফবীযের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। তাওয়াক্কুল হলো সূচনা, তাসলীম হলো মধ্যম অবস্থা, আর তাফবীয হলো শেষ ধাপ। সুতরাং তাওয়াক্কুল হলো সাধারণ মুমিনদের সিফাত, তাসলীম হলো আউলিয়াদের সিফাত আর তাফবীয হলো মুওয়াহ্‌হিদীন (একত্ববাদী)-দের সিফাত।'[৪১৭]

তাওয়াক্কুলের প্রকৃত মর্ম

মূলকথা হলো তাওয়াক্কুল অনেকগুলো বিষয়ের সমষ্টির নাম। সেগুলো ব্যতীত তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ পরিপূর্ণ হয় না। জ্ঞানীদের প্রত্যেকেই এই সকল বিষয়ের যেকোনো একটির দিকে অথবা দুইটির দিকে অথবা তার চেয়েও অধিক বিষয়ের দিকে ইশারা করেছেন।

সেগুলোর মধ্য থেকে প্রথমটি হলো : আল্লাহ তাআলার সত্তা, ক্ষমতা, প্রাচুর্যতা, সবকিছু পরিচালনা করার সক্ষমতা, সৃষ্টিজগতের সবকিছুর শেষ পরিণতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, সবকিছুর অস্তিত্ব আসে আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় ইত্যাদি গুণাবলি সম্পর্কে অবগত হওয়া। এই জ্ঞান লাভ করাই হচ্ছে বান্দার প্রথম ধাপ; যার মাধ্যমে সে তাওয়াক্কুলের পথে পা বাড়ায়।

আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেছেন, 'আর এ কারণেই ফালসাফি বা দার্শনিকদের তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হয় না এবং তাদের কাছে তা কল্পনাও করা যায়

[৪১৭] ইমাম গাযালি, ইহইয়াউ উলূমিদ দ্বীন, ৪/২৬৫।

না। এমনিভাবে কাদরিয়্যাদের নিকট থেকেও তা আশা করা যায় না। কারণ তারা আল্লাহ তাআলার অনেক সিফাতকে অস্বীকার করে এবং বলে : তাঁর রাজত্বে এমন কিছুরও অস্তিত্ব রয়েছে, যা তিনি চান না। অনুরূপভাবে জাহ্মিয়্যাদের কাছ থেকেও তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হবে না। কারণ তারা আল্লাহর সিফাতকে প্রত্যাখ্যান করে। তাওয়াক্কুল কেবল সেই সমস্ত ব্যক্তিদের থেকেই বিশুদ্ধ হবে, যারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা কোনোরূপ বিকৃত করা ছাড়াই যথাযথভাবে সাব্যস্ত করে।'

দ্বিতীয় স্তর[৪১৮] : কার্যকরী উপকরণ ও উত্তম পন্থা অবলম্বন করা। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করবে, তার তাওয়াক্কুল হবে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত। অগভীর ও চিন্তাশূন্য দৃষ্টিতে তাকালে বিষয়টি সম্পূর্ণ এর উলটা মনে হয়। অর্থাৎ উপায়-উপকরণ ও বাহ্যিক তাদবীর গ্রহণ করা হলো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি আর কোনো ধরনের উপকরণ অবলম্বন না করাই হলো প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

জেনে রাখবেন, যারা আসবাব-উপকরণকে বাদ দেয় এবং তা প্রত্যাখ্যান করে, তাদের তাওয়াক্কুল কখনোই সঠিক হয় না। কারণ স্বয়ং তাওয়াক্কুলই হলো প্রয়োজনীয় বস্তু হাসিল হওয়ার জন্য শক্তিশালী একটি উপকরণ। এটি দুআর মতো; আল্লাহ তাআলা যা কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা মাধ্যম ও কারণ বানিয়েছেন।

তাওয়াক্কুল হলো প্রত্যাশিত বস্তু হাসিলের জন্য এবং ক্ষতিকর জিনিস হতে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বড়ো উপকরণ। সুতরাং যে ব্যক্তি উপকরণকে অস্বীকার করে তার তাওয়াক্কুল পরিপূর্ণ হয় না এবং তা সঠিকও হয় না। তবে হ্যাঁ, খাঁটি ও প্রকৃত তাওয়াক্কুলের একটি অন্যতম দিক হলো : উপকরণের দিকে ঝুঁকে না পড়া, কেবল সেগুলোর ওপরই আস্থা না রাখা এবং অন্তর সেগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। উপকরণ অবলম্বনের পর ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, উপকরণের সাথে নয়। যদিও বাহ্যিকভাবে তার শরীরের অঙ্গভঙ্গি দেখলে মনে হয়, উপকরণের প্রতি সে একান্ত নিবিষ্ট।

বাহ্যিক উপকরণের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার হিকমত, আদেশ ও দ্বীনের সাথে। আর তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক তাঁর রুবূবিয়্যাত, ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের সাথে। সুতরাং

---

[৪১৮] মুসান্নিফ ﷺ এখানে তা স্তর হিসেবে বর্ণনা করেছেন; যদিও তা তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থের বিবরণ।

উপকরণের ক্ষেত্রে দাসত্বের যে হুকুম, তা তাওয়াক্কুল ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। তাওয়াক্কুল আর উপকরণ অবলম্বন করা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটি অপরটিকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

তৃতীয় স্তর : তাওয়াক্কুলের তাওহীদ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করার ব্যাপারে অন্তরকে মজবুত করা।

কেননা বান্দার তাওয়াক্কুল ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক অবস্থানে আসে না, যতক্ষণ-না তার তাওহীদ বিশুদ্ধ হয়। বরং তাওয়াক্কুলের হাকীকত হলো অন্তরের তাওহীদ তথা অন্তর কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে। এ ক্ষেত্রে শির্ক অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সাথে আসবাব বা অন্য কোনোকিছুর ওপরও ভরসা করার বিষয়টি অন্তরে থাকলে তাওয়াক্কুল হবে ত্রুটিপূর্ণ ও রোগাক্রান্ত। আসলে তাওহীদের বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা অনুপাতে তাওয়াক্কুলেও আসে বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা। কারণ বান্দা যখন গাইরুল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন তার সেই দৃষ্টিপাত অন্তরে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। যার ফলে আল্লাহর ওপর তার তাওয়াক্কুলের পরিমাণ কমে যায়। এখান থেকেই অনেকে ধারণা করে বসেছেন যে, তাওয়াক্কুল কেবল তখনই সহীহ হয়, যখন উপকরণ বর্জন করা হয়। এই ধারণাটি সত্য। তবে তা হলো আত্মিকভাবে পরিত্যাগ করা, বাহ্যিকভাবে নয়।

চতুর্থ স্তর : আল্লাহর প্রতি অন্তর নির্ভরশীল হওয়া, নিশ্চিন্ত ও স্থির থাকা; যেন উপকরণের স্বল্পতার কারণে তাতে কোনো প্রকারের অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা ও উদ্‌বেগ না থাকে। আবার উপকরণ বেশি হলে সেগুলোর ওপর আস্থাও না রাখা। বরং পরম নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা ও আস্থা থাকবে কেবলই আল্লাহর ওপর।

পঞ্চম স্তর : আল্লাহ তাআলার প্রতি উত্তম ধারণা রাখা। আল্লাহর প্রতি আশা রাখা ও উত্তম ধারণা করার অনুপাতে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের তীব্রতা ও দৃঢ়তা নির্ভর করে। আর এ কারণে অনেকেই এর দ্বারা তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা করেছেন, বলেছেন, 'তাওয়াক্কুল হলো : আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখা।'

তবে সঠিক কথা হলো : আল্লাহর প্রতি সুধারণা বান্দাকে তাওয়াক্কুলের প্রতি আহ্বান জানায়। কারণ সেই সত্তার ওপর ভরসা করা যায় না, যার প্রতি ধারণা খারাপ থাকে। এমনিভাবে যার কাছে কোনো আশা-প্রত্যাশা থাকে না, তার ওপরও ভরসা

করা যায় না।

ষষ্ঠ স্তর : আল্লাহর প্রতি অন্তর অনুগত থাকা, নিজেকে অর্পণ করা, সমস্ত অনুপ্রেরণাকে তাঁর প্রতিই ধাবিত করা এবং সব ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলা। এর দ্বারা অনেকেই তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা করেছেন যে, বান্দা আল্লাহর সামনে এমনভাবে অবস্থান করবে, যেমন ধৌতকারীর সামনে মৃত ব্যক্তি অবস্থান করে; সে তাকে যেমন ইচ্ছা তেমন করে উলট-পালট করে, যেখানে মৃত ব্যক্তির কোনো ইচ্ছা বা নড়াচড়া থাকে না।

এটিই হলো সেই ব্যক্তির কথার অর্থ, যিনি বলেছেন, 'তাওয়াক্কুল হলো : সব ধরনের চেষ্টা-তাদবীর থেকে সম্পর্কহীনতা। অর্থাৎ আল্লাহ যা করেন, তার সামনে নিজেকে অনুগত করে রাখা। তবে মনে রাখতে হবে, এই বিষয়টি সেখানে প্রযোজ্য, যেখানে আল্লাহর কোনো আদেশ-নিষেধ নেই। তখন আপনার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার যা ফায়সালা, তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে হবে। তবে যেখানে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে কাজ করতে এবং উপকরণ অবলম্বন করতে হুকুম প্রদান করেছেন, সেখানে আপনাকে মেনে নেওয়ার পাশাপাশি উপকরণ অবলম্বন করতে হবে।

অনুগত হওয়ার বিষয়টি হলো লাঞ্ছিত ও অপমানিত গোলামের ন্যায়, যে নিজেকে তার মনিবের সামনে অনুগত ও অর্পণ করে দেয়, মনিবের সব কথা মেনে নেয়, নিজের চাহিদা নিয়ে মনিবের সাথে কোনো প্রকার বিরোধিতা করে না, মনিবের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা।

সপ্তম স্তর : তাফবীয বা সমর্পণ করা। এটি হলো তাওয়াক্কুলের প্রাণ, সারাংশ ও হাকীকত। নিজের সব বিষয় আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করা। আগ্রহ সহকারে নিজ ইচ্ছায় এই বিষয়ে এগিয়ে আসা। বাধ্য হয়ে বা জোরপূর্বকভাবে নয়। যেমন দুর্বল অদক্ষ ছেলে, যে নিজের কাজ নিজে ঠিকমতো করতে পারে না, সে তার সমস্ত কাজকর্ম তার স্নেহশীল, দয়াময়, উত্তমভাবে পরিচর্যাকারী ও দেখাশুনাকারী বাবার প্রতি ন্যস্ত করে। সে এটাই বিশ্বাস করে যে, কাজগুলো নিজে নিজে আঞ্জাম দেওয়ার চেয়ে তার পিতার মাধ্যমে সেগুলো পরিচালিত করা উত্তম ও কল্যাণকর।

অষ্টম স্তর : বান্দা যখন এই স্তরে অবতরণ করে, তখন সে 'রিযা' বা 'সন্তুষ্টি'র স্তরে স্থানান্তরিত হয়। এটি হলো তাওয়াক্কুলের ফল। যে ব্যক্তি এর দ্বারা তাওয়াক্কুলের

ব্যাখ্যা করে, সে মূলত তাওয়াক্কুলের অন্যতম একটি ফলাফল ও উপকারিতার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে। কারণ বান্দা যখন যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল করে, তখন সে তার কর্মসম্পাদনকারী আল্লাহর সমস্ত কাজকর্মে সন্তুষ্ট থাকে।

আমাদের শাইখ (ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ) বলতেন, 'যেকোনো কাজ দুটি বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে : শুরুতে তাওয়াক্কুল আর শেষে সন্তুষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি কাজ শুরু করার পূর্বে আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং কাজ শেষ করার পর আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে, সে যেন পরিপূর্ণরূপে তার দাসত্ব পালন করে নিল।'

সুতরাং এই অষ্টম স্তরটি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করার মাধ্যমে বান্দা তার তাওয়াক্কুলের মাকাম পরিপূর্ণ করে নেয়। এতে তার অবস্থান দৃঢ় হয়। এটিই হলো বিশ্‌র হাফী ﷺ-এর কথার তাৎপর্য : 'কেউ কেউ বলে, تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ 'আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম' আসলে সে এর দ্বারা আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করে। কারণ যদি সে প্রকৃতই আল্লাহর ওপর ভরসা করত, তা হলে আল্লাহ যা ফায়সালা করেন তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকত!'

আল-আসমাউল হুসনার সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলার উত্তম নামসমূহের সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক সবচেয়ে ব্যাপক। কারণ আল্লাহ তাআলার গুণাবলি-সংক্রান্ত নাম ও কর্মসম্পাদন-সংক্রান্ত নাম উভয়ের সাথেই এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন : اَلْغَفُوْرُ (অতি ক্ষমাপরায়ণ), اَلتَّوَّابُ (তাওবা কবুলকারী), اَلْعَفُوُّ (পরম ক্ষমাশীল), اَلرَّؤُوْفُ (পরম স্নেহশীল), اَلرَّحِيْمُ (অতি দয়ালু) এই নামগুলোর সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক রয়েছে। তেমনি এর সম্পর্ক রয়েছে—اَلْفَتَّاحُ (উন্মোচনকারী), اَلْوَهَّابُ (প্রকৃত দানকারী), اَلرَّزَّاقُ (রিয্‌কদাতা), اَلْمُعْطِيْ (পরম দানশীল), اَلْمُحْسِنُ (ইহ্‌সানকারী) এই নামগুলোর সাথেও। اَلْمُعِزُّ (সম্মানদানকারী), اَلْمُذِلُّ (অপমানকারী), اَلْحَافِظُ (হেফাজতকারী), اَلرَّافِعُ (উঁচুকারী), اَلْمَانِعُ (বাধাদানকারী) এই নামগুলোর সাথে এই দিক দিয়ে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক রয়েছে যে, দ্বীনের শত্রুদের অপমানিত করা, তাদেরকে বাধাদান করা, তাদের থেকে শক্তি-সামর্থ্যের উপকরণ কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি। এর সম্পর্ক রয়েছে—اَلْقُدْرَةُ (ক্ষমতা), اَلْإِرَادَةُ (ইচ্ছাশক্তি) এই রকম গুণাবলির

সাথেও। আসলে আল্লাহ তাআলার সমস্ত উত্তম নামসমূহের সাথেই তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই অনেক ইমাম তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বারা।

এই কথার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহ সম্পর্কে বান্দার জ্ঞান অনুযায়ী বান্দার তাওয়াক্কুলের মাকাম বিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ সম্পর্কে যার জ্ঞান যত বেশি হবে, আল্লাহর ওপর তার তাওয়াক্কুল তত শক্তিশালী হবে।

তাওয়াক্কুল এবং উপকরণ

পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়। বরং উপকরণ ব্যবহার করা ব্যতীত তাওয়াক্কুল সহীহই হয় না। এটি ব্যতীত তাওয়াক্কুল ত্রুটিযুক্ত হয়।

সাহ্ল ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে গড়িমসি করল, সে যেন সুন্নাহ পালনেই গড়িমসি করল আর যে তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে অবহেলা করল, সে যেন ঈমানের ক্ষেত্রেই অবহেলা করল।'[৪১৯]

আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করা হলো নবি ﷺ-এর বিশেষ অবস্থা আর উপকরণ অবলম্বন করা হলো তাঁর সুন্নাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর বিশেষ অবস্থার ওপর আমল করবে, সে যেন কোনোভাবেই তাঁর সুন্নাহ ছেড়ে না দেয়। আবূ সাঈদ ﷺ-এর কথার অর্থ এটিই। তিনি বলেছেন, 'তাওয়াক্কুল হলো (উপকরণ অবলম্বন করার ক্ষেত্রে) নিশ্চিন্ততাশূন্য অস্থিরতা এবং (আল্লাহর ওপর ভরসা করার ক্ষেত্রে) অস্থিরতাশূন্য নিশ্চিন্ততা।'

এ সত্ত্বেও অনেকেই নফসকে কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে উপকরণ ব্যবহার করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; যাতে তাদের তাওয়াক্কুল খাঁটি হয়।

সূফি-দরবেশদের মধ্যে ইবাদাতগুজার একটি দলের মাযহাব হলো এটি। তাদের অনেকেই মরুভূমিতে চলতে শুরু করে সাথে কোনো পাথেয় নেওয়া ছাড়াই। তারা পাথেয় নেওয়াকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি বলে মনে করে। এ ব্যাপারে তাদের প্রসিদ্ধ

[৪১৯] ইবনু রজব হাম্বালি, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪৯৮।

অনেক ঘটনাও রয়েছে। তারা তাদের সত্যবাদিতা ও স্বচ্ছতা অনুযায়ী ফলাফলও পেয়েছে। কিন্তু তাদের স্তর আরিফ বা আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চেয়ে নিম্ন। এ সত্ত্বেও সত্যিকারার্থে কোনো ব্যক্তির জন্য একেবারে আসবাব-উপকরণ পরিত্যাগ করে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়।

আর সূফিয়ায়ে কেরামের যেসকল প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণিত আছে, সেগুলো কোনো প্রমাণ হতে পারে না; কারণ তা খণ্ডিত কিছু ঘটনা, যা কখনো কখনো কারও কারও সাথে ঘটেছে। তা অনুসৃত কোনো পথ কিংবা শারীআত-সমর্থিত কোনো আদেশও নয়। তাদের এই বিষয়টি দুটি দলের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে : একটি দল হলো যারা এটাকে অনুসরণীয় পথ ও প্রশংসনীয় মাকাম হিসেবে ধারণা করে। ফলে তারা এর ওপর আমল আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু কেউ এই পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেউ ফিরে আসে; পথচলা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয় না। আর কেউ কেউ পেছন ফিরে পালিয়ে যায়।

আরেকটি দল হলো : তারা প্রকৃত তাওয়াক্কুলের অধিকারী ব্যক্তিদের দুর্নাম ও নিন্দা করে, তাদেরকে শারীআত ও আকল বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে। আর তারা নিজেদের দাবি করে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মাকামের অধিকারী বলে; এমনকি তারা নবি ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের চেয়েও নিজেদের বেশি পরিপূর্ণ বলে জ্ঞান করে। কারণ সাহাবিদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না, যিনি এই রকম তাওয়াক্কুলের অধিকারী ছিলেন। তারা উপকরণ গ্রহণ না করে পথ চলতে পুরাপুরি ব্যর্থ হয়েছেন!

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের দিন দুটি বর্ম পরিধান করে যুদ্ধ করতে বের হয়েছিলেন।[৪২০] তিনি যুদ্ধের পোশাক না পরিধান করে কখনো যুদ্ধের কাতারে দাঁড়াননি। যেমনটি অনেক ইলম ও মা'রিফাতশূন্য ব্যক্তিদের করতে দেখা যায়। নবি ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় একজন মুশরিক ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ভাড়া করেছিলেন। যে তাঁকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল।[৪২১] সেই মুশরিক ব্যক্তির সাহায্য করার কারণেই আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-এর মাধ্যমে পুরা বিশ্ববাসীকে হিদায়াত দান করেছেন এবং নবিজিকে মানুষদের (কাফিরদের) থেকে রক্ষা করেছেন।

---

[৪২০] আবূ দাউদ, ২৫৯০।

[৪২১] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৩৯০৫-৩৯০৬।

নবি ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য এক বছরের খাবার জমা করে রাখতেন।[৪২২] অথচ তিনি ছিলেন সমস্ত তাওয়াক্কুলকারীর সর্দার, সাইয়্যিদুল মুতাওয়াক্কিলীন। তিনি যখন কোনো জিহাদ, হাজ্জ বা উমরার সফরে বের হতেন, তখন পথের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও পাথেয় সঙ্গে নিয়ে নিতেন। তাঁর সকল সাহাবিও এমনই করতেন। আসলে তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী।

তাঁদের পরে পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী হলেন : যারা বহুদূর থেকেই তাঁদের তাওয়াক্কুলের ঘ্রাণ পায় এবং তাঁদের দেখানো পথ অবলম্বন করে। আসলে তাঁদের অবস্থাই হলো মানদণ্ড ও কষ্টিপাথর; সেগুলোর মাধ্যমেই চেনা যায় কোনটা ভুল আর কোনটা শুদ্ধ। তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে তাদের হিম্মত ছিল পরবর্তীদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুউচ্চ। কারণ তাদের তাওয়াক্কুল ছিল মানুষের অন্তর এবং বড়ো বড়ো শহর জয় করার জন্য; ফলে তারা তাদের তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে অন্তরসমূহকে ঈমান ও হিদায়াত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতেন, কুফরি রাজ্যকে জয় করে ঈমানের রাজ্যে পরিণত করতেন।

তাঁদের সংকল্প ও মনোবল ছিল অনেক মহান ও উঁচু মাপের। ফলে তারা তাদের তাওয়াক্কুলের শক্তি ও উপকারিতা এমন সব ছোটো ছোটো কাজে ব্যয় করতেন না, যা সামান্য চেষ্টায় ও কৌশলেই অর্জন করা যায়। তাদের তাওয়াক্কুল ও মনোবল আরও অনেক বড়ো বড়ো কাজের জন্য ব্যয় হতো।

তাওয়াক্কুল এবং তাফবীয

তাফবীয হলো : শক্তি ও সামর্থ্য দেখানো থেকে মুক্ত থাকা, সমস্ত বিষয় আপন মালিকের নিকট অর্পণ করা।

কুরআনের কেবল এক জায়গাই তাফবীযের আলোচনা এসেছে। ফিরআউনের অনুসারীদের মধ্যে যে ঈমান গ্রহণ করেছিল তার প্রসঙ্গে—

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

“আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ

[৪২২] বুখারি, ২৯০৪; মুসলিম, ১৭৫৭।

বান্দাদের দেখছেন।"[৪২৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে আদেশ করেছেন যেন তিনি তাঁকে ওকীল বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

"তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের রব। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। অতএব, তাঁকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করুন।"[৪২৪]

এটি জাহমিয়্যাদের সেই কথাকে বাতিল করে দেয়, যারা বলে, আল্লাহকে ওকীল বা অভিভাবক বানানোর অর্থ তাঁর ওপর দুঃসাহসিকতা দেখানো। কারণ কাউকে ওকীল বানানোর অর্থ হলো : যাকে ওকীল বানানো হয়, সে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করবে। আর আল্লাহর সাথে এমনটা করা তো চরম ধৃষ্টতা। এটা জাহমিয়্যাদের সবচেয়ে বড়ো মূর্খতা। কারণ আল্লাহকে ওকীল বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা খাঁটি দাসত্ব ও স্বচ্ছ তাওহীদের পরিচায়ক; যখন ব্যক্তি তা যথাযথভাবে পালন করে।

সাহ্ল ইবনু আবদিল্লাহ তুসতারি ﷺ কতই-না প্রজ্ঞাবান ছিলেন, তিনি বলেছেন, 'ইলমের পুরাটাই বন্দেগির একটি অধ্যায়। বন্দেগির পুরাটাই আল্লাহভীতির একটি অধ্যায়। আল্লাহভীতির পুরাটাই দুনিয়াবিমুখতার একটি অধ্যায়। আর দুনিয়াবিমুখতার পুরাটাই হলো তাওয়াক্কুলের একটি অধ্যায়।'[৪২৫]

সুতরাং আমাদের নিকট তাওয়াক্কুল হলো তাফবীযের চেয়েও উচ্চস্তরের ও উচ্চ মর্যাদার।

আল্লাহর ওপর ভরসা এবং আল্লাহর ওপর আস্থা

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা (اَلثِّقَةُ بِاللهِ)।

[৪২৩] সূরা গাফির, ৪০ : ৪৪।

[৪২৪] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ৯।

[৪২৫] আবূ তালিব মাক্কি, কূতুল কুলূব, ২/৪।

আল্লাহ তাআলা মূসা ﷺ-এর মাকে বলেছিলেন,

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي

"তারপর যখন তার প্রাণের ভয় করবে, তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে এবং কোনো ভয় ও দুঃখ করবে না।"[৪২৬]

(মূসা ﷺ-এর মা নির্দ্বিধায় আল্লাহ তাআলার সে হুকুম পালন করেছিলেন।) এটি আসলে আল্লাহর ওপর আস্থা রাখার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ আল্লাহর ওপর যদি তার পরিপূর্ণ আস্থা না থাকত, তা হলে তিনি তার কলিজার টুকরা সন্তানকে উত্তাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করতেন না; যার বিশাল বিশাল ঢেউ তাকে নিয়ে খেলা করত, অবশেষে কোথায় নিয়ে পৌঁছাত তা ছিল অজানা।

পূর্বে অনেকের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে, যারা তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা করেছেন, 'আল্লাহ ওপর আস্থা রাখা' বলে। কেউ কেউ একে তাওয়াক্কুলের হাকীকত আখ্যা দিয়েছেন। কেউ তাফবীয বা আত্মসমর্পণ করার দ্বারা আর কেউ তাসলীম বা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার দ্বারাও তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা করেছেন।

সুতরাং আপনি অবগত হয়েছেন যে, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা করার মানযিল উপরিউক্ত সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

*****

[৪২৬] সূরা কাসাস, ২৮ : ৭।

২৪ নং মানযিল

নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া (اَلتَّسْلِيْمُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার মানযিল।

এটি দুই প্রকার :

১. আল্লাহর আদেশসূচক দ্বীনি ফায়সালা মেনে নেওয়া এবং

২. মহাবিশ্বসংক্রান্ত আল্লাহর তাকদীরি ফায়সালা মেনে নেওয়া।

প্রথম প্রকারটি হলো : মুমিন ও আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিদের তাসলীম বা মেনে নেওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

"না, আপনার রবের কসম, এরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা আপনাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেবে, অতঃপর আপনার ফায়সালা সম্পর্কে নিজেদের মনে কোনো প্রকার দ্বিধা ও জটিলতা খুঁজে পাবে না, বরং নির্দ্বিধায় তা মেনে নেবে।"[৪২৭]

এই তিনটি স্তরকে বিবেচনা করা জরুরি :

১. (নবিজিকে) বিচারক বানানো,

২. দ্বিধা ও সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে বক্ষকে প্রশস্ত করা এবং

---

[৪২৭] সূরা নিসা, ৪ : ৬৫।

৩. মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া।

মহাবিশ্বসংক্রান্ত আল্লাহর তাকদীরি ফায়সালা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের পদস্খলন ঘটে। এ বিষয়টি তাদেরকে পেরেশান করে তোলে এবং ঝগড়ায় লিপ্ত করে। সেটি হলো 'রিযা বিল কাযা' বা তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকার মাসআলা। পূর্বে এর যথেষ্ট আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। আমরা বলেছি, ফায়সালা মেনে নেওয়া তখনই প্রশংসনীয়, যখন বান্দাকে সে ব্যাপারে চেষ্টা-তাদবীর ও প্রতিরোধ করার হুকুম দেওয়া না হয়, এবং সে ওই ব্যাপারে সক্ষমও নয়; যেমন বিপদাপদে আক্রান্ত হওয়া; যা প্রতিহত করা বা দমিয়ে রাখার ক্ষমতা বান্দার নেই।

পক্ষান্তরে যে বিষয়ে প্রতিরোধ ও চেষ্টা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কিছুই না করে শুধু মেনে নেওয়া জায়িয নয়। বরং সেই বিষয়গুলোকে (আল্লাহ তাআলার) অন্য হুকুম দ্বারা প্রতিহত করার মাধ্যমে আল্লাহর দাসত্ব করা আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয়।

জেনে রাখবেন, তাসলীম বা মেনে নেওয়া হলো : শারঈ বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক কামনা করা থেকে বিরত থাকা, ইখলাসের বিপরীত ইচ্ছা করা থেকে এবং শারীআত ও তাকদীরের ওপর আপত্তি করা থেকে বিরত থাকা। এই সব গুণের অধিকারী ব্যক্তিই হলো সেই অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি, কিয়ামাতের দিন যেই অন্তর নিয়ে না এলে কেউ নাজাত পাবে না। কারণ তাসলীম হলো বিরোধিতায় লিপ্ত হওয়ার বিপরীত।

বিরোধিতা করা বা মেনে না নেওয়া সৃষ্টি হয় এমন ভ্রান্ত সন্দেহের কারণে, যা আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন, তার সাথে সাংঘর্ষিক; অথবা তিনি আখিরাতের জগৎ সম্পর্কে যে খবর জানিয়েছেন, তার বিপরীত অথবা এ রকম অন্যান্য বিষয়ে। সুতরাং এগুলোর ক্ষেত্রে তাসলীম হলো: মুতাকাল্লিমীন বা দার্শনিকদের বিভ্রান্ত চিন্তাচেতনার কারণে নিজে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয়ে জড়িয়ে না পড়া।

অথবা (বিরোধিতা করা বা মেনে না নেওয়া সৃষ্টি হয়) এমন কামনার কারণে, যা আল্লাহ তাআলার আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং আল্লাহর আদেশের ক্ষেত্রে

তাসলীম বা মেনে নেওয়া হলো : অসংযত ও বেপরোয়া কামনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

অথবা (বিরোধিতা করা বা মেনে না নেওয়া সৃষ্টি হয়) এমন ইচ্ছার কারণে, যা বান্দার নিকট আল্লাহ যা চান, তার সাথে সাংঘর্ষিক। এর ফলে আল্লাহর নিকট বান্দার চাওয়ার মধ্যেও বৈপরিত্যের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে তাসলীম হলো : এগুলো থেকে মুক্ত থাকা।

অথবা (বিরোধিতা করা বা মেনে না নেওয়া সৃষ্টি হয়) এমন আপত্তি করার কারণে, যা সৃষ্টিজগৎ ও আদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হিকমতের বিপরীত। এমন ধারণা করা যে, শারীআত ও তাকদীরি ফায়সালা হলো যুক্তি ও প্রজ্ঞার পরিপন্থি। এ ধরনের সমস্ত বিবাদ ও বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকা ও মুক্ত থাকার নামই তাসলীম বা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তাসলীম হলো ঈমানের মাকামসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মাকাম ও মানযিল। বিশেষ ব্যক্তিদের বিশেষ পথ। তাসলীম হলো খাঁটি সত্যবাদিতার মানযিল; যার মর্যাদা নুবুওয়াতের মর্যাদার পরেই। যে ব্যক্তির তাসলীম বা মেনে নেওয়ার গুণটি পরিপূর্ণ হবে, তার সত্যবাদিতাও পরিপূর্ণ হবে।

*****

২৫ নং মানযিল
ধৈর্য ধারণ করা (اَلصَّبْرُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—সবর বা ধৈর্য ধারণ করার মানযিল।

কুরআন ও সুন্নাহতে সবরের আলোচনা

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা কুরআনে প্রায় ৯০ জায়গায় সবরের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।'

এটি উম্মাহর ঐকমত্যে ওয়াজিব। এটি হলো ঈমানের অর্ধেক। কেননা ঈমান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত : অর্ধেক সবর আর অর্ধেক শোকর।[৪২৮]

ধৈর্য ধারণ করা বা সবর সম্পর্কে কুরআনে ১৬ প্রকার আলোচনা এসেছে,

১. সবরের আদেশ : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ

"হে মুমিনগণ, তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।"[৪২৯]

২. সবরের বিপরীত বিষয় থেকে নিষেধ : যেমন—

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ

[৪২৮] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৯২৬৪।

[৪২৯] সূরা বাকারা, ২ : ১৪৫।

"অতএব আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী রাসূলগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না।"[৪৩০]

৩. সবরকারীদের প্রশংসা : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۖ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

"এবং যারা অভাবে, রোগে-শোকে ও হক-বাতিলের সংগ্রামে সবর করবে তারাই সত্যবাদী এবং তারাই আল্লাহভীরু।"[৪৩১]

৪. ধৈর্যশীলদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা :

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

"আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।"[৪৩২]

৫. আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সান্নিধ্যেই থাকেন : এটি হলো বিশেষ সান্নিধ্য; যা তাদেরকে সাহায্য করা, হেফাজত করা এবং শক্তিশালী করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি আসলে সাধারণ সান্নিধ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহর ইলম ও আওতাধীন থাকা নয়; (কারণ এতে সবাই শামিল)। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاصْبِرُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴿٤٦﴾

"আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।"[৪৩৩]

৬. আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, সবর ধৈর্যশীলদের জন্য কল্যাণকর : যেমন :

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾

---

[৪৩০] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৫।

[৪৩১] সূরা বাকারা, ২ : ১৭৭।

[৪৩২] সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৪৬।

[৪৩৩] সূরা আনফাল, ৮ : ৪৬।

"তোমরা যদি সবর করো, তা হলে তা সবরকারীদের জন্য কল্যাণকর।"[৪৩৪]

৭. সবরকারীদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

"যারা সবর করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেবো, তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত।"[৪৩৫]

৮. তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য প্রতিদান : আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

"যারা ধৈর্যশীল, তাদেরকে দেওয়া হবে অসংখ্য পুরস্কার।"[৪৩৬]

৯. সবরকারীদের জন্য রয়েছে বিশেষ সুসংবাদ : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

"আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, প্রাণ ও ফল-ফসলে ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।"[৪৩৭]

১০. তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :

بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

"অবশ্য তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তা হলে যে মুহূর্তে দুশমন তোমাদের ওপর চড়াও হবে, ঠিক

[৪৩৪] সূরা নাহল, ১৬ : ১২৬।
[৪৩৫] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৬।
[৪৩৬] সূরা যুমার, ৩৯ : ১০।
[৪৩৭] সূরা বাকারা, ২ : ১৫৫।

তখনি তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।”[৪৩৮]

১১. এই সংবাদ দিয়েছেন যে, সবরকারীগণ হলেন দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

“অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, তার সে কাজ বড়ো হিম্মত ও সংকল্পদীপ্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত।”[৪৩৯]

১২. এই খবর দেওয়া হয়েছে যে, নেক আমল, এর পুরস্কার ও প্রতিদান কেবল ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের জন্যই বরাদ্দ : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

“ধিক তোমাদের! যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল, তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া প্রতিদানই উত্তম। তবে এটা কেবল তারাই পায়, যারা সবরকারী।”[৪৪০]

১৩. এই খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাদি দ্বারা কেবল সবরকারীরাই উপকৃত হয় এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٥﴾

“আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলিসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনো এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপদেশ দাও। নিশ্চয়

[৪৩৮] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১২৫।

[৪৩৯] সূরা শূরা, ৪২ : ৪৩।

[৪৪০] সূরা কাসাস, ২৮ : ৮০।

এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।”[৪৪১]

১৪. সবরকারীদের জন্য রয়েছে তাদের পছন্দনীয় ও প্রত্যাশিত বস্তু এবং তাদের অপছন্দনীয় ও কষ্টকর বস্তু থেকে তারা মুক্তি পায় আর তারা তাদের সবরের দ্বারা জান্নাত অর্জন করে নেয় : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

“ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। এসে বলবে, ‘তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণামগৃহ কতই-না চমৎকার!’”[৪৪২]

১৫. সবর সবরকারীর মাঝে নেতৃত্ব দেবার গুণ সৃষ্টি করে; আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷬-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘সবর ও ইয়াকীনের মাধ্যমে দ্বীনের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।’ এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

“তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। আর তারা ছিল আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী।”[৪৪৩]

১৬. ঈমান ও ইসলামের সমস্ত মাকামের সাথেই সবর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যেমন আল্লাহ তাআলা সবরকে ইয়াকীন, ঈমান, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, নেক আমল ও রহমতের সাথে সংযুক্ত করেছেন।

আর এ কারণেই বলা যায়, ঈমান ও সবরের সম্পর্ক হলো দেহ ও মাথার মতো। যার সবর নেই তার ঈমান নেই, যেমন মাথা ব্যতীত দেহের কোনো অস্তিত্ব নেই। উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেছেন, ‘সবরের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম জীবনোপকরণ

[৪৪১] সূরা ইবরাহীম, ১২ : ৫।

[৪৪২] সূরা রা'দ, ১৩ : ২৩-২৪।

[৪৪৩] সূরা সাজদা, ৩২ : ২৪।

লাভ করেছি।'[৪৪৪]

সহীহ্ হাদীসে এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন, وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ "ধৈর্য হলো উজ্জ্বল আলো।"[৪৪৫]

তিনি আরও বলেছেন,

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ

"যে ব্যক্তি ধৈর্যের ওপর অটল থাকতে চায়, আল্লাহ্ তাকে সে সক্ষমতা দান করেন।"[৪৪৬]

সুহাইব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের ব্যাপারটি ভারি আশ্চর্যজনক! তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত আর কারও জন্য তা প্রযোজ্য নয়। সে আনন্দের বস্তু লাভ করলে শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়, আবার বিপদাপদে পতিত হলে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়!"[৪৪৭]

নবি ﷺ কৃষ্ণবর্ণের একজন মহিলাকে বলেছিলেন, যে মহিলা তাঁর নিকট নিজের অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য দুআর আবদার করেছিল,

إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ

"তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পারো। এর পুরস্কারস্বরূপ তোমার জন্য থাকবে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তা হলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, যেন তিনি তোমাকে সুস্থতা দান করেন।"

---

[৪৪৪] মুনাবি, ফাইযুল কাদীর, ৫১২৮।

[৪৪৫] মুসলিম, ২২৩।

[৪৪৬] বুখারি, ১৪৬৯; মুসলিম, ১০৫৩।

[৪৪৭] বুখারি, ২৯৯৯।

মহিলাটি বলল, 'আমি ধৈর্য ধারণ করব। তবে অসুস্থতার কারণে আমার সতর প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তাই আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন আমার সতর প্রকাশিত না হয়।' তখন নবি ﷺ তার জন্য সেই দুআ করলেন।[৪৪৮]

আল্লাহর রাসূল ﷺ আনসার সাহাবিদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাদের ওপর অন্যান্য লোকদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে তারা যেন তাঁর সাথে হাউজে কাউসারে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে।[৪৪৯]

তিনি শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সময় ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন।[৪৫০] বিপদাপদে সবর করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন,

اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى

"বিপদের শুরুতে সবর করাই হলো প্রকৃত সবর।"[৪৫১]

নবি ﷺ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার জন্য সবচেয়ে উপকারী বস্তুটিই আদেশ করেছেন: ধৈর্য ধারণ করা এবং সাওয়াবের আশা রাখা।[৪৫২] কারণ এটি তার যন্ত্রণাকে হালকা করে এবং তার প্রতিদানকে বৃদ্ধি করে। অপরদিকে চিৎকার করা, অসন্তুষ্ট হওয়া এবং অভিযোগ পেশ করার দ্বারা বিপদ-মুসীবত বাড়তে থাকে আর এর মাধ্যমে তার সাওয়াবও নষ্ট হয়।

সবরের পরিচয় এবং সবর সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের বাণী

اَلصَّبْرُ শব্দটির শাব্দিক অর্থ : আটকে রাখা, বাধা দেওয়া বা বিরত রাখা। যখন কাউকে কোথায় বন্দি করে আটকে রেখে হত্যা করা হয়, তখন এই অর্থের প্রতি লক্ষ করেই তার ব্যাপারে বলা হয়, قُتِلَ فُلَانٌ صَبْرًا (অমুককে আটকে রেখে হত্যা করা হয়েছে)। এই অর্থে সবরের ব্যবহার কুরআনেও পাওয়া যায়; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

[৪৪৮] বুখারি, ৫৬৫২; মুসলিম, ২৫৭৬।

[৪৪৯] দেখুন—বুখারি, ৩৭৯২; মুসলিম, ১৮৪৫।

[৪৫০] বুখারি, ৩০২৬; মুসলিম, ১৭৪১।

[৪৫১] বুখারি, ১২৮৩; মুসলিম, ৯২৬।

[৪৫২] বুখারি, ১২৮৪; মুসলিম, ৯২৩।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

"আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁকে ডাকে।"[৪৫৩]

এখানে اِصْبِرْ نَفْسَكَ অর্থ হলো নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ করে রাখুন।

সুতরাং সবর অর্থ হলো : অন্তরকে অসন্তোষ হওয়া থেকে, জবানকে অভিযোগ করা থেকে আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি থেকে বিরত রাখা।

জুনাইদ বাগদাদি ﷺ বলেছেন, 'মুমিনের জন্য দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের পথে চলা কষ্টহীন ও সহজসাধ্য। আল্লাহ তাআলার জন্য সৃষ্টিজগৎকে পরিত্যাগ করা এর চেয়ে একটু কঠিন। নফসের চাহিদা থেকে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া আরেকটু কঠিন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে সবর করা সবচেয়ে কঠিন।'[৪৫৪]

যুন-নূন মিসরি ﷺ বলেছেন, 'সবর হলো বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকা।'[৪৫৫]

কেউ বলেছেন, 'সবর হলো বিপদের সময় উত্তম শিষ্টাচার দেখানো।'

কেউ বলেছেন, 'সবর হলো নিজেকে প্রকাশ না করে, অভিযোগ না করে বিপদের সময় মিশে যাওয়া।'

কেউ বলেছেন, 'নফসকে কষ্টকর কাজে অগ্রসর হতে অভ্যস্ত করে তোলা।'

কেউ বলেছেন, 'সুস্থতার সময় যেমন উত্তমভাবে অবস্থান করি, বিপদের সময়ও তেমনি অবস্থান করা।'[৪৫৬]

খাওয়াস ﷺ বলেছেন, 'সবর হলো কুরআন ও সুন্নাহর হুকুম-আহকামে দৃঢ় থাকা।'[৪৫৭]

---

[৪৫৩] সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ২৮।

[৪৫৪] তাজুদ্দীন ইবনুস সুবকি, তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, ২/২৬৪।

[৪৫৫] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/৩২৩।

[৪৫৬] আবদুল কাদীর জীলানি, আল-গুনইয়া লি-তালিবী তরীকিল হাক্ব, ২/৩২৮।

[৪৫৭] শাতিবি, আল-ই'তিসাম, ২/১৬৭।

বলা হয়েছে, 'সবরকারীদের স্তর হলো পাঁচটি : ১. সাবির, ২. মুসতাবির, ৩. মুতাসাব্বির, ৪. সাবূর আর ৫. সাব্বার।

সাবির হলো : ব্যাপক, এটি সমস্ত সবরকারীদের শামিল করে। **মুসতাবির** হলো : যে ব্যক্তি কষ্ট করে সবরের গুণ অর্জন করে নিয়েছে এবং তাতে পূর্ণতা অর্জন করেছে। **মুতাসাব্বির** হলো : যে ব্যক্তি সবরের গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং নিজের নফসকে সবরের ওপর উঠানোর চেষ্টায় মগ্ন থাকে। **সাবূর** হলো : গুণে ও পরিমাণে সবচেয়ে বড়ো সবরের অধিকারী, যার সবর অন্যান্যদের তুলনায় অনেক উচ্চমানের ও বেশ কঠিন। আর **সাব্বার** হলো : পরিমাণের দিক দিয়ে অনেক বেশি সবরের অধিকারী, এই ব্যক্তির সবরও বেশ কঠিন ও কষ্টসাধ্য।'

আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ বলেছেন, 'সবর এমন এক বাহন, যা কখনো হোঁচট খায় না।'[৪৫৮]

আবূ আলি দাক্কাক ﵀ বলেছেন, 'সবর অবলম্বনকারীরা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতেই ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী। কারণ তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে থাকে। কেননা আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে থাকেন।'[৪৫৯]

আল্লাহ তাআলার এই বাণী—

اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا

> "তোমরা সবর করো, শত্রুদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও এবং যুদ্ধের জন্য সবসময় তৎপর থাকো।"[৪৬০]

এই আয়াত সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন, এখানে নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরের দিকে এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং اَلصَّبْرُ (ধৈর্য ধরা) হলো اَلْمُصَابَرَةُ (শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখানো)-এর চেয়ে নিম্ন স্তরের। আবার اَلْمُصَابَرَةُ হলো اَلْمُرَابَطَةُ (যুদ্ধের জন্য সবসময় তৎপর থাকা)-এর চেয়ে নিম্ন স্তরের। اَلْمُرَابَطَةُ হলো اَلرَّبْطُ থেকে বাবে মুফাআলার সীগাহ; যার অর্থ : বেঁধে রাখা। 'মুরাবিত'কে এ কারণেই মুরাবিত

---

[৪৫৮] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/৩২৪।

[৪৫৯] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/৩২৫।

[৪৬০] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ২০০।

বলা হয় যে, সে তাঁর ঘোড়াকে বেঁধে রেখে জিহাদের ডাক আসার অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর নেককাজের জন্য নিজেকে-বেঁধে-রাখা-প্রত্যেক অপেক্ষাকারীকেই মুরাবিত বলা হয়। এই অর্থ নবি ﷺ-এর একটি হাদীসেও লক্ষ করা যায়। তিনি বলেছেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ

"আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তু সম্পর্কে জানিয়ে দেবো না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং মর্যাদার স্তর বাড়িয়ে দেবেন? (তা হলো) কষ্টের সময় পরিপূর্ণরূপে ওজু করা, মাসজিদের দিকে বেশি বেশি কদম উঠানো এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা; আর এটিই হলো 'রিবাত', আর এটিই হলো 'রিবাত' (অর্থাৎ সীমান্ত প্রহরায় নিজেকে আবদ্ধ রাখার ন্যায় সাওয়াবের আমল।)"[৪৬১]

সুতরাং সবর হলো আপনার নিজের নফসের সাথে, মুসাবারাহ হলো আপনার ও আপনার শত্রুর মধ্যে আর মুরাবাতাহ হলো মজবুতভাবে লেগে থাকা, শক্তি ও পাথেয় প্রস্তুত করা। যেমন রিবাত হলো সীমান্ত প্রহরায় সবসময় সতর্ক থাকা, যাতে শত্রুপক্ষ কোনো দিক দিয়ে আক্রমণ করে না বসে; ঠিক তেমনি মুরাবাতাহ হলো অন্তরের সীমানা পাহারা দেওয়ায় সবসময় নিযুক্ত থাকা, যাতে অন্তরের ওপর শয়তান আক্রমণ করে না বসে, ফলে সে অন্তরের মালিক হয়ে যাবে বা অন্তর বরবাদ করে দেবে বা অন্তরের সবকিছু বিশৃঙ্খল করে দেবে।

গুনাহের সাথে সম্পৃক্ততার বিচারে সবরের প্রকারভেদ

সবর তিন প্রকার :

১. নেক আমলের ওপর অবিচল থাকার যে কষ্ট, তার ওপর সবর করা,
২. আল্লাহর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার যে কষ্ট, তার ওপর সবর করা এবং
৩. আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষা অর্থাৎ বিভিন্ন বিপদাপদের যে কষ্ট, তার ওপর সবর করা।

[৪৬১] মুসলিম, ২৫১।

প্রথম দুটি হলো : বান্দার কাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর সবর। আর তৃতীয়টি হলো : এমন বিষয়ের ওপর সবর, বান্দার কাজকর্মের সাথে যার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'মিশরের বাদশাহর স্ত্রীর খারাপ প্ররোচনার ওপর ইউসুফ ﷺ যে সবর করেছিলেন, তা সেই সবরের তুলনায় অনেক বেশি পরিপূর্ণ ছিল, যে সবর তিনি করেছিলেন তার ভাইয়েরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করার সময়, এরপর তাকে বিক্রয় করা ও তার পিতা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার সময়। কারণ এই সবগুলো হয়েছিল তার অনিচ্ছায়, সেখানে তার কিছুই করার ছিল না, এ রকম পরিস্থিতিতে বান্দার ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

কিন্তু ফাহিশা বা খারাপ কাজটিতে জড়িয়ে পড়া থেকে তার সবর করা ছিল স্বেচ্ছায়, সন্তুষ্টচিত্তে এবং নফসের সাথে যুদ্ধ করার সবর। বিশেষ করে এমন সব উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, যা ছিল ওই পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার শক্তিশালী কারণ। যেমন তিনি ছিলেন যুবক; এ সময়টায় যৌবনের তাড়না থাকে যথেষ্ট প্রবল। তিনি ছিলেন অবিবাহিত; ফলে জৈবিক চাহিদা ও কামবাসনা পূরণের বিকল্প কোনো পথও ছিল না। তিনি ছিলেন প্রবাসী; আর প্রবাসীরা অপরিচিতদের ভিড়ে কোনো কাজ করতে তেমন লজ্জা অনুভব করে না, যেমনটি অনুভব করে নিজ দেশে পরিচিত ও আপনজনদের মাঝে থাকাবস্থায়। তিনি ছিলেন গোলাম; আর গোলামের কাজে স্বাধীন মানুষের মতো তেমন বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকে না। নারীটিও ছিল বেশ সুন্দরী, উঁচু বংশের, তার মনিব, আবার সেখানে কোনো পর্যবেক্ষণকারীও ছিল না, সেই নারী নিজেই তাকে সে কাজে আহ্বান করেছে, সে ব্যাপারে ওই নারী ছিল প্রচণ্ড আগ্রহী, এতকিছু সত্ত্বেও তিনি যদি সে পাপ কাজে সাড়া না দেন, তা হলে তাকে বন্দি করা ও লাঞ্ছিত করার হুমকি দিয়েছিল বাদশাহর সেই স্ত্রী। কিন্তু ইউসুফ ﷺ এত সব আয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজ ইচ্ছায় এবং আল্লাহর নিকট যা আছে, সেগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এই সবরের সাথে তার সেই সবরের কী কোনো তুলনা হয়, যা তিনি কূপে নিক্ষিপ্ত হবার সময় করেছিলেন, যাতে তার কোনো অন্য উপায় ছিল না?!'

তিনি আরও বলেছেন, 'নেককাজ আদায় করার যে কষ্ট, তার ওপর সবর করা,

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার যে কষ্ট, তার ওপর সবর করার চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ ও উত্তম। কারণ নেককাজ করার উপকারিতা, গুনাহ্ পরিত্যাগ করার উপকারিতার তুলনায় শারীআত প্রণেতার নিকট অধিক প্রিয়। এমনিভাবে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতির তুলনায় নেককাজ না করার ক্ষতি তাঁর নিকট বেশি অপছন্দনীয়।'

আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততার বিচারে সবরের প্রকারভেদ

এ ক্ষেত্রেও সবর তিন প্রকারর :

১. আল্লাহর তাওফীকে সবর,

২. আল্লাহর জন্য সবর এবং

৩. আল্লাহর সাথে সবর।

১. আল্লাহর তাওফীকে সবর : এটি হলো আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবরের প্রার্থনা করা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি রাখা যে, আল্লাহ্ তাআলাই সবর দানকারী এবং বান্দার সবর কেবল তাঁরই দান, এতে তার নিজের কোনো অর্জন নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

"সবর অবলম্বন করো আর তোমার এ সবর কেবল আল্লাহরই দান।"[৪৬২]

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি সবরের তাওফীক না দিতেন, তা হলে আপনি সবরের গুণে গুণান্বিত হতে পারতেন না।

২. আল্লাহর জন্য সবর : এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলার মহাব্বত, সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভ। নিজের নফসের শক্তি প্রকাশ, মানুষের প্রশংসা লাভ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য নয়।

৩. আল্লাহর সাথে সবর : বান্দা দ্বীনের ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্ তাআলার চাওয়া ও তাঁর হুকুম-আহকামের সাথেই আবর্তিত হবে। তা তাকে সবর করতে বললে সে সবর করবে, চলতে বললে চলবে, থামতে বললে থামবে, যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেই যাবে আর যেখানে অবতরণ করাবে সেখানেই অবতরণ করবে।

[৪৬২] সূরা নাহ্ল, ১৬ : ১২৭।

সুতরাং এটিই হলো 'আল্লাহর সাথে সবর করা'র অর্থ। অর্থাৎ বান্দা নিজেকে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও মহাব্বতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রাখবে। এটি সবরের সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ও কঠিন প্রকার। এটি হলো সিদ্দীকের মর্যাদায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের সবর।

সঠিক অভিমত হলো : আল্লাহর জন্য সবর হলো আল্লাহর তাওফীকে সবরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও বেশি মর্যাদাপূর্ণ। এর একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহর জন্য সবর হলো: তাঁর ইলাহিয়্যাত বা ইবাদাতসংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত এবং আল্লাহর তাওফীকে সবর হলো : তাঁর রুবূবিয়্যাত বা পরিচালনাগত বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত। আর তাঁর ইলাহিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি তাঁর রুবূবিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির তুলনায় অধিক পরিপূর্ণ ও মহত্তর।

আরেকটি কারণ : আল্লাহর জন্য সবর করা হলো ইবাদাত আর আল্লাহর তাওফীকে সবর করা হলো সাহায্য প্রার্থনা। ইবাদাত হলো উদ্দেশ্য আর সাহায্য প্রার্থনা করা হলো মাধ্যম। সুতরাং মাধ্যমের তুলনায় উদ্দেশ্যই হয় প্রত্যাশিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আরেকটি কারণ : আল্লাহর তাওফীকে সবর করা এতে মুমিন-কাফির, সৎ-অসৎ সবাই অন্তর্ভুক্ত। আসলে যে-ই গভীরভাবে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজগতের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, সে-ই আল্লাহর নিকট সবরের তাওফীক চায়। আর আল্লাহর জন্য সবর হলো নবি, রাসূল, সিদ্দীক এবং إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -এর গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির মানযিল।

আরেকটি কারণ : আল্লাহর জন্য সবর কেবল সেসব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে; যা আল্লাহর হক, পছন্দনীয় এবং সন্তুষ্টিজনক। পক্ষান্তরে আল্লাহর তাওফীকে সবর কখনো তাঁর পছন্দনীয় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আবার কখনো তার অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। এ জন্য এই সবর দুইয়ের মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যবধান!

এ কারণে নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ﷺ আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়ে যে সবর করেছিলেন, তা আইয়ূব ﷺ-এর সবরের চেয়ে পরিপূর্ণ ছিল। কারণ আইয়ূব ﷺ যে কষ্ট ও বিপদাপদের মধ্যে পড়েছিলেন, তা তার ইচ্ছাধীন ছিল না এবং তাতে তার কর্মেরও কোনো প্রভাব ছিল না।

এমনিভাবে ইসমাঈল যবীহ ও তাঁর পিতা ইবরাহীম ﷺ আল্লাহর তাআলার হুকুম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে সবর করেছিলেন, তা ইয়া'কূব ﷺ তাঁর ছেলে ইউসুফ ﷺ-কে হারিয়ে যে সবর করেছিলেন তার তুলনায় পূর্ণাঙ্গ ছিল।

ওপরের আলোচনার মাধ্যমে আপনি জানতে পারলেন যে, আল্লাহর জন্য সবর করা, আল্লাহর তাওফীকে সবরের চেয়ে পরিপূর্ণ। এমনিভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার ওপর সবর করা, আল্লাহর তাকদীরি ফায়সালা ও পরীক্ষার ওপর সবর করার চেয়ে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাআলাই সাহায্য-লাভের একমাত্র উৎস, ভরসা করতে হবে কেবল তাঁরই ওপর, মহামহিম আল্লাহ ছাড়া না আছে কারও কোনো শক্তি, আর না আছে কোনো সামর্থ্য।

আল্লাহর নিকট অভিযোগ করা সবর-পরিপন্থি নয়

আল্লাহ তাআলার নিকট অভিযোগ করা সবরের পরিপন্থি কিছু নয়। কারণ ইয়া'কূব ﷺ উত্তম সবর (اَلصَّبْرُ الْجَمِيْلُ)-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর নবিগণ ﷺ কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করেন না, এরপরেও তিনি বলেছিলেন,

إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِيْ إِلَى اللهِ

"আমি আমার অসহ্য যন্ত্রণা ও দুঃখের ব্যাপারে কেবল আল্লাহর নিকটই ফরিয়াদ করছি।"[৪৬৩]

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা আইয়্যুব ﷺ-এর ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছেন। এ সত্ত্বেও আইয়্যুব ﷺ বলেছিলেন,

أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

"আমি রোগাক্রান্ত হয়েছি; অথচ তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।"[৪৬৪]

আসলে সবর-পরিপন্থি হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা এবং আল্লাহর নামে অভিযোগ করা। আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা নয়। যেমন পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউ

[৪৬৩] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৬।

[৪৬৪] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৩।

এক ব্যক্তিকে দেখলেন, নিজের অভাব-অনটনের ব্যাপারে আরেকজনের কাছে অভিযোগ করছে। তখন তিনি তাকে বললেন, 'হে অমুক, যে তোমার ওপর দয়া-অনুগ্রহ করে, তাঁর নামে এমন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ করছো, যে তোমার ওপর সামান্যতম দয়া-অনুগ্রহও করে না? এরপর তিনি আবৃত্তি করেন,

وَإِذَا عَرَتْكَ بَلِيَّةٌ فَاصْبِرْ لَهَا *** صَبْرَ الْكَرِيْمِ فَإِنَّهُ بِكَ أَعْلَمُ

وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا *** تَشْكُو الرَّحِيْمَ إِلَى الَّذِيْنَ لَا يَرْحَمُ

তোমার কাছে বিপদাপদ এলে সবর কোরো ভদ্রমতো;
কারণ তোমার ব্যাপারে আল্লাহ আছেন অধিক জ্ঞাত।
তুমি আদম-সন্তানের কাছে অভিযোগ করছো—এর অর্থ
যে দয়া করে না তার কাছে দয়ালুর নামে নালিশ অবিরত।

সবর এবং মহাব্বত

মহাব্বত বা আল্লাহকে ভালোবাসার পথে সবর হলো সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী মানযিল। মহাব্বতকারীরা একেই আঁকড়ে ধরে। তারা অন্য সব মানযিলের চেয়ে এর প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী থাকে। এটি হলো তাওহীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রজ্ঞাময় ও সুস্পষ্ট মানযিল। মহাব্বতকারীর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক।

যদি প্রশ্ন করা হয় : মহাব্বতকারীদের জন্য কীভাবে সবরের প্রয়োজন অনেক বেশি?

উত্তরে বলা হবে : সবরই হলো সেই রহস্য, যার কারণে এটি মহাব্বতের পথে সবচেয়ে শক্তিশালী মানযিল। সবরের মাধ্যমেই মহাব্বতের বিষয়ে খাঁটি ও ভেজালের মধ্যে পার্থক্য রচিত হবে, জানা যাবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। কারণ প্রিয় মানুষের পছন্দ ও অপছন্দের ক্ষেত্রে কষ্টকর বিষয়ে সবর করার শক্তির মাধ্যমেই প্রমাণ হবে মহাব্বতের বিশুদ্ধতা।

এখানে এসেই বোঝা যায় যে, অধিকাংশ মানুষের মহাব্বত মিথ্যা ছিল। কারণ প্রত্যেকেই আল্লাহর মহাব্বতের দাবি করে, কিন্তু কষ্টকর কোনো বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করার সময় তারা প্রকৃত মহাব্বত থেকে বেরিয়ে যায়। তখন তাতে কেবল

ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই টিকে থাকে। যদি দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়ে যেতে না হতো, তা হলে তাদের মহাব্বতের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হতো না। এগুলোর দ্বারাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সেই ব্যক্তিই মহাব্বতের দাবিতে সবচেয়ে খাঁটি, যার সবর থাকে সবচেয়ে কঠিন।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও বিশেষ বিশেষ বান্দাদের সবরের গুণে গুণান্বিত করেছেন। তিনি তাঁর পছন্দনীয় বান্দা আইয়ুব ﷺ সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

"আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি।"[৪৬৫]

এরপর তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন,

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

"উত্তম বান্দা ছিল সে, নিজের রবের অভিমুখী।"[৪৬৬]

আল্লাহ তাআলা সবরের মাহাত্ম্যের কারণে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাদের সবর করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের সবর হলো আল্লাহর তাওফীকেই এবং তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। তিনি সবরকারীদের উত্তম প্রশংসা করেছেন। অন্য আমলকারীদের সাওয়াব করেছেন গণনাযোগ্য আর সবরকারীদের সাওয়াব করেছেন বেহিসাব। সবরকে ইসলাম, ঈমান, ইহ্‌সান ইত্যাদির সাথে যুক্ত করেছেন; যেমন পূর্বে এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। ফলে তিনি সবরকে তাওয়াক্কুল, ইয়াকীন, ঈমান, আমল ও তাকওয়ার নিকটবর্তী করেছেন।

*****

[৪৬৫] সূরা সা দ, ৩৮ : ৪৪।

[৪৬৬] সূরা সা দ, ৩৮ : ৪৪।

২৬ নং মানযিল

সন্তুষ্টি (اَلرِّضَى)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—সন্তুষ্টির মানযিল।

উলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন যে, সন্তুষ্টি বা রিযা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মুস্তাহাব আমল। এটি ওয়াজিব কি না এ নিয়ে তাদের মধ্যে দুইটি অভিমত পাওয়া যায়। একদল বলেছেন ওয়াজিব। আরেকদল বলেছেন ওয়াজিব নয়।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-কে বলতে শুনেছি—তিনি আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ-এর অনুসারীদের দুটি মতামত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মুস্তাহাব হওয়ার অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন।—তিনি বলেছেন, 'সন্তুষ্টির ব্যাপারে আদেশসূচক হুকুম আসেনি, যেমনটি এসেছে সবরের বেলায়। তবে হ্যাঁ, যারা সন্তুষ্টির গুণে গুণান্বিত তাদের ব্যাপারে কুরআনে প্রশংসার বর্ণনা এসেছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'এ সম্পর্কে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়—'যে ব্যক্তি আমার দেওয়া বিপদাপদের ওপর সবর করে না এবং আমার ফায়সালায় সন্তুষ্ট হয় না, সে যেন আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করে'—তা একটি ইসরাঈলি বর্ণনা, নবি ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়।'[৪৬৭]

দ্বীনের মাকামসমূহের ভিত্তি হলো সন্তুষ্টি

আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

---

[৪৬৭] ইবনু তাইমিয়্যা, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৩/৩০৪।

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا

"সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে, যে আল্লাহ্‌কে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট।"[৪৬৮]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুআযযিনকে (অর্থাৎ আযান) শুনে বলে,

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ(أَشْهَدُ) أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, যিনি একক, যার কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট।'

তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"[৪৬৯]

উপরিউক্ত দুটি হাদীসের ওপরই দ্বীনের সমস্ত মাকামের ভিত্তি এবং এ দুটি অর্জন করাই হলো সেগুলোর চূড়ান্ত গন্তব্য। এ দুটি হাদীস ১. আল্লাহ্ তাআলার রুবূবিয়্যাতের প্রতি সন্তুষ্টি, ২. তাঁর ইলাহিয়্যাতের প্রতি সন্তুষ্টি, ৩. তাঁর রাসূলের প্রতি সন্তুষ্টি ও আনুগত্য এবং ৪. তাঁর দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্টি ও তা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এই চারটি বিষয় যার মধ্যে একত্রিত হয় সে-ই প্রকৃত সিদ্দীক। এগুলো মুখে মুখে বলা ও দাবি করা খুব সহজ; কিন্তু বাস্তবতা ও পরীক্ষার সময় তা মেনে চলা অত্যন্ত কঠিন; বিশেষ করে যখন এমন বিষয় সামনে আসে, যা প্রবৃত্তির বিপরীত এবং নিজস্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক। সেই সময় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সন্তুষ্টির দাবি ছিল মৌখিক আর বাস্তব অবস্থা ছিল এর থেকে আলাদা।

(উপরিউক্ত চারটি বিষয়ের বর্ণনা :)

[৪৬৮] মুসলিম, ৩৬।

[৪৬৯] মুসলিম, ৩৮৬; আবূ দাউদ, ৫২৫।

আল্লাহ তাআলার ইলাহিয়্যাতের প্রতি সন্তুষ্টি : এটি আল্লাহর মহাব্বত, ভয়, আশা, তাঁর অভিমুখী হওয়া, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়া, ইচ্ছা ও ভালোবাসার সবটুকুই তাঁর প্রতি নিবেদিত করা ইত্যাদিকে শামিল করে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ইলাহ্ হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, সে তাঁর ইবাদাতে তৃপ্তি পায় এবং তাতে একনিষ্ঠ ও আন্তরিক হয়।

আল্লাহ্ তাআলার রুবুবিয়্যাতের প্রতি সন্তুষ্টি : এটি হলো আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের জন্য যে ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত নেন, তাতে সন্তুষ্ট হওয়া। এমনিভাবে এটি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া, তাঁর প্রতি আস্থা রাখা, তাঁর ওপর নির্ভর করা এবং তিনি তার বান্দার ব্যাপারে যা কিছু করেন, তাতে রাজি-খুশি থাকাকেও শামিল করে।

প্রথমটা আল্লাহ্ তাআলার আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়টা আল্লাহ্ তাআলার তাকদীরি ফায়সালার ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তাঁর নবিকে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া : এটি তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণ করাকে আবশ্যক করে। এ ক্ষেত্রে বান্দা নিজের জীবন থেকেও রাসূল ﷺ-কে বেশি মহাব্বত করবে। ফলে তাঁর দেখানো পথ ছাড়া আর কোনো পথের অনুসরণ করবে না, কেবল তাঁর নিকটেই সমাধান চাইবে, তাঁকেই বিচারক বানাবে, তাঁকে বাদ দিয়ে আর কারও হুকুম মানবে না এবং তাতে সন্তুষ্টও হবে না, আল্লাহ্ তাআলার কোনো একটি নাম, সিফাত বা কাজের ক্ষেত্রে, এমনিভাবে ঈমান ও ইসলামের যেকোনো বিষয়ে প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য তাঁর হুকুম ব্যতীত অন্য কারও হুকুমে সন্তুষ্ট হবে না, সবক্ষেত্রে কেবল তাঁর হুকুমই মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। তবে এতে যদি সে অক্ষম হয়, তা হলে অন্যকে বিচারক বানানোর ব্যাপারটি হবে মৃত্যুর-মুখে-পতিত অসহায় ব্যক্তির মৃত বস্তু ও রক্ত খাওয়ার বিধানের মতো। অথবা তার অবস্থা হবে মাটির মতো; যখন পবিত্র পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে অক্ষম হবে, কেবল তখনই মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার হুকুম প্রযোজ্য হবে।

দ্বীনের ব্যাপারে সন্তুষ্টি : ইসলাম যে কথা বলে, যে হুকুম দেয়, যা করতে বলে বা যা করতে নিষেধ করে, বান্দা পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে সেগুলো মেনে চলবে এবং পালন করবে, কোনো হুকুমের ব্যাপারে অন্তরে সামান্যতমও দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সংকীর্ণতাকে

প্রশ্রয় দেবে না; নিজের স্বার্থ ও চাহিদার বিরুদ্ধে গেলেও অথবা নিজের দল, শাইখ বা আদর্শের বিপরীত হলেও।

এখানে এসে সমস্ত মানুষ মনে হয় আপনাকে একাকিত্বের মধ্যে ফেলে দেবে। পৃথিবীতে নিজেকে আপনার একা মনে হবে। এই দলে আপনি খুব অল্পসংখ্যক মানুষ পাবেন। তবে এই গুরাবা বা অপরিচিত অবস্থা দেখে বিষণ্ণ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর শপথ! এটিই হলো খাঁটি সম্মানের বিষয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সান্নিধ্যলাভ, এতেই রয়েছে প্রাণবন্ত ঘনিষ্ঠতা, আল্লাহকে রব হিসাবে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসাবে আর ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পাওয়ার সন্তুষ্টি।

বরং সত্যবাদী ব্যক্তি যখনই একাকিত্ব-অপরিচিতির ছোঁয়া স্পর্শ করে, এর স্বাদ পায় এবং এর দ্বারা তার রূহ উৎফুল্ল হয়, তখন সে দুআ করতে থাকে, 'হে আল্লাহ, আমার এই অপরিচিতি আরও বৃদ্ধি করে দিন, মানুষজন থেকে দূরে রাখুন এবং আপনার সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে দিন।' আর যখনই সে একাকিত্বের এই স্বাদ আস্বাদন করে, তখনই সে দেখতে পায়—মানুষের সাথে দূরত্ব অবলম্বন করাই হলো তাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির মাধ্যম, আর এ পথে অপমান-লাঞ্ছনাই হলো খাঁটি ইজ্জত-সম্মান, মানুষের বিষয়াদি থেকে অজ্ঞ থাকাই হলো তাদের চিন্তাভাবনা ও যুক্তির সাথে একমত পোষণ করা, আর বিচ্ছিন্ন থাকাই হলো প্রকৃতপক্ষে তাদের রসম-রেওয়াজের সাথে যুক্ত থাকা। ফলে যে একবার এর স্বাদ পায়, সে কখনো আল্লাহর ওপর সৃষ্টিজগতের কাউকে প্রাধান্য দেয় না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার যে অংশ, তা মানুষের সাথে মেলামেশা করে বিক্রি করে না, তাদের সাথে একমত হওয়াতে তো কেবল বঞ্চনাই জোটে। এই পথ অবলম্বন করার শেষ পরিণতি হলো—দুনিয়ার জীবনে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া আর যেদিন সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সব বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হবে, কবরে যা কিছু রয়েছে সব প্রকাশিত হয়ে পড়বে, অন্তরে যা আছে সব জানা যাবে, যখন সকল রহস্য ফাঁস হবে, যেদিন সত্যিকারের মাওলা ব্যতীত কোনো শক্তি ও সাহায্যকারী থাকবে না, সেদিন তার সামনে লাভ-ক্ষতির হিসাব সুস্পষ্ট হবে এবং দাঁড়িপাল্লা ভারী হবে নাকি হালকা হবে; তা সে দেখতে পাবে! আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সাহায্য লাভের উৎস আর ভরসা করতে হবে কেবল তাঁরই ওপর।

সন্তুষ্টি এবং অভিভাবক বানানো

আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ : আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রব না বানানো; যার কাছে বান্দা নিজের কাজকর্ম ও প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করবে এবং যার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

"বলুন, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো রবের সন্ধান করব, অথচ তিনিই সবকিছুর রব?"[৪৭০]

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য ও অভিভাবক হিসেবে আমি অন্য কাউকে সন্ধান করব?' অর্থাৎ আমি কীভাবে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যকে রব হিসাবে খুঁজব, অথচ তিনিই সবকিছুর রব?!

এই সূরারই শুরুর দিকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"বলুন, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব, (সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে,) যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা?"[৪৭১]

অর্থাৎ ইবাদাত লাভের সত্তা, বন্ধু, সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা হিসাবে (আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করব?)। ওপরের আয়াতে উল্লেখিত وَلِيًّا শব্দটি এসেছে الْمُوَالَاةُ (বন্ধুত্ব করা)-থেকে; যা মহাব্বত ও আনুগত্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ওই সূরার মাঝামাঝিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

"আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মীমাংসাকারীর সন্ধান

[৪৭০] সূরা আনআম, ৬ : ১৬৪।

[৪৭১] সূরা আনআম, ৬ : ১৪।

করব, অথচ তিনি তোমাদের প্রতি বিস্তারিত বিবরণসহ কিতাব নাযিল করেছেন?"[৪৭২]

অর্থাৎ আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে সন্ধান করব, যিনি আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে? ফলে আমরা যে বিষয়ে বিরোধ করছি, সে বিষয়ে অন্য কাউকে মীমাংসাকারী বানাব? অথচ আল্লাহর এই কিতাব সমস্ত মীমাংসাকারীদের সর্দার! সুতরাং কীভাবে আমরা তাঁর কিতাব ব্যতীত বিচার-মীমাংসার জন্য অন্য কারও দ্বারস্থ হব, অথচ তিনি বিস্তারিত, সুস্পষ্ট, পূর্ণাঙ্গ ও উপযোগী করে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?

আপনি যদি উপরিউক্ত তিনটি আয়াত নিয়ে যথাযথভাবে চিন্তাভাবনা করেন, তা হলে দেখতে পাবেন যে, এই আয়াতগুলো সরাসরি আল্লাহকে রব হিসাবে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসাবে আর ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া(র বিষয়টিকেই স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।) আর সেই হাদীসটিকে পাবেন এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাকারী হিসেবে এবং এটা উপলব্ধি করবেন যে, সেই হাদীসটির উৎস হলো এই আয়াতগুলোই।

অনেক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো রবের সন্ধানও করে না; কিন্তু তাঁকে এককভাবে অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না; বরং তাঁকে ছাড়াও আরও অনেক নেককার ব্যক্তিদেরকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, এই ভেবে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী বানিয়ে দেবে, আল্লাহর প্রিয় পাত্র বানাবে। তাদেরকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়টি হলো রাজা-বাদশাহদের কাছের ও বিশেষ ব্যক্তিদেরকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করার ন্যায়। আসলে এটিই হলো শির্‌ক।

এ ক্ষেত্রে তাওহীদ হলো : আল্লাহকে ছেড়ে আর কাউকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী না বানানো। কুরআনে অনেকবার মুশরিকদের এই স্বভাব ও চরিত্রের বর্ণনা এসেছে যে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আরও অনেককে অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করে।

---

[৪৭২] সূরা আনআম, ৬ : ১১৪।

মুশরিকদের অভিভাবকগ্রহণ আর নবি-রাসূল ও মুমিন বান্দাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব ও অভিভাবকগ্রহণ করা এক নয়। কারণ এটি হলো ঈমানের ও আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের পরিপূরক। আসলে আল্লাহর ওলিদের বন্ধুত্বের মাঝে রয়েছে একটি রং আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করার মাঝে রয়েছে ভিন্ন আরেকটি রং। যারা এ দুটি রঙের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না, তারা যেন তাদের তাওহীদের মূল অনুসন্ধান করে। কারণ এই মাসআলাটি হলো তাওহীদের মূল ভিত্তি ও বুনিয়াদ।

আবার অনেক মানুষ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহকে ছাড়া বিচারক-মীমাংসাকারী হিসাবে অন্যকে খোঁজে, তার কাছেই মীমাংসা চায়, বিচার-ফায়সালার জন্য তার কাছেই যায় এবং তার বিচারেই সন্তুষ্ট থাকে। এই তিনটি মাকামই হলো তাওহীদের রোকন বা ভিত্তি; অর্থাৎ : ১. আল্লাহকে ব্যতীত কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ না করা, ২. আল্লাহকে ব্যতীত কাউকে ইলাহ্ হিসাবে গ্রহণ না করা ও ৩.আল্লাহকে ব্যতীত কাউকে মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ না করা।

আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাখ্যা হলো : আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করতে সে অসন্তুষ্ট হবে। আর এটি হলো আল্লাহকে ইলাহ্ হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া। আবার এটি (অর্থাৎ আল্লাহকে ইলাহ্ হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া) আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়াকে পূর্ণতা দান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হবে, অবশ্যই সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করতে অসন্তোষ প্রকাশ করবে। কারণ রব হিসাবে যে একজনকে মানবে, ইলাহ্ হিসাবেও সে কেবল একজনকে মানতে বাধ্য; যেমন যে ব্যক্তি জানে তার রব একজন, সে আবশ্যকীয়ভাবে এটাও জানবে যে, তার ইলাহ্ও একজন।

সন্তুষ্টির গুণ অর্জনযোগ্য নাকি আল্লাহ-প্রদত্ত?

কুশাইরি[৪৭৩] ﷺ বলেছেন, 'এ দুটির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব। তা এভাবে যে, সন্তুষ্টির সূচনা হলো বান্দার উপার্জিত। এটি হলো সমস্ত মাকামের মতোই একটি মাকাম। আর এর শেষ হলো 'হাল' বা বিশেষ অবস্থার অন্তর্ভুক্ত; যা বান্দার জন্য

[৪৭৩] *'আর-রিসালাহ'* গ্রন্থের লেখক। যা আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা নামে প্রসিদ্ধ।

অর্জনযোগ্য নয়। সুতরাং সন্তুষ্টির সূচনা হলো মাকাম আর এর শেষ হলো হাল।'

তবে সঠিক অভিমত হলো : রিযা বা সন্তুষ্টি কারণ-উপকরণের দিক বিবেচনায় অর্জনযোগ্য। আর প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় তা আল্লাহ-প্রদত্ত। সুতরাং বান্দা যদি সঠিক উপকরণ অবলম্বন করে এবং এর গাছ রোপণ করে, তা হলে সে এর থেকে সন্তুষ্টির ফল লাভ করবে। কারণ তাওয়াক্কুলের শেষ ধাপই হলো রিযা বা সন্তুষ্টি।

সুতরাং যে ব্যক্তির পা তাওয়াক্কুল, তাসলীম ও তাফবীযের মানযিলে স্থির হবে, নিশ্চিতভাবেই তার সন্তুষ্টির মাকাম হাসিল হবে।

কিন্তু এর অর্জন অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হওয়ার কারণে, অধিকাংশ মানুষের এতে সাড়া দেওয়ার প্রবণতা না থাকার কারণে এবং তাদের জন্য এটি অনেক কঠিন হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর তা ওয়াজিব করে দেননি; বান্দার প্রতি তাঁর অসীম দয়ার কারণে এবং তাদের ওপর সহজ করার জন্য। তবে এটিকে তিনি তাদের জন্য পছন্দনীয় আমল হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন এবং যারা এর গুণে গুণান্বিত হয় তাদের প্রশংসা করেছেন। এই সংবাদও দিয়েছেন যে, বান্দার ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি জান্নাত ও জান্নাতের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার চেয়েও অনেক বড়ো, মর্যাদাপূর্ণ ও উত্তম।

যে ব্যক্তি তার রবের ওপর সন্তুষ্ট হয়, আল্লাহও তার ওপর সন্তুষ্ট হন। বরং বলা যায় আল্লাহর প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি, বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টিরই ফল। আসলে বান্দার সন্তুষ্টি আল্লাহর দুটি সন্তুষ্টি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে : একটি সন্তুষ্টি এর পূর্বে; যা বান্দাকে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করে, আরেকটি সন্তুষ্টি এর পরে; আর তা হলো বান্দার প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির ফল। এ কারণেই সন্তুষ্টি হলো আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রশস্ত দরজা, দুনিয়ার জান্নাত, আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তৃপ্তির স্থান, মহাব্বতকারীদের জীবন, ইবাদাতকারীদের প্রফুল্লতা আর আল্লাহর প্রতি আগ্রহীদের চোখের শীতলতা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে বড়ো একটি উপকরণ হলো : আল্লাহ তাআলা যে কাজগুলোর মধ্যে তাঁর সন্তুষ্টি নিহিত রেখেছেন, তা আঁকড়ে ধরা। কারণ নিশ্চিতভাবে এটি তাকে সন্তুষ্টির মানযিলে পৌঁছিয়ে দেবে।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, বান্দা কখন সন্তুষ্টির মাকামে পৌঁছতে পারে? এর জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'বান্দা যখন তার রবের ব্যাপারে নিজেকে চারটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। (আর তা হলো,) সে বলবে,

১. 'আপনি যদি আমাকে দান করেন, আমি গ্রহণ করব;

২. যদি আমাকে দান করা থেকে বিরত থাকেন, আমি সন্তুষ্ট থাকব;

৩. যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবুও আমি আপনার ইবাদাত করতে থাকব; আর

৪. যদি আমাকে ডাকেন, তা হলে আমি সাড়া দেবো।'[৪৭৪]

অন্তরে ব্যথা-বেদনা অনুভব করা সন্তুষ্টির পরিপন্থি নয়

সন্তুষ্টির জন্য এটা শর্ত নয় যে, অন্তরে ব্যথা-বেদনা, কষ্ট ও দুঃখও অনুভব করবে না। বরং এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো : আল্লাহর কোনো বিধানে আপত্তি না করা এবং ক্রোধান্বিত না হওয়া। এই বিষয়টি না বোঝার কারণে কিছু কিছু মানুষ প্রশ্ন করে যে, কষ্টকর ও অপছন্দনীয় বিষয়ে সন্তুষ্টি কীভাবে আসে? তারা এ বিষয়টিকে মানতে নারাজ। তারা বলে, এ ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি প্রকৃতি ও স্বভাববিরুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো সবর বা ধৈর্যধারণ করা। আর কীভাবেই-বা সন্তুষ্টি ও অপছন্দ একত্রিত হবে, যখন এ দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী বিষয়!?

সঠিক অভিমত হলো : এ দুটির মাঝে কোনো বৈপরিত্য ও বিরোধ নেই। ব্যথা-বেদনা অনুভব করা আর নফস কোনো বিষয়কে অপছন্দ করা সন্তুষ্টির বিপরীত নয়। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি তিক্ত ও অপছন্দনীয় ওষুধ সেবনে সন্তুষ্ট থাকে, সাওম পালনকারী ব্যক্তি কষ্টকর ও কঠিন গরম দিনেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সন্তুষ্ট থাকে, এমনিভাবে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ আঘাত ও যন্ত্রণা সহ্য করেও সন্তুষ্ট থাকে। এ রকম আরও উদাহরণ রয়েছে। (সুতরাং বোঝা গেল, কষ্টকর ও অপছন্দনীয় বিষয়েও সন্তুষ্ট হওয়া যায়।)

সন্তুষ্টির পথ সংক্ষিপ্ত পথ, বেশ নিকটবর্তী; যা একটি মহান গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেয়। তবে এ পথে বেশ কষ্ট ও পরিশ্রম রয়েছে। এ সত্ত্বেও এর কষ্ট, মুজাহাদা বা চেষ্টা-সাধনা করার কষ্টের চেয়ে কম এবং মুজাহাদার পথের মতো এখানে বেশি ঘাঁটি

[৪৭৪] দেখুন—আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১০/৬৬।

ও তেমন জটিলতা নেই। সন্তুষ্টির ঘাঁটির জন্য প্রয়োজন কেবল সুউচ্চ মনোবল, দৃঢ় সংকল্প, নফসের পবিত্রতা আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ আরোপিত হয়, তাতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া।

বান্দার জন্য এটি অর্জন করা সহজ করে দেয় যে বিষয়টি তা হলো : বান্দার নিজের দোষত্রুটি এবং আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও বান্দার প্রতি তাঁর দয়া-অনুগ্রহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখা। যখন কেউ এই উভয় দিক প্রত্যক্ষ করেও আল্লাহর সামনে নিজেকে অর্পণ করে না, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয় না এবং তাঁর প্রতি মহাব্বতের টান অনুভব করে না; তখন তার জেনে রাখা উচিত, তার নফস হলো আল্লাহর কাছ থেকে বিতাড়িত নফস, তার অবস্থান আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, সে আল্লাহর বন্ধুত্ব ও নৈকট্যলাভের যোগ্য নয়; অথবা বিভিন্ন বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত দিয়ে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করছেন।

সন্তুষ্টি ও মহাব্বতের পথ বান্দাকে ভ্রমণ করাতে থাকে, যদিও সে তার বিছানায় শুয়ে থাকে, ফলে সে আল্লাহর পথের অন্যান্য অভিযাত্রীদের চেয়ে সামনে এগিয়ে যায় এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে যায়।

রিযা বা সন্তুষ্টির ফল

তাকদীরের সব বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা অন্তরে আনন্দ ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে। সন্তুষ্টি দুনিয়াবি প্রতিটি পরিস্থিতি ও বিপদাপদে অন্তরে স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা নিয়ে আসে। এমনিভাবে সন্তুষ্টির ফল হলো—অল্পেতুষ্টি, আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য বান্দার আগ্রহী থাকা, আল্লাহ কর্তৃক তার কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার ব্যাপারে খুশি থাকা, প্রতিটি বিষয়ে মাওলার প্রতি সমর্পিত থাকা, বান্দার ওপর আল্লাহ যে হুকুম জারি করেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং তা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া, আল্লাহর প্রতিটি কার্যপরিচালনাতেই বান্দার জন্য কল্যাণ ও হিকমত রয়েছে; এই বিশ্বাস করা, আল্লাহর ফায়সালা সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধে কারও কাছে কোনো অভিযোগ না করা ইত্যাদি।

এ কারণেই আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ সন্তুষ্টির নামকরণ করেছেন 'আল্লাহর সাথে উত্তম আচরণ' বলে। কারণ সন্তুষ্টি বান্দাকে আল্লাহর

মালিকানাধীন যেকোনো বিষয়ে আপত্তি না করাকে আবশ্যক করে। এমনিভাবে এমন কথাবার্তা বলা থেকেও তাকে বিরত রাখে, যা আল্লাহর সাথে উত্তম আচরণের পরিপন্থি। ফলে সে এ কথা বলবে না যে, 'মানুষের কত-না বৃষ্টির প্রয়োজন!' এ কথাও বলবে না যে, 'আজকে প্রচণ্ড গরম' বা 'আজকে তীব্র ঠান্ডা'। এ কথাও বলবে না যে, 'দরিদ্রতা হলো বিপদ আর পরিবার-পরিজন হলো চিন্তা ও পেরেশানির কারণ'। আল্লাহ তাআলা যা কিছু ফায়সালা করেন, সেগুলোকে মন্দ নাম দেওয়া থেকেও বিরত থাকবে। কারণ উপরিউক্ত সবগুলোই হলো সন্তুষ্টির বিপরীত ও পরিপন্থি বিষয়।

উমর ইবনু আবদিল আযীয ﷺ বলেছেন, 'তাকদীরি বিষয়েই কেবল আমার আনন্দ ও খুশি উপলব্ধি হয়।'[৪৭৫]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেছেন, 'দরিদ্রতা ও প্রাচুর্যতা দুইটি বাহন। আমি কোনটাতে আরোহণ করছি তার কোনো পরোয়া করি না। যদি দরিদ্রতা হয়, তা হলে তাতে রয়েছে সবর। আর যদি প্রাচুর্যতা হয়, তা হলে তাতে রয়েছে খরচ করা।'[৪৭৬]

ইবনু আবিল হাওয়ারি ﷺ বলেছেন, 'অমুক ব্যক্তি বলে, 'আমি পছন্দ করি যে, রাত যদি আরও দীর্ঘ হতো'। তিনি বলেন, 'এটি এক দিক দিয়ে ভালো, আরেক দিক বিবেচনায় মন্দ। ভালো দিকটি হলো : সে এটি কামনা করছে বেশি ইবাদাত ও মুনাজাত করার জন্য। আর মন্দ দিকটি হলো : আল্লাহ যা ইচ্ছা করেননি, সে তা কামনা করছে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেননি, সে তা পছন্দ করছে।'[৪৭৭]

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেছেন, 'আমি কোনো পরোয়া করি না যে, আমার সকাল-সন্ধ্যা দরিদ্রতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে নাকি সচ্ছলতার ভেতর দিয়ে।'[৪৭৮]

একদিন রাগান্বিত হয়ে উমর ﷺ তার স্ত্রী আতিকা ﷺ-কে বলেন, যিনি সাঈদ ইবনু যাইদ ﷺ-এর বোন, 'আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দেবো।'

---

[৪৭৫] ইবনু রজব হাম্বালি, ফাতহুল বারি, ১/৫৩।

[৪৭৬] আবূ তালিব মাক্কি, কূতুল কুলূব, ২/৬৬।

[৪৭৭] আবূ তালিব মাক্কি, কূতুল কুলূব, ২/৬৬।

[৪৭৮] আবূ তালিব মাক্কি, কূতুল কুলূব, ২/৬৬।

জবাবে তার স্ত্রী বলেন, 'আপনি কি আমাকে ইসলাম থেকে সরিয়ে দিতে পারবেন, আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করার পর?' উমর ﵁ বলেন, 'না।' তখন তার স্ত্রী বলেন, 'তা হলে আর কীসের মাধ্যমে আমাকে কষ্ট দেবেন?!'[৪৭৯]

এর দ্বারা আতিকা ﵂ বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি তাকদীরের সব বিষয়ে সন্তুষ্ট। কোনোকিছুই তাকে তেমন কষ্ট দিতে পারে না। কেবল তার ইসলাম থেকে সরিয়ে দেওয়াতেই তিনি কষ্ট পাবেন আর এর তো কোনো পথ নেই। (কারণ তা আল্লাহর হাতে, কোনো মানুষের আয়ত্তে তা নেই।)

একদিন সুফ্ইয়ান সাওরি ﵀ রাবিয়া বাস্রি ﵀-এর নিকট অবস্থান করার সময় এই দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের ওপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান।' তখন রাবিয়া বাস্রি ﵀ বললেন, 'আপনার কি লজ্জা হয় না, আপনি আল্লাহর কাছে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার প্রার্থনা করছেন; অথচ আপনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট?!' তখন সাওরি ﵀ বললেন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।' এরপর রাবিয়া বাস্রির কাছে জা'ফর ইবনু সুলাইমান ﵀ প্রশ্ন করলেন, 'কখন বান্দা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট বলে বিবেচিত হয়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বান্দা যখন বিপদ-মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তখন সেরকমই আনন্দিত হওয়া; যেরকম আনন্দিত হয় কোনো নিয়ামাত ও অনুগ্রহ লাভ করলে।'[৪৮০]

তাকদীরের ওপর ঈমান আনা এবং এতে সন্তুষ্ট হওয়া বান্দার সমস্ত পেরেশানি, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করে দেয়।

সন্তুষ্টি সম্পর্কে মনীষীদের কতিপয় উক্তি

যুন-নূন মিস্রি ﵀ বলেছেন, 'সন্তুষ্টির তিনটি আলামত আছে :

১. ফায়সালার আগে কোনো একদিক পছন্দ না করা,

২. ফায়সালার পরে মনঃক্ষুণ্ণ না হওয়া এবং

৩. বিপদাপদের কারণে মহাব্বত হ্রাস না পাওয়া।[৪৮১]

---

[৪৭৯] আবূ তালিব মাক্কি, কূতুল কুলূব, ২/৬৬।

[৪৮০] আবূ তালিব মাক্কি, কূতুল কুলূব, ২/৬৬।

[৪৮১] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৯/৩৪১।

হুসাইন ইবনু আলি ﷺ-কে বলা হলো : আবূ যার ﷺ বলেন, 'দরিদ্রতা আমার নিকট প্রাচুর্যতার চেয়ে বেশি পছন্দনীয় এবং অসুস্থতা আমার নিকট সুস্থতার চেয়ে বেশি প্রিয়।' তখন হুসাইন ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আবূ যারের প্রতি রহম করুন! আমি বলব, আল্লাহ তাআলা কারও জন্য যা পছন্দ করেন, সে যদি তা মেনে নেয়, তা হলে সে কখনো আল্লাহর পছন্দের বাইরে কোনোকিছু কামনা করতে পারে না।'[৪৮২]

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ বিশ্‌র হাফী ﷺ-কে বলেন, 'সন্তুষ্টি দুনিয়াবিমুখতা থেকেও উত্তম। কারণ সন্তুষ্ট ব্যক্তি তার স্তরের চেয়ে ওপরের স্তরের কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না।'[৪৮৩]

আবূ উসমান ﷺ-কে নবি ﷺ-এর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো : أَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ফায়সালার পরে সন্তুষ্টি চাই।"[৪৮৪] (এ রকম বলার কারণ কী?) এর জবাবে তিনি বললেন, 'কারণ ফায়সালার আগে সন্তুষ্টি হলো সন্তুষ্টির ওপর দৃঢ় সংকল্প। আর ফায়সালার পরের সন্তুষ্টিই হলো প্রকৃত সন্তুষ্টি।'[৪৮৫]

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ আবূ মূসা ﷺ-কে একবার চিঠি লিখলেন, 'মনে রাখবে, সমস্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে। সুতরাং যদি পারো সন্তুষ্ট থেকো, অন্যথায় সবর কোরো।'[৪৮৬]

একবার উহাইব ইবনুল ওয়ার্‌দ, সুফ্‌ইয়ান সাওরি ও ইউসুফ ইবনু আসবাত ﷺ এক জায়গায় সমবেত হলেন। তখন সুফ্‌ইয়ান সাওরি ﷺ বললেন, 'আমি আজকের পূর্বে হঠাৎ-মৃত্যুকে অপছন্দ করতাম, তবে আজকে আমি মৃত্যুকেই পছন্দ করি।' ইউসুফ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কারণ কী?' তিনি জবাব দিলেন, 'কারণ আমি ফিতনার আশঙ্কা করছিলাম।' তখন ইউসুফ ﷺ বললেন, 'কিন্তু আমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা পছন্দ করি।' সাওরি ﷺ বললেন, 'কেন আপনি মৃত্যুকে অপছন্দ

[৪৮২] যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৬২।
[৪৮৩] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-ইসতিকামাহ, ২/৮১।
[৪৮৪] নাসাঈ, ১৩০৫।
[৪৮৫] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১৯২।
[৪৮৬] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-ইসতিকামাহ, ২/৮৪।

করেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'হয়তো এমন একদিন আসবে, যেদিন আমি খাঁটি তাওবা করব এবং (মাকবূল) নেক আমল করব।' এবার উহাইব ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো : 'এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?' তিনি বললেন, 'এগুলোর কিছুই আমি পছন্দ করি না। আমার নিকট কেবল তা-ই প্রিয়, যা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয়।' এই কথা শুনে সুফ্‌ইয়ান সাওরি ﷺ তার কপালে একটি চুমু দিলেন এবং বললেন, 'কা'বার রবের কসম, এটি রূহানিয়্যাত বা আধ্যাত্মিকতা!'[৪৮৭]

*****

[৪৮৭] আবূ তালিব মাক্কি, কূতুল কুলূব, ১/৭৩।

২৭ নং মানযিল

শোকর (اَلشُّكْرُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—শোকরের মানযিল।

শোকর আদায়ে উৎসাহদান

শোকর সর্বশেষ্ঠ মানযিলগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম মানযিল। সন্তুষ্টির মানযিলের চেয়ে উচ্চ স্তরের মানযিল হলো শোকরের মানযিল। কেননা শোকর সন্তুষ্টির মানযিলকে ধারণ করার সাথে সাথে আরও অতিরিক্ত গুণাবলিকেও ধারণ করে। সুতরাং সন্তুষ্টি হলো শোকরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সন্তুষ্টি ব্যতীত শোকরের অস্তিত্ব অসম্ভব।

শোকর ঈমানের অর্ধেক। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে—ঈমানের দুটি অংশ:

১. শোকর বা কৃতজ্ঞতা এবং

২. সবর বা ধৈর্য ধারণ করা।

আল্লাহ তাআলা শোকরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির আদেশ করেছেন এবং এর বিপরীত বিষয়াবলি থেকে নিষেধ করেছেন। শোকরগুজার বান্দাদের প্রশংসা করেছেন, তাঁর খাছ খাছ বান্দাদের শোকরের গুণে গুণান্বিত করেছেন, আল্লাহ তার সকল সৃষ্টি ও আদেশের মূল হিসাবে শোকরকে নির্ধারণ করেছেন, কৃতজ্ঞ বান্দাদের উত্তম প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শোকরকে তাঁর অধিক অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন, তাঁর নিয়ামাতরাজি সংরক্ষণের জন্য প্রহরী ও পর্যবেক্ষক সাব্যস্ত করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর নিদর্শনাবলি থেকে কেবল শোকরগুজার বান্দারাই উপকৃত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের নামগুলোর মধ্যে একটি নাম ব্যবহার করেছেন শোকরগুজার বান্দাদের জন্য। তিনি 'আশ-শাকূর'; তিনি শুকরিয়া-আদায়কারীকে পৌঁছে দেন তাঁর কাছে, যার শুকরিয়া সে আদায় করেছে; শুধু তাই নয়, বরং তিনি শুকরিয়া-আদায়কারীকে পরিণত করেন এমন এক সত্তায়, যার শুকরিয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এটাই হলো বান্দার ওপর রবের সন্তুষ্টির সর্বোচ্চ পর্যায়। তাঁর বান্দাদের মধ্যে এ-গুণের অধিকারীদের সংখ্যা খুবই অল্প।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

"আল্লাহর নিয়ামাতের শোকর আদায় করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করে থাকো।"[৪৮৮]

তিনি আরও বলেন,

وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

"আর তোমরা আমার শোকর আদায় করো এবং আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"[৪৮৯]

তিনি আরও বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ﴿٧﴾

"তোমরা যদি শোকর আদায় করো, তা হলে আমি তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেবো আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে বড়োই কঠোর।"[৪৯০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٥﴾

---

[৪৮৮] সূরা নাহল, ১৬ : ১১৪।

[৪৮৯] সূরা বাকারা, ২ : ১৫২।

[৪৯০] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৭।

"নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল শোকরগুজার বান্দাদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।"[৪৯১]

আল্লাহ তাআলা নিজের নামকরণ করেছেন—শাকির (اَلشَّاكِرُ), শাকূর (اَلشَّكُوْرُ) দ্বারা। আর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরও এই দুই নামে নামকরণ করেছেন। নিজের গুণাবলি দ্বারা তাঁদেরকে গুণান্বিত করেছেন এবং নিজের নামে তাঁদের নাম দিয়েছেন। সুতরাং শোকরগুজার ব্যক্তি ভালোবাসা ও উদারতা পাওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা শোকরকারীদের উত্তম বিনিময় দান করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾

"নিঃসন্দেহে এটি হচ্ছে তোমাদের জন্য পুরস্কার, আর তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়েছে।"[৪৯২]

শোকরের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তা হলে এতে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।"[৪৯৩]

আর পৃথিবীতে শোকরকারী বান্দা কম, এটিই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তাঁরা আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

"আমার বান্দাদের মধ্যে শুকরিয়া আদায়কারী বান্দা খুবই কম।"[৪৯৪]

আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতে দাঁড়িয়ে এত অধিক পরিমাণ সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর দুই পা ফুলে গিয়েছিল। ফলে

[৪৯১] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৫।

[৪৯২] সূরা ইনসান, ৭৬ : ২২।

[৪৯৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ৭।

[৪৯৪] সূরা সাবা, ৩৪ : ১৩।

তাঁকে বলা হলো, আপনি এভাবে আমল করছেন, অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার আগে-পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!' জবাবে তিনি বলেন,

أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا

'আমি কি শোকরগুজার বান্দা হব না?'[৪৯৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মুআয ইবনু জাবাল ﵁-কে বলেন, 'আল্লাহর শপথ! হে মুআয, অবশ্যই আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের পরে (এই দুআটি) পাঠ করতে ভুলে যেয়ো না—

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ, আপনার স্মরণে, আপনার শোকর আদায়ে এবং আপনার উত্তম ইবাদাতে আমাকে সাহায্য করুন।'[৪৯৬]

শোকরের প্রকৃত মর্ম

ইবাদাতের ক্ষেত্রে শোকরের প্রকৃত মর্ম হলো—আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও নিয়ামাতের প্রভাব বান্দার জবানে প্রশংসা ও স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া, অন্তরে সাক্ষ্য ও মহাব্বতের মাধ্যমে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমর্পণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া।

শোকর পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত—

১. শোকরগুজার বান্দা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনম্র হবে,

২. তাঁকে ভালোবাসবে,

৩. তাঁর দেওয়া অনুগ্রহ ও নিয়ামাত স্বীকার করবে,

৪. নিয়ামাত প্রদানের কারণে তাঁর প্রশংসা করবে এবং

৫. নিয়ামাতসমূহকে তাঁর অপছন্দনীয় খাতে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।

এই পাঁচটি ভিত্তির ওপরই শোকর প্রতিষ্ঠিত। ফলে যখন এগুলোর মধ্য থেকে

[৪৯৫] বুখারি, ৪৮৩৭; মুসলিম, ২৮২০।

[৪৯৬] আবূ দাউদ, ১৫২২, সহীহ।

কোনো একটি অনুপস্থিত থাকবে, তখন শোকরের ভিত্তিসমূহ থেকে একটি ভিত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে কেউ শোকর ও শোকরের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করে, তার আলোচনা এই পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

যেমন : কেউ বলেছেন, 'শোকরের সংজ্ঞা হলো : বিনয় ও নম্রতার সাথে অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহকে স্বীকার করা।'

আবার কেউ বলেছেন, 'অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসা করা।'

কেউ বলেছেন, 'শোকর হলো : অন্তর অনুগ্রহকারীর ভালোবাসায় সিক্ত হওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার আনুগত্যে বিনম্র হওয়া এবং জবানে তার আলোচনা ও প্রশংসা চলমান থাকা।'

শিবলি ﷺ বলেছেন, 'শোকর হচ্ছে : অনুগ্রহদাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা; অনুগ্রহের প্রতি নয়।'[৪৯৭]

আমি বলি, তাঁর কথাটি দুটি বিষয়ের সম্ভাবনা রাখে—

১. অনুগ্রহদাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে তার দেওয়া অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করার ফুরসতই সে পাবে না, (সে তাঁর প্রতিই মগ্ন থাকবে।)

২. আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতের প্রতি দৃষ্টিপাত, আল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। এই ব্যাখ্যাটি পরিপূর্ণ। তবে তাদের নিকট প্রথমটিই বেশি শক্তিশালী।

কিন্তু সবদিক বিবেচনায় ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হলো—নিয়ামাত ও নিয়ামাতদাতা উভয়ের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা। কারণ নিয়ামাতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তাঁর থেকে প্রাপ্ত-নিয়ামাত অনুসারে। সুতরাং নিয়ামাত যখন পরিপূর্ণ হবে, কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায়ও পরিপূর্ণ হবে। আর আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দারা তাঁর দেওয়া নিয়ামাত প্রত্যক্ষ করুক, তাঁর প্রতি এর স্বীকৃতি জানাক, নিয়ামাত দেওয়ার কারণে তাঁর প্রশংসা করুক এবং তাঁকে ভালোবাসুক। তিনি এটা

---

[৪৯৭] মুনাবি, ফাইযুল কাদীর, ২/১৪০।

পছন্দ করেন না যে, বান্দারা তাঁর দেওয়া নিয়ামাত থেকে চোখ ফিরিয়ে নিক, তার আলোচনা বন্ধ করে দিক এবং তা প্রত্যক্ষ করা থেকে বিরত থাকুক।

শোকর আদায় করলে সবসময় অধিক নিয়ামাত পাওয়া যায়। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "যদি তোমরা আমার শোকর আদায় করো, তা হলে আমি তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেবো।"[৪৯৮] সুতরাং যখন দেখবেন আপনার অবস্থা সংকটময়, তখন শোকর আদায়ের প্রতি মনোযোগী হোন।

অনুগ্রহদাতার প্রশংসা করাও শোকর

অনুগ্রহদাতার প্রশংসা করার বিষয়টি তার দেওয়া অনুগ্রহের সাথে দুইভাবে সম্পৃক্ত:

১. ব্যাপক (اَلْعَامُّ) এবং
২. বিশেষ (اَلْخَاصُّ)।

১. ব্যাপক প্রশংসা : অনুগ্রহদাতার দয়া ও উদারতার কথা, করুণা ও মহানুভবতার কথা, তার ব্যাপক দান করার কথাসহ এ রকম আরও গুণাবলির কথা প্রকাশ করা।

২. বিশেষ প্রশংসা : প্রাপ্ত-নিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করা, নিয়ামাত দানকারীর পক্ষ থেকে তার নিকট নিয়ামাত পৌঁছার কথা জানিয়ে দেওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"এবং আপনার রবের নিয়ামাতের কথা প্রকাশ করুন।"[৪৯৯]

এখানে 'নিয়ামাতের কথা প্রকাশ করা'র যে আদেশ, তার দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

প্রথম ব্যাখ্যা : প্রাপ্ত-নিয়ামাতের আলোচনা করা এবং এ সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া। যেমন : 'আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এই এই নিয়ামাত দান করেছেন' ইত্যাদি বলা। মুকাতিল ﷺ বলেন, 'অর্থাৎ, এই সূরাতে বর্ণিত যে নিয়ামাতগুলো আপনাকে দেওয়া হয়েছে—যেমন : ইয়াতীম অবস্থায় আশ্রয় দেওয়া, পথ সম্পর্কে

[৪৯৮] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৭।
[৪৯৯] সূরা দোহা, ৯৩ : ১১।

জিনিসেরও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। আর যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না। আল্লাহ তাআলার নিয়ামাতের আলোচনা করা হলো : শোকর আর তা পরিত্যাগ করা হলো : অকৃতজ্ঞতা এবং একতাবদ্ধ হয়ে থাকা হলো : রহমত আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হলো : আযাব।"[৫০২]

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত আয়াতে 'নিয়ামাতের কথা প্রকাশ করা'র যে আদেশ নবি ﷺ-কে করা হয়েছে, তার অর্থ হলো—আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, আল্লাহর পয়গাম (রিসালাত) পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং উম্মাহকে শিক্ষাদান করা। মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সে (নিয়ামাতটি) হলো নুবুওয়াত।' যাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'অর্থাৎ, আপনাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন এবং আল্লাহ তাআলা যে নুবুওয়াত আপনাকে দান করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।' কালবি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তা হলো কুরআন; আল্লাহ তাআলা নবিজিকে তা পাঠ করে শুনানোর আদেশ দিয়েছেন।'[৫০৩]

সঠিক অভিমত হলো—এটি দুটি ব্যাখ্যাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ দুটির প্রত্যেকটিই নিয়ামাত, যার ব্যাপারে শুকরিয়া আদায় করার এবং আলোচনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর তা প্রকাশ করা তো শোকরেরই অন্তর্ভুক্ত।

*****

---

[৫০২] আহমাদ, ৪/৩৭৫।

[৫০৩] বাগাবি, তাফসীর, ৮/৪৫৮।

২৮ নং মানযিল

লাজুকতা (اَلْحَيَاءُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—হায়া বা লজ্জাশীলতার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾

“সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?”[৫০৪]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ একব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,

دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيْمَانِ

“ওকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা হলো ঈমানের অংশ।”[৫০৫]

ইমরান ইবনু হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِيْ إِلاَّ بِخَيْرٍ

“লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে।”[৫০৬]

---

[৫০৪] সূরা আলাক, ৯৬ : ১৪।

[৫০৫] বুখারি, ২৪; মুসলিম, ৩৬।

[৫০৬] বুখারি, ৬১১৭; মুসলিম, ৩৭।

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ

"ঈমানের সত্তরের চেয়ে কিছু বেশি অথবা ষাটের চেয়ে কিছু বেশি শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম শাখা হলো : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই) বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।"[৫০৭]

আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ পর্দায়-আবৃত-কুমারী মেয়ের চেয়ে বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোনোকিছু অপছন্দ করতেন, তখন আমরা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারতাম।'[৫০৮]

'সহীহ বুখারি'-তে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلٰى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

"পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম ﵈-এর বাণীসমূহ থেকে মানুষ যা লাভ করেছে, তার মধ্যে একটি হলো—যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা তা করতে পারো।"[৫০৯]

এই হাদীসের দুইটি ব্যাখ্যা রয়েছে—

এক. এটি ভীতিপ্রদর্শনমূলক হাদীস। এর দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যখন কারও লজ্জা থাকে না, তখন সে যা ইচ্ছা সব করতে পারে। (সুতরাং তোমরা

---

[৫০৭] বুখারি, ৯; মুসলিম, ৩৫।

[৫০৮] বুখারি, ৩৫৬২; মুসলিম, ২৩২০।

[৫০৯] বুখারি, ৩৪৮৩।

লজ্জাশীলতাকে আঁকড়ে ধরো।)

দুই. এটি বৈধতা দানকারী হাদীস। অর্থাৎ তুমি যে কাজটি করার ইচ্ছা করেছ, তা ভালোভাবে খেয়াল করে দেখো—কাজটি করে যদি লজ্জায় পড়তে না হয়, তা হলে তা করো; অন্যথায় তা থেকে বিরত থাকো। প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক বিশুদ্ধ। অধিকাংশেরই অভিমত সেটি।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

"তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করো।"

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো লজ্জা করি!'

তখন তিনি বললেন,

لَيْسَ ذَاكَ وَلٰكِنَّ الاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعٰى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

"(তোমরা যা ভেবেছ) তা নয়; বরং আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ হলো : তুমি তোমার মাথা ও মাথা যা ধারণ করে, তার হেফাজত করবে এবং পেট ও পেটের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার হেফাজত করবে; মৃত্যুকে ও মৃত্যুর পর পচেগলে যাওয়ার কথা স্মরণ করবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে, সে দুনিয়ার চাকচিক্য ছেড়ে দেয়। এ রকমভাবে যে জীবনযাপন করে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে লজ্জা করে।"[৫১০]

***

اَلْحَيَاءُ (লজ্জা) শব্দটির উৎসমূল হলো—اَلْحَيَاةُ (জীবন)। এ শব্দ থেকেই এসেছে اَلْحَيَا যার অর্থ : বৃষ্টি। অন্তর সজীব ও জীবন্ত হওয়ার অনুপাতে অন্তরে লজ্জাশীলতার

[৫১০] তিরমিযি, ২৪৫৮; আহমাদ, ৩৬৭১।

গুণ শক্তিশালী হয়। আর অন্তরে লজ্জাহীনতা তখন আসে, যখন অন্তর ও রূহ মরে যায়। আসলে অন্তর যত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত থাকে, লাজুকতাও তত পূর্ণতা পায়।

জুনাইদ বাগদাদি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিয়ামাতরাজি এবং নিজের অক্ষমতার দিকে তাকালে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে অবস্থার নাম হলো লাজুকতা। লাজুকতার প্রকৃত মর্ম—এটি এমন গুণ, যা ব্যক্তিকে খারাপ ও অশ্লীলতা পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করা থেকে বিরত রাখে।'[৫১১]

কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, 'সবাই যাকে লজ্জা করে, এমন ব্যক্তির সান্নিধ্যে থেকে নিজের লাজুকতাকে জীবিত করো। আর মনে রেখো, অন্তর সক্রিয় থাকে ভয় ও লজ্জার মাধ্যমে। যখন এ দুটি গুণ অন্তর থেকে চলে যায়, তখন তাতে আর কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকে না।'[৫১২]

যুন-নূন মিসরি ﷺ বলেছেন, 'লজ্জা হলো—অন্তরে ভয়ের উপস্থিতি এবং তোমার রবের নিকট তোমার কৃতকর্মের দরুন সৃষ্ট অস্থিরতা। ভালোবাসা থেকে আসে আলাপচারিতা, লজ্জা থেকে আসে নীরবতা আর ভয় থেকে আসে উৎকণ্ঠা।'[৫১৩]

সারি সাকাতি ﷺ বলেছেন, 'লজ্জা ও ঘনিষ্ঠতা অন্তরে এসে কড়া নাড়ে, যদি সেখানে দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহভীতিকে পায়, তা হলে অবস্থান করে; অন্যথায় চলে যায়।'[৫১৪]

হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّكَ إِنِ اسْتَحْيَيْتَ مِنِّيْ أَنْسَيْتُ النَّاسَ عُيُوْبَكَ، وَأَنْسَيْتُ بِقَاعَ الْأَرْضِ ذُنُوْبَكَ، ومَحَوْتُ مِنَ الْكِتَابِ زَلَّاتِكَ، وَلَمْ أُنَاقِشْكَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"(হে আদম-সন্তান,) তুমি যদি আমাকে লজ্জা করো, আমি তোমার দোষত্রুটি সম্পর্কে মানুষকে ভুলিয়ে রাখব, তোমার পাপাচার সম্পর্কে

---

[৫১১] নববি, শারহু মুসলিম, ১/২২১; রিয়াদুস সালিহীন, ৬৮৩।

[৫১২] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৩৬৭।

[৫১৩] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৩৫০।

[৫১৪] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৩৬৮।

জমিনকে ভুলিয়ে রাখব, তোমার বিচ্যুতিগুলো আমি তোমার আমলনামা থেকে মিটিয়ে দেবো এবং কিয়ামাতের দিন আমি তোমার হিসাব কঠিন করে নেব না।"[৫১৫]

আরেকটি হাদীসে কুদসিতে এসেছে, 'আল্লাহ তাআলা ঈসা ﷺ-এর নিকট এ মর্মে ওহি পাঠিয়েছেন যে,

عِظْ نَفْسَكَ. فَإِنِ اتَّعَظَتْ، وَإِلَّا فَاسْتَحِيْ مِنِّيْ أَنْ تَعِظَ النَّاسَ

"তুমি তোমার নফসকে উপদেশ দাও, যদি উপদেশ গ্রহণ করে, (তা হলে তো ভালো)। অন্যথায় মানুষকে উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে লজ্জা করো।"[৫১৬]

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ বলেছেন, 'পাঁচটি জিনিস দুর্ভাগ্যের আলামত—

১. অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া,

২. চোখে অশ্রু না আসা,

৩. লজ্জা কমে যাওয়া,

৪. দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়া এবং

৫. দীর্ঘ আশা করা।'[৫১৭]

***

লজ্জাশীলতার প্রকারভেদ

লজ্জাকে ১০টি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. অপরাধের কারণে সৃষ্ট লজ্জা (حَيَاءُ الْجِنَايَةِ)

২. অপারগতার দরুন লজ্জা (حَيَاءُ التَّقْصِيْرِ)

---

[৫১৫] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৩৬১।

[৫১৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৮২।

[৫১৭] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৩৫৪।

৩. শ্রদ্ধার কারণে লজ্জা (حَيَاءُ الْإِجْلَالِ)

৪. ভদ্রতাজনিত লজ্জা (حَيَاءُ الْكَرَمِ)

৫. শালীনতার লজ্জা (حَيَاءُ الْحِشْمَةِ)

৬. নফসকে ছোটো ও অপদস্থ মনে করার কারণে লজ্জা (حَيَاءُ اسْتِصْغَارٍ لِلنَّفْسِ وَاحْتِقَارٍ لَهَا)

৭. ভালোবাসার কারণে লজ্জা (حَيَاءُ الْمَحَبَّةِ)

৮. গোলামির কারণে লজ্জা (حَيَاءُ الْعُبُوْدِيَّةِ)

৯. সম্মান ও মর্যাদার কারণে লজ্জা (حَيَاءُ الشَّرَفِ وَالْعِزَّةِ) এবং

১০. নিজের প্রতি নিজের লজ্জা (حَيَاءُ الْمُسْتَحْيِيْ مِنْ نَفْسِهِ)

১. অপরাধের কারণে সৃষ্ট লজ্জা : আদম ﷺ-এর লজ্জা এর অন্তর্ভুক্ত। যখন জান্নাত থেকে তিনি পালিয়ে লুকানোর চেষ্টা করছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেছিলেন, 'হে আদম, আমার থেকে পালানোর চেষ্টা করছো?' তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'ইয়া রব, না; বরং আপনার প্রতি লজ্জার কারণে লুকানোর চেষ্টা করছি।'[৫১৮]

২. অপারগতার দরুন লজ্জা : যেমন, ফেরেশতাদের লজ্জা। যারা দিন-রাত আল্লাহ্ তাআলার তাস্‌বীহ-তাহ্‌লীলে মশগুল, সামান্য সময়ের জন্যও ক্লান্ত হয় না। কিয়ামাতের দিন তারা বলতে থাকবে, سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ 'আপনি দোষত্রুটি মুক্ত, আমরা আপনার যথোপযুক্ত ইবাদাত করতে পারিনি!'[৫১৯]

৩. শ্রদ্ধার কারণে লজ্জা : এটি হলো পরিচয়-প্রাপ্তির লজ্জা। বান্দা তার রবের পরিচয় অনুপাতে তাঁকে লজ্জা করে থাকে। (আল্লাহ্‌র পরিচয় যত বেশি পাবে, শ্রদ্ধা ও মহত্ত্বের কারণে তাঁর প্রতি লজ্জাও তত বাড়তে থাকবে।)

৪. ভদ্রতাজনিত লজ্জা : যেমন, নবি ﷺ-এর লজ্জা। যখন যাইনাব ﷺ-এর সাথে তাঁর বিয়ের ওলীমা খাওয়ার জন্য লোকজনদের দাওয়াত করেছিলেন আর তারা দীর্ঘসময় ধরে সেখানে বসে আলাপ করছিলেন। নবি ﷺ-এর অনেক অসুবিধা

[৫১৮] সুয়ূতি, জামিউল আহাদীস, ৫৯০২।

[৫১৯] সুয়ূতি, জামিউল আহাদীস, ৮৩১২।

হচ্ছিল, তবুও তিনি লজ্জার কারণে তাদেরকে বলতে পারেননি, 'তোমরা চলে যাও।'[৫২০]

৫. শালীনতার লজ্জা : যেমন, আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ-এর লজ্জা। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মযির মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলেন। কারণ নবি ﷺ-এর মেয়ে ফাতিমা ﷺ তার স্ত্রী ছিলেন।

৬. নফসকে ছোটো ও অপদস্থ মনে করার কারণে লজ্জা : যেমন, বান্দা যখন তার কোনো প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চায়, তখন লজ্জা অনুভব করে; নিজেকে ছোটো ও ক্ষুদ্র মনে করার কারণে। ইসরাঈলি বর্ণনায় এসেছে, 'মূসা ﷺ বলেন,

يَا رَبِّ، إِنَّهُ لَتَعْرَضُ لِيَ الْحَاجَةُ مِنَ الدُّنْيَا. فَأَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ هِيَ يَا رَبِّ

'রব আমার, অনেক সময় আমার দুনিয়াবি জিনিসপত্রের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু তোমার কাছে তা চাইতে লজ্জা লাগে!'

জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَلْنِيْ حَتَّى مِلْحَ عَجِيْنَتِكَ وَعَلَفَ شَاتِكَ

'তুমি আমার কাছে চাইবে, এমনকি তোমার খামিরার লবণ কিংবা বকরির জন্য ঘাস-পাতা হলেও।'[৫২১]

কখনো কখনো এই প্রকারের লজ্জার দুইটি কারণ থাকে—

১. প্রার্থনাকারী নিজেকে খুব ছোটো মনে করে আর তার অপরাধ ও গুনাহসমূহকে বড়ো করে দেখে, অথবা

২. যে জিনিসটি চাইছে, তা অনেক বড়ো মনে করে।

৭. ভালোবাসার কারণে লজ্জা : অনুরক্ত ব্যক্তি তার প্রিয় মানুষকে প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে লজ্জা পায়। এমনকি তার অনুপস্থিতিতেও যখন তার কথা অন্তরে আসে, হৃদয় ভরে লজ্জা অনুভূত হয় এবং সে তার চেহারাতেও তা টের

---

[৫২০] বুখারি, ৫১৬৮; মুসলিম, ১৪২৮।

[৫২১] ইবনু রজব হাম্বালি, জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ২/৬৬২।

পায়; কিন্তু জানে না, কী তার কারণ।

৮. গোলামির কারণে লজ্জা : এটি ভয় ও ভালোবাসা মিশ্রিত লজ্জা। আল্লাহ তাআলার গোলাম হওয়ার জন্য সে নিজেকে উপযুক্ত মনে করে না। কারণ তিনি হলেন সুউচ্চ ও সুমহান গুণাবলির অধিকারী। সুতরাং (অক্ষম, শক্তিহীন এক) বান্দার জন্য এমন রবের গোলাম হওয়ার কারণে তো লজ্জা অনুভূত হবেই; এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৯. সম্মান ও মর্যাদার কারণে লজ্জা : সম্মানের অধিকারী বড়ো কোনো ব্যক্তির লজ্জা; যখন তার কাছ থেকে এমন কোনো কাজ, দান বা অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, যা তার মর্যাদা ও পদবিমতো হয় না। তখন সেই ব্যক্তি তার সম্মান ও ইজ্জতের কারণে লজ্জিত হয়। এর দুটি কারণ—

এক. ওপরে যা বর্ণনা করা হলো। অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদার কারণে,

দুই. গ্রহণকারী বা প্রার্থনাকারীর প্রতি সে লজ্জাবোধ করে। যেন সে নিজেকেই প্রার্থনাকারী হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি এমন রয়েছে, যারা দান করার পর দানগ্রহণকারীর সামনে আর কখনো যাননি; তার প্রতি লজ্জার কারণে। এই প্রকারের লজ্জা ভদ্রতাজনিত লজ্জারও অন্তর্ভুক্ত। কেননা সেও গ্রহণকারীর প্রতি আন্তরিকতার দরুন লজ্জা অনুভব করে।

১০. নিজের প্রতি নিজের লজ্জা : সম্ভ্রান্ত, অভিজাত ও উঁচু স্তরের ব্যক্তি নিজের জন্য ত্রুটিযুক্ত কিছুতে সন্তুষ্ট হওয়ার লজ্জা। সে নিজেই নিজেকে লজ্জা পায়। যেন তার মাঝে দুটি আত্মা। একটি অপরটির নিকট লজ্জিত হয়। এই প্রকারের লজ্জাশীলতা সবগুলোর চেয়ে পরিপূর্ণ ও উঁচু স্তরের। কারণ বান্দা যখন নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পায়, তখন অপরের কাছে যে অধিক লজ্জা পাবে এটাই স্বাভাবিক।

*****

২৯ নং মানযিল

সত্যবাদিতা (اَلصِّدْقُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—সিদ্‌ক বা সত্যবাদিতার মানযিল।

এটি হলো সবচেয়ে বড়ো মানযিল। সালিকীন বা আখিরাতের পথযাত্রীদের সমস্ত মানযিলের উৎসকেন্দ্র হলো এই সত্যবাদিতার মানযিল। এটি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রশস্ত পথ, যে এ পথে চলবে না, সে পথহারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর মাধ্যমেই মুমিন থেকে মুনাফিক এবং জাহান্নামি থেকে জান্নাতিরা পৃথক হয়ে যায়। আল্লাহর জমিনে সত্যবাদিতা হলো আল্লাহর তরবারি, যার ওপরেই একে স্থাপন করা হয়, তাকে কেটে ফেলে। বাতিলের মোকাবিলায় এলে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। যে এর দ্বারা আক্রমণ করে, তার আক্রমণকে প্রতিহত করা অসম্ভব। আর যে এর পক্ষে কথা বলে, প্রতিপক্ষের ওপর তার কথাই বিজয়ী হয়।

সত্যবাদিতা হলো সমস্ত আমলের প্রাণ এবং সব পরিস্থিতিতেই তা মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। (এর দ্বারা সবকিছুকেই পরিমাপ করা যায়।) সব রকমের ভয়ভীতি, উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে দূরে রাখে। এটি এমন একটি দরজা, যা দিয়ে আখিরাতের-পথের-পথিক মহামহিম আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়।

সিদ্‌ক বা সত্যবাদিতার ওপর দ্বীনের মৌলিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপিত। এটি ইয়াকীন নামক তাঁবুর একটি মজবুত খুঁটি। নুবুওয়াতের স্তরের পরের স্তরটিই হলো সত্যবাদিতার স্তর। নুবুওয়াতের স্তর পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্তর। জান্নাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম ﷤-এর বাসস্থান থেকে সিদ্দীকীন বা মহাসত্যবাদীদের বাসস্থানের দিকে ঝরনা ও নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। যেভাবে এই দুনিয়াতে

তাঁদের অন্তর থেকে সত্যবাদীদের অন্তরে অবিরাম বৃষ্টি ও ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আদেশ করেছেন সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করতে। তিনি আম্বিয়ায়ে কেরাম, সত্যবাদী, শহীদ ও নেককার ব্যক্তিবর্গকে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বলে বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।"[৫২২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, সে তাঁদের সঙ্গী হবে, যাঁদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ দান করেছেন। তাঁরা হলেন নবি, সত্যবাদী, শহীদ ও নেককার ব্যক্তিবর্গ। আর তারা কতই-না চমৎকার সঙ্গী!"[৫২৩]

আল্লাহ তাআলা সবসময় তাঁদেরকে নিজ দয়া, অনুগ্রহ, অধিক করুণা ও তাওফীক দান করে সাহায্য করেন। সত্যবাদী ব্যক্তিরা অধিকাংশ সময় আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে থাকেন। কারণ আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে সত্যবাদীদের সাথে রয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর নৈকট্যলাভের স্তরে পৌঁছে যান। কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের মর্যাদা নবিগণের মর্যাদার পরেই।

আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের উত্তম আমল; যেমন : ঈমান আনা, ইসলাম গ্রহণ করা, দান-সদাকা করা, ধৈর্য ধরা ইত্যাদির প্রশংসা করে বলেছেন যে, তারা হলো আহলুস সিদ্‌ক বা সত্য অবলম্বনকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

[৫২২] সূরা তাওবা, ৯ : ১১৯।
[৫২৩] সূরা নিসা, ৪ : ৬৯।

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا ۖ وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۖ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

"বরং সৎকাজ হলো : মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামাতের দিনের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবি-রাসূলের ওপর, আর আল্লাহর মহাব্বতে সম্পদ ব্যয় করবে আত্নীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের, মুসাফিরদের, ভিক্ষুকদের এবং ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য। আর সালাত কায়েম রাখবে, যাকাত দান করবে, যখন অঙ্গীকার করবে, তখন তা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, রোগেশোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করবে—তারাই হলো সত্যবাদী আর তারাই আল্লাহভীরু মুত্তাকী।"[৫২৪]

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট হলো যে, সত্যবাদিতা প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব আমলের সাথেই সম্পর্কিত এবং সত্যবাদিতাই হলো—ঈমান ও ইসলামের মূল।

আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—সাদিক (সত্যবাদী) ও মুনাফিক (কপট)। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لِيَجْزِىَ اللّٰهُ الصَّادِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾

"যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সততার পুরস্কার দেন এবং মুনাফিকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করে নেন। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"[৫২৫]

ঈমানের ভিত্তি হলো সত্যের ওপর আর নিফাকের ভিত্তি হলো মিথ্যার ওপর। সুতরাং মিথ্যা ও ঈমান কখনো একত্রিত হবে না। যদি হয়, তবে একটি অপরটির সাংঘর্ষিক হিসেবেই অবস্থান করবে।

---

[৫২৪] সূরা বাকারা, ২ : ১৭৭।

[৫২৫] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২৪।

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সত্যবাদিতাই কেবল কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আযাব থেকে বান্দাকে মুক্ত করবে এবং তার উপকারে আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾

"আজকের দিনে সত্যবাদীদের সততা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে; তাতেই তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর এটিই সবচেয়ে বড়ো সফলতা।"[৫২৬]

সত্যবাদিতার প্রকারভেদ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾

"আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা তাকে সত্য বলে স্বীকার করেছে; তারাই আল্লাহভীরু।"[৫২৭]

যে ব্যক্তি সত্যকে সাথে করে পথ চলে তার নিদর্শন হলো—কথা, কাজে ও প্রতিটি পরিস্থিতিতে সত্য বলা। সুতরাং সত্যবাদিতা তিন প্রকার।

এক. কথোপকথনে সত্যবাদিতা : প্রতিটি কথার ক্ষেত্রে জবান যেন সোজা ও সত্যবাদী হয়; যেমন (ধান বা গমের) শিষ তার কাণ্ডের ওপর সোজা ও স্থির থাকে।

দুই. কাজকর্মে সত্যবাদিতা : বান্দার যাবতীয় কাজ হবে আল্লাহর হুকুম ও আদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত; যেমন দেহের ওপর মাথা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তিন. প্রতিটি পরিস্থিতিতে সত্যবাদিতা : অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃত সমস্ত

---

[৫২৬] সূরা মায়িদা, ৫ : ১১৯।

[৫২৭] সূরা যুমার, ৩৯ : ৩৩।

কাজ ইখলাস বা একনিষ্ঠতার সাথে করা এবং এতে যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করা।

এই তিনটি গুণাবলির মাধ্যমে বান্দা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা সত্যকে সাথে নিয়ে সত্যের পথে চলে। এই বিষয়গুলো অনুপাতেই ব্যক্তির সিদ্দীকের মাকাম নির্ণীত হয়। এসব গুণাবলির কারণেই আবূ বকর ﵁ সিদ্দীকের মাকামের সর্বোচ্চ চূড়ায় উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'আসসিদ্দীক' (মহাসত্যবাদী) বলে। 'সিদ্দীক' শব্দটি 'সাদূক' থেকে বেশি পূর্ণাঙ্গ। আর 'সাদূক' শব্দটি 'সাদিক' থেকে বেশি পূর্ণাঙ্গ।

সুতরাং সত্যবাদিতার সর্বোচ্চ স্তর সিদ্দীকের স্তর। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আনীত প্রতিটি বিষয় পূর্ণ ইখলাসের সাথে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া এবং সেগুলোর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা।

সত্যবাদিতার তাৎপর্য ও মর্মকথা

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে আদেশ করেছেন তিনি যেন তাঁর নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, তার বের হওয়া ও প্রবেশ করা সবই যেন হয় সততার সাথে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴿٨٠﴾

"আপনি বলুন, 'হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করান সততার সাথে এবং আমাকে বের করুন সততার সাথে এবং আমাকে দান করুন আপনার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী শক্তি।"[৫২৮]

আল্লাহ তাআলা তাঁর খলীল ইবরাহীম ﵇ সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর নিকট পরবর্তীদের কাছে তার উত্তম প্রশংসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দুআ করেছিলেন।

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾

---

[৫২৮] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮০।

"পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আমার উত্তম প্রশংসা ছড়িয়ে দিয়ো।"[৫২৯]

আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের সত্যিকারের মর্যাদা ও সম্মানজনক আসনের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ

"ঈমানদারগণকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য রয়েছে সত্যিকারের মর্যাদা।"[৫৩০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَّنَهَرٍ ۝ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

"আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও ঝরনাসমূহতে, মহা শক্তিধর সম্রাটের সান্নিধ্যে সম্মানজনক আসনে।"[৫৩১]

এখানে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা এসেছে—

১. সততার সাথে প্রবেশ করা (مُدْخَلُ الصِّدْقِ),
২. সততার সাথে বের হওয়া (مُخْرَجُ الصِّدْقِ),
৩. উত্তম প্রশংসা (لِسَانُ الصِّدْقِ),
৪. সত্যিকারের মর্যাদাবান হওয়া (قَدَمُ الصِّدْقِ) এবং
৫. সম্মানজনক আসন লাভ করা (مَقْعَدُ الصِّدْقِ)।

এই পাঁচটি বিষয়ই হলো সত্যবাদিতার মূল তাৎপর্য ও প্রকৃত মর্ম। এগুলো যথাযথ ও সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত এবং এগুলোই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কথা ও কাজের ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার সবগুলো প্রকারই এর সাথে সম্পৃক্ত। আর দুনিয়া-আখিরাতে সত্যবাদিতার পুরস্কারও এর সাথে সম্পর্কিত।

---

[৫২৯] সূরা শুআরা, ২৬ : ৮৪।
[৫৩০] সূরা ইউনুস, ১০ : ২।
[৫৩১] সূরা কমার, ৫৪ : ৫৪-৫৫।

১-২. সততার সাথে প্রবেশ করা এবং সততার সাথে বের হওয়া : এর মানে হলো—প্রবেশ করা ও বের হওয়া সবই হবে আল্লাহর হুকুম মোতাবিক, আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক সৃষ্টি করা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা অর্জন করার উদ্দেশ্যে। এর বিপরীতে রয়েছে মিথ্যার সাথে বের হওয়া ও প্রবেশ করা, এর নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই, যেখানে সে পৌঁছাবে এবং এর মজবুত কোনো ভিত্তিও নেই, যার ওপর তা স্থায়ী হবে। যেমন, বদরের দিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের বের হওয়া। পক্ষান্তরে সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم-এর বের হওয়া ছিল সত্যবাদিতার সাথে বের হওয়া, (তা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়।)

এমনিভাবে রাসূল ﷺ-এর মদীনায় প্রবেশ করাও ছিল সত্যবাদিতার সাথে প্রবেশ করা, যা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত এবং আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে। ফলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য-সহযোগিতাও এসেছে এবং দুনিয়া-আখিরাতের লক্ষ্যও অর্জন হয়েছে। এর বিপরীতে মিথ্যার সাথে প্রবেশ করা হলো : খন্দকের যুদ্ধের দিন আল্লাহর শত্রুদের মদীনায় প্রবেশ করা। কেননা তা আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য ছিল না; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ছিল। ফলে তারা কেবল লাঞ্ছিত, অপমানিত আর ধ্বংস হয়েই ফিরেছে।

কেউ কেউ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সততার সাথে প্রবেশ করা ও সততার সাথে বের হওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, মক্কা থেকে বের হওয়া এবং মদীনায় প্রবেশ করার মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে এটি একটি উত্তম উদাহরণ। কেননা এই বের হওয়া এবং প্রবেশ করা ছিল নবি ﷺ-এর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বের হওয়া ও প্রবেশ করা। আসলে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতিটি বের হওয়া ও প্রবেশ করাই ছিল সত্যবাদিতা ও সততার সাথে। কারণ সবগুলোই ছিল আল্লাহর আদেশে এবং সবগুলোর উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহ তাআলার রাজি-খুশি ও সন্তুষ্টি অর্জন।

যে কেউ তার বাড়ি থেকে বের হয়, এরপর বাজারে কিংবা অন্য কোথাও প্রবেশ করে; তা হয়তো সততার সাথে হয় কিংবা মিথ্যার সাথে। প্রত্যেকের বের হওয়া ও প্রবেশ করা অবশ্যই এ দুটির কোনো না কোনো একটির সাথে সম্পর্কিত। হয়তো সততার সাথে নয়তো মিথ্যার সাথে। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সাহায্য-লাভের উৎস।

৩. উত্তম প্রশংসা : লিসানুস সিদ্‌ক (لِسَانُ الصِّدْقِ) অর্থ : উত্তম প্রশংসা। নবি ﷺ সমগ্র উম্মাতের মধ্যে এ রকম উত্তম প্রশংসায় প্রশংসিত ছিলেন। এর দ্বারা কপট বা মিথ্যা প্রশংসা উদ্দেশ্য নয়। যেমন নবি-রাসূলগণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝٥٠

"এবং তাদেরকে দিলাম যথার্থ সুখ্যাতি।"[৫৩২]

এখানে لِسَانٌ (জবান) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উত্তম প্রশংসা। জবান দ্বারাই যেহেতু প্রশংসা করা হয়, তাই আল্লাহ তাআলা সরাসরি জবান উল্লেখ করে প্রশংসা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

'লিসান' দ্বারা তিনটি জিনিস বোঝানো হয়ে থাকে—

এক. প্রশংসা, যেমন ওপরে বর্ণনা করা হলো।

দুই. ভাষা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার সম্প্রদায়ের ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি।"[৫৩৩]

তিন. লিসান দ্বারা 'জিহ্বা' বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝١٦

"এ ওহিকে দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা দ্রুত সঞ্চালন করবেন না।"[৫৩৪]

---

[৫৩২] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫০।

[৫৩৩] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪।

[৫৩৪] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৬।

৪. সত্যিকারের মর্যাদাবান হওয়া (قَدَمُ الصِّدْقِ) : কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন জান্নাত দ্বারা। কেউ করেছেন মুহাম্মাদ ﷺ দ্বারা। আর কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন সৎকর্ম দ্বারা।

اَلْقَدَمُ এর প্রকৃত অর্থ হলো : যা আগে পাঠানো হয়েছে। কিয়ামাতের দিনের জন্য পাথেয়স্বরূপ তারা বিভিন্ন প্রকার সৎকর্ম, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনাসহ ইত্যাদি আমল আগে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর এই সমস্ত আমলের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের দিকেই তারা অগ্রসর হয়।

৫. সম্মানজনক আসন লাভ করা (مَقْعَدُ الصِّدْقِ) : এটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআলার নিকট চিরসুখের জান্নাত লাভ।

ওপরের পাঁচটি বিষয়কে সিদ্ক শব্দের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এ বিষয়গুলোর সংঘটিত হওয়া ও স্থায়ী হওয়া সুনিশ্চিত এবং এগুলোর উপকারিতা ও পরিপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। কেননা এই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। সুতরাং এগুলো হলো সত্য ও হক, মিথ্যা ও বাতিল নয়; এমনিভাবে স্থায়ী ও উপকারী, অস্থায়ী ও ক্ষতিকর নয়। আর বাতিল ও বাতিলসংক্রান্ত কোনোকিছুর সম্পৃক্ততা ও অনুপ্রবেশ এখানে নেই।

সত্য (اَلصِّدْقُ) হলো—কোনো বস্তু পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হওয়া, তার শক্তি সম্পূর্ণ হওয়া এবং তার সব অংশগুলো একত্রিত হওয়া। যেমন বলা হয়, عَزِيْمَةٌ صَادِقَةٌ (সুদৃঢ় ইচ্ছা) যখন ইচ্ছাশক্তি পূর্ণতা পায়। এমনিভাবে বলা হয় مَحَبَّةٌ صَادِقَةٌ (প্রবল ভালোবাসা), إِرَادَةٌ صَادِقَةٌ (প্রবল অভিলাষ), حَلَاوَةٌ صَادِقَةٌ (সুমিষ্ট); যখন এই বস্তুগুলো পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয় এবং এতে কোনো প্রকার ঘাটতি না থাকে।

এই কারণে صِدْقُ الْخَبَرِ (সত্য সংবাদ) বলা হয়ে থাকে। যখন সংবাদদাতা শ্রোতাকে কোনো বিষয়ে বাস্তবসম্মত পূর্ণ সংবাদ প্রদান করে, যাতে মিথ্যার কোনো মিশ্রণ থাকে না।

সত্যবাদিতার আলামত

সত্যবাদিতার আলামত হলো : অন্তরে নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তি আসে। আর মিথ্যাচারের

আলামত হলো : অন্তর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেমন 'সুনানুত তিরমিযি'তে এসেছে, হাসান ইবনু আলি ইবনি আবী তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَّإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ

"সত্য হলো নিশ্চিন্ততা আর মিথ্যা হলো দ্বিধাগ্রস্ততা।"[৫৩৫]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَالْفُجُوْرُ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

"তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো। কেননা নিশ্চয়ই সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। কোনো ব্যক্তি সত্য বলতে থাকলে অবশেষে তাকে আল্লাহ তাআলার নিকট সিদ্দীক বা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকো। কেননা মিথ্যা নিশ্চিতরূপে পাপাচারের পথ দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে তাকে আল্লাহ তাআলার নিকট কায্যাব বা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।"[৫৩৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যবাদিতাকে সিদ্দীকের মর্যাদা লাভের চাবি ও সূচনা বানিয়েছেন। আর সিদ্দীকের মর্যাদা লাভ করাই হলো সত্যবাদিতার চূড়ান্ত ধাপ। সুতরাং কথায়, কাজে বা আচার-আচরণে মিথ্যাবাদী কোনো ব্যক্তি কখনো এই মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না। বিশেষভাবে যারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ও নামসমূহের ক্ষেত্রে মিথ্যা আরোপ করে এবং আল্লাহ যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন আর যা সাব্যস্ত করেননি, সেসব ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কোনোকালেও সিদ্দীকের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

---

[৫৩৫] তিরমিযি, ২৫১৮।

[৫৩৬] বুখারি, ৬০৯৪; মুসলিম, ২৬০৬।

এমনিভাবে দ্বীন ও শারীআতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা; যেমন : আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন, তা হালাল করা; যা হালাল করেছেন, তা হারাম করা; যা আবশ্যক করেছেন, তা পরিত্যাগ করা; যা আবশ্যক করেননি, তা অবধারিত করে নেওয়া; আর আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেছেন, তা অপছন্দ করা কিংবা তিনি যা অপছন্দ করেছেন, তা পছন্দ করা ইত্যাদি এ সবগুলোই সিদ্দীক হওয়ার পরিপন্থি ও সাংঘর্ষিক।

এমনিভাবে বাহ্যিক আমলে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া; যেমন : কেউ সত্যবাদী, মুখলিস, দুনিয়াবিরাগী ও আল্লাহর ওপর ভরসাকারীদের মতো বেশভূষা গ্রহণ করে; অথচ বাস্তবে সে তাদের দলভুক্ত নয়। (সেও সিদ্দীক হতে পারবে না।)

এ জন্যই সত্যবাদিতা হলো—গোপনে ও প্রকাশ্যে পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তা মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া।

সত্যবাদিতা সম্পর্কে সালাফদের কতিপয় উক্তি

আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যাইদ ﷺ বলেছেন, 'সত্যবাদিতা হলো : আল্লাহর সাথে যে চুক্তি (করা হয়েছে) আমলের মাধ্যমে তা পূর্ণ করা।'[৫৩৭]

কেউ বলেছেন, 'সত্যবাদিতা হলো অন্তরে লুকায়িত কথার সাথে মুখে-বলা-কথার মিল থাকা।'[৫৩৮]

কেউ বলেছেন, 'বাহ্যিক অবস্থা ও গোপন অবস্থা এক হওয়া। অর্থাৎ মিথ্যাবাদীর বাহ্যিক অবস্থা তার গোপন অবস্থার চেয়ে ভালো হয়; মুনাফিকের মতো; যার ভেতরের চেয়ে বাইরের অবস্থা ভালো থাকে।'

কেউ বলেছেন, 'সত্যবাদিতা হলো—মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলেও ন্যায় ও হক কথা বলা।'

কেউ বলেছেন, 'যার নিকট তুমি আশাও করো, আবার ভয়ও পাও; তার সামনে ন্যায্য কথা বলা।'

---

[৫৩৭] সাহ্‌ল ইবনু আবদিল্লাহ তুসতারি, তাফসীর, ১২৬।

[৫৩৮] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৩৬৪।

ইবরাহীম খাওয়াস ﷺ বলেছেন, 'আপনি সত্যবাদীকে দেখবেন, হয়তো সে কোনো ফরজ দায়িত্ব পালন করছে, অথবা উত্তম কোনো কাজে লিপ্ত রয়েছে।'[৫৩৯]

জুনাইদ বাগদাদি ﷺ বলেছেন, 'সত্যবাদিতার প্রকৃত মর্ম হলো— যেখানে মিথ্যা বলা ছাড়া রেহাই পাবে না, সেখানেও তুমি সত্য কথা বলবে।'[৫৪০]

কেউ কেউ বলেছেন, 'সত্যবাদী ব্যক্তিকে তিনটি বিষয় সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারে না—

১. মিষ্টান্ন (অর্থাৎ উপহার),

২. ভয়ভীতি ও

৩. চাটুকারিতা।'[৫৪১]

হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَنْ صَدَقَنِيْ فِيْ سَرِيْرَتِهِ صَدَقْتُهُ فِيْ عَلَانِيَتِهِ عِنْدَ خَلْقِيْ

"যে ব্যক্তি তার গোপন অবস্থাতেও আমার প্রতি সত্যবাদী থাকে, আমি আমার সৃষ্টিকুলের মাঝে তাকে তার বাহ্যিক অবস্থাতেও সত্যবাদী হিসেবে রাখব।"[৫৪২]

*****

---

[৫৩৯] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৩৬৫।

[৫৪০] আবদুল কাদীর জীলানি, আল-গুনইয়া, ২/৩৩৫।

[৫৪১] আবদুল কাদীর জীলানি, আল-গুনইয়া, ২/৩৩৫।

[৫৪২] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৩৬৫।

৩০ নং মানযিল

অপরকে প্রাধান্য দেওয়া (اَلْإِيْثَارُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার মানযিল।

নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্য দানকারীর প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

"এবং নিজেরা যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন, তারা নিজেদের চেয়ে অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মূলত যেসব লোককে তাদের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"[৫৪৩]

اَلْإِيْثَارُ 'অপরকে প্রাধান্য দেওয়া' হলো اَلشُّحُّ 'লোভ'-এর বিপরীত। কারণ নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্য দানকারী ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় জিনিস পরিত্যাগ করে। আর লোভী ব্যক্তি তার হাতে যা নেই, তার আকাঙ্ক্ষা করে। যদি কোনো জিনিস তার হাতে আসে, তবে সে লোভে পড়ে যায় এবং তা বের করতে কৃপণতা করে। কৃপণতা হলো লোভের ফল। লোভ কৃপণতা করার আদেশ দেয়। যেমন নবি ﷺ বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا

"তোমরা লোভ থেকে বেঁচে থেকো। কেননা লোভের কারণে তোমাদের

---

[৫৪৩] সূরা হাশর, ৫৯ : ৯।

পূর্ববর্তী জাতিরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। লোভ তাদেরকে কৃপণতা করতে আদেশ দিত, ফলে তারা কৃপণতা করত; তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলত, তারা তা ছিন্ন করত এবং তাদেরকে অপকর্ম করতে নির্দেশ দিত, ফলে তারা অপকর্মে লিপ্ত হতো।”[৫৪৪]

সুতরাং কৃপণ হলো সেই ব্যক্তি, যে লোভের আহ্বানে সাড়া দেয়। আর অপরকে প্রাধান্য দানকারী হলো সেই ব্যক্তি, যে উদারতার আহ্বানে সাড়া দেয়।

এমনিভাবে প্রকৃত দানশীলতা হলো অপরের সম্পদে লোভনীয় দৃষ্টি না দেওয়া। এটি সম্পদ খরচ করার চেয়েও উত্তম দানশীলতা।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀ বলেছেন, ‘অপরের সম্পদে লোভ করা থেকে বিরত থাকা, ধনসম্পদ দান করার চেয়েও উত্তম।’[৫৪৫]

এই মানযিলটি হলো দানশীলতা, উদারতা ও অনুগ্রহের মানযিল। কিন্তু এটিকে اَلْإِيْثَارُ বা ‘অপরকে প্রাধান্য দেওয়া’ বলে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ এগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে উঁচু স্তরের। কেননা দান করার তিনটি স্তর রয়েছে—

১. দান করার দ্বারা ব্যক্তির সম্পদে কোনো ঘাটতি হয় না এবং এতে তার কোনো কষ্টও হয় না। এটি হলো اَلسَّخَاءُ বা দানশীলতার মানযিল।

২. ব্যক্তি তার অধিকাংশই দান করে দেয় এবং নিজের জন্য সামান্য কিছু অবশিষ্ট রাখে অথবা যে পরিমাণ দান করে, ওই পরিমাণ নিজের জন্যও অবশিষ্ট রাখে। এটি হলো اَلْجُوْدُ বা উদারতার মানযিল।

৩. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অপরকে প্রাধান্য দেওয়া। আর এটিই হলো اَلْإِيْثَارُ বা ‘অপরকে অগ্রাধিকার দান’-এর মানযিল। এর বিপরীত হলো اَلْأَثَرَةُ অর্থাৎ অপরের প্রয়োজনের চেয়ে নিজেকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া। এটি হলো সেই স্তর, যার ব্যাপারে নবি ﷺ আনসার সাহাবিদের বলেছিলেন,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[৫৪৪] আবূ দাউদ, ১৬৯৬, সহীহ।

[৫৪৫] ইবনু মানযূর, মুখতাসারু তারীখি দিমাশ্ক, ১৪/২৭।

وَسَلَّمَ عَلَى الْحَوْضِ

"(হে আনসার সাহাবিরা,) আমার পরে অচিরেই তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের ওপর অগ্রাধিকার দিতে দেখবে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করে থেকো, যে পর্যন্ত-না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে হাউজে কাওসারে সাক্ষাৎ করছো।"[৫৪৬]

আল্লাহ তাআলা আনসার সাহাবিদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা নিজের চেয়ে অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার গুণে গুণান্বিত—

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"এবং নিজেরা যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন, তারা নিজেদের চেয়ে অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে।"[৫৪৭]

আল্লাহ তাআলা দানশীলতার সবচেয়ে উঁচু স্তরের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন। আসলে আনসার সাহাবিদের মাঝে এই বিষয়টি খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

কাইস ইবনু সা'দ ইবনি উবাদা ﷺ দানশীলতা ও উদারতার ক্ষেত্রে ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তি। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তার ভাইয়েরা তাকে দেখতে আসতে গড়িমসি করতে থাকে। বিষয়টি টের পেয়ে তিনি এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। তারা জানান যে, তিনি তাদের কাছে যে ঋণ পাবেন, সে লজ্জায় তারা তার কাছে আসতে পারছেন না। জবাবে কাইস ইবনু সা'দ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সম্পদকে লাঞ্ছিত করুন, যে ভাইকে ভাইয়ের সাক্ষাতে আসতে বাধা দেয়!' এরপর তিনি একজনকে এই ঘোষণা দিতে আদেশ করেন যে, 'যার যার কাছে কাইস কোনো অর্থকড়ি পাবে, তার জন্য তা হালাল।' এই ঘোষণা শোনার পর বহু মানুষ তাকে দেখতে আসেন। এমনকি মানুষের ভিড়ে তার দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত ভেঙে যায়।[৫৪৮]

---

[৫৪৬] বুখারি, ৩১৪৭, ৩৭৯৩; মুসলিম, ১০৫৯।

[৫৪৭] সূরা হাশর, ৫৯ : ৯।

[৫৪৮] যামাখশারি, রবীউল আবরার, ৫/৩৪।

দানশীলতার স্তর

দানশীলতার দশটি স্তর রয়েছে :

১. নিজেকেই বিলিয়ে দেওয়া (اَلْجُوْدُ بِالنَّفْسِ) : এটি সর্বোচ্চ স্তরের দানশীলতা। কবি (কোনো একজনের প্রশংসায়) বলেন,

يَجُوْدُ بِالنَّفْسِ إِذْ ضَنَّ الْجَوَادُ بِهَا
وَالْجُوْدُ بِالنَّفْسِ أَقْصٰى غَايَةِ الْجُوْدِ

সে নিজের জীবন দিয়ে দেখায় উদারতা,
যখন দানবীর ব্যক্তিগণও করে কৃপণতা।
এ পথে আসলে তারাই অগ্রগামী মহান,
যারা নিজের নফকেই করে দেয় কুরবান।

২. ক্ষমতার মাধ্যমে দানশীলতা (اَلْجُوْدُ بِالرِّيَاسَةِ) : এটি দানশীলতার দ্বিতীয় স্তর। ক্ষমতা পেয়েও নমনীয় আচরণ করা এবং উদারতা দেখানো বড়ো কঠিন। এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তি নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্য দেয়।

৩. আরাম-আয়েশ পরিত্যাগের মাধ্যমে দানশীলতা (اَلْجُوْدُ بِالرَّاحَةِ وَالرَّفَاهِيَّةِ) : এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি অপরের উপকারার্থে নিজের আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আহার-নিদ্রা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে। যেমন বলা হয়েছে—

مُتَيَّمٌ بِالنَّدٰى، لَوْ قَالَ سَائِلُهُ :
هَبْ لِيْ جَمِيْعَ كَرٰى عَيْنَيْكَ، لَمْ يَنَمِ

'প্রকৃত দানবীরকে যদি কোনো প্রার্থনাকারী বলে,
'তোমার দুচোখের সবটুকু নিদ্রা আমাকে দিয়ে দাও',
তা হলে সে একটুও ঘুমুবে না।'

৪. ইলম শিক্ষা দেওয়া মাধ্যমে দানশীলতা(اَلْجُوْدُ بِالْعِلْمِ وَبَذْلِهِ) : এটি দানশীলতার সর্বোচ্চ মর্যদাপূর্ণ স্তর। ধনসম্পদ দান করার চেয়ে ইলম শিক্ষা দেওয়া অধিক উত্তম। কারণ সম্পদের চেয়ে ইলম বা জ্ঞান বেশি মূল্যবান।

ইলম শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণির হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ তাআলার হিকমত ও তাকদীরি ফায়সালার দাবি হলো, ইলমের দ্বারা আল্লাহ তাআলা কোনো কৃপণ ব্যক্তিকে কখনো উপকার পৌঁছান না।

ইলম শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে দানশীলতার অন্যতম একটি দিক হলো : কেউ কোনো বিষয়ে জানতে না চাইলেও সুন্দর উপস্থাপনায় তাকে তা বুঝিয়ে দেওয়া।

৫. পদবি ও প্রভাবের দ্বারা উপকার করার মাধ্যমে দানশীলতা (اَلْجُوْدُ بِالنَّفْعِ بِالْجَاهِ) : যেমন : কারও ব্যাপারে সুপারিশ করা, কোনো ব্যক্তির জটিলতা নিরসনে ক্ষমতাবান কারও কাছে যাওয়া ইত্যাদি। এটি পদবি ও প্রভাবের যাকাতের ন্যায়। যেমন ইলমের যাকাত হলো, মানুষের মাঝে তা বিতরণ করা এবং তাদেরকে তা শেখানো।

৬. নিজের শরীরের উপকার করার মাধ্যমে দানশীলতা (اَلْجُوْدُ بِنَفْعِ الْبَدَنِ) : যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ

"সূর্যোদয়ের প্রতিটি দিনে মানুষের প্রত্যেক জোড়া গ্রন্থির ওপর সদাকা নির্ধারিত রয়েছে, দুজন মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সদাকা, কাউকে সাহায্য করে তাকে তার সওয়ারিতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা সওয়ারির ওপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও সদাকা, ভালো কথা বলাও সদাকা, সালাত আদায়ের উদ্দেশে চলা প্রতিটি কদমও সদাকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সদাকা।"[৫৪৯]

৭. সম্মান বিসর্জন দিয়ে দানশীলতা (اَلْجُوْدُ بِالْعِرْضِ) : যেমন সাহাবি আবূ দমদম رضي الله عنه-এর দানশীলতা। প্রতিদিন সকালে তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমার তেমন কোনো সম্পদ নেই যে, আমি মানুষের ওপর দান-সদাকা করব। তবে আমি তাদের

[৫৪৯] বুখারি, ২৯৮৯; মুসলিম, ১০০৯।

প্রতি আমার সম্মান দিয়ে সদাকা করে থাকি, কেউ যদি আমাকে গালি দেয় বা অপবাদ দেয়, আমি তা ক্ষমা করে দিই।' নবি ﷺ বলেন, "তোমাদের কে আছে, যে আবূ দমদমের ন্যায় করতে পারে?"[৫৫০]

এই প্রকার দানশীলতার জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ হৃদয়, প্রশান্ত ও প্রশস্ত মন এবং মানুষের প্রতি শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত অন্তর।

৮. ধৈর্য ধারণ করা ও ক্ষমা করার মাধ্যমে দানশীলতা (اَلْجُوْدُ بِالصَّبْرِ وَالْاِحْتِمَالِ وَالْإِغْضَاءِ) : এটি হলো অন্যান্য স্তরগুলোর চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ স্তর। বান্দার জন্য অর্থ-সম্পদ দান করার চেয়ে এটি বেশি উপকারী, অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং নিজের নফসকে দমিয়ে রাখতে বেশ কার্যকরী। সবার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষমা করে দেওয়ার এই নীতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। এটি কেবল মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব।

সুতরাং যে ব্যক্তির পক্ষে টাকা-পয়সা দান করা কষ্টকর, তার উচিত এই পন্থাকে আঁকড়ে ধরা। কেননা এটি আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই সুন্দর পরিণতি নিয়ে আসে। এটি হলো প্রকৃত উদারতার নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ

"এবং জখমের বদলা অনুরূপ জখম। তবে যে তা ক্ষমা করে দেবে (অর্থাৎ কিসাস নেবে না) তার জন্য তা কাফফারা (পাপমোচনকারী) হবে।"[৫৫১]

৯. উত্তম চরিত্র ও হাসিখুশির মাধ্যমে দানশীলতা (اَلْجُوْدُ بِالْخُلُقِ وَالْبِشْرِ وَالْبَسْطَةِ): এটি ধৈর্য ধারণ করা, অপরের দেওয়া কষ্ট সহ্য করা এবং ক্ষমা করার চেয়েও ওপরের স্তরের দানশীলতা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি লাগাতার সাওম পালনকারী ও রাতে সালাত আদায়কারীর মর্যাদায় পৌঁছে যায়। অন্যান্য আমলের চেয়ে আমলনামায় এটি সবচেয়ে বেশি ভারী হবে। আবূ যার গিফারি ؓ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

"কোনো নেককাজকে ছোটো করে দেখো না। এমনকি তা তোমার

---

[৫৫০] এর অনুরূপ হাদীস দেখুন—আবূ দাউদ, ৪৮৮৭; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৭০২৬।
[৫৫১] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৫।

ভাইয়ের সাথে হাসিখুশি চেহারায় সাক্ষাৎ করা হলেও।”[৫৫২]

(আবুদ দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

“মীযান বা দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী কোনো আমলই নেই।”)[৫৫৩]

এই প্রকারের দানশীলতায় অনেক উপকারিতা ও কল্যাণ রয়েছে। কোনো ব্যক্তি সমস্ত মানুষকে ধনসম্পদ দিয়ে খুশি করতে পারবে না। কিন্তু উত্তম চরিত্র, ভালো আচরণ আর হাশিখুশি ব্যবহার দিয়ে সবাইকেই সন্তুষ্ট করতে পারে।

১০. মানুষের ধনসম্পদ উপেক্ষা করার মাধ্যমে দানশীলতা (اَلْجُوْدُ بِتَرْكِهِ مَا فِيْ أَيْدِى النَّاسِ عَلَيْهِمْ) : মানুষের নিকট যা রয়েছে তা পরিত্যাগ করা, সে দিকে ভ্রুক্ষেপই না করা, অন্তরে তা পাওয়ার আশাও না রাখা এবং ভাবভঙ্গি কিংবা কথাবার্তার মাধ্যমেও সেগুলোর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করা। এ সম্পর্কেই আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ বলেছেন, ‘অপরের সম্পদে লোভ করা থেকে বিরত থাকা, ধনসম্পদ দান করার চেয়েও উত্তম।’[৫৫৪]

এই ধরনের ব্যক্তি মানুষকে দান করার মতো হয়তো কোনো সম্পদ পায় না; কিন্তু সে মানুষের অর্থকড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে, ফলে তারা দানশীলদের চেয়ে বেশি মর্যাদা লাভ করে এবং আত্মিক প্রশান্তি পায়।

দানশীলতার প্রতিটি স্তরেই ব্যক্তির জন্য সে যা দান করে তার চেয়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি রয়েছে। (দান করার কারণে ধনসম্পদ কখনো কমে না।) ব্যক্তির অন্তরে ও অবস্থায় এর একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা দানশীল ব্যক্তিকে তার দানের চেয়ে বেশি দিয়ে থাকেন। অপরদিকে তিনি সম্পদ সঞ্চয়কারীর অর্থকড়ি ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত সাহায্যকারী।

---

[৫৫২] মুসলিম, ২৬২৬; আবূ দাউদ, ৪০৮৪।

[৫৫৩] আবূ দাউদ, ৪৭৯৯; তিরমিযি, ২০০২।

[৫৫৪] ইবনু মানযূর, মুখতাসারু তারীখি দিমাশ্‌ক, ১৪/২৭।

আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সবকিছুর চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া

অন্যের সন্তুষ্টির ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া, যে কাজে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে, তা সম্পন্ন করা, যদিও মানুষজন তাতে অসন্তুষ্ট হয়।

এটি হলো আম্বিয়ায়ে কেরাম ﷺ-এর স্তর। এর চেয়েও উঁচু স্তর হলো রাসূলগণের স্তর। তার চেয়েও উচ্চ স্তর হলো রাসূলদের মধ্যে যারা أُولُو الْعَزْمِ (দৃঢ় মনোবলের অধিকারী) ছিলেন তাদের স্তর। আর সর্বোচ্চ স্তর হলো আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্তর। কেননা তিনি (তাওহীদের বাণী নিয়ে) সমগ্র পৃথিবীবাসীর বিপরীতে একা দাঁড়িয়েছেন, একাই আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহর জন্য কাছের-দূরের সব রকমের শত্রুতা সহ্য করেছেন, সবকিছুর সন্তুষ্টির আগে পুরাপুরিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বরং নবি ﷺ-এর সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ইচ্ছা-উদ্যম ও তৎপরতা ছিল একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাজি-খুশি করা, তাঁর দেওয়া বিধিবিধান মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া, তাঁর কালিমাকে বিজয়ী করা এবং তাঁর শত্রুদের সাথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে; যতক্ষণ-না আল্লাহর দ্বীন সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী হয়, আল্লাহর বিধান সমগ্র পৃথিবীবাসীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুমিনদের ওপর তাঁর নিয়ামাত পূর্ণতা পায়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায়) আল্লাহর বিধান (রিসালাত) সবার নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ওপর অর্পিত আমানত যথাযথভাবে আদায় করেছেন, উম্মাতের কল্যাণকামিতায় তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মনোযোগী, আল্লাহর জন্য সর্বশক্তি দিয়ে জিহাদ করেছেন এবং একনিষ্ঠতার সাথে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আপন রবের ইবাদাত করে গিয়েছেন। সুতরাং মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া প্রাধান্যদানের এই স্তর আর কেউ পেতে পারে না।

*****

৩১ নং মানযিল

উত্তম চরিত্র (حُسْنُ الْخُلُقِ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—উত্তম চরিত্রের মানযিল।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি ﷺ-কে বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"[৫৫৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ও মুজাহিদ ﵀ বলেছেন, 'অর্থাৎ আপনি মহান দ্বীনের অধিকারী। এমন কোনো দ্বীন নেই, যা আমার নিকট এর চেয়ে অধিক প্রিয় ও সন্তুষ্টিজনক। আর তা হলো—দ্বীনুল ইসলাম।'[৫৫৬]

হাসান বাস্‌রি ﵀ বলেছেন, 'অর্থাৎ কুরআনের আদব ও শিষ্টাচার।'[৫৫৭]

কাতাদা ﵀ বলেছেন, 'অর্থাৎ আল্লাহর যে সমস্ত আদেশ তিনি মেনে চলতেন এবং যে সমস্ত নিষেধ থেকে তিনি বিরত থাকতেন।'[৫৫৮] এর অর্থ হলো : 'নিশ্চয়ই কুরআনে যে সব গুণাবলির কথা এসেছে, আপনি সেসবের অধিকারী।'

যেমন *'সহীহ বুখারি'* ও *'সহীহ মুসলিম'*-এর বর্ণনায় এসেছে, সা'দ ইবনু হিশাম ﵀ আয়িশা ﵂-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে আয়িশা ﵂ বলেন, "তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন (অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত গুণাবলির

---

[৫৫৫] সূরা কলম, ৬৮ : ৪।

[৫৫৬] বাগাবি, তাফসীর, ৮/১৮৭।

[৫৫৭] বাগাবি, তাফসীর, ৮/১৮৭।

[৫৫৮] সা'লাবি, তাফসীর, ১০/৯।

অনুরূপ)।"[৫৫৯]

নবি ﷺ-এর জন্য চারিত্রিক গুণাবলিকে আল্লাহ তাআলা একটি আয়াতে জমা করে দিয়েছেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"হে নবি, কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন, সৎকাজের উপদেশ দিন এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলুন।"[৫৬০]

জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-কে মহৎ চরিত্রের অধিকারী হতে আদেশ করেছেন। আর কুরআনে এই আয়াতের চেয়ে মহৎ চরিত্রের গুণাবলিকে একত্রকারী আর কোনো আয়াত নেই।'[৫৬১]

আল্লাহর রাসূল ﷺ জানিয়েছেন যে, সৎকাজের মূল হলো উত্তম চরিত্র। নাওয়াস ইবনু সামআন ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সৎকাজ ও গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বললেন,

اَلْبِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَّطلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

"সৎকাজ হলো : উত্তম চরিত্র আর গুনাহ হলো : যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং তুমি অপছন্দ করো যে, লোকজন তা জানুক।"[৫৬২]

এই হাদীসে নবি ﷺ সৎকাজকে গুনাহের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, সৎকাজ হলো উত্তম চরিত্র আর গুনাহ হলো মনে খটকা ও সন্দেহ সৃষ্টিকারী বস্তু। এটি এই বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, উত্তম চরিত্রই হলো সম্পূর্ণ দ্বীন এবং ঈমান ও শারীআতের মূল। এ কারণেই তিনি গুনাহের বিপরীতে একে নিয়ে এসেছেন।

---

[৫৫৯] মুসলিম, ৭৪৬।

[৫৬০] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯৯।

[৫৬১] সা'লাবি, তাফসীর, ১২/৬৩২।

[৫৬২] মুসলিম, ২৫৫৩।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।"[৫৬৩]

উত্তম চরিত্রের পরিচয়

দ্বীনের পুরোটাই উত্তম চরিত্র নির্ভর। সুতরাং মনে রাখবেন, যিনি স্বভাব-চরিত্রে আপনার চেয়ে এগিয়ে, তিনি দ্বীন পালনেও আপনার চেয়ে এগিয়ে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'উত্তম চরিত্র হলো : সাধ্যমতো খরচ করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরের দেওয়া কষ্ট সহ্য করা।'

কেউ বলেছেন, 'উত্তম চরিত্র হলো : সুন্দর আচরণ করা এবং খারাপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।'

আবার কেউ বলেছেন, 'খারাপ বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং ভালো গুণাবলি দ্বারা নিজেকে সাজিয়ে তোলা।'

উত্তম চরিত্র চারটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত; যা ব্যতীত তা কল্পনাও করা যায় না—

১. ধৈর্য ধারণ করা (اَلصَّبْرُ)

২. পবিত্র থাকা (اَلْعِفَّةُ)

৩. সাহসিকতা (اَلشَّجَاعَةُ) এবং

৪. ইনসাফ বা সুবিচার করা (اَلْعَدْلُ)

১. ধৈর্য ধারণ করা : ধৈর্য বা সবর মানুষকে কষ্ট সহ্য করতে, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। আবার সহনশীলতা, স্থিরতা, নম্রতা, মনোযোগিতা ও তাড়াহুড়ো না করে চিন্তাভাবনার সাথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

---

[৫৬৩] বুখারি, ৬০৩৫; মুসলিম, ২৩২১।

২. **পবিত্র থাকা** : পবিত্র থাকার প্রেরণা মানুষকে কথা ও কাজে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নোংরামি থেকে দূরে রাখে, লাজুকতা অবলম্বন করতে শেখায়; যা সমস্ত কল্যাণের মূল। আর ফাহশা বা অশ্লীলতা, কৃপণতা, মিথ্যা, গীবত ও চোগলখুরি করা থেকে বাধা দান করে।

৩. **সাহসিকতা** : আত্মসম্মানবোধ বজায় রাখতে, অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে এবং ধনসম্পদ খরচ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। মানসিক শক্তি ও সাহসের কারণে মানুষ তার প্রিয় বস্তুকেও পরিত্যাগ করতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করে সহনশীল হতে পারে, নিজের নফসকে আয়ত্তে আনতে পারে। যেমন আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

"প্রকৃত বীর সে নয়, যে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেয়; বরং সেই ব্যক্তিই হলো আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"[৫৬৪]

এটিই হলো সাহসিকতার মূল তাৎপর্য। এটি এমন একটি গুণ, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হওয়া থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৪. **ইনসাফ বা সুবিচার করা** : এই গুণটি মানুষকে তার স্বভাব-চরিত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে বেঁচে থেকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে সাহায্য করে। সুতরাং ইনসাফ মানুষকে কৃপণতা ও অপচয় এ দুয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ের দানশীলতায় অভ্যস্ত করে তোলে। এমনিভাবে তা ব্যক্তির মাঝে সৃষ্টি করে—**লজ্জাশীলতা**; যা অধিক নীচতা ও নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নেওয়ার মধ্যবর্তী গুণ। **সাহসিকতা**; যা কাপুরুষতা ও দুঃসাহসিকতার মধ্যবর্তী গুণ। **সহনশীলতা**; যা অতি রাগ ও নিজেকে চূড়ান্ত অপদস্থ করার মধ্যবর্তী গুণ।

উপরিউক্ত চারটি গুণই হলো সমস্ত উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির উৎস ও ভিত্তি।

অপরদিকে নীচ স্বভাব ও চরিত্রের ভিত্তিও হলো চারটি—

১. অজ্ঞতা (اَلْجَهْلُ),

---

[৫৬৪] বুখারি, ৬১১৪; মুসলিম, ২৬০৯।

২. জুলুম (اَلظُّلْمُ),

৩. কুপ্রবৃত্তি (اَلشَّهْوَةُ) এবং

৪. রাগ (اَلْغَضَبُ)।

১. অজ্ঞতা : অজ্ঞতার কারণে মানুষ ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো, দোষত্রুটিকে পূর্ণতা আর পূর্ণতাকে দোষত্রুটি বলে মনে করে। (ফলে অজ্ঞ ব্যক্তি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।)

২. জুলুম : জুলুমের দরুন মানুষ যার যা প্রাপ্য, তা তাকে দেয় না। (এতে অন্যের হক নষ্ট হয়।)

৩. কুপ্রবৃত্তি : কুপ্রবৃত্তির কামনা ব্যক্তিকে লোভ-লালসা, কৃপণতা, অসততা এবং সব ধরনের অশ্লীলতা ও নীচতায় নামিয়ে দেয়।

৪. রাগ : রাগ মানুষকে অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও নির্বুদ্ধিতায় নিক্ষেপ করে।

ওপরে বর্ণিত এই অসৎগুণাবলি দ্বারা ব্যক্তির মাঝে নিন্দনীয় ও মন্দ স্বভাবের সৃষ্টি হয়। আর একটি মন্দ স্বভাব আরেকটি মন্দ স্বভাবের জন্ম দেয়। যেমন একটি উত্তম স্বভাব আরেকটি উত্তম স্বভাবের জন্ম দেয়।

প্রতিটি উত্তম স্বভাব দুইটি মন্দ স্বভাব দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। উত্তম স্বভাবটি মন্দ দুই স্বভাবের মাঝে অবস্থান করে। যেমন : দানশীলতা; যার দুই প্রান্তে রয়েছে দুটি মন্দ স্বভাব—কৃপণতা ও অপচয়। এমনিভাবে বিনয়, যা দুটি মন্দ স্বভাব অহংকার ও হীনতা দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে।

অন্তর যখন মধ্যমপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়, তখন নিশ্চিতভাবেই তা দুই মন্দ স্বভাবের কোনো একদিকে ধাবিত হয়। সুতরাং অন্তর যদি বিনয়ের গুণ থেকে বিচ্যুত হয়, তা হলে হয়তো অহংকার ও দম্ভে লিপ্ত হয়ে পড়বে; নয়তো হীনতা ও অপদস্থতায় জড়াবে।

অন্তর পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি

মানুষের আচার-আচরণে শেকড়-গেড়ে-বসা কোনো স্বভাব পরিবর্তন করা খুব কঠিন। যারা মন্দ স্বভাব বদলাতে কঠোর সাধনা ও মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই তা পরিবর্তন করতে পারে না এবং তাতে সফল হয় না।

স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে এটি হলো একটি চূড়ান্ত সত্য কথা, যা সাথে করেই পথিককে পথ চলতে হয়; এর চিকিৎসা করা কিংবা তা সমূলে দূর করতে সচেষ্ট হওয়া অনুচিত। যে এভাবে পথ চলে, তার পথচলা হয় সেই ব্যক্তির চেয়ে শক্তিশালী ও দ্রুত, যে তা দূর করতে ব্যস্ত থাকে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে একটি উদাহরণ পেশ করছি, যাতে যা বোঝাতে চাচ্ছি তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ধরুন, একটি নদী ঢালু ও নিম্নাঞ্চলের দিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। বাড়িঘর, ফল-ফসলাদি, মাল-সামানা সব ডুবিয়ে দেওয়ার উপক্রম হয়েছে। লোকজন নিশ্চিতভাবেই জানতে পেরেছে যে, এই প্লাবন তাদের ঘরবাড়ি, জমির ফসল ও ধনসম্পদ বরবাদ করে দেবে। ফলে এই পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়—

প্রথম দল : তারা নিজেদের সবটুকু শক্তি-সামর্থ্য এই প্রবাহ দমিয়ে রাখতে ও বন্ধ করতে ব্যয় করে। কিন্তু এতে তারা তেমন ফলপ্রসূ ও কার্যকরী কিছু করতে সক্ষম হয় না। কারণ তারা একদিকে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করলে অন্যদিক ধ্বসে যায়। যার ফলে তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হয়।

দ্বিতীয় দল : এই দলটি তাদের পূর্ববর্তী দলের অবস্থা লক্ষ করে, ফলে তারা বুঝতে পারে যে, কোনোভাবেই এটা বাধা দিয়ে আটকানো যাবে না। তারা ভেবেচিন্তে এর ক্ষতি থেকে বাঁচার একটি উপায় বের করে। আর তা হলো এর মূল ঝরনাধারাই কেটে দেওয়া। যেখানে এই প্রবাহের উৎস, সেখান থেকেই তা বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু বিষয়টি তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কোনোভাবেই তারা এর প্রবাহমানতাকে আয়ত্তে আনতে পারে না। যত চেষ্টাই করে সব নস্যাৎ হয়ে যায়। তারা এতে ব্যস্ত থাকার দরুন এই পানির দ্বারা চাষাবাদ করা, ফল-ফসল উৎপন্ন করা, গাছ লাগানো ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত থাকে, এর দ্বারা উপকার অর্জনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তাদের হয় না।

তৃতীয় দল : এই দলটি আগের দুই দলের বিপরীতে অবস্থান নেয়। এরা উপলব্ধি করেছে যে, আগের দল দুটি যে পন্থা অবলম্বন করেছে, তাতে তাদের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়েছে। ফলে এরা এদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে নদীর প্রবাহমানতাকে তার স্বাভাবিক গন্তব্য থেকে তাদের অনাবাদি শুষ্ক জমির দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এমন জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করে, যেখানে এর পানি পৌঁছার দরুন তারা উপকার লাভ করতে পারে। আবার এতে তাদের ক্ষতিরও কোনো আশঙ্কা থাকে না। ফলস্বরূপ, তারা এর দ্বারা বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফলমূল ও গাছ-গাছালি-ঘাস উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। এতে করে নদীর ক্ষয়ক্ষতি থেকেও বাঁচতে পারে এবং নিজেরাও পর্যাপ্ত লাভবান হয়।

এই পরিস্থিতিতে এই দলটিই ছিল সঠিক পথ অবলম্বনকারী। আর বাকি দুই দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপদ্ধতি ছিল ভুল।

যখন উদাহরণটি স্পষ্ট হলো তখন জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলার মহান হিকমতের দাবি হলো, তিনি মানুষসহ সব প্রাণীর স্বভাবেই দুটি শক্তি প্রোথিত রেখেছেন—ক্রোধ শক্তি এবং কামনা বা ইচ্ছা শক্তি।

এই দুটি শক্তিই বিভিন্ন স্বভাব-চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ধারণে সাহায্য করে। প্রত্যেক প্রাণীর স্বভাবেই এই দুটি শক্তি দেওয়া হয়েছে। ফলে সে কামনা বা ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে উপকারী স্বভাব টেনে নেয় আর ক্রোধ শক্তির মাধ্যমে সে ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর সবকিছু থেকে নিজেকে বাঁচায়।

যখন এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো তখন জেনে রাখুন, এই দুই শক্তি হলো সেই নদীটির মতো, যা অন্তরের দিকে প্রবাহমান। আর তা নিশ্চিতভাবেই অন্তরের আবাদিকে বরবাদ করে দেবে।

অত্যাচারী অজ্ঞ অন্তর এ থেকে গাফেল থাকে, তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয় এবং কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। ফলে তা ঈমানের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয় এবং এর প্রভাব ও আবাদিকে নষ্ট করে ফেলে। এরাই কিয়ামাতের দিন জাহান্নামি হবে।

আর পবিত্র সচেতন অন্তর ওপরের উদাহরণের মতো তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়—

১. একটি দল রয়েছে, যারা তাদের মন্দ স্বভাবগুলো দমিয়ে রাখার জন্য প্রচুর রিয়াযত, মুজাহাদা ও চেষ্টা করে থাকে; কিন্তু তারা এতে সফল হয় না। ক্লান্ত হওয়া ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না।

২. আরেকটি দল রয়েছে, যারা তাদের মন্দস্বভাবগুলো সমূলে উৎপাটন করার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা ও হিকমত তা অস্বীকার করে। কারণ মানুষের তবিয়ত বা সহজাত প্রকৃতিকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে তাদের লড়াই তুমুল আকার ধারণ করে। কিন্তু তাতে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশি হয়।

৩. আরেকটি দল রয়েছে, যারা এসব বিষয় এড়িয়ে যান, নিজেদেরকে সবসময় আমলে মগ্ন রাখেন। তারা মন্দ স্বভাবের আহ্বানে সাড়া দেন না। তারা সেগুলোকে আপন গতিতে ছেড়ে দেন, তবে গতিপথটা পালটে দেন। ফলে সেগুলো তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এই শ্রেণির ব্যক্তিরা নিজেদের ভিত্তি মজবুত করতে তৎপর থাকেন। তারা জানেন, সেই নদীর প্রবাহ তাদের নিকট অবশ্যই আসবে; কিন্তু দৃঢ় দেওয়াল ও মজবুত ভিত্তি যদি থাকে, তা হলে তা ভাঙতে পারবে না। বরং ডানে-বামে ঘুরতে থাকবে। এ কারণেই তারা তাদের শক্তি-সামর্থ্য, চিন্তা-চেতনা এবং ইচ্ছাশক্তি নিজেদের ভিত্তি ও আমল সুন্দর ও মজবুত করার কাজে ব্যয় করে থাকে।[৫৬৫]

---

[৫৬৫] ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, 'আমি একদিন এই বিষয়টি সম্পর্কে এবং অন্তরের রোগসমূহ একেবারে নিশ্চিহ্ন করা এবং তার পথ পরিষ্কার করা সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বললেন, 'আত্মা হলো ময়লা-আবর্জনার কূপের মতো। যত খুঁড়বে, ততই সেখান থেকে নোংরা আবর্জনা বেরুবে। তবে তোমার পক্ষে যদি এর ওপরে ঢাকনা দিয়ে তা অতিক্রম করা সম্ভব হয়, তা হলে তা-ই কোরো। এটা খুঁড়তে ব্যস্ত হোয়ো না। কারণ তুমি কখনো এর গভীরতায় পৌঁছুতে পারবে না; বরং যখনই খুঁড়তে যাবে অন্য আরেকটি বেরিয়ে আসবে।'
তখন আমি বললাম, 'এ সম্পর্কে আমি আরেকজন শাইখকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'আত্মার মন্দ স্বভাবগুলো হলো মুসাফিরের পথে পাওয়া সাপ, বিচ্ছুর মতো। যদি সে এগুলোর পেছনে পড়ে এবং তা মেরে ফেলতে উদ্যত হয়, তা হলে সে পথচ্যুত হয়ে যাবে। তার পক্ষে আর পথচলা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না। ফলে গন্তব্যে পৌঁছা কঠিন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তোমার উচিত হবে সামনে অগ্রসর হওয়া এবং এগুলোর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করা। হ্যাঁ, যদি তোমার পথ রোধ করে সামনে কিছু এসে পড়ে, তা হলে তা মেরে ফেলো। অতঃপর সামনে এগিয়ে যাও।'
ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ এই কথাগুলো খুবই পছন্দ করেন এবং এর বেশ প্রশংসা করেন।

তৃতীয় এই দলটি ভাবে—এই সমস্ত গুণাবলি এমনি এমনি ও অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি, এগুলো পানির মতো; যার দ্বারা ফুল, ফল, কাঁটা, ডালপালা সবই পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়; এ পথে যেগুলোকে ভয় করা হয়, আসলে হুবহু সেগুলোই হলো সফল ও কামিয়াব হওয়ার মাধ্যম। তারা উপলব্ধি করে, বড়োত্ব (اَلْكِبْرُ) হলো একটি নদী। এখান থেকে অহংকার, ঔদ্ধত্য, আত্মগর্ব, জুলুম ও সীমালঙ্ঘন-প্রবণতা যেমন শক্তিপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সুউচ্চ মনোবল, আত্মমর্যাদাবোধ ও আল্লাহর শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছাশক্তিও শক্তিপ্রাপ্ত হয়। ফলে এই শ্রেণির ব্যক্তিরা এই মন্দ স্বভাবটির (বড়োত্বের) প্রবাহমানতাকে এই সমস্ত উত্তম গুণাবলির দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং এটিকে তাদের অন্তরে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়, একেবারে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে না। বরং এই বড়োত্বকে এমন সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, যা তাদের জন্য অধিক উপকারী। বদর যুদ্ধে নবি ﷺ আবূ দুজানা رضي الله عنه-কে দুই সারির মধ্যে ঔদ্ধত্য ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন,

إِنَّهَا مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلَّا فِيْ هٰذَا الْمَوْضَعِ

> “এটি এমন এক ভঙ্গির হাঁটা, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন; কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তিনি তা পছন্দ করেন।”[৫৬৬]

দেখুন, মন্দ একটি গুণ কীভাবে প্রশংসনীয় হয়ে গেল! শুধু ক্ষেত্র পরিবর্তন করার কারণে। আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللهُ، فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِيْ يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ

> “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এক প্রকার অহংকারকে পছন্দ করেন, আর এক প্রকার অহংকারকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ যে অহংকার পছন্দ করেন তা হলো—যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় অহংকার প্রদর্শন করা (যেন দুশমন ভয় পায়) এবং দান-সদাকা করার সময় ঔদ্ধত্য দেখানো (যাতে বেশি বেশি সদাকা করতে পারে)।”[৫৬৭]

---

[৫৬৬] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬/১১২।

[৫৬৭] আবূ দাউদ, ২৬৫৯।

গভীরভাবে ভাবুন, কীভাবে একটি মন্দ স্বভাব ইবাদাতে পরিণত হলো এবং আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্নকারী একটি গুণ কীভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে রূপান্তরিত হলো!

সুতরাং যারা এই মন্দ স্বভাবগুলো মূল থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পরিশ্রমে লিপ্ত, তারা আসলে এই বড়োত্ব ও অহংকারকে একেবারে মিটিয়ে দিতে প্রয়াসী। অথচ এই গুণগুলো দ্বারাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা যায়, যদি তা সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এমনিভাবে হিংসার স্বভাবটিও যদি সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তা হলে তা ইবাদাতে পরিণত হয়। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

"দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারও প্রতি হিংসা (ঈর্ষা) পোষণ করা বৈধ নয়। একজন হলো—এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন (-এর জ্ঞান) দান করেছেন। ফলে সে তা অনুযায়ী রাত-দিন আমল করে। দ্বিতীয়জন হলো—সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা অর্থসম্পদ দান করেছেন। আর সে দিন-রাত তা (আল্লাহর পথে) খরচ করে।"[৫৬৮]

সুতরাং হিংসা মানুষকে সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে, যা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং তিনি এই প্রতিযোগিতার আদেশও দিয়েছেন—

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾

"এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।"[৫৬৯]

তাই অন্তর থেকে এই মন্দ স্বভাবটিকে একেবারে দূর করার চেষ্টা না করে, বরং একে প্রশংসিত হিংসায় রূপান্তরিত করুন এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করুন।

---

[৫৬৮] মুসলিম, ৮১৫; বুখারি, ৭৩।

[৫৬৯] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ২৬।

মূলকথা হলো—পরীক্ষার এই দুনিয়ায় মানুষের ফিতরাত ও তবিয়তকে মূল থেকে দূর করা সম্ভব নয়। তাই সূক্ষ্মদর্শী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এগুলোকে এমন সব উপকারী ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যা হারাম কিংবা অবৈধ নয়, যা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিতে কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি করে না এবং তাঁর দৃষ্টি থেকে ফেলেও দেয় না।

যারা নিজের অন্তর পরিশুদ্ধ করতে চায় এবং অন্তরের রোগ দূর করতে চায়, তাদের জন্য এটি এই বইয়ের সবচেয়ে উপকারী একটি অনুচ্ছেদ। ইসলামে কিছু ভুল ধারণা অনুপ্রবেশ করার কারণে অনেকেই মনে করেন যে, সহজ পরিশ্রমে ও সাধারণ মুজাহাদায় নফস বা অন্তর পরিশুদ্ধ করা এবং উত্তম চরিত্রাবলিতে গুণান্বিত হওয়া অসম্ভব! আসলে তাদের এই ভাবনা তাদেরকে আরও জটিল জটিল রোগব্যাধি, পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহিতে নিক্ষেপ করে।

অন্তর পরিশুদ্ধ করার বিষয়টি মূলত রাসূলগণের ওপর অর্পিত। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েই প্রেরণ করেছেন, তাঁদের হাতেই এর সংশোধন প্রক্রিয়া রেখেছেন। তাঁরা মানুষজনকে দাওয়াত দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, সঠিক দিকনির্দেশনা দান করে তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করবেন। ইলহাম বা অন্য কিছু দিয়ে নয়। রাসূলগণ উম্মাতের অন্তরের চিকিৎসা করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ۞

"তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতঃপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"[৫৭০]

শরীরের চিকিৎসা করার চেয়ে অন্তর পরিশুদ্ধ করা অনেক বেশি কঠিন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ বহির্ভূত পন্থায় যে ব্যক্তি রিয়াযত, মুজাহাদা, সাধনা ও নির্জনতা অবলম্বন করে নিজের নফসকে সংশোধনের চেষ্টে করে, সে ওই রোগীর

[৫৭০] সূরা জুমুআ, ৬২ : ২।

মতো; যে অভিজ্ঞ চিকিৎসককে বাদ দিয়ে নিজে নিজেই আপন খেয়াল ও সিদ্ধান্ত অনুসারে রোগের চিকিৎসা করা শুরু করে! আসলে আল্লাহর রাসূলগণ হলেন অন্তরের চিকিৎসক। তাই অন্তরের সংশোধন ও পরিশোধনের জন্য তাঁদের দেখানো পথ গ্রহণ করা, তাঁদের নিকট নিজেকে সমর্পণ করা এবং তাঁদের একান্ত অনুগত হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই।

উত্তম চরিত্র অর্জনযোগ্য নাকি আল্লাহ-প্রদত্ত?

যদি প্রশ্ন করেন : 'পরিশ্রম করে কি উত্তম চরিত্র অর্জন করা সম্ভব, নাকি এটি আয়ত্তে আনা অসম্ভব?'

উত্তরে আমি বলব : 'এটি কষ্ট ও পরিশ্রম করে অর্জন করা সম্ভব। চেষ্টা সাধনা করতে করতে একপর্যায়ে তা ব্যক্তির স্বভাবে ও যোগ্যতায় পরিণত হয়। একবার নবি ﷺ আবদুল কাইস গোত্রের আশাজ্জ رضي الله عنه-কে বললেন,

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ : اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ

"তোমার মধ্যে দুইটি গুণ রয়েছে, আল্লাহ তাআলা যা ভালোবাসেন—সহনশীলতা ও স্থিরতা।"

আশাজ্জ رضي الله عنه বললেন, 'আমি কি এই দুটি গুণ অর্জন করেছি নাকি এর ওপরই আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন?'

নবি ﷺ উত্তরে বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর ওপরই সৃষ্টি করেছেন।"

তিনি বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে এমন দুটি গুণের ওপর সৃষ্টি করেছেন; যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।'[৫৭১]

এই হাদীসটি ইঙ্গিত প্রদান করে যে, মানুষের স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে কিছু রয়েছে সৃষ্টিগত আর কিছু রয়েছে অর্জিত, যা মানুষ পরিশ্রম করে অর্জন করতে পারে। যেমন : নবি ﷺ সালাত শুরু করার পর যে দুআ করতেন, তাতে বলতেন,

---

[৫৭১] মুসলিম, ১৭; আবূ দাউদ, ৫২২৫।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ, আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের পথ দেখাও। তুমি ছাড়া আর কেউ এ পথ দেখাতে পারে না। আর স্বভাব-চরিত্রের মন্দ দিকগুলো আমার থেকে দূরে রাখো। তুমি ছাড়া আর কেউ মন্দগুলোকে আমার থেকে দূরে রাখতে সক্ষম নয়।"[৫৭২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে অর্জিত ও আল্লাহ-প্রদত্ত দু ধরনের স্বভাব-চরিত্রের কথাই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

*****

[৫৭২] মুসলিম, ৭৭১।

৩২ নং মানযিল

বিনয় (اَلتَّوَاضُعُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—বিনয়ের মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

"রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।"[৫৭৩]

অর্থাৎ স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও বিনয়ের সাথে পথ চলে। দাম্ভিকতা, অহংকার ও গর্বের সাথে নয়। হাসান বাস্‌রি ﷺ বলেছেন, 'তারা হলেন জ্ঞানী ও সহনশীল সম্প্রদায়।' মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা ﷺ বলেছেন, 'গাম্ভীর্যপূর্ণ ও পবিত্র ব্যক্তিগণ, যারা মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে দূরে থাকেন। আর তাদের সাথে কোনো অশোভনীয় আচরণ করা হলে, তারা তা সহ্য করেন।'

'সহীহ মুসলিম'-এ এসেছে, ইয়ায ইবনু হিমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ أَوْحٰى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ وَّلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ

"আল্লাহ তাআলা আমার নিকট ওহি পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, কেউ যেন কারও ওপর গর্ব না করে এবং কেউ যেন কারও প্রতি অবিচার না করে।"[৫৭৪]

---

[৫৭৩] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩।

[৫৭৪] মুসলিম, ২৮৬৫।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৫৭৫]

'সহীহাইন'-এর বর্ণনায় এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

"আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসীর পরিচয় জানাব না? তারা হবে প্রত্যেক নিষ্ঠুর, দাম্ভিক ও অহংকারী লোক।"[৫৭৬]

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাত-জাহান্নামের তর্কবিতর্ক সম্পর্কে বলেছেন, "জাহান্নাম বলবে,

مَا لِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلَّا الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ

'আমার কী হলো, আমার মধ্যে কেবল দাম্ভিক ও অহংকারীরাই প্রবেশ করছে!'

জান্নাত বলবে,

مَا لِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ

'আমার কী হলো, আমার মধ্যে কেবল দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তিরাই প্রবেশ করছে!'[৫৭৭]

'সহীহ মুসলিম'-এর এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরি ও আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

---

[৫৭৫] মুসলিম, ৯১।

[৫৭৬] বুখারি, ৪৯১৮; মুসলিম, ২৮৫৩।

[৫৭৭] বুখারি, ৪৮৫০; মুসলিম, ২১৪৬।

اَلْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ

"সম্মান হলো আল্লাহ তাআলার জামা আর অহংকার হলো তাঁর চাদর। (আল্লাহ বলেন) যে ব্যক্তি আমার সাথে তা নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করবে, আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দেবো।"[৫৭৮]

নবি ﷺ ছোটো ছোটো শিশুদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিতেন।[৫৭৯]

দাসীও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। আর তিনিও তার সাথে তার ইচ্ছামতো চলে যেতেন।[৫৮০]

নবি ﷺ যখন ঘরে থাকতেন, ঘরের লোকজনকে তাদের কাজে সাহায্য করতেন।[৫৮১]

আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের জুতা নিজেই মেরামত করতেন, নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, পরিবারের লোকজনদের জন্য বকরির দুধ দোহন করতেন, খাদিমের সঙ্গে বসে খাবার খেতেন, ইয়াতীম ও বিধবাদের প্রয়োজন পুরা করতেন, কারও সাথে দেখা হলে তিনিই আগে সালাম দিতেন আবার কেউ দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করতেন, তা যত সামান্য বস্তুর জন্যই হোক না কেন।

নবি ﷺ বলেছেন,

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

"যদি আমাকে পশুর পায়া বা হাতা খেতে দাওয়াত করা হয়, তবুও আমি তা কবুল করব। আর যদি আমাকে পায়া বা হাতা হাদিয়া দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই আমি তা গ্রহণ করব।"[৫৮২]

---

[৫৭৮] মুসলিম, ২৬২০।

[৫৭৯] বুখারি, ৬২৪৭; মুসলিম, ২১৬৮।

[৫৮০] বুখারি, ৬০৭২।

[৫৮১] বুখারি, ৬৭৬।

[৫৮২] বুখারি, ২৫৬৮।

নবি ﷺ অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন, জানাযায় উপস্থিত হতেন এবং গোলাম বা দাসের দাওয়াতও কবুল করতেন।

***

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﵀-কে একবার বিনয় (اَلتَّوَاضُعُ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। উত্তরে তিনি বললেন, 'বিনয় হলো—হক ও সত্যের প্রতি নত হওয়া, তা মেনে নেওয়া এবং তা যে-ই বলুক, তার থেকে তা গ্রহণ করা।'[৫৮৩]

কেউ কেউ বলেছেন, 'বিনয় হলো নিজেকে মূল্যহীন দেখা। যে নিজেকে মূল্যবান মনে করে, বিনয়ে তার কোনো অংশ নেই।' এটি ফুযাইল ﵀-সহ আরও কতিপয় আলিমের মত।[৫৮৪]

জুনাইদ বাগদাদি ﵀ বলেছেন, 'তাওয়াজু' হলো : ডানাকে নত করা এবং পার্শ্বকে নরম করা।'

আবূ ইয়াযীদ বুসতামি ﵀ বলেছেন, 'নিজের কোনো মর্যাদা ও অবস্থান চোখে না পড়া এবং সৃষ্টির মধ্যে নিজের থেকে খারাপ আর কাউকে না দেখা।'[৫৮৫]

ইবনু আতা ﵀ বলেছেন, 'বিনয় হলো সত্যকে গ্রহণ করা, তা যার কাছেই থাকুক। আর বিনয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত সম্মান। যে ব্যক্তি অহংকারের মধ্যে তা তালাশ করে, সে ওই ব্যক্তির মতো যে আগুনের মধ্যে পানি খোঁজে।'

উরওয়া ইবনুয যুবাইর ﵀ বলেন, 'আমি উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর কাঁধে পানির মশক দেখে বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার জন্য এটা শোভা পায় না।' জবাবে তিনি বললেন, 'বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন নত হয়ে, আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে আসে, তখন আমার অন্তরে কিছুটা অহমিকা চলে আসে, আমি পছন্দ করি যে, তা ভেঙে দিই।'[৫৮৬]

---

[৫৮৩] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, ৪৮/৪১৯।

[৫৮৪] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, ৪৮/৪১৯।

[৫৮৫] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৭৯।

[৫৮৬] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ১/২৭৯।

আবূ হুরায়রা ﷺ একবার আমীর নিযুক্ত হলেন। তখন তিনি নিজের পিঠে করে কাঠের বোঝা বহন করতেন আর বলতেন, 'আমীরকে পথ করে দাও, আমীরকে পথ করে দাও!'[৫৮৭]

রজাহ ইবনু হাইওয়া ﷺ বলেন, 'উমর ইবনু আবদিল আযীয ﷺ যে পোশাক পরে খুতবা দিতেন, তার মূল্য ছিল মাত্র বারো দিরহাম। পোশাকের মধ্যে ছিল—একটি জুব্বা, একটি পাজামা, একটি পাগড়ি, দুটি মোজা আর একটি টুপি।'[৫৮৮]

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' ﷺ তার এক ছেলেকে দেখলেন দাম্ভিকতার সাথে হাঁটছে। তখন তিনি তাকে বললেন, 'তুমি জানো, তোমার মাকে আমি কত দিরহাম দিয়ে কিনেছি? মাত্র তিনশ দিরহাম। আর তোমার বাবা? আমি! আল্লাহ যেন মুসলমানদের মধ্যে তার মতো অধিক (মানুষ) না বানান! আর তুমি এভাবে দাম্ভিকতার সাথে হাঁটছো!?'[৫৮৯]

***

আল্লাহর সাথে সর্বপ্রথম যে গুনাহ করা হয়েছে তা হলো—অহংকার ও লোভ। অহংকার ছিল অভিশপ্ত ইবলীসের গুনাহ। আর এর পরিণতি যা হবার তা-ই হয়েছে। আর লোভ ও খাহেশ ছিল আদম ﷺ-এর গুনাহ। যার পরিণতি হয়েছিল তাওবা ও হিদায়াত। ইবলীসের গুনাহ তাকে হঠকারিতা, বড়োত্ব আর মর্যাদা পাওয়ার জন্য তর্কবিতর্কের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অপরদিকে আদম ﷺ-এর গুনাহ তাকে নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করতে এবং ইস্তিগফার করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

সুতরাং অহংকারী, হঠকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিদের ঠিকানা হবে তাদের শাইখ ও নেতা ইবলীসের সাথে জাহান্নামে। অপরদিকে অপরাধে লিপ্ত ও লোভী ব্যক্তি, যারা ইস্তিগফার করে, তাওবা করে, নিজের দোষ স্বীকার করে এবং বড়োত্ব লাভের জন্য তর্কবিতর্ক করে না, তাদের ঠিকানা হবে তাদের পিতা আদম ﷺ-এর সাথে জান্নাতে।

---

[৫৮৭] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্‌ক। ৬৭/৩৭৩।

[৫৮৮] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/৩২২।

[৫৮৯] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্‌ক, ৩/৭২।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'অহংকার হলো শির্‌কের চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার ইবাদাতের ক্ষেত্রেও অহংকার করে। আর মুশরিক আল্লাহ্ তাআলার ইবাদাত করে, তবে তার সাথে অন্যান্য উপাস্যেরও ইবাদাত করে।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

> "যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৫৯০]

*****

[৫৯০] মুসলিম, ৯১।

৩৩ নং মানযিল

উদারতা (اَلْفُتُوَّةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—উদারতার মানযিল।

এই মানযিলের মূল হলো : মানুষের প্রতি দয়া করা, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করা, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা ইত্যাদি। এটি মূলত উত্তম চরিত্র ও তার প্রয়োগের ফল।

উদারতা(اَلْفُتُوَّةُ) এবং মানবিকতা (اَلْمُرُوءَةُ) –এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—মানবিকতা ব্যাপক আর উদারতা মানবিকতার একটি প্রকার। কারণ মানবিকতা (اَلْمُرُوءَةُ) হলো সুন্দর ও উত্তম গুণাবলিতে সুসজ্জিত হওয়া, এটা ব্যক্তির নিজের সাথেও সম্পৃক্ত হতে পারে আবার অন্যের সাথেও সম্পৃক্ত হতে পারে। এমনিভাবে সব রকমের কুৎসিত ও মন্দ গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকা।

অপরদিকে উদারতা (اَلْفُتُوَّةُ) হলো সৃষ্টিকুলের সাথে সর্বোত্তম ও কোমল আচরণ করা।

আচার-আচরণ সংশ্লিষ্ট তিনটি মানযিল রয়েছে—

১. উত্তম চরিত্রের মানযিল (مَنْزِلَةُ حُسْنِ الْخُلُقِ) ; যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

২. উদারতার মানযিল (مَنْزِلَةُ الْفُتُوَّةِ) এবং

৩. মানবিকতার মানযিল (مَنْزِلَةُ الْمُرُوءَةِ)

এই মানযিলটি হলো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ মানযিল। যদিও শারীআত (اَلْفُتُوَّةُ) বা উদারতা নামে নামকরণ করেনি। শারীআত এর নাম দিয়েছে مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ বা মহৎ গুণাবলি। যেমন জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَنِيْ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الْأَفْعَالِ

"আল্লাহ তাআলা আমাকে মহৎ গুণাবলি ও উত্তম কার্যাবলিকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরণ করেছেন।"[৫৯১]

اَلْفُتُوَّةُ এর মূল উৎস اَلْفَتَى যার অর্থ তরুণ বা যুবক। আল্লাহ তাআলা আসহাবুল কাহ্ফ সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

"এরা ছিল কয়েকজন যুবক; যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল, আর আমি তাদের সৎপথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।"[৫৯২]

সুতরাং اَلْفَتَى (যুবক) নামটি প্রশংসা কিংবা নিন্দা কোনোটিরই দাবি রাখে না। اَلشَّابُ وَالْحَدَثُ (তরুণ, নবীন) এই দুটি নামের মতো। এই কারণে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফের ব্যবহারে এই নামটি আসেনি। তবে তাদের পরবর্তীরা এটিকে مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ-এর অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

এর মূল অর্থ : বান্দা সবসময় অপরের উপকারে কাজ করে যাবে।

আমার জানা মতে সর্বপ্রথম উদারতা (اَلْفُتُوَّةُ) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ, তারপর ফুদাইল ইবনু ইয়ায, ইমাম আহমাদ, সাহ্ল ইবনু আবদিল্লাহ, জুনাইদ বাগদাদি ﷺ। তারপর আরও অনেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

একবার একব্যক্তি জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে জা'ফর ﷺ প্রশ্নকারীকেই বলেন, 'এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' প্রশ্নকারী বলেন, 'দান করা হলে শোকর আদায় করবে আর না দেওয়া হলে সবর করবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের নিকট তো কুকুরের এই স্বভাব।' প্রশ্নকারী বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান, তা হলে আপনাদের নিকট উদারতা কী?' উত্তরে জা'ফর ﷺ বলেন, 'যদি আমাদেরকে দেওয়া হয়, তা হলে আমরা অন্যকে প্রাধান্য

---

[৫৯১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২৭৩।

[৫৯২] সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ১৩।

দিই আর না দেওয়া হলে, শোকর আদায় করি।'

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ বলেছেন, 'উদারতা হলো : (মুসলিম) ভাইয়ের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া।'[৫৯৩]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'উদারতা হলো : মন যা চায়, আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করা।'[৫৯৪]

এ সম্পর্কে তিনি ব্যতীত চার ইমামের আর কারও বক্তব্য আছে বলে আমার জানা নেই।

হারিস মুহাসিবি ﷺ বলেছেন, 'উদারতা হলো : তুমি ইনসাফ করতে থাকবে; কিন্তু ইনসাফ পাওয়ার আশা করবে না।'[৫৯৫]

আমর ইবনু উসমান মাক্কি ﷺ বলেছেন, 'উত্তম চরিত্রই হলো উদারতা।'

মুহাম্মাদ ইবনু আলি তিরমিযি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর পক্ষ নিয়ে তুমি তোমার নিজের নফসের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়াবে।'[৫৯৬]

কেউ কেউ বলেছেন, 'উদারতা হলো : অন্যের ওপর তুমি নিজের কোনো মর্যাদা দেখবে না।'

দাক্কাক ﷺ বলেছেন, 'এই মহৎ গুণটি পরিপূর্ণরূপে কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। কারণ কিয়ামাতের কঠিন দিনে সবাই বলতে থাকবে, 'নাফসি, নাফসি; আমার কী হবে, আমার কী হবে!' আর নবি ﷺ বলতে থাকবেন, 'উম্মাতি, উম্মাতি; আমার উম্মাতের কী হবে, আমার উম্মাতের কী হবে!'[৫৯৭]

---

[৫৯৩] যামাখশারি, রবীউল আবরার, ২/১০১।

[৫৯৪] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ১১/৮৪।

[৫৯৫] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৩৮১।

[৫৯৬] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৩৮০।

[৫৯৭] এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৭৫১০; মুসলিম, ১৯৩।

উদারতার দুইটি চমৎকার উদাহরণ

হাজ্জসম্পন্নকারী একব্যক্তি মদীনায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে-থাকা-একটি ব্যাগ হারিয়ে যায়; যেখানে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছিল। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ব্যাগ না পেয়ে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তখন তিনি জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাক্ষাৎ পান। তিনি তাকে ব্যাগ হারানোর কথা জানান। জা'ফর ﷺ জানতে চান ব্যাগে কী ছিল। তিনি বলেন, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তখন জা'ফর সেই ব্যক্তিকে তার বাড়িতে নিয়ে যান এবং তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেন। এর খানিক পরে সেই ব্যক্তি তার হারিয়ে-যাওয়া-ব্যাগটি ফিরে পান। ফলে তিনি জা'ফর ﷺ-এর নিকট এসে তার দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলো ফেরত দিতে চান। কিন্তু তিনি এই বলে তা ফেরত নেননি যে, 'আমি আমার হাত থেকে একবার যা বের করেছি, তা আর কখনো ফিরিয়ে নেব না।' লোকটি মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ওনি কে?' তারা জবাব দেন, 'জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ।' রহিমাহুল্লাহ।[৫৯৮]

আবূ আলি দাক্কাক ﷺ বলেন, 'একবার হাতিম ﷺ-কে এক নারী একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সে সময় অসতর্কতাবশত সেই নারী থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে যায়। ফলে নারীটি বেশ লজ্জায় পড়ে যান। তখন হাতিম ﷺ বলেন, 'তুমি আরেকটু জোরে বলো।' আসলে তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি কানে কম শোনেন। এই ভেবে নারীটি খুব খুশি হয় যে, তিনি কিছু শুনতে পাননি।[৫৯৯] এই ঘটনার কারণে হাতিম ﷺ-এর উপাধি দেওয়া হয় اَلْأَصَمُّ (বধির বা শ্রবণশক্তিহীন)। হাতিম ﷺ-এর অন্যমনস্কতা নারীটিকে লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করল—এটি উদারতার অর্ধেক।

*****

---

[৫৯৮] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৩৮৪।

[৫৯৯] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/৬৩।

৩৪ নং মানযিল

মানবিকতা (اَلْمُرُوْءَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—মানবিকতার মানযিল।

اَلْمُرُوْءَةُ হলো—আত্মাকে মানবিক গুণাবলিতে গুণান্বিত করা; যে গুণগুলোর মাধ্যমে প্রাণী ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে মানুষ পৃথক হয়ে যায়।

ফকীহগণ এর সংজ্ঞায় বলেছেন, ' যা ব্যক্তিকে সুন্দর ও উত্তম গুণাবলিতে সুসজ্জিত করে, তা আঁকড়ে ধরা আর যা তাকে ত্রুটিযুক্ত ও মন্দ স্বভাবের বানায়, তা পরিত্যাগ করা।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'সব ধরনের ভালো ও উত্তম আচরণ প্রয়োগ করা এবং সব ধরনের খারাপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।'

মুরূআত বা মানবিকতার মূল তাৎপর্য হলো—কথায়, কাজে এবং স্বভাব-চরিত্রে সমস্ত নীচতা ও হীনতা পরিহার করে চলা।

সুতরাং **জিহ্বার মুরূআত :** মিষ্টতা, পবিত্রতা ও কোমলতা এবং সহজ ও প্রাঞ্জলতার মাধ্যমে এর উপকারী ফল লাভ করা।

স্বভাব-চরিত্রের মুরূআত : প্রিয়জন ও দুশমন সবার প্রতিই অন্তর প্রশস্ত রাখা এবং হাসিখুশি ব্যবহার করা।

সম্পদের মুরূআত : যৌক্তিক, সামাজিক ও শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল প্রশংসনীয় খাতে তা ব্যয় করা।

ক্ষমতার মুরূআত : অভাবী ব্যক্তির প্রয়োজনে ক্ষমতাকে কাজে লাগানো।

দয়া-অনুগ্রহের মুরূআত : দ্রুততার সাথে বেশি বেশি দয়া ও অনুগ্রহ করতে থাকা। কারও প্রতি ইহসান করার সময় এর পরিমাণের দিকে না দেখা এবং ইহসান করার পর তা ভুলে যাওয়া।

এগুলো হলো সুন্দর ও উত্তম গুণাবলি দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করার মানবিকতা।

আর মন্দ ও খারাপ গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে মুরূআত হলো : ঝগড়া করা থেকে বিরত থাকা; এমনিভাবে নিন্দা করা, কারও নিকট হাতপাতা এবং তর্কবিতর্ক করা থেকে বিরত থাকা। এর তিনটি স্তর রয়েছে—

প্রথম স্তর : ব্যক্তির নিজের সাথে মানবিকতা (مُرُوْءَةُ الْمَرْءِ مَعَ نَفْسِهِ) : এটি ব্যক্তিকে সমস্ত ভালো গুণাবলির দ্বারা সজ্জিত হওয়ার দিকে এবং খারাপ গুণাবলি ছেড়ে দেওয়ার দিকে মনোযোগী হতে বাধ্য করে।

দ্বিতীয় স্তর : অন্যান্য সবার সাথে মানবিকতা (اَلْمُرُوْءَةِ مَعَ الْخَلْقِ) : এটি হলো সবার সাথে শিষ্টাচার, ভদ্রতা, লজ্জাশীলতা এবং উত্তম আদব-আখলাকের সাথে মেলামেশা করা।

তৃতীয় স্তর : আল্লাহর সাথে মানবিকতা (اَلْمُرُوْءَةُ مَعَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى) : আল্লাহ তাআলা আপনাকে দেখছেন এবং তিনি আপনার প্রতিটি বিষয়ে খুঁটিনাটি সবকিছু অবগত আছেন—এই ভাবনায় আল্লাহকে লজ্জা পাওয়া। আর নিজের নফসের দোষত্রুটিগুলোকে সংশোধন করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করা।

উত্তম চরিত্র ও উদারতার মানযিলে যে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে, সে আলোচনা এই মানযিলেও প্রযোজ্য।

*****

৩৫ নং মানযিল

ইচ্ছা (اَلْإِرَادَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—ইচ্ছা বা ইরাদার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

"আর তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-বিকাল তাদের রবের ইবাদাত করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের **ইচ্ছা করে।**"[৬০০]

সূফিয়ায়ে কেরামের নিকট ইচ্ছার মানযিলের মূলকথা হলো—ইচ্ছাশূন্য হওয়া।[৬০১]

এই বিষয়ে অনেকের অনেক বক্তব্য রয়েছে। অধিকাংশের অভিমত হলো—ইরাদা হচ্ছে : অভ্যাস পরিত্যাগ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের কাজগুলো অভ্যাসের বশে অন্যমনস্কতার সাথে এবং প্রবৃত্তির আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু আল্লাহর-পথের-পথিক বা মুরীদ এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার থেকে (তার নিজস্ব) ইচ্ছাকে দূর করা হয়। আল্লাহর পথের পথিকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে বের

---

[৬০০] সূরা আনআম, ৬ : ৫২।

[৬০১] আবদুল কারীম কুশাইরি ﷺ তার 'আর-রিসালাহ (২/৩৫১)' গ্রন্থে বলেছেন, 'ইচ্ছা বা ইরাদা হলো আল্লাহ-অভিমুখীদের পথের শুরু। এটি হলো এই পথের প্রথম মানযিল। একে 'ইরাদা' করে নামকরণের কারণ হলো : সবকিছুর শুরুতেই ইচ্ছা বা ইরাদা থাকে। কেউ যদি কোনোকিছুর ইচ্ছাই না করে, তা হলে তার আর সেই কাজ করা হয়ে ওঠে না।

ইচ্ছা বা ইরাদা আল্লাহর-পথের-পথিকদের পথচলার শুরু হওয়ার কারণে বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের প্রথম মানযিলের নাম রাখা হয়েছে ইচ্ছা বা ইরাদার মানযিল। সুতরাং শব্দের দিকে লক্ষ করলে 'মুরীদ' তাকেই বলা হবে, যার ইরাদা রয়েছে; যেমন আলিম তাকেই বলা হয়, যায় ইলম রয়েছে। কিন্তু সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় 'মুরীদ' তাকেই বলা হয়, যার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা বা ইরাদা থাকে না। সুতরাং তাদের পরিভাষায় যে ব্যক্তি ইচ্ছাশূন্য হতে পারে না, তাকে মুরীদ বলা হয় না; যেমন শব্দের দিকে লক্ষ করলে যার ইচ্ছা থাকবে না, তাকে মুরীদ বলা হবে না।'

হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে, তার শুদ্ধ ইচ্ছার আলামত ও প্রমাণ।

কেউ কেউ বলেছেন, 'সত্যের সন্ধানে অন্তরকে জাগ্রত করা।'

দাক্কাক ﷺ বলেছেন, 'ইরাদা হলো : অন্তরে জ্বলন, অস্থিরতা ও আসক্তি সৃষ্টি হওয়া এবং নিজের ভেতরে এমন তোলপাড় ও আগুন অনুভব করা, যা হৃদয়কে দগ্ধ করে দেয়।'[৬০২]

কেউ কেউ বলেছেন, 'মুরীদের অন্যতম গুণাবলি হলো—বেশি বেশি নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা, উম্মাতের কল্যাণকামিতায় একনিষ্ঠ হওয়া, একাকিত্ব ভালো লাগা, আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনে কষ্ট সহ্য করা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে প্রাধান্য দেওয়া, 'আল্লাহ দেখছেন' এই ভেবে লজ্জা অনুভব করা, তাঁর প্রিয় ক্ষেত্রগুলোতে সাধ্যমতো পরিশ্রম করা, যে সমস্ত মাধ্যম আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তা আঁকড়ে ধরা, অল্পে পরিতুষ্ট হওয়া এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্তর স্থির না হওয়া।'

আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'মুরীদ বা আল্লাহকে-চিনতে-ইচ্ছুক ব্যক্তির গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো—সে কেবল তখনই ঘুমাবে, যখন চোখ খোলা রাখতে অপারগ হবে; সে কেবল তখনই আহার করবে, যখন প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করবে আর সে কেবল তখনই কথা বলবে, যখন তার কথা বলা জরুরি হবে।'

আবূ উসমান হারীরি ﷺ বলেছেন, 'পথচলার শুরুতেই যার ইচ্ছা শুদ্ধ হবে না, তার পথচলা তাকে কেবল উলটো দিকেই নিয়ে যাবে।'[৬০৩]

তিনি আরও বলেছেন, 'মুরীদ যখন কোনো জ্ঞানের কথা শোনে আর সে অনুযায়ী আমল করে, তখন তা একটি হিকমত হিসেবে আজীবন তার অন্তরে থেকে যায়, যা তার উপকার করে এবং যখন কথা বলে, তখন শ্রোতারা এর মাধ্যমে উপকৃত হয়। অপরদিকে কেউ যখন কোনো জ্ঞানের কথা শোনে; কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে না, তখন তা একটি ঘটনা হিসেবে সে কয়েক দিন স্মরণ রাখতে পারে, অতঃপর ভুলে যায়।'[৬০৪]

---

[৬০২] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৩৫২।

[৬০৩] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৩৫৩।

[৬০৪] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৩৫৪।

ওয়াসিতি ﷺ বলেছেন, 'মুরীদের সর্বপ্রথম স্তর হলো—আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার মাঝে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দেওয়া।'[৬০৫]

*****

[৬০৫] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৩৫৪।

৩৬ নং মানযিল

শিষ্টাচার (اَلْأَدَبُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—শিষ্টাচারের মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

> "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।"[৬০৬]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ ও অন্যান্যরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'অর্থাৎ তাদেরকে ইলম শিক্ষা দাও এবং আদব (শিষ্টাচার) শিখাও।'[৬০৭]

اَلْأَدَبُ শব্দটি একত্রিত হওয়া বোঝায়। সুতরাং আদব হলো : ব্যক্তির মাঝে সব ধরনের ভালো গুণাবলি একত্রিত হওয়া। এই শব্দ থেকেই اَلْمَأْدُبَةُ শব্দের উৎপত্তি; যার অর্থ : সেই খাবার, যা খেতে মানুষজন একত্রিত হয়।

ইলমুল আদাব (عِلْمُ الْأَدَبِ) বলা হয় সেই ইলমকে, যার দ্বারা জবান ও কথাবার্তা বিশুদ্ধ হয়, সঠিক স্থানে তা প্রয়োগ করা যায়, শব্দাবলিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং এ ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে বেঁচে থাকা যায়। এটি হলো সাধারণ শিষ্টাচারের একটি অংশ। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

আবূ আলি দাক্কাক ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর আনুগত্য করে বান্দা জান্নাত পর্যন্ত

[৬০৬] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬।

[৬০৭] তাবারি, তাফসীর, ২৩/১০৩।

পৌঁছে যায়। আর আল্লাহর সাথে আদব মেনে আনুগত্য করার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।'[৬০৮]

ইবনু আতা ﷺ বলেছেন, 'আদব হলো—সবসময় উত্তম বিষয়ের ওপর অবস্থান করা।' তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'এর মানে কী?' উত্তরে তিনি বলেন, 'প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ তাআলার সাথে শিষ্টাচার বজায় রাখা।'[৬০৯]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত হবে, সে তাঁর মহাব্বতের বান্দা বলে গণ্য হবে।'[৬১০]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ বলেছেন, 'বেশি ইলম শেখার চেয়ে, আমরা অল্প আদব শেখার প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী।'[৬১১]

হাসান বাস্‌রি ﷺ-কে সবচেয়ে উপকারী আদব বা শিষ্টাচার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন, 'দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা, দুনিয়াবিমুখ হওয়া এবং আল্লাহ সম্পর্কে জরুরি মা'রিফাত বা ইলম অর্জন করা।'[৬১২]

আবূ হাফ্‌স ﷺ বলেছেন, 'বাইরের উত্তম শিষ্টাচার ভেতরের উত্তম শিষ্টাচারের প্রতিচ্ছবি। আল্লাহর সাথে উত্তম শিষ্টাচারের অর্থ : প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত কাজকর্মকে আল্লাহর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও লজ্জা অনুসারে সম্পাদন করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে উত্তম সান্নিধ্য বজায় রাখা।'[৬১৩]

সাহ্‌ল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের নফসকে শিষ্টাচার শেখাতে কঠোরতা অবলম্বন করে, সে আল্লাহর ইবাদাত ইখলাসের সাথে করতে পারে।'[৬১৪]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ বলেছেন, 'আদব সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা

---

[৬০৮] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৪৪৫।

[৬০৯] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৪৪৬।

[৬১০] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৪৪৭।

[৬১১] আবূ বকর মালিকি, রিয়াদুন নুফূস, ১/২৩০।

[৬১২] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৪৪৭।

[৬১৩] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৪৪৭।

[৬১৪] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৪৪৮।

বলেছেন। তবে আমি বলি, 'আদব হলো নিজের নফস সম্পর্কে জানা।'[৬১৫] অর্থাৎ নফসের অবস্থা এবং এর অমনোযোগিতা, অলসতা ও স্থবিরতার দিকে লক্ষ রাখা। আর সেগুলো থেকে সযত্নে বেঁচে থাকা।

আদব বা শিষ্টাচারের প্রকারভেদ

আদব বা শিষ্টাচার তিন প্রকার—

এক. আল্লাহর সাথে শিষ্টাচার (اَلْأَدَبُ مَعَ اللهِ),

দুই. রাসূলের সাথে শিষ্টাচার (اَلْأَدَبُ مَعَ الرَّسُوْلِ) এবং

তিন. সৃষ্টিকুলের সাথে শিষ্টাচার (اَلْأَدَبُ مَعَ الخَلْقِ)।

এক. আল্লাহর সাথে শিষ্টাচার : আল্লাহ তাআলার সাথে শিষ্টাচার আবার তিন ভাগে বিভক্ত :

১. কাজকর্মকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে বাঁচানো,

২. অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও দিকে ধাবিত হওয়া থেকে বাঁচানো এবং

৩. নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টিজনক স্থানে প্রয়োগ করা থেকে বাঁচানো।

আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে নবি-রাসূলদের অবস্থা, তাঁদের সম্বোধন, প্রার্থনা ইত্যাদি লক্ষ করলে আপনি উপলব্ধি করবেন যে, তাঁদের প্রতিটি বিষয়ই ছিল শিষ্টাচার ও আদবের গুণে গুণান্বিত।

ঈসা ﷺ বলেছেন,

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ

"যদি আমি তা বলে থাকি, তা হলে আপনি অবশ্যই তা জানেন।"[৬১৬]

তিনি এটা বলেননি যে, 'আমি তা বলিনি।' এ দুটি জবাবের মাঝে রয়েছে আসলে শিষ্টাচারের পার্থক্য। এরপর তিনি তার প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়কে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে সমর্পণ করেন। তিনি বলেন,

---

[৬১৫] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাহ, ২/৪৪৮।

[৬১৬] সূরা মায়িদা, ৫ : ১১৬।

تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ

"আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন।"

এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার গায়িবের জ্ঞান ও তাঁর সাথে বিশেষিত জ্ঞান সম্পর্কে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে বলেন,

وَلَا أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ

"আর আমি আপনার মনে যা আছে তা জানি না।"

এরপর আল্লাহ তাআলা যে গায়িব বা অদৃশ্যের জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে জানেন, সে বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি তাঁর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন,

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾

"নিশ্চয় অদৃশ্য বিষয়ে আপনিই পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত।"[৬১৭]

এরপর তিনি এ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তিনি তার উম্মাহকে রবের হুকুম ব্যতীত অন্য কোনো হুকুম দিয়েছেন; এটি খাঁটি তাওহীদের পরিচয়। তিনি বলেন,

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِيْ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ

"আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা বলতে আপনি আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো; যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা।"

এরপর তিনি জানান যে, তিনি তার উম্মাতের মাঝে যত দিন ছিলেন, তত দিন তাদের দেখাশুনা করেছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তাদের ব্যাপারে তার কোনো অবগতি ছিল না। তখনকার ব্যাপারে কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। তিনি বলেন,

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

"আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যত দিন আমি তাদের মধ্যে

[৬১৭] সূরা মায়িদা, ৫ : ১১৬।

ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক।”[৬১৮]

এরপর ঈসা ﷺ বলেছেন,

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ

“আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তো তারা আপনারই বান্দা।”

ঈসা ﷺ-এর এই ভঙ্গিতে কথা বলা তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিষ্টাচারের বহিঃপ্রকাশ ছিল। মালিক তার নিজ গোলামের প্রতি দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। আর এরা তো আপনারই গোলাম, অন্য কারও নয়। সুতরাং তারা আপনার গোলাম হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন না। যদিও তারা আপনার অবাধ্য গোলাম, আপনার আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলেনি, পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তবে তারা গোলাম হওয়ার দরুন মালিকের অনুগ্রহ লাভের অধিকার রাখে। সাধারণ একজন মালিকও তার দাসদের প্রতি অনুগ্রহ করে, সেখানে আপনি (সব মালিকের মালিক,) সব দয়াবানদের চেয়ে দয়ালু, সমস্ত দানশীলদের চেয়েও দানশীল; আপনি কীভাবে শাস্তি প্রদান করবেন? যদি তাদের অপরাধ ও সীমালঙ্ঘন মাত্রা অতিক্রম করে এবং তারা পরিপূর্ণ শাস্তির উপযুক্ত হয়, তা হলে ভিন্ন কথা।

এরপর তিনি বলেন,

وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

“আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।”[৬১৯]

ঈসা ﷺ এখানে বলেননি, اَلْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ‘পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু’। এটি আল্লাহর সাথে তার চূড়ান্ত শিষ্টাচারের পরিচয়। কারণ তিনি এটি বলেছেন তখন, যখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রাগান্বিত এবং তিনি তাদেরকে জাহান্নামের

[৬১৮] সূরা মায়িদা, ৫ : ১১৭।

[৬১৯] সূরা মায়িদা, ৫ : ১১৮।

অথচ দুই বালকের ব্যাপারে বলেছেন,

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

"সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক।"[৬২২]

এমনিভাবে জিনদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদের কথা,

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ

"আমরা জানি না যে, পৃথিবীবাসীদের সাথে কোনো খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে..."

এখানে তারা বলেননি যে, 'পৃথিবীবাসীদের সাথে তাদের রব কোনো খারাপ আচরণ করার সংকল্প করেছেন।' এরপর তারা বলেন,

أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

"নাকি তাদের রব তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর ইচ্ছা করেছেন?"[৬২৩]

এগুলোর চেয়েও উত্তম শিষ্টাচারের কথা হলো মূসা ﵇ যা বলেছিলেন,

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

"হে আমার প্রতিপালক, যে অনুগ্রহই তুমি আমার প্রতি নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।"[৬২৪]

এখানে তিনি বলেননি, 'তুমি আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে দাও...

***

এই প্রকারের শিষ্টাচারের অন্যতম নমুনা হলো : নবি ﷺ-এর এই আদেশ যে,

---

[৬২২] সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ৮২।

[৬২৩] সূরা জিন, ৭২ : ১০।

[৬২৪] সূরা কাসাস, ২৮ : ২৪।

নিজের গোপনাঙ্গকে আবৃত করে রাখবে, যদিও এমন স্থানে থাকো যে, তোমাকে কেউ না দেখে; (অথচ আল্লাহ দেখছেন)।[৬২৫] আল্লাহ তাআলার প্রতি চূড়ান্ত শিষ্টাচার থেকেই নবি ﷺ এই হুকুম দিয়েছেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অধিক নৈকট্যশীল, আল্লাহর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি অধিক লাজুক।

শিষ্টাচার বা আদবই হলো পরিপূর্ণ দ্বীন। কেননা লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা, ওজু করা, ফরজ গোসল করা, নাপাকি ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা এবং পরিশেষে পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো সবই শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলিমগণ এটা মুস্তাহাব বলেছেন যে, সালাতে বান্দা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর পূর্বে নিজেকে সুসজ্জিত করে নেবে।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ﷬-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা সালাতে সতর ঢাকার চেয়েও অতিরিক্ত একটি হুকুম দিয়েছেন। তা হলো, সৌন্দর্য অবলম্বন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا بَنِيٓ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"হে বনী আদম, তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর সাজে সজ্জিত হও।"[৬২৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা সুসজ্জিত হতে আদেশ করেছেন, সতর ঢাকতে নয়। আর এ জন্য বান্দার উচিত সালাতে সবচেয়ে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা।'

উত্তম শিষ্টাচারের একটি হলো—নবি ﷺ সালাত আদায়কারীকে তার দৃষ্টি আসমানের দিকে উঠাতে নিষেধ করেছেন।[৬২৭]

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ﷬-কে বলতে শুনেছি, 'এটি সালাতের পরিপূর্ণ শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত যে, বান্দা তার রবের সামনে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াবে, জমিনের দিকে দৃষ্টি অবনত রাখবে, ওপরের দিকে দৃষ্টি উঠাবে না।'

---

[৬২৫] আবূ দাউদ, ৪০১৭।

[৬২৬] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১।

[৬২৭] বুখারি, ৭৫০।

মূলকথা হলো : আল্লাহর সাথে শিষ্টাচার মানে তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরা এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়া।

তিনটি বিষয় ব্যতীত কেউ আল্লাহ তাআলার সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করতে পারে না :

১. আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জানা,

২. তাঁর দ্বীন, শারীআত, তিনি কী পছন্দ করেন, কী অপছন্দ করেন সে সম্পর্কে জানা এবং

৩. সত্য গ্রহণে উপযোগী ও কোমল আত্মার অধিকারী হওয়া, যা সব পরিস্থিতিতেই হক ও ন্যায় গ্রহণে প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সাহায্য-লাভের উৎস।

দুই. রাসূলের সাথে শিষ্টাচার : পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে অসংখ্য দিকনির্দেশনা এসেছে—

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শিষ্টাচারের মূল কথা হলো : সম্পূর্ণরূপে তাঁকে মেনে নেওয়া, তাঁর আনীত বিষয়াদির প্রতি আত্মসমর্পণ করা, তিনি যে খবর নিয়ে এসেছেন, তা পরিপূর্ণরূপে সত্যায়ন করা ও গ্রহণ করা; কোনো প্রকার যুক্তি, সংশয়, ব্যক্তিগত অভিমত ও গবেষণার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ছাড়াই। সুতরাং হুকুম দানের ক্ষেত্রে, আনুগত্য করার ক্ষেত্রে, আত্মসমর্পণ ও মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একক বলে ঘোষণা দিতে হবে এবং বাস্তবে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলাকে ইবাদাত, একনিষ্ঠতা, নিজেকে তাঁর সামনে মিটিয়ে দেওয়া, তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া এবং তাঁর ওপর ভরসা করার ক্ষেত্রে একক বলে বিশ্বাস করা ও মানা জরুরি।

এই দুই প্রকার তাওহীদ ব্যতীত আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে বান্দার মুক্তি মিলবে না। আল্লাহ তাআলার তাওহীদ এবং রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাওহীদ। সুতরাং নবিকে ছাড়া আর কাউকে বিচারক মানা যাবে না এবং তাঁর ফায়সালা ছাড়া অন্য কারও ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না।

রাসূলের সাথে আরেকটি আদব হলো—কোনো আদেশ, নিষেধ, অনুমতি দেওয়া-নেওয়া বা অন্য কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অগ্রগামী না হওয়া; যতক্ষণ-

না তিনি এর আদেশ করেন, নিষেধ করেন কিংবা অনুমতি দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।"[৬২৮]

এই হুকুম কিয়ামাত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, এটি রহিত হয়নি। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সুন্নাতের চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে অগ্রবর্তী হওয়ার মতোই (খারাপ)। সুস্থবোধসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

রাসূলের সাথে আরেকটি আদব হলো—তাঁর আওয়াজের চেয়ে আওয়াজ উঁচু না করা। কেননা এটি সমস্ত আমল বরবাদ হওয়ার কারণ। সুতরাং সিদ্ধান্ত ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাহ এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার ওপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেওয়া হলে আপনার কী ধারণা? তা কী আমল কবুল হওয়ার কারণ হবে, যখন রাসূলের আওয়াজের চেয়ে আওয়াজ উঁচু করাই আমল বরবাদের কারণ?!

রাসূলের সাথে আরেকটি আদব হলো—সাহাবায়ে কেরাম ﷺ যখন নবি ﷺ-এর সাথে কোনো সম্মিলিত কাজে অংশগ্রহণ করতেন, যেমন : কোনো বক্তৃতা শোনা, জিহাদ করা বা পাহারা দেওয়া—তখন কেউ নিজ প্রয়োজনেও ততক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে চলে যেতেন না, যতক্ষণ-না তাঁর অনুমতি গ্রহণ করতেন।

তিন. সৃষ্টিকুলের সাথে শিষ্টাচার : সমগ্র সৃষ্টির সাথে শিষ্টাচার বা আদব হলো—সবার মর্যাদা ও স্তরের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের সাথে যথোপযুক্ত ব্যবহার করা। প্রতিটি স্তরের ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আদব। আর কিছু কিছু স্তরের জন্য রয়েছে বিশেষ আদব।

সুতরাং মাতা-পিতার সাথে রয়েছে বিশেষ আদব। আবার শুধু পিতার জন্য রয়েছে

---

[৬২৮] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১।

বিশেষ আদব, যা কেবল তাঁর জন্যই প্রযোজ্য।

আলিমদের সাথে রয়েছে আলাদা আদব বা শিষ্টাচার। রাজা-বাদশাদের সাথে রয়েছে তাদের মর্যাদা অনুসারে আলাদা শিষ্টাচার। সমবয়সিদের সাথে তাদের স্তর অনুপাতে রয়েছে শিষ্টাচার। অপরিচিতের সাথে শিষ্টাচার আর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠজনদের সাথে শিষ্টাচার এক নয়। এমনিভাবে মেহমানের সাথে ও পরিবারের লোকজনদের সাথেও রয়েছে আলাদা আলাদা শিষ্টাচার।

আবার প্রতিটি পরিবেশের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শিষ্টাচার। খাওয়ার জন্য এক ধরনের আদব, পান করার জন্য রয়েছে আরেক ধরনের আদব। আরোহণ করা, প্রবেশ করা, বের হওয়া, সফর করা, একজায়গায় অবস্থান করা, ঘুমানো, প্রশ্রাব করা, কথা বলা, চুপ থাকা, অপরের কথা শোনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে আলাদা আলাদা আদব বা শিষ্টাচার।

উত্তম শিষ্টাচার হলো ব্যক্তির সফলতা ও সৌভাগ্যের শিরোনাম। আর মন্দ বা কম শিষ্টাচার হলো তার ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যের শিরোনাম।

সুন্দর আদবের মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতের অনেক কল্যাণ অর্জন করা যায়। আর মন্দ ও খারাপ আদবের কারণে জোটে বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা।

সুতরাং মা-বাবার প্রতি শিষ্টাচারের ফল দেখুন, কীভাবে তাদের প্রতি শিষ্টাচারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা পাহাড়ের গুহা থেকে রক্ষা করেছিলেন, যখন পাথর এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল?[৬২৯]

আর মায়ের সাথে আদব রক্ষা না করায় আল্লাহর ইবাদাতগুজার বান্দা (জুরাইজকে) কী রকম পরীক্ষা দিতে হয়েছিল? তাকে অপকর্মের অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তার ইবাদাতখানা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে পতিতা নারীদের সামনে আনা হয়েছিল!![৬৩০]

প্রত্যেক দুর্ভাগা, ব্যর্থ ও অসফল ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে দেখবেন, তাদের দুর্ভাগ্য, ব্যর্থতা ও অসফলতার মূলে রয়েছে আদবের ঘাটতি, (অর্থাৎ

---

[৬২৯] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ২২১৫, ৫৯৭৪; মুসলিম, ২৭৪৩।

[৬৩০] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ১২০৬; মুসলিম, ২৫৫০।

খারাপ ব্যবহার ও মন্দ শিষ্টাচার।)

দেখুন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﷺ-এর সাথে মন্দ আচরণ করার কারণে আওফ ইবনু মালিক কীভাবে গনীমাতের মাল পেয়েও বঞ্চিত হয়েছেন?[৬৩১]

সালাতে সামনে যাওয়ার ক্ষেত্রে নবি ﷺ-এর সাথে আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ-এর আদব লক্ষ করুন—আবূ বকর ﷺ বলেছিলেন,

مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আবূ কুহাফার পুত্রের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে (ইমাম হিসেবে) সালাত আদায় করা শোভনীয় নয়।'[৬৩২]

তিনি কীভাবে (আদবের মাধ্যমে) রাসূল ﷺ-এর পর তাঁর মর্যাদা ও উম্মাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছেন?! সেদিন আবূ বকর ﷺ-এর পেছনে সরে আসাই তাকে অনেক দূর সামনে এগিয়ে দিয়েছে। যদিও রাসূল ﷺ তাকে আপন জায়গাতেই থাকতে বলেছিলেন।

*****

---

[৬৩১] আওফ ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হিময়ার গোত্রের একব্যক্তি শত্রুদলের একব্যক্তিকে হত্যা করল, ফলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পদগুলো নিতে চাইল। কিন্তু খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। তিনি তখন তাদের সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু আওফ ইবনু মালিক ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং ওই ঘটনা সম্পর্কে জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তাকে দিতে কীসে তোমাকে বাধা দিলো?' খালিদ ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি তার অনেক সম্পদ পেয়েছি।' তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তাকে তা দিয়ে দাও।' তারপর খালিদ ﷺ আওফ ইবনু মালিক ﷺ-এর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি খালিদ ﷺ-এর চাদর ধরে টান দিয়ে বললেন, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছাবো, তাই হয়নি কি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনতে পেলেন। এতে তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, 'হে খালিদ, তুমি তাকে তা দেবে না। হে খালিদ, তুমি তাকে তা দেবে না। তোমরা কি আমার খাতিরে আমার সেনাপতিদের একটু ছাড়ও দেবে না? নিশ্চয় তোমাদের এবং তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি উট কিংবা ছাগল চরাতে মনস্থ করল, অতঃপর মাঠে নিয়ে গিয়ে চরালো। তার পর পিপাসার সময় পানি পান করানোর জন্য জলাশয়ে নিয়ে গেল। ফলে পশুগুলো পরিষ্কার পানি পান করতে শুরু করল আর ঘোলাটে পানি পরিত্যাগ করল। সুতরাং (এখন কি তোমরা এটাই চাও যে,) পরিষ্কারটা তোমাদের জন্য হোক এবং অপরিষ্কারটা হোক তোমাদের নেতাদের জন্য?'—মুসলিম, ১৭৫৩।

[৬৩২] বুখারি, ১২১৮; মুসলিম, ৪২১।

৩৭ নং মানযিল

দৃঢ় বিশ্বাস (اَلْيَقِيْنُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—দৃঢ় বিশ্বাসের মানযিল।

ঈমানের জন্য দৃঢ় বিশ্বাস হলো শরীরের জন্য আত্মার ন্যায়। এর মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত বান্দারা মর্যাদা লাভ করে থাকে। এ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে। এর প্রতিই আমলকারীদের পথচলা। দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবাই আমল করে। প্রত্যেকের ইঙ্গিত এ দিকেই। আর যখন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ধৈর্য মিলিত হয়, তখন দ্বীনের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—আর আল্লাহর কথার মাধ্যমেই হিদায়াতপ্রাপ্তরা পথ পেয়ে থাকে—

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

> "আর যখন তারা সবর করে এবং আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এমন নেতা সৃষ্টি করে দিই, যারা আমার হুকুম অনুসারে পথপ্রদর্শন করত।"[৬৩৩]

আল্লাহ তাআলা দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দাদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তারাই তাঁর নিদর্শনাদি ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা উপকৃত হয়। মহাসত্যবাদী আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

"দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে বহু নিদর্শন।"[৬৩৪]

---

[৬৩৩] সূরা সাজদা, ৩২ : ২৪।

[৬৩৪] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২০।

আমলকারীদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা সফলতা ও হিদায়াতকে কেবল দৃঢ় বিশ্বাসীদের সাথেই খাছ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

"আর যারা আপনার ওপর যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং আপনার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, সেগুলোর ওপর ঈমান আনে আর আখিরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে; তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।"[৬৩৫]

সুতরাং ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস হলো অন্তরের আমলসমূহের প্রাণ, অন্তরের আমলগুলো আবার বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলসমূহের প্রাণ। এটি সত্যবাদিতার প্রকৃত মর্ম। দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া সত্যবাদিতার মানযিল অস্তিত্বহীন।

অন্তরে যখন ইয়াকীন হাসিল হয়, তখন তা নূর ও জ্যোতিতে ভরে যায়। অন্তর থেকে সব ধরনের সন্দেহ, সংশয়, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি ও অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা, ভয়, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, তাঁর ওপর ভরসা ও তাঁর প্রতি আত্মনিবেদনে হৃদয় পূর্ণতা পায়। ইয়াকীনই হলো সমস্ত মর্যাদা ও সম্মান লাভের মৌলিক উপাদান।

ইয়াকীন অর্জনযোগ্য নাকি আল্লাহ-প্রদত্ত—

এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে :

কেউ কেউ বলেছেন, 'এটি অন্তরে গচ্ছিত রাখা ইলম।' এর দ্বারা বুঝা যায় ইয়াকীন অর্জনের বিষয় নয়।

সাহ্ল ﵀ বলেছেন, 'ইয়াকীন হলো ঈমানের আধিক্য। আর ঈমান যে অর্জন করে নিতে হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

---

[৬৩৫] সূরা বাকারা, ২ : ৪-৫।

সঠিক অভিমত হলো : মাধ্যম ও কারণ বিবেচনায় ইয়াকীন অর্জনযোগ্য। আর মৌলিক দিক বিবেচনায় তা আল্লাহ-প্রদত্ত।

সাহ্‌ল ﷺ বলেছেন, 'ইয়াকীনের শুরু হলো অন্তর্গত বিশ্বাস। এরপর সরাসরি ও চোখে দেখে বিশ্বাস।'

ইবনু খাফীফ ﷺ বলেছেন, 'ইয়াকীন হলো অদৃশ্য বিষয়াবলির হুকুম-আহকামের তাৎপর্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।'[৬৩৬]

আবূ বকর ইবনু তাহির ﷺ বলেছেন, 'ইলমের ক্ষেত্রে সংশয় আসতে পারে। কিন্তু ইয়াকীনের ক্ষেত্রে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।'[৬৩৭]

কেউ কেউ বলেছেন, 'যে অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য বিষয়ের প্রতি নিশ্চিন্ততা রয়েছে, সে অন্তরে ইয়াকীন অবস্থান করে না।'

যুন-নূন মিসরি ﷺ বলেছেন, 'ইয়াকীন আশাকে ছোটো রাখতে আহ্বান করে। ছোটো আশা দুনিয়াবিমুখতাকে আহ্বান করে। দুনিয়াবিমুখতা হিকমত সৃষ্টি করে। আর হিকমত পরিণামের দিকে দৃষ্টি দিতে উদ্‌বুদ্ধ করে।'[৬৩৮]

তিনি আরও বলেছেন, 'তিনটি বিষয় ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের আলামত—

১. মানুষের সাথে মেলেমেশা কম করা,
২. দান করলে অতিরিক্ত প্রশংসা না করা এবং
৩. দান না করলে নিন্দা করা থেকে বেঁচে থাকা।

ইয়াকীনের আলামত হিসেবে আরও তিনটি বিষয় রয়েছে—

১. প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া,
২. প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং
৩. প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।'[৬৩৯]

---

[৬৩৬] আবূ আবদির রহমান সুলামি, তবাকাতুস সূফিয়্যা, ৩৪৮।
[৬৩৭] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/৩১৮।
[৬৩৮] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/৩১৮।
[৬৩৯] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৯/৩৬১।

জুনাইদ বাগদাদি ﷺ বলেছেন, 'দৃঢ় বিশ্বাস হলো এমন স্থির ইলম, যা এদিক-সেদিক নড়াচড়া করে না, বদলেও যায় না এবং অন্তরে কোনো পরিবর্তনও আনে না।'[৬৪০]

ইবনু আতা ﷺ বলেছেন, 'মানুষ তাকওয়ার কতটা নিকটবর্তী, সে হিসেবে ইয়াকীন অর্জন করে থাকে।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'ইয়াকীন হলো মুকাশাফা বা উদ্ভাসিত হওয়া। এটি তিন প্রকার—

১. (আল্লাহর দেওয়া) খবরসমূহ উদ্ভাসিত হওয়া,
২. আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি উদ্ভাসিত হওয়া এবং
৩. অন্তরে ঈমানের হাকীকত উদ্ভাসিত হওয়া।

'মুকাশাফা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : চোখে দেখার মতো কোনো বস্তু অন্তরে প্রকাশিত বা উদ্ভাসিত হওয়া। যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় বাকি থাকে না। এটি হলো ঈমানের সর্বশেষ স্তর; ইহ্‌সানের স্তর।

কখনো কখনো মুকাশাফা দ্বারা তারা অন্য আরেকটি বিষয় বুঝিয়ে থাকেন। তা হলো, যা কেউ ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থার মাঝে শরীর থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার শুরুর দিকে দেখে থাকে।

আর যারা এই দুই ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, তারা আসলে ভুলের মধ্যে রয়েছে। তারা সঠিক বিষয় উপলব্ধি করতে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।

আবূ বকর ওয়ার্‌রাক ﷺ বলেছেন, 'ইয়াকীনের তিনটি স্তর রয়েছে—

১. খবর শুনে দৃঢ় বিশ্বাস করা (يَقِينُ خَبَرٍ),
২. দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস করা (يَقِينُ دَلَالَةٍ) এবং
৩. স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস করা (يَقِينُ مُشَاهَدَةٍ)।'[৬৪১]

---

[৬৪০] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১/৩১৯।
[৬৪১] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১/৩২১।

তিনি 'খবর শুনে দৃঢ় বিশ্বাস করা' দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন : খবরদাতার (রাসূলের) খবরের প্রতি অন্তরের স্থিরতা এবং তাতে নিশ্চিন্ত আস্থা রাখা। আর 'দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস করা' হলো আগের চেয়ে উঁচু স্তরের। এটি হলো দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাথে যে খবর প্রদান করেছে, দলীলের সাহায্যে তা প্রমাণ করা।

আর এটি হলো ঈমান, তাওহীদ ও কুরআনের অন্যান্য সাধারণ খবরের মতো। কেননা আল্লাহ তাআলা সমস্ত সত্যবাদীর চেয়ে বেশি সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর খবরের সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য তিনি বান্দাদের জন্য দলীল, প্রমাণ ও উপমা পেশ করেছেন। ফলে তাদের জন্য দুই দিক থেকে ইয়াকীন হাসিল হয় : খবরের দিক দিয়ে এবং দলীল-প্রমাণের দিক দিয়ে।

আর এর মাধ্যমে বান্দা তৃতীয় স্তরে উন্নীত হয়। আর তা হলো স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস। এই স্তরে এসে বান্দার অন্তরে সেই খবরগুলো সম্পর্কে চোখে-দেখা-বস্তুর মতো আস্থা জন্মে। তখন অদৃশ্য বিষয়াবলির প্রতি বিশ্বাস, নিজ চোখে দেখা বস্তুর প্রতি বিশ্বাসের মতো হয়ে যায়; যেখানে কোনো দ্বিধা কিংবা সংশয় থাকে না। এটি হলো সর্বোচ্চ স্তরের মুকাশাফা (উদ্ভাসিত হওয়া)। এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন আমির ইবনু আবদি কাইস ﵁। তিনি বলেছিলেন, لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيْنًا 'যদি পর্দা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, আমার ইয়াকীন একটুও বাড়বে না।' এটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাদীস নয় এবং এটি আলি ইবনু আবী তালিব ﵁-এর কথাও নয়। যেমনটি ধারণা করে থাকে হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তিবর্গ।

জ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেছেন, 'আমি বাস্তবেই জান্নাত-জাহান্নাম দেখেছি।' তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'কীভাবে?' তিনি জবাব দেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুচোখ দিয়ে তা দেখেছি। আর তাঁর চোখ দিয়ে দেখা, আমার নিকট আমার চোখ দিয়ে দেখার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কারণ আমার চোখ মাঝে মাঝে ভুল দেখে এবং সঠিকতা নির্ণয় করতে বিচ্যুত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। (তাঁর চোখ সবসময় সঠিক দেখে, কখনো বিচ্যুত হয় না।)'

*****

৩৮ নং মানযিল

আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা (اَلْأُنْسُ بِاللهِ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -এর আরেকটি মানযিল হলো—আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতার মানযিল।

ঘনিষ্ঠতা হলো : আনুগত্য ও মহাব্বতের ফল। সুতরাং প্রত্যেক অনুগত বান্দাই আল্লাহর ঘনিষ্ঠ। আর প্রত্যেক অপরাধীই নিঃসঙ্গ। যেমন কবি বলেছেন :

فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَوْحَشَتْكَ الذُّنُوْبُ
فَدَعْهَا إِذَا شِئْتَ وَاسْتَأْنِسِ

'পাপাচার যদি তোমাকে ডুবিয়ে দেয় নিঃসঙ্গতায়;
তা হলে যখন ইচ্ছা তুমি তা ছেড়ে দাও নির্দ্বিধায়,
আর নিমগ্ন হও আপন প্রভুর নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়।'

সালিক বা আখিরাতের পথের পথিক আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে। আর কুরআন শ্রবণে তার অন্তর শক্তিশালী হয়, যেমন খাদ্য ও পানীয় দ্বারা শরীর শক্তিশালী হয়।

কেউ যদি সত্যিকারার্থেই আল্লাহকে ভালোবাসে, তাঁর সন্তুষ্টি তালাশ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তা হলে তার অন্তরের খাদ্য ও খোরাক হবে কুরআন শ্রবণ; যেমন এটি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের আত্মিক খোরাক ছিল, যাঁরা ছিলেন এই উম্মাতের জ্ঞানীদের নেতা, যাঁদের অন্তর ছিল সবচেয়ে পবিত্র এবং যাঁদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ। তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم।

আর কেউ যদি পথচ্যুত, ধোঁকাগ্রস্ত ও নিকৃষ্ট অবস্থার অধিকারী হয়, তা হলে তার অন্তরের খাবার হবে সংগীত; যেটা শয়তানের কুরআন। যাতে প্রবৃত্তির ও

নফসের চাহিদা থাকে বেশ প্রাণবন্ত। আল্লাহ্ থেকে এদের অবস্থান হয় অনেক দূরে, আল্লাহর মাঝে ও তাদের মাঝে রয়েছে মোটা পর্দা; যদিও তারা নিজেকে আল্লাহওয়ালা বলে দাবি করে থাকে।

কুরআন শ্রবণ হলো আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শ্রবণ। কুরআন শ্রবণের দ্বারা স্বচ্ছ মস্তিষ্কে অনেক ধরনের সূক্ষ্মজ্ঞান, ইঙ্গিত, মা'রিফাত ও তত্ত্বকথা হাসিল হয়, যা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সাথে অন্তরের ঘনিষ্ঠতা শক্তিশালী ও মজবুত হয়। ফলে এর দ্বারা তারা আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন এবং তাদের অন্তরে আসে আনন্দ ও উৎফুল্লতা। যা মাঝে মাঝে শরীরেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন তারা এতে এমন তৃপ্তি পায়, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত তৃপ্তির চেয়ে আলাদা।

শ্রবণের মাধ্যমে আত্মা যে খোরাক পায়, তাতে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। এর সূক্ষ্মতা ও রহস্যময়তার মধ্য থেকে কিছু উল্লেখ করছি :

জেনে রাখুন, আত্মার জন্য আল্লাহ তাআলা দুই ধরনের খাবার নির্ধারণ করেছেন :

এক ধরনের খাবার হলো বাহ্যিক খাদ্য ও পানীয়; যার মূল ও সারাংশ আত্মার জন্য আর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য থাকে খাদ্য গ্রহণ করার সক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট অংশ।

আরেক ধরনের খাবার হলো আত্মিক খাবার, দৃশ্যমান বাহ্যিক খাবার-পানীয় থেকে আলাদা। যেমন : সুখ, শান্তি, আনন্দ, খুশি, স্বাদ, প্রফুল্লতা, জ্ঞান-বিদ্যা ইত্যাদি। এই খাবার হলো ঊর্ধ্বজগতের আসমানি খাবার।

এই দুই ধরনের খাবার দ্বারাই মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখে। মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাথে এগুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—) এগুলোর মাধ্যমেই উভয় ধরনের খাবার মানুষের শরীরে পৌঁছে থাকে।

তবে চোখ ও কানের সাথে আত্মিক খোরাকের যে সম্পর্ক, তা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তুলনায় অনেক বেশি। খাবার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এই দুটি মাধ্যম অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় অধিক কার্যকর ও শক্তিশালী। এ দুটির প্রভাবও সবচেয়ে বেশি। এ কারণেই আপনি দেখবেন, কুরআনের বহু জায়গায় চোখ ও কানকে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

"আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদেরকে এমন অবস্থায় বের করেছেন, যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন আর চিন্তাভাবনা করার মতো হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"[৬৪২]

কুরআনে এ রকম উপস্থাপনা অনেক এসেছে। এর একটি কারণ—ব্যক্তি যা দেখে এবং শোনে তা দ্বারা যতটুকু প্রভাবিত হয়; যা স্পর্শ করে, স্বাদ নেয় এবং যা শোঁকে তা দ্বারা ততটুকু প্রভাবিত হয় না। এর আরেকটি কারণ—আয়াতে যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো ইলম অর্জনের পথ : চোখ, কান ও বুদ্ধি-বিবেচনা।

কানের সাথে অন্তরের সম্পর্ক ও সম্পৃক্ততা, চোখের সাথে সম্পর্ক ও সম্পৃক্ততার চেয়ে অনেক বেশি। এ কারণেই মজাদার কিছু দেখার চেয়ে মজাদার কিছু শ্রবণের প্রভাব বেশি হয়। এমনিভাবে অপছন্দনীয় বস্তুর ক্ষেত্রেও দেখা ও শোনার মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে।

যখন এই বিষয়টি জানা হয়ে গেল, তখন মনে রাখবেন—মানুষের এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের জন্য রয়েছে ভালো ও খারাপ গুণ। ভালো গুণগুলো হলো অন্তরের অংশ আর খারাপ গুণগুলো হলো নফসের অংশ।

কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের ইন্দ্রিয় থেকে অন্তর বা কল্‌বের কোনো অংশ নেই। আছে শুধু চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় অতি সামান্য একটু অংশ। কেবল মনুষ্যত্বের স্তরটি ছাড়া তাদের স্তর আর পশুর স্তর সমান। এই কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন; বরং তাদেরকে পশুর চেয়েও পথভ্রষ্ট বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٤﴾

---

[৬৪২] সূরা নাহল, ১৬ : ৭৮।

"আপনি কি মনে করেন, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা আরও বেশি পথভ্রষ্ট।"[৬৪৩]

আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কাফিরদের কান, চোখ ও বোধ-বিবেচনা নেই বলে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো, তারা এগুলো দ্বারা উপকৃত হয় না। ফলে তা যেন না থাকার মতোই।

সুতরাং প্রকৃত শ্রবণ অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে যে পবিত্র জীবনের সূচনা হয়, সেই জীবনই এই পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ জীবন। কারণ এর মাধ্যমেই অন্তর সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। যার ফলে শক্তি, উদ্যম, আনন্দ, খুশি, সজীবতা, প্রফুল্লতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। আর অন্তর যখন ভালো ও উপযুক্ত খাবার পায় না, তখন নষ্ট ও খারাপ খাবারের দ্বারাই শক্তিশালী হয়। খাবার যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন শক্তি-সামর্থ্য, আনন্দ, সজীবতা, প্রফুল্লতা সবই কমে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন খারাপ ও নষ্ট খাবার দ্বারা শরীর শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

অন্তরের সাথে বাহ্যিক কানের সম্পর্ক খুব বেশি আর এ দুটির পরস্পরের দূরত্বও চোখ ও অন্তরের দূরত্বের চেয়ে কম। এই কারণে চোখের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলির তুলনায় কানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলি অন্তরে দ্রুত প্রভাব ফেলে। যার ফলে মাঝে মাঝে মানুষ অতি আনন্দদায়ক, বা অতি কষ্টদায়ক বা পছন্দনীয় সুমিষ্ট কোনো সুর শোনার সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যায়। অপরদিকে চিত্তাকর্ষক ও মনোরম কোনো দৃশ্য দেখে মানুষ জ্ঞান হারায় না।

কখনো কখনো অন্তরে এই ধরনের শ্রবণের মাধ্যমে প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে; কিন্তু ব্যক্তি অন্যমনস্ক ও ব্যস্ত থাকার দরুন এবং সে সময় বাহ্যিক অবস্থার সাথে ভেতরগত অবস্থার মিল না থাকার কারণে তা টের পায় না। পরে যখন অবসর হয় এবং নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় পায়, তখন ঠিকই সেই প্রভাবে সে আচ্ছন্ন হয়।

রূহ ও অন্তর যখনই ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়, তখনই এই প্রকার শ্রবণ তাতে পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী প্রভাব ফেলে।

যা শ্রবণ করা হয়, তা যদি সুন্দর অর্থবিশিষ্ট হয় এবং সুমিষ্ট স্বরে শ্রবণ করা হয়, তা

[৬৪৩] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৪।

হলে অন্তরে সেই সুন্দর অর্থের একটা অংশ হাসিল হয় এবং অর্থ উপলব্ধি অনুসারে অন্তর এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ আনন্দিত হয়। রূহের জন্যও একটা অংশ অর্জিত হয়; যেমন : সুরের মিষ্টতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি। এর মাধ্যমে প্রাণশক্তি, উৎফুল্লতা, আনন্দ ও খুশি বেড়ে যায়। এমনকি মাঝে মাঝে এর প্রভাব শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং আশপাশের সাথিসঙ্গীদের ওপরও পড়ে।

এটি পরিপূর্ণরূপে এই দুনিয়ায় অর্জন করা সম্ভব নয়। আর এটি কেবল আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম আল-কুরআনুল কারীম শ্রবণের মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং রূহ যখন ঝামেলা মুক্ত হয়, ওহির আলো ধারণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে, অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার প্রতি আগ্রহী হয় এবং সমস্ত মনোযোগ শ্রুত বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ রাখে; ফলে সে অন্তর উপস্থিত রেখে সতর্কতার সাথে কান পেতে রাখে, অতঃপর যখন সে তিলাওয়াতকারীর সুমধুর স্বর শ্রবণ করে, তখন তার অন্তর এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার উপক্রম হয়, সে প্রবেশ করে ভিন্ন একজগতে, যেখানে সে এমন স্বাদ অনুভব করে সৃষ্টিজগতের কোনোকিছুর সাথেই তার কোনো তুলনা হয় না। সেটি জান্নাতে জান্নাতিদের অবস্থার চেয়েও অতি সূক্ষ্ম।

সুতরাং খাবার ও খোরাক হিসেবে এটা কতই-না উত্তম আর কতই-না উপকারী!

যে অন্তর শয়তানি (সংগীত) শ্রবণ দ্বারা পরিপুষ্ট, সেই অন্তরের জন্য এটা হারাম যে, সে কুরআন শ্রবণে এই স্বাদ পাবে; তবুও যদি সে এর কিছুটা স্বাদ অনুভব করে, তা হলে তা কেবল তিলাওয়াতকারীর সুমিষ্ট সুরের কারণে, এর গভীর অর্থ অনুধাবন করার কারণে নয়।

যখন অন্তর মনোযোগের সাথে কোনোকিছু শ্রবণ করে এবং এর বাহির ও ভেতরের মধ্যে বেশি তারতম্য না থাকে, তখন কান অন্তর পর্যন্ত সেই তথ্য পৌঁছিয়ে দেয়, যা অন্তরের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও (অন্তর এমন কিছু উপলব্ধি করে,) যা সেই শ্রবণকৃত বিষয় বোঝায় না এবং বক্তাও তা উদ্দেশ্য নেয় না। এটি শুধু অর্থবহ বাক্যের সাথেই বিশেষিত নয়; বরং অনেক সময় অর্থহীন কোনো শব্দ শ্রবণ করার মাধ্যমেও এ রকম উপলব্ধি হয়।

কুশাইরি ﷺ বলেছেন, 'আমি আবূ আবদির রহমান সুলামি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমি একবার আবূ উসমান মাগরিবির নিকট প্রবেশ

করলাম। তখন সেখানে একব্যক্তি চরকি দিয়ে পানি উত্তোলন করছিল। এটি দেখে তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো, এই চরকিটি কী বলছে?' আমি বললাম, 'না।' তখন তিনি বললেন, 'সে বলছে, 'আল্লাহ, আল্লাহ।'[৬৪৪]

সুতরাং ইশারা-ইঙ্গিতও দলীল ও আলামতের অন্তর্ভুক্ত। তবে এটি উপলব্ধি করার জন্য অন্তরে একাগ্রতা ও স্বচ্ছতা থাকা আবশ্যক। তীক্ষ্ণ অনুভূতির দ্বারা এমন ছোটো ছোটো বস্তুও উপলব্ধি করা যায়, যা অন্যরা বুঝতে পারে না এবং তাদের কল্পনাতেও আসে না।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-কে আল্লাহ তাআলার এই আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছি—

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না।"[৬৪৫]

এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এই আয়াতটি ইঙ্গিত প্রদান করে যে, পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ ঊর্ধ্বজগতের সেই সহীফা আল্লাহর নিকট অতি সম্মানিত হওয়ার কারণে যখন ফেরেশতারা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত তা স্পর্শ করতে পারে না, তখন এই সহীফার ক্ষেত্রেও পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না—এটাই অধিক সংগত।'

আবার নবি ﷺ বলেছেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

"যে বাড়িতে কুকুর থাকে এবং (কোনো প্রাণীর) ছবি থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"[৬৪৬]

এই হাদীস সম্পর্কে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'যখন কুকুর ও ছবি আল্লাহর-সৃষ্টি-করা-ফেরেশতাদেরকে বাড়িতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, তখন কীভাবে

---

[৬৪৪] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৫১৭।

[৬৪৫] সুরা ওয়াকিআ, ৫৬ : ৭৯।

[৬৪৬] বুখারি, ৩২২৫; মুসলিম, ২১০৬।

আল্লাহ তাআলার মা'রিফাত, তাঁর মহাব্বত, তাঁর যিকরের স্বাদ এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা সেই অন্তরে প্রবেশ করবে, যে অন্তর বিভিন্ন ধরনের মন্দচাহিদা আর কুবাসনার কুকুর ও ছবি দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে?!' এটি উপরিউক্ত হাদীসের শব্দ থেকেই সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়।'

এর আরেকটি উদাহরণ হলো : সালাত সহীহ হওয়া এবং সাওয়াব পাওয়ার জন্য শর্ত হলো কাপড় ও শরীর পবিত্র হওয়া। যদি এতে কোনো কমতি হয়, তা হলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং অন্তর যখন নাপাক হয় আর ব্যক্তি তা পবিত্র না করে, তা হলে তার সালাত কীভাবে বিশুদ্ধ হবে এবং এর দ্বারা সে কী সাওয়াব পাবে? যদিও এর দ্বারা তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। বাহ্যিক পবিত্রতার হুকুম দেওয়া হয়েছে তো কেবল অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাকে পরিপূর্ণ করার জন্যই।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো : সালাত সহীহ হওয়ার জন্য কিবলামুখী হওয়া একটি আবশ্যকীয় শর্ত। আর তা হলো আল্লাহ তাআলার ঘর। বান্দার শরীরকে সেদিকে ফেরানো জরুরি, তা না হলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সেই ব্যক্তির সালাত কীভাবে বিশুদ্ধ হবে, যার অন্তর কিবলার অধিপতি ও শরীরের মালিক আল্লাহর অভিমুখী না হয়? বরং তার শরীর থাকে কিবলার দিকে ফেরানো, আর তার অন্তর থাকে আল্লাহ থেকে গাফিল?

এই রকম বিশুদ্ধ ইশারা-ইঙ্গিতের অনেক উদাহরণ রয়েছে; যেগুলো অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা, সঠিক অন্তর্দৃষ্টি এবং উত্তম চিন্তাভাবনা ছাড়া অর্জিত হয় না। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

***

শ্রবণের ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : যে ব্যক্তি তার অন্তরকে কেবল নফসের বৈশিষ্ট্য দ্বারা পূর্ণ করে। ফলে তার অন্তর তার নফসে পরিণত হয়ে যায়। যার কারণে শাহওয়াত ও কুপ্রবৃত্তি তার ওপর প্রবল হয়। শ্রবণ থেকে এই ব্যক্তির অংশ জন্তু-জানোয়ারের অংশের মতো, যারা হাঁকডাক ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না।

দ্বিতীয় প্রকার : যে ব্যক্তি তার নফসকে তার অন্তরের গুণাবলি দ্বারা সুসজ্জিত করে তোলে। ফলে তার নফস তার অন্তরে রূপান্তরিত হয়। এ কারণে তার ওপর মা'রিফাত, মহাব্বত, আকল-বুদ্ধি ও পরিপূর্ণতার সব গুণসমূহ প্রবল হয়। এর ফলে তার নফস তার অন্তরের আলোয় উদ্ভাসিত হয়, আল্লাহর প্রতি নিশ্চিন্ত হয়, আল্লাহর দাসত্বে তার চক্ষু শীতল হয়, আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসায় সে প্রফুল্ল ও সতেজ হয়। শ্রবণ থেকে এই ব্যক্তির অংশ হলো ফেরেশতাদের অংশের সমান বা তার নিকটবর্তী। তার শ্রবণ করা হলো তার কল্‌ব ও রূহের খোরাক, দুনিয়াতে তার চোখের শীতলতা ও প্রশান্তি, একটি মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন বাগান, যেখানে সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে বেড়ায় এবং এতে তার জীবন হয় স্বাচ্ছন্দ্যময়।

কবিতা ও ছন্দমালা যারা শ্রবণ করে, তারা এ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে থাকে। কিন্তু তারা পথ ভুল করে ফেলেছে আর দিশেহারা হয়ে এদিক-সেদিক ঘুরছে।

তৃতীয় প্রকার : এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই ব্যক্তি, যার মানযিল উপরিউক্ত দুই মানযিলের মাঝে অবস্থিত। তার অন্তর মূল ফিতরাত বা স্বভাবের ওপর অবশিষ্ট থাকে।

শ্রবণ থেকে এই ব্যক্তির অংশ হলো আগের দুই অংশের মাঝামাঝি অংশ। যদি সে তার কল্‌বের আহ্বানে সাড়া দেয়, তা হলে তার শ্রবণের অংশ হয় শক্তিশালী আর যদি সে তার নফস ও কুপ্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেয়, তা হলে তার শ্রবণের অংশ হয় দুর্বল।

আর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার এই পার্থক্যের কারণেই আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে দ্বীনের বুঝশক্তি, উৎফুল্লতা এবং তাঁর কালাম শ্রবণে প্রশান্তি লাভ করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য হয়ে থাকে।

*****

৩৯ নং মানযিল

আল্লাহর স্মরণ (اَلذِّكْرُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আল্লাহর স্মরণ বা যিক্‌রের মানযিল।

এটি আখিরাতের পথের পথিকদের বিশাল মানযিল। এখান থেকেই তারা পাথেয় সংগ্রহ করে, এতেই নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগ করে আর সবসময় এখানেই ফিরে আসে।

আল্লাহর স্মরণ বা যিক্‌র হলো বিশেষ বন্ধুত্ব, যাকে তা দান করা হয়, সে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। আর যাকে এর থেকে বঞ্চিত করা হয়, সে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যিক্‌র সূফিয়ায়ে কেরামের আত্মার খোরাক, যা বন্ধ হয়ে গেলে শরীর তাদের জন্য কবরে পরিণত হয়। যিক্‌র তাদের (ঈমানের) ঘরবাড়ি আবাদ রাখে, যখন যিক্‌র থেমে যায়, তাদের বাড়িঘর বিরানভূমিতে পরিণত হয়। যিক্‌র হলো তাদের অস্ত্র, যা দিয়ে তারা পথের সমস্ত চোর-ডাকাতদের (অর্থাৎ শয়তান ও তার কুমন্ত্রণার) সাথে লড়াই করে। এটি হলো তাদের জন্য পানিস্বরূপ, যা দিয়ে তারা জাহান্নামের আগুন নেভায়; যিক্‌র আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। যিক্‌র বান্দা ও আল্লাহ তাআলার সাথে গভীর এক সম্পর্কের নাম।

যিক্‌র অন্তর ও জবানের ইবাদাত। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। বরং বান্দাকে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে অর্থাৎ সবসময়েই তাদের মা'বূদ ও মাহবূব আল্লাহর যিক্‌র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জান্নাত যেমন গাছপালাশূন্য প্রান্তর আর যিক্‌র তার বৃক্ষরাজি, ঠিক তেমনি অন্তরও ঘর-বাড়ি শূন্য বিরানভূমি, যিক্‌র হলো তার ভিত্তি ও আবাদকারী।

আল্লাহর স্মরণ হলো অন্তরের উজ্জ্বলতা, অন্তর পরিশুদ্ধকারী এবং অসুস্থ অন্তরের

জন্য ওষুধ। আল্লাহর স্মরণকারী ব্যক্তি যত বেশি আল্লাহর স্মরণে মগ্ন হয়, তত বেশি আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাতের আগ্রহ জন্মে এবং আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। বান্দা যখন অন্তর ও জবান একীভূত করে আল্লাহর স্মরণ করতে থাকে, তখন সে অন্য সবকিছু ভুলে যায়। আর আল্লাহ তাআলা তার জন্য সবকিছু সংরক্ষণ করে রাখেন এবং তিনি নিজেই তার জন্য সবকিছুর বিনিময়স্বরূপ হয়ে যান।

যিক্‌র হলো আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মাঝে একটি উন্মুক্ত প্রশস্ত দরজা। যতক্ষণ-না বান্দা নিজেই গাফিলতির মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়।

হাসান বাস্‌রি ﷺ বলেছেন, 'তিনটি জিনিসের মধ্যে মিষ্টতা তালাশ কোরো : সালাত, যিক্‌র এবং কুরআন তিলাওয়াত। যদি পেয়ে যাও, তা হলে খুব ভালো। আর যদি না পাও, তা হলে জেনে নিয়ো যে, (তোমার জন্য) দরজা বন্ধ।'[৬৪৭]

বান্দা আল্লাহর স্মরণ বা যিক্‌রের মাধ্যমে শয়তানকে আক্রমণ করে। যেভাবে আল্লাহকে-ভুলে-যাওয়া ও গাফিল লোকদেরকে শয়তান আক্রমণ করে থাকে।

যিক্‌র সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য

কুরআনে আল্লাহর স্মরণ বা যিক্‌র সম্পর্কে ১০টি বিষয় এসেছে—

১. যিক্‌রের আদেশ করা হয়েছে; কখনো সময় নির্দিষ্ট করে আবার কখনো কোনো নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই; আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো।"[৬৪৮]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً

"আর মনে মনে আপন রবকে স্মরণ করতে থাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে ও

[৬৪৭] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৩৭৮।

[৬৪৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪১-৪২।

ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়।"[৬৪৯]

২. যিক্‌রের বিপরীত বিষয় যেমন : গাফলতি, অমনোযোগিতা, ভুলে থাকা ইত্যাদি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে; আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝

"আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যারা গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে।"[৬৫০]

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

"তোমরা তাদের মতো হোয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।"[৬৫১]

৩. নিয়মিত এবং বেশি বেশি যিক্‌র করাকে সফলতা লাভের জন্য শর্ত করা হয়েছে; আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি করে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায়, এতে তোমরা সফল হবে।"[৬৫২]

৪. যিক্‌রকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাদের জন্য যে জান্নাত ও মাগফিরাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, তার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

[৬৪৯] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৫।

[৬৫০] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৫।

[৬৫১] সূরা হাশর, ৫৯ : ১৯।

[৬৫২] সূরা আনফাল, ৮ : ৪৫।

"নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিক্‌রকারী পুরুষ ও অধিক যিক্‌রকারী নারী—তাদের সবার জন্যই আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[৬৫৩]

৫. যারা অন্য কিছুর জন্য আল্লাহকে ভুলে থাকে, তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে; আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ۝٩

"হে মুমিনগণ, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[৬৫৪]

৬. আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহও তাদেরকে স্মরণ করবেন; আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۝١٥٢

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"[৬৫৫]

৭. যিক্‌রকে সবকিছু থেকে বড়ো বলে উল্লেখ করা হয়েছে; আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ۗ

---

[৬৫৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫।

[৬৫৪] সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ : ৯।

[৬৫৫] সূরা বাকারা, ২ : ১৫২।

"আপনার নিকট যে কিতাব ওহির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে আপনি তা পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।"[৬৫৬]

৮. যিক্‌রের মাধ্যমে যেকোনো সৎকাজের শুরু ও শেষ করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যেমন রোযার আমল আল্লাহর যিক্‌রের সাথে শেষ করা হয়েছে :

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ

"যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন, সেজন্য তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে পারো।"[৬৫৭]

এমনিভাবে সালাতের ক্ষেত্রেও যিক্‌রের আলোচনা এসেছে,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ

"তারপর যখন তোমরা সালাত শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো।"[৬৫৮]

৯. এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যিক্‌রকারীরাই কেবল আল্লাহর নিদর্শনাবলি থেকে উপকার লাভ করতে পারে এবং তারাই প্রকৃত জ্ঞানী; আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে; যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে।"[৬৫৯]

---

[৬৫৬] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৫।

[৬৫৭] সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫।

[৬৫৮] সূরা নিসা, ৪ : ১০৩।

[৬৫৯] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৯০-১৯১।

১০. সমস্ত নেক আমলের সাথেই যিক্‌রকে যুক্ত করা হয়েছে এবং একে প্রাণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যিক্‌রকে সালাতের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

"এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত কায়েম করো।"[৬৬০]

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা সিয়াম, হাজ্জ ও অন্যান্য আমলসমূহের সাথেও যিক্‌রকে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর স্মরণকারীদের মর্যাদা

আল্লাহর স্মরণকারী বা যিক্‌রকারীরাই হলো সবচেয়ে অগ্রগামী। যেমন, '*সহীহ মুসলিম*'-এর এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ মক্কার পথ দিয়ে হাঁটছিলেন। 'জুমদান' নামক পাহাড় অতিক্রমকালে তিনি বলেন,

سِيْرُوْا، هٰذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ

"তোমরা চলতে থাকো, এটি হলো জুমদান পাহাড়। 'মুফাররিদূন'রা অগ্রগামী হয়ে গেল।"

সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, মুফাররিদূন কারা?

নবি ﷺ উত্তর দিলেন,

اَلذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ

"আল্লাহ তাআলাকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীগণ।"[৬৬১]

---

[৬৬০] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১৪।

[৬৬১] মুসলিম, ২৬৭৬।

আরেকটি হাদীসে এসেছে, আবুদ দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ

"আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের অধিক উত্তম কাজ সম্পর্কে জানিয়ে দেবো না, যা তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাধিক উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়ে বেশি উত্তম, তোমাদের শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে হত্যা করা এবং তোমাদের নিহত হওয়ার চাইতেও উত্তম?"

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, সেটি কী'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

ذِكْرُ اللهِ تَعَالٰى

"আল্লাহ তাআলার যিক্‌র।"[৬৬২]

আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

"কোনো সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার যিক্‌র বা স্মরণ করতে বসলে একদল ফেরেশতা তাদের বেষ্টন করে রাখে, রহমত তাদের ঢেকে নেয়, তাদের ওপর সাকীনা বা প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছের ফেরেশতাগণের নিকট তাদের নিয়ে আলোচনা করেন।"[৬৬৩]

---

[৬৬২] তিরমিযি, ৩৩৭৭; ইবনু মাজাহ, ৩৭৯০; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১৭০২, সহীহ।

[৬৬৩] মুসলিম, ২৭০০; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৭৪২৭।

যিক্‌রের সুউচ্চ মর্যাদার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা যিকরকারীদের নিয়ে ফেরেশতাদের ওপর গর্ব করেন। যেমন, *'সহীহ মুসলিম'*-এর বর্ণনায় এসেছে, মুআবিয়া ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাদের একটি দলের নিকটে গিয়ে বললেন, 'তোমাদেরকে কীসে বসিয়েছে?'

তারা বলল, 'আমরা বসেছি আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। যেহেতু তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং এর দ্বারা আমাদের ওপর তিনি অশেষ অনুগ্রহ করেছেন।'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদেরকে কি শুধু এ বিষয়টিই বসিয়েছে?'

তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদেরকে কেবল এই বিষয়টিই বসিয়েছে।'

তখন নবি ﷺ বললেন,

أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ وَلٰكِنَّهُ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ

"আমি তোমাদের প্রতি মিথ্যে অপবাদ দেওয়ার জন্য শপথ করতে বলিনি; বরং আমার নিকট জিবরীল ﵇ এসে আমাকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের ওপর গর্ব করছেন।"[৬৬৪]

আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার জন্য ইসলামের বিধিবিধান অনেক বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয়ের আদেশ করুন, যা আমি মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি।'

জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللهِ

"তোমার জিহ্বা যেন সবসময় আল্লাহ্‌র যিক্‌রে সিক্ত থাকে।"[৬৬৫]

[৬৬৪] মুসলিম, ২৭০১; তিরমিযি, ৩৩৭৯; আহমাদ, ১৬৮৩৫।

[৬৬৫] তিরমিযি, ৩৩৭৫; ইবনু মাজাহ, ৩৭৯৩।

যিক্‌রের প্রকারভেদ

যিক্‌র তিন প্রকার—প্রশংসা, দুআ এবং মনোযোগ।

১. প্রশংসাসূচক যিক্‌র : যেমন : সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী—এ রকম বিভিন্ন প্রকার যিক্‌র।

২. দুআ সংবলিত যিক্‌র : যেমন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তা হলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।"[৬৬৬]

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"[৬৬৭]

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

"হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর সত্তা, আমি আপনার রহমতের ওসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি।"[৬৬৮]

এ জাতীয় আরও অন্যান্য দুআ এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. মনোযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যিক্‌র : যেমন, যিক্‌রের মাঝে মাঝে বলা,

اَللّٰهُ مَعِيْ—আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন।

---

[৬৬৬] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৩।

[৬৬৭] সূরা বাকারা, ২ : ২০১।

[৬৬৮] তিরমিযি, ৩৫২৪।

اَللهُ نَاظِرٌ إِلَيَّ—আল্লাহ আমাকে দেখছেন।

اَللهُ شَاهِدِيْ—আল্লাহ আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

এই রকম আরও যিক্‌র করা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যকে আরও জোরালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। এ ধরনের যিক্‌র করার মাধ্যমে অন্তর সংশোধন করার জন্য মনোযোগী হওয়া যায়, আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা করা যায়, গাফলত থেকে বাঁচা যায় এবং শয়তান ও নফসের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

নবি ﷺ যত যিক্‌র করেছেন, সবগুলোই এই তিন প্রকারের মধ্যে শামিল। হয়তো আল্লাহ তাআলার প্রশংসাসূচক যিক্‌র, অথবা আল্লাহর নিকট কিছু চেয়ে দুআ করা, অথবা মনোযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে (অন্তর সংশোধন করতে এবং শয়তান থেকে সুরক্ষা পেতে) যিক্‌র।

*****

৪০ নং মানযিল

দরিদ্রতা (اَلْفَقْرُ)
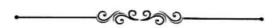
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—দরিদ্রতার মানযিল।

এই মানযিলটি হলো সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ, উঁচু ও সর্বোৎকৃষ্ট মানযিল। বরং এটি হলো সমস্ত মানযিলের প্রাণ, তাৎপর্য, সারাংশ ও উদ্দেশ্য।

এই বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে 'দরিদ্রতা' (اَلْفَقْرُ)-এর প্রকৃত অর্থ জানার দ্বারা (এবং এর দ্বারা সূফিয়ায়ে কেরাম কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা।) তারা এর মূল অর্থের বাইরে বিশেষ একটি অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

দরিদ্রতা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো : নিজের দাসত্ব প্রমাণিত করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী থাকা।

এই নামকরণের ক্ষেত্রে এই অর্থটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বরং এটিই হলো ইবাদাত ও দাসত্বের মূল। সব ধরনের আশ্রয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবল এক আল্লাহর নিকট আত্মনিবেদন করা। রব হিসেবে কেবল তাঁকেই সাব্যস্ত করা।

দরিদ্রতা সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয ﷬-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'দরিদ্রতার হাকীকত হলো : আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া। আর এর আলামত হলো : কোনো ধরনের উপকরণ না থাকা।'[৬৬৯]

তিনি আরও বলেন, 'উপকরণের ওপর আস্থা না রাখা এবং উপকরণের মধ্যেই থেমে না থাকা।'

আবূ হাফস্ ﷬-কে প্রশ্ন করা হলো, 'ফকীর বা দরিদ্র ব্যক্তি কী নিয়ে তার রবের

---

[৬৬৯] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৪৩০।

দিকে অগ্রসর হবে?' তিনি জবাব দেন, 'দরিদ্র ব্যক্তি তার মুখাপেক্ষিতা নিয়েই তার রবের প্রতি অগ্রসর হবে।'[৬৭০]

দরিদ্রতার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ অর্থ উপলব্ধি করা যায় কোনো এক আলিমের উক্তি থেকে; যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'কখন দরিদ্র ব্যক্তি দরিদ্রতার গুণে গুণান্বিত হয়?' জবাবে তিনি বললেন, 'যখন তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তখন।' আবার প্রশ্ন করা হলো, 'তা কীভাবে?' তিনি বললেন, 'যখন তার কিছু থাকবে, তখন তার কিছুই নেই আর যখন তার কিছুই থাকবে না, তখন তার সবকিছুই আছে।'

এই অর্থ হলো ফাক্র বা দরিদ্রতার সর্বোত্তম অর্থ। অর্থাৎ পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া, নিজের জন্য কোনো অংশই অবশিষ্ট না থাকা। সুতরাং যখন নিজের জন্য কোনো অংশ থেকে যায়, তখন দরিদ্রতায় ঘাটতি আসে।

এরপর আবার এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'যখন তার কিছু থাকবে, তখন তার কিছুই নেই...'। অর্থাৎ যখন সে নিজের নফসের জন্য হয়, তখন আল্লাহর জন্য হয় না, আর যখন নফসের জন্য হয় না, তখন সে পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (ফলে সবকিছুই তখন তার অনুকূলে আসে।)

সুতরাং দরিদ্রতার তাৎপর্য হলো—আপনি নিজের নফসের জন্য হবেন না; বরং আপনি পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যাবেন। এটিই প্রকৃত দরিদ্রতা। কিন্তু যখন আপনি নিজের নফসের জন্য হবেন, তখন আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতায় আপনার ত্রুটি দেখা দেয়।

ওপরে যে দরিদ্রতার কথা বলা হলো, তা ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ও বস্তুগত সম্পদের মালিক হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আল্লাহর রাসূল ও নবিগণ বাহ্যিক ধনসম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ফাক্র বা দরিদ্রতার গুণে ছিলেন সবার শীর্ষে। যেমন ইবরাহীম ﷺ মেহমানদারি করানোর ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর অনেক সম্পদ ও গবাদি পশুও ছিল। এমনিভাবে সুলাইমান ও দাঊদ ﷺ-ও অনেক সম্পদশালী ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আমাদের নবি ﷺ-ও তেমনই ছিলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

[৬৭০] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৪৩৩।

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

"তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর ধনী বানিয়ে দিয়েছেন।"[৬৭১]

আসলে তাঁরা তাঁদের দরিদ্রতার মাঝেও ধনী ছিলেন। আবার তাঁদের ধনাঢ্যতার মাঝেও তাঁরা দরিদ্র ছিলেন।

সুতরাং প্রকৃত দরিদ্রতা হলো : সবসময় সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া এবং বান্দা তার প্রকাশ্য-গোপন, ছোটো-বড়ো প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর নিকট নিজের পরিপূর্ণ অভাবগ্রস্ততা স্বীকার করবে এবং তা প্রকাশ করবে।

বান্দার জন্য দরিদ্রতা হলো একান্ত নিজস্ব ও ভেতরগত একটি গুণ। যা তার পারিপার্শ্বিকতা ও অবস্থা অনুসারে প্রকাশ পায়। তবে এর কিছু আলামত, নিদর্শন, কারণ ও উপকরণ রয়েছে। অনেকেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, 'দরিদ্রতা (اَلْفَقْرُ) –এর চারটি ভিত্তি রয়েছে—

১. এই পরিমাণ ইলম, যা বান্দাকে সঠিক পথে পরিচালনা করে,

২. এই পরিমাণ আল্লাহভীতি, যা তাকে (হারামে লিপ্ত হতে) বাধা প্রদান করে,

৩. এই পরিমাণ ইয়াকীন, যা তাকে সৎকাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে এবং

৪. এই পরিমাণ আল্লাহর যিক্‌র, যা তাকে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ করে তোলে।'

শিবলি ﵀ বলেছেন, 'দরিদ্রতার প্রকৃত অর্থ হলো : আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে না করা।'

একবার সাহ্‌ল ইবনু আবদিল্লাহ ﵀-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কখন ফকীর (দরিদ্র ব্যক্তি) শান্তি লাভ করে?' তিনি বললেন, 'যখন সে যে সময়টাতে অবস্থান করছে, তা ছাড়া নিজের বলে আর কিছুই দেখে না।'[৬৭২]

আবূ হাফস্ ﵀ বলেছেন, 'বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট পৌঁছার সর্বোত্তম পন্থা

[৬৭১] সূরা দোহা, ৯৩ : ৮।

[৬৭২] আবূ আবদির রহমান সুলামি, আল-ফুতুওয়্যাহ, ৫১।

হলো—সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে অভাবী থাকা, সব কাজে সুন্নাহর অনুসরণ করা এবং হালাল পথে খাদ্য অন্বেষণ করা।'[৬৭৩]

কেউ কেউ বলেছেন, 'দরিদ্রতার অন্যতম একটি আলামত হলো—কোনোকিছু পাওয়ার আগ্রহ না থাকা। আর যদি থাকেই, তা হলে তার আগ্রহ যেন তার প্রয়োজনকে অতিক্রম না করে।'

***

দরিদ্রতা বা মুখাপেক্ষিতার শুরু ও শেষ এবং এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। দরিদ্রতার শুরু হলো অপমান আর শেষ হলো সম্মান। এর বাহ্যিক অবস্থা হলো অভাবগ্রস্ততা আর অভ্যন্তরীণ দিক হলো (আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছু থেকে) অমুখাপেক্ষী হওয়া।

সূফিয়ায়ে কেরাম সবাই একমত যে, ধূলিমলিন অবস্থায় থেকে সবসময় আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকা, দম্ভ ও আত্মগর্বের সাথে সবসময় পরিচ্ছন্ন থাকার চেয়ে উত্তম। আর দম্ভ ও আত্মগর্বের সাথে তো পরিচ্ছন্ন থাকাই যায় না!

যখন দরিদ্রতার প্রকৃত অর্থ জানা হয়ে গেল, তখন এটিও পরিষ্কার হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করাই হলো দরিদ্রতা। সুতরাং এই প্রশ্নের কোনো অর্থ নেই যে, কোন অবস্থাটি উত্তম, আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী থাকা নাকি আল্লাহকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করা?

কারণ প্রশ্নটি সঠিক নয়। কেননা আল্লাহকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করাই হলো আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী থাকা।

সূফিয়ায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, ফাক্র বা মুখাপেক্ষিতার পথ ছাড়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার আর কোনো পথ নেই। আর আল্লাহর নিকট প্রবেশ করার জন্য মুখাপেক্ষিতার দরজা ব্যতীত অন্য কোনো দরজা নেই। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।

---

[৬৭৩] যাহাবি, তারীখুল ইসলাম, ২০/১৪৫।

৪১ নং মানযিল

পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষিতা (اَلْغِنَى الْعَالِيْ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষিতার মানযিল।

এটি দুই প্রকার :

এক. আল্লাহর সম্পদেই নিজেকে সম্পদশালী মনে করা এবং

দুই. আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

এই দুটিই হলো প্রকৃত দরিদ্রতা বা মুখাপেক্ষিতা। কিন্তু সূফিগণ অমুখাপেক্ষিতা (اَلْغِنَى)-কেও আলাদা একটি মানযিল সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

> "তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর ধনী বানিয়ে দিয়েছেন।"[৬৭৪]

এই আয়াতটির ব্যাপারে তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে—

১. আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-এর নিঃস্ব অবস্থাকে ধনসম্পদ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়ে তাঁকে ধনী বানিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ মুফাস্সিরের অভিমত এটিই। কারণ ধনী বানিয়ে দেওয়ার কথা এসেছে عَائِلًا শব্দের বিপরীতে; যার অর্থ অভাবী বা সম্পদহীন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্পদ দান করে ধনী বানিয়ে দিয়েছেন।

---

[৬৭৪] সূরা দোহা, ৯৩ : ৮।

২. আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-কে যা দান করেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট রেখেছেন এবং আল্লাহকে ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে তাঁকে অমুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। এটি হলো আত্মিক প্রাচুর্য, বাহ্যিক ধনসম্পদের প্রাচুর্য নয়। আর এটিই প্রকৃত ধনাঢ্যতা ও অমুখাপেক্ষিতা।

৩. এই অভিমতটিই সঠিক। আর তা হলো : এটি ওপরে বর্ণিত দুই প্রকারকেই শামিল করে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-কে আত্মিকভাবেও ধনী বানিয়েছেন এবং বস্তুগত ধনসম্পদ দান করেও ধনী বানিয়েছেন।

অন্তরের প্রাচুর্য দ্বারা সার্বিক অমুখাপেক্ষিতা পূর্ণতা পায়

অন্তরের প্রাচুর্য হলো : অন্তর কেবল আল্লাহ তাআলার সাথেই সম্পর্কিত থাকবে, কোনো প্রকারের উপায়-উপকরণের সাথে নয়। তবে উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা দোষের কিছু নয়। অমনোযোগী ও গাফিলদের নিকট উপকরণের আধিক্যই হলো প্রাচুর্যতা। এ কারণেই তাদের অন্তর বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের সাথেই সম্পৃক্ত থাকে। কিন্তু জ্ঞানীরা আসবাব-উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহর সাথেই কেবল অন্তরকে সম্পৃক্ত রাখেন।

অন্তরের ধনাঢ্যতা আসে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করার মাধ্যমে এবং লোক দেখানো কথা ও কাজ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে।

*****

৪২ নং মানযিল

জ্ঞান (اَلْعِلْمُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—জ্ঞান বা ইলমের মানযিল।

ইলমের সম্পর্ক কুরআন ও সুন্নাহর সাথে

আল্লাহর-পথের-পথিক তার পথচলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি এই মানযিলের সাথে যুক্ত না থাকে, তা হলে নিশ্চিতভাবে তার পথচলা হবে ভ্রান্তপথে, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। সফলতা ও হিদায়াতের পথ সে হারিয়ে ফেলবে এবং এর সমস্ত দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। মাশায়েখগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। আসলে আল্লাহর পথে ইলম অর্জন করা থেকে চোর-ডাকাত আর শয়তানের প্রতিনিধিরা ছাড়া আর কেউ বাধা দেয় না।

সূফিয়ায়ে কেরামের সর্দার ও শাইখ জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বাগদাদি ﷀ বলেছেন, 'মানুষের জন্য সমস্ত পথ বন্ধ। কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারীদের জন্য তা খোলা রয়েছে।'[৬৭৫]

তিনি আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করেনি এবং হাদীস লিখে রাখেনি, সে অনুসরণযোগ্য নয়। কারণ আমাদের ইলম কেবল কুরআন ও সুন্নাহর সাথেই সম্পৃক্ত।'[৬৭৬]

তিনি আরও বলেছেন, 'আমাদের এই পথ কুরআন-সুন্নাহর উসূল বা বিধিবিধানের সাথে শর্তযুক্ত।'

---

[৬৭৫] খতীব বাগদাদি, আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/৩৮৯।

[৬৭৬] শাতিবি, আল-ই'তিসাম, ১/১৬৪।

আবূ হাফস্ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা নিজের কাজকর্ম ও অবস্থাকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাচাই করে না এবং নিজের অন্তরকে পরীক্ষা করে না, তাকে সাধকদের কাতারে গণ্য করা যায় না।'[৬৭৭]

আবূ সুলাইমান দারানি ﷺ বলেছেন, 'কখনো কখনো আমার অন্তরে অনেক ভালো ভালো কথার উদয় হয়, তবে আমি তা থেকে কেবল তখনই কোনোকিছু গ্রহণ করি, যখন সেই ব্যাপারে দুই ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে—কুরআন ও সুন্নাহ।'[৬৭৮]

আবূ ইয়াযীদ ﷺ বলেছেন, 'আমি তিরিশ বছর সাধনা করেছি। কিন্তু ইলম ও ইলমসংক্রান্ত বিষয়াদির চেয়ে কঠিন কিছু পাইনি। যদি আলিমদের মতবিরোধ না থাকত, তা হলে আমি সেখানেই পড়ে থাকতাম। উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ হলো রহমতস্বরূপ; তবে তাওহীদের ক্ষেত্র ব্যতীত।'[৬৭৯]

একদিন আবূ ইয়াযীদ ﷺ একজন যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে বের হলেন। গিয়ে দেখলেন তিনি মাসজিদে প্রবেশ করার সময় কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করছেন। আবূ ইয়াযীদ ﷺ তখন (তার সাথে সাক্ষাৎ না করে) তাকে সালাম না দিয়েই ফিরে আসেন এবং বলেন, 'এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদবসমূহের মধ্য থেকে একটি আদবের ব্যাপারেই বিশ্বস্ত নন; সুতরাং তিনি যে বিষয়ের দাবি করছেন, সে ক্ষেত্রে কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবেন?'[৬৮০]

তিনি আরও বলেছেন, 'একবার আমি ইচ্ছা করলাম আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করব যে, তিনি যেন আমাকে নারীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখেন। তারপর ভাবলাম, কীভাবে এমন প্রার্থনা করা আমার জন্য বৈধ হবে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যার প্রার্থনা কখনো করেননি? এরপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাকে নারীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এমনকি এখন আমি কোনো পরোয়াই করি না যে, কোনো নারী আমাকে অভ্যর্থনা জানাল নাকি কোনো দেওয়াল!'[৬৮১]

---

[৬৭৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৩০।

[৬৭৮] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/১৪৫।

[৬৭৯] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-ইসতিকামাহ, ১/৯৫।

[৬৮০] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/৯৫।

[৬৮১] শাতিবি, আল-ই'তিসাম, ১/১৬০।

তিনি আরও বলেছেন, 'যদি তোমরা দেখো কোনো ব্যক্তিকে এমন কারামাত (অলৌকিক বিষয়) দান করা হয়েছে যে, তিনি শূন্যে উড়ছেন; তবুও তোমরা তার ধোঁকায় পড়ো না। যতক্ষণ-না তোমরা তার দ্বীনদারি, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও শারীআত পালনে তার অবস্থান যাচাই করে নাও।'[৬৮২]

আবূ হামযা বাগদাদি ﷺ ছিলেন অনেক বড়ো শাইখ। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ মাসআলা জিজ্ঞেস করার সময় তাঁকে (সম্বোধন করে) বলতেন, 'ইয়া সূফি!' আবূ হামযা ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সত্য পথ সম্পর্কে অবগত হয়, তার জন্য পথচলা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলার নিকট এ পথের কেবল একটিই নিদর্শন—প্রতিটি কথা, কাজ ও পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করা।'[৬৮৩]

***

কেউ কেউ বিভ্রান্তিকর এমন কিছু কথা বলেছেন, যা ইলম অর্জন করা থেকে বিরত থাকতে এবং ইলমকে উপেক্ষা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। যেমন : কেউ বলেছেন, 'আমরা ইলম অর্জন করি, এমন চিরঞ্জীব সত্তা থেকে যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আর তোমরা এমন ব্যক্তিদের থেকে ইলম অর্জন করে থাকো, যারা মরণশীল।'

তাদের কাউকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি আবদুর রাযযাক[৬৮৪] থেকে হাদীস শোনার জন্য সফর করেন না কেন?' তিনি জবাব দেন, 'সেই ব্যক্তি আবদুর রাযযাক থেকে হাদীস শুনে কী করবে, যে সরাসরি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে তা শুনে থাকে?!' (এগুলো হলো চরম মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা।)

আরেকজন (ভণ্ড সূফি) বলেছেন, 'জ্ঞান (اَلْعِلْمُ) হলো অন্তর এবং আল্লাহর মাঝে একটি পর্দা।'

---

[৬৮২] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১০/৯০।

[৬৮৩] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্‌ক, ৫১/২৫৫।

[৬৮৪] আবদুর রাযযাক ﷺ সে সময় হাদীসের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তার জীবনকাল ছিল : ১২৬-২১১ হিজরি পর্যন্ত। তিনি ইয়ামেনের সানআ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তার সংকলিত হাদীসগ্রন্থ 'মুসান্নাফু আবদির রাযযাক' সবারই পরিচিত।

আরেকজন বলেছেন, 'তুমি যখন কোনো সূফিকে حَدَّثَنَا ও أَخْبَرَنَا[৬৮৫] নিয়ে ব্যস্ত দেখবে, তখন তার থেকে হাত ধুয়ে নেবে।'

আরেকজন (ভণ্ড) সূফি বলেছেন, 'আমাদের রয়েছে অক্ষরের জ্ঞান আর তোমাদের রয়েছে কাগজের জ্ঞান।'

এগুলো হলো বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা। যারা এগুলো বলেছেন, তাদের মধ্যে যার অবস্থা সবচেয়ে ভালো, সে-ই হলো মূর্খ; অথবা সে অগভীর চিন্তার অধিকারী। অন্যথায় আবদুর রাযযাক ﵀ ও তার মতো অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ এবং 'আখবারানা' ও 'হাদ্দাসানা'[৬৮৬] অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার ধারা যদি চলমান না থাকত, তা হলে তাদের পর্যন্ত এবং পরবর্তীদের নিকট পর্যন্ত ইসলামের কিছুই পৌঁছুত না!

যে ব্যক্তি আপনাকে 'আখবারানা' ও 'হাদ্দাসানা' অর্থাৎ হাদীস থেকে ফিরিয়ে দেয়, মনে রাখবেন সে হয়তো আপনাকে ভ্রান্ত-সূফিবাদের দিকে অথবা দার্শনিক যুক্তির দিকে কিংবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতের দিকে ঠেলে দেয়। কারণ কুরআন-সুন্নাহর ছাড়া তাদের কাছে রয়েছে শুধু ধর্ম-গবেষকদের সন্দেহ-সংশয়, বিভ্রান্তদের মতামত, বেশধারী সূফিদের কল্পনা-জল্পনা আর দার্শনিকদের খোঁড়া যুক্তি-বিবেচনা।

যে ব্যক্তি দলীল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সে সঠিক পথ থেকে বিপথে যায়। আল্লাহর নিকট পৌঁছার এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত আর কোনো দলীল নেই। যে সমস্ত পথ কুরআন-সুন্নাহর বহির্ভূত, সেগুলো হলো জাহান্নাম ও অভিশপ্ত শয়তানের পথ।

জ্ঞান বা ইলম হলো যার ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ রয়েছে। জ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী জ্ঞান হলো—রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা। ইলম হচ্ছে হাল বা বিশেষ অবস্থা থেকেও উত্তম। ইলম হুকুম দানকারী আর হাল হুকুম গ্রহণকারী। ইলম পথপ্রদর্শক আর হাল অনুসারী। ইলম আদেশকারী ও নিষেধকারী আর হাল আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নকারী। হালের সাথে ইলম যুক্ত না থাকলে, তা খেলোয়াড়ের হাতে কোষমুক্ত তরবারিতে পরিণত হয়।

---

[৬৮৫] অর্থাৎ হাদীস বর্ণনা করতে ব্যস্ত দেখি।

[৬৮৬] أَخْبَرَنَا অর্থ : তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন। আর حَدَّثَنَا অর্থ : তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

হালের উপকার তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অতিক্রম করে না। আর ইলমের উপকারিতা হলো বৃষ্টির মতো; পাহাড়ে, মরুভূমিতে, টিলা উপত্যকায় এবং গাছগাছালি উৎপন্ন হওয়ার স্থানসহ সব জায়গায় পৌঁছে যায়।

ইলমের পরিধি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগৎকেই বেষ্টন করে নেয়। অপরদিকে হাল বা বিশেষ অবস্থার পরিধি কেবল নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই বেষ্টন করে রাখে। আর কখনো কখনো সে ক্ষেত্রেও সংকীর্ণ হয়ে যায়।

***

ইলম হলো পথপ্রদর্শক আর বিশুদ্ধ হাল হলো ইলমের মাধ্যমে পথপ্রাপ্ত। ইলম হলো আম্বিয়ায়ে কেরাম ﷺ-এর উত্তরাধিকার, তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পদ। ইলমের মাধ্যমেই আল্লাহকে চেনা যায়, আল্লাহর ইবাদাত করা যায়, তাঁর যিক্‌র করা যায়, তাঁকে এক বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং তাঁর প্রশংসা-স্তুতি করা যায়, ইলমের মাধ্যমেই ব্যক্তি আল্লাহর পথ প্রাপ্ত হয়, যারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তারা ইলমের পথ ধরেই পৌঁছেছে আর যারা আল্লাহর নিকট প্রবেশ করেছে, তারা ইলমের দরজা দিয়েই প্রবেশ করেছে।

ইলমের দ্বারাই শারীআত ও আল্লাহর হুকুম-আহকামের পরিচয় জানা যায়, হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করা যায়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার পছন্দ-অপছন্দ জানা যায়; ফলে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা সহজ হয়।

ইলম হলো ইমাম আর আমল তার মুক্তাদি। ইলম হলো নেতা আর আমল তার অনুসারী। ইলম নিঃসঙ্গতায় সঙ্গ দেয়, একাকিত্বের সময় আলাপ করে আর বিষণ্ণতার সময় বন্ধু হয়। ইলম সমস্ত দ্বিধা ও সংশয় দূর করে দেয়। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, সে এমন ধনাঢ্যতার অধিকারী হয়, যেখানে থাকে না কোনো দরিদ্রতার ভয়। ইলম এমন এক আশ্রয়স্থল, যেখানে আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তি থাকে নিরাপদ ও ভয়হীন।

ইলম নিয়ে আলোচনা করা তাসবীহ, গবেষণা করা জিহাদ, ইলম অন্বেষণ করা নৈকট্যলাভ, ইলম খরচ করা সদাকা আর ইলমের দারস দেওয়া সালাত আদায়

করা এবং সিয়াম পালন করার ন্যায় মর্যাদা রাখে। ইলমের প্রয়োজনীয়তা খাবার-পানীয়ের প্রয়োজনীয়তার চেয়েও অনেক বেশি।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ বলেছেন, 'খাবার ও পানীয়ের চেয়ে মানুষ ইলমের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। কারণ মানুষ দিনে একবার বা দুইবার খাবার-পানীয়ের প্রয়োজন অনুভব করে আর ইলমের প্রয়োজন অনুভব করে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো অসংখ্যবার।'

ইলম তিন প্রকার :

এক. প্রকাশ্য ইলম (اَلْعِلْمُ الْجَلِيُّ) ,

দুই. গোপন ইলম (اَلْعِلْمُ الْخَفِيُّ) এবং

তিন. আধ্যাত্মিক ইলম (اَلْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ)

এক. প্রকাশ্য ইলম : এমন সুস্পষ্ট ইলম, যাতে কোনো প্রকারের অস্পষ্টতা থাকে না। এটি আবার তিন প্রকার :

১. যে ইলম সরাসরি প্রত্যক্ষ করে অর্জন করা হয়। এটি চোখের মাধ্যমে অর্জিত ইলম।

২. যে ইলম শ্রবণের দ্বারা অর্জন করা হয়। এটিকে ইলমুল ইসতিফাযা বলা হয়।

৩. যে ইলম বুদ্ধি বা আকলের সাহায্যে অর্জন করা হয়। এটিকে ইলমুত তাজরিবা বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বলা হয়।

কান, চোখ ও বুদ্ধি—এই তিনটি হলো ইলম অর্জনের প্রশস্ত পথ ও দরজা। তবে তা এতেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সবগুলোর মাধ্যমেই ইলম হাসিল করতে পারে।

আবার মানুষ অভ্যন্তরীণভাবেও জ্ঞান অর্জন করে থাকে। যেমন : আনন্দ, খুশি, দুঃখ, বেদনা ইত্যাদি।

এমনিভাবে সত্য সংবাদদাতার দেওয়া খবরের মাধ্যমেও জ্ঞান হাসিল হয়। যদিও সংবাদ প্রদানকারী মাত্র একজন হোক না কেন?

এমনিভাবে অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জ্ঞান হাসিল করা যায়।

দুই. গোপন ইলম : সূফিয়ায়ে কেরামের নিকট এই প্রকারের ইলমকে মা'রিফাত বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়—বান্দার মাঝে ও তার রবের মাঝে যে সমস্ত মাকাম ও অবস্থা সংরক্ষণ করা হয় ও লিখে রাখা হয় সেগুলো।

একজন সালাফ বলেছেন, 'অন্তর যখন গুনাহ পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হয়, তখন অন্তরে ঊর্ধ্বজগতের বিষয়াদি প্রকাশিত হয়। অতঃপর তা ব্যক্তির মাঝে বিভিন্ন প্রকারের উপকার ও উপহার নিয়ে আসে।'

তিন. আধ্যাত্মিক ইলম : এটি হলো দাসত্ব ও আনুগত্যের ফল। আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতার পুরস্কার। কুরআন ও সুন্নাহর ইলম অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করার প্রতিদান। আধ্যাত্মিক ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও সুন্নাহর উপলব্ধিজ্ঞান; যা আল্লাহ তাআলা আমলকারী ব্যক্তিকে দান করে থাকেন। যেমন, *'সহীহ বুখারি'*-তে এসেছে, একব্যক্তি আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাদের বিশেষ কিছু দান করেছেন, যা অন্য কাউকে দেননি?' উত্তরে আলি ﷺ বলেন,

لَا وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمًا يُؤْتِيْهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا فِيْ كِتَابِهِ

'না, সেই সত্তার শপথ, যিনি শস্যদানা বিদীর্ণ করেছেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেছেন! কেবল সেই বোধশক্তি ও উপলব্ধিজ্ঞান, যা আল্লাহ তাআলা কাউকে তার কিতাব বোঝার জন্য দান করেন।'[৬৮৭]

আসলে এটি হলো আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

আর যারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ দুটির সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না, তাদের নিকটও ইলম আসে; তবে তা নিজের নফস ও বিতাড়িত শয়তানের পক্ষ থেকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া আধ্যাত্মিক ইলমের আলামত হলো : তা রাসূল ﷺ-এর আনীত ইলমের সাথে একাত্মতা পোষণ করে। সুতরাং আধ্যাত্মিক ইলম দুই প্রকার : একটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ

[৬৮৭] বুখারি, ৩০৪৭।

থেকে, আরেকটি শয়তানের পক্ষ থেকে। আর তা যাচাইয়ের মানদণ্ড হলো ওহি; কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পরে ওহি আসার আর কোনো পথ নেই। (সুতরাং এখন কুরআন-সুন্নাহই হলো তা যাচাইয়ের একমাত্র মানদণ্ড।)

মূসা ও খাদির ﷺ-এর ঘটনাকে দলীল বানিয়ে যারা বলে, আল্লাহ-প্রদত্ত আধ্যাত্মিক ইলম বা ইলমে লাদুন্নি দ্বারা ওহির ইলম থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা বৈধ; তারা আসলে দ্বীনকে অস্বীকারকারী, আর এটি কুফর, যা তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং তাদের রক্ত হালাল সাব্যস্ত করে।

সুতরাং যে ব্যক্তি দাবি করে যে, তার অবস্থান মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে, যেরকম অবস্থান ছিল মূসা ﷺ-এর সাথে খাদির ﷺ-এর, অথবা সে কোনো ইমামের জন্য এই বিষয়টি সাব্যস্ত করে—তার জন্য জরুরি হলো : সে যেন ঈমান নবায়ন করে এবং পুনরায় সত্য কালিমার সাক্ষ্য দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে। কারণ সে পুরোপুরিভাবে দ্বীন থেকে বাহির হয়ে গেছে; এই কারণে আল্লাহর আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তো দূরের কথা; বরং সে অভিশপ্ত শয়তানের আউলিয়া ও প্রতিনিধিতে পরিণত হয়েছে।

এই বিষয়টিই নাস্তিক-মুরতাদ এবং পরিপূর্ণ ঈমানদারদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়।

*****

৪৩ নং মানযিল

প্রজ্ঞা (اَلْحِكْمَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—প্রজ্ঞা বা হিকমতের মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

"তিনি যাকে চান, প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে আসলে বিপুল কল্যাণ দান করা হয়েছে। উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।"[৬৮৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

"আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বেশি।"[৬৮৯]

কুরআনে বর্ণিত اَلْحِكْمَةُ বা প্রজ্ঞার আলোচনা দুইভাবে এসেছে : এককভাবে এবং কিতাবের সাথে মিলিয়ে।

---

[৬৮৮] সূরা বাকারা, ২ : ২৬৯।

[৬৮৯] সূরা নিসা, ৪ : ১১৩।

যেখানে হিকমত বা প্রজ্ঞা এককভাবে এসেছে, তার ব্যাখ্যা করা হয় 'নুবুওয়াত' দ্বারা আবার কখনো কুরআনের ইলম দ্বারা। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'হিকমত হলো কুরআনের জ্ঞান। অর্থাৎ কুরআনের নাসিখ-মানসূখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ, মুকাদ্দাম-মুআখখার, হালাল-হারামসহ এ রকম আরও অন্যান্য বিষয়াদির জ্ঞান।'

দাহ্হাক ﷺ বলেছেন, 'হিকমত হলো কুরআন ও কুরআনের বুঝ।' মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, 'এটি হলো কুরআন, ইলম ও ফিক্হ।' আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 'এটি হলো কথা ও কাজে বিশুদ্ধতা।'

হাসান বাস্রি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে ভয় করা।' তিনি যেন হিকমতের ব্যাখ্যা করলেন হিকমতের ফলাফল ও দাবির মাধ্যমে।

আর যেখানে হিকমত কিতাবের সাথে একত্রে এসেছে, তার দ্বার উদ্দেশ্য হলো সুন্নাহ। ইমাম শাফিয়ি ﷺ-সহ অন্যান্য ইমামগণ এই ব্যাখ্যার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, 'ওহি মোতাবিক ফায়সালা করা।' তবে সুন্নাহ দ্বারা যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেটিই ব্যাপক ও অধিক প্রসিদ্ধ।

প্রজ্ঞা বা হিকমতের ব্যাখ্যায় সেসব কথা বলে হয়েছে তার মধ্যে ইমাম মালিক ও মুজাহিদ ﷺ-এর ব্যাখ্যাই সবচেয়ে উত্তম; তা হলো—'সত্য জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। আর কথা ও কাজে বিশুদ্ধতা অবলম্বন করা।'

আর এই অবস্থা কেবল কুরআন, ফিক্হ ও ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলি বোঝার দ্বারাই অর্জিত হয়।

***

হিকমত আবার দুই প্রকার : ইলমি ও আমলি।

ইলমি হিকমত হলো : বস্তুসমূহের ভেতরগত বিষয়ে অবগত হওয়া এবং শারঈ ও সৃষ্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে কারণ ও পরিণতির পরস্পরের সম্পর্ক কী, তা জানা।

আমলি হিকমত হলো : প্রতিটি বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখা।

১. প্রতিটি বস্তুরই কিছু স্তর ও হক রয়েছে; যেগুলো তাকদীর ও শারীআতের দাবি। ২. এমনিভাবে প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, তার আসা-যাওয়া সে পর্যন্তই; এর বাইরে সে যেতে পারে না। ৩. এমনিভাবে প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে; ঠিক সে সময়েই তা ঘটবে, সামান্য আগেও না, পরেও না। সুতরাং হিকমত হলো বস্তুর এই তিনটি দিকেই পরিপূর্ণ খেয়াল রাখা। আল্লাহ তাআলা শারঈ ও তাকদীরিভাবে যার যা হক ও অধিকার নির্ধারণ করেছেন, তাকে সে অধিকারই প্রদান করা; এতে সীমালঙ্ঘন না করা। কারণ সীমালঙ্ঘন করা হিকমতের খেলাফ। কোনোকিছুকে তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কামনা না করা; কারণ তা হিকমতের বিপরীত আবার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্বও না করা। কারণ বিলম্ব করলে তা হাতছাড়া হয়ে যায়।

এটি হলো শারঈ ও তাকদীরি দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে সাধারণ হুকুম। সুতরাং তা বিনষ্ট করলে, হিকমতও নষ্ট হয়ে যায়। যেমন বীজ ও জমি চাষের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে, ফসল উৎপাদনেও সমস্যা দেখা দেয়।

তবে অধিকারের চেয়ে বেশি প্রদান করা হলো, জমিনের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানি সেঁচ দেওয়ার মতো। ফলে অতিরিক্ত পানি বীজ ও ফসল ডুবিয়ে দেয় এবং তা নষ্ট করে ফেলে। আর সময়ের পূর্বেই কিছু পেতে চাওয়া হলো, ফসল পরিপূর্ণভাবে পাকার আগেই তা কেটে ফেলার ন্যায়।

সুতরাং হিকমত হলো যতটুকু প্রয়োজন, যেভাবে প্রয়োজন এবং যে সময়ে প্রয়োজন ঠিক সেভাবেই তা সম্পন্ন করা।

প্রজ্ঞা বা হিকমতের ভিত্তি হলো তিনটি :

১. ইলম,

২. সহিষ্ণুতা ও

৩. ধীর-স্থিরতা।

আর এর বিপদ ও বিপরীত বিষয় হলো :

১. অজ্ঞতা,

২. অস্থিরতা ও

৩. তাড়াহুড়ো করা।

সুতরাং অজ্ঞ, অস্থির ও তাড়াহুড়োকারী ব্যক্তির কোনো প্রজ্ঞা বা হিকমত নেই। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

***

আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞানুসারেই ওয়াদা ও শাস্তির বিষয়টি নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কারও ওপর এক অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, তা হলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে দান করেন মহাপুরস্কার।"[৬৯০]

শাস্তিদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ইনসাফের রীতি গ্রহণ করেন। আর ওয়াদা পূরণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন দয়া ও অনুগ্রহের রীতি। সমস্ত বিষয় তাঁর পরম প্রজ্ঞা বা হিকমত অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

এমনিভাবে আল্লাহর ইনসাফের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত শারীআর হুকুম-আহকাম এবং সৃষ্টিকুলের ওপর তাঁর চলমান নিয়মনীতির মধ্যে। এগুলোর মধ্যে কোনো জুলুম, অবিচার কিংবা অত্যাচার নেই। যদিও তিনি অত্যাচারীর হাতে ক্ষমতা দান করে থাকেন। তিনি হলেন সমস্ত ইনসাফকারীর চেয়ে বেশি ইনসাফকারী। আসলে তিনি যাকে ক্ষমতা দেন, যে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে, সে হলো জালিম। (তবে অত্যাচারী শাসক নিযুক্তির পেছনেও থাকে তাঁর অপার প্রজ্ঞা।)

[৬৯০] সূরা নিসা, ৪ : ৪০।

এমনিভাবে কাউকে না দেওয়াও আল্লাহ তাআলার হিকমতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি তো এমন প্রাচুর্যভান্ডারের মালিক, অগণন দান করলেও যা থেকে চুল পরিমাণও কমে না। সুতরাং যাকে তিনি তাঁর অনুগ্রহ দান করেন না, তাকে তাঁর পরিপূর্ণ হিকমতের কারণেই দান করেন না। তিনি হলেন اَلْجَوَّادُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ পরম দাতা ও প্রজ্ঞাময়। আর তাঁর প্রজ্ঞা তাঁর দানশীলতার সাথে সাংঘর্ষিক ও বিপরীত নয়।

সুতরাং দান করা, দান করা থেকে বিরত থাকা, হিদায়াত দেওয়া, পথভ্রষ্ট করা সবকিছুর পেছনেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার পরম প্রজ্ঞা ও হিকমত।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যখন দুনিয়ার বিভিন্ন অবস্থা ও এর অপূর্ণতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, তখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে এটিই হলো হিকমাহ। দুনিয়া-আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম সবই আল্লাহর প্রজ্ঞা বা হিকমতের সাথেই আবর্তিত।

*****

৪৪ নং মানযিল

অন্তর্দৃষ্টি বা বিচক্ষণতা (اَلْفِرَاسَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—অন্তর্দৃষ্টি বা ফিরাসাতের মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

"নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।"[৬৯১]

এই আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, 'এটি হলো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।' আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য।' কাতাদা ﷺ বলেছেন, 'শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য।' মুকাতিল ﷺ বলেছেন, 'চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য।'

এই অভিমতগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ পর্যবেক্ষণকারীরা যখন অস্বীকারকারীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ি ও তাদের পরিণাম পর্যবেক্ষণ করবে, তখন তাদের মাঝে অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি ও শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন,

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

"আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতাম, তখন আপনি

---

[৬৯১] সূরা হিজর, ১৫ : ৭৫।

তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন। তবে তাদের বাচনভঙ্গি থেকে আপনি তাদেরকে অবশ্যই চিনে ফেলবেন। আল্লাহ্ তোমাদের সব আমল ভালো করেই জানেন।"[৬৯২]

এখানে প্রথমটি হলো দেখা ও চোখের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা আর দ্বিতীয়টি কান ও শোনার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা।

আল্লাহ্ তাআলা মুনাফিকদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, তাদের বাচনভঙ্গি দ্বারাই তাদের চেনা যাবে। কারণ কোনো ব্যক্তির চেহারা ও অন্যান্য আলামত দেখে তাকে যতটা চেনা যায়, তার কথা শুনে তাকে এর চেয়েও বেশি চেনা যায়, তার মনের অবস্থা সম্পর্কে আরও বেশি জানা যায়। কেননা বক্তার উদ্দেশ্য ও তার মনের ইচ্ছা অন্যান্য আলামতের তুলনায় তার কথার দ্বারা বেশি প্রকাশিত হয়। অন্তর্দৃষ্টি বা ফিরাসাতের সম্পর্ক দুটি বস্তুর সাথে : দেখা ও শোনা। আবূ সাঈদ খুদ্রি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি ﷺ বলেছেন,

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

"তোমরা মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকো। কারণ সে আল্লাহর নূরের সাহায্যে দেখে।"

এরপর নবি ﷺ তিলাওয়াত করলেন,

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٥﴾

"নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।"(সূরা হিজর, ১৫ : ৭৫)[৬৯৩]

***

[৬৯২] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩০।

[৬৯৩] তিরমিযি, ৩১২৭।

অন্তর্দৃষ্টি (اَلْفِرَاسَةُ) তিন প্রকার :

১. ঈমানি অন্তর্দৃষ্টি (اَلْفِرَاسَةُ الْإِيْمَانِيَّةُ)।

২. সাধনা, ক্ষুধা, রাত্রিজাগরণ ও নির্জনতা যাপনের মাধ্যমে অর্জিত অন্তর্দৃষ্টি (فِرَاسَةُ الرِّيَاضَةِ وَالْجُوْعِ وَالسَّهَرِ وَالتَّخَلِّيَةِ)

৩. সৃষ্টিগত অন্তর্দৃষ্টি (اَلْفِرَاسَةُ الْخَلْقِيَّةُ)।

১. ঈমানি অন্তর্দৃষ্টি : এই মানযিলে এ প্রকারের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

ঈমানি অন্তর্দৃষ্টি এমন নূর, যা আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে দান করেন। এর সাহায্যে বান্দা হক-নাহক ও সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে পারে।

এর তাৎপর্য হলো : এটি অন্তরে এমন চিন্তাভাবনার উদয় করে, যা ঈমানের বিপরীত বিষয়াদিকে আক্রমণ করে দূর করে দেয়। (ঈমানের বিপরীত বিষয়গুলো দূর করতে) তা অন্তরে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেমন সিংহ তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই প্রকারের অন্তর্দৃষ্টি ঈমানি শক্তি অনুসারে হয়ে থাকে। যার ঈমানি শক্তি যত বেশি, তার দূরদর্শিতাও তত তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী।

আবূ সাঈদ খাররায ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টির আলোয় দেখে, সে আসলে আল্লাহর দেওয়া নূর দিয়েই দেখে। কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি ও গাফলত ছাড়াই তার জ্ঞানের উৎস হয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। বরং তখন আল্লাহ তাআলার ফায়সালা তাঁর বান্দার জবান দিয়ে প্রকাশ পায়।'[৬৯৪]

ওয়াসিতি ﷺ বলেছেন, 'ফিরাসাত হলো আলোর কিছু টুকরো, যা অন্তরকে আলোকিত করে তোলে, অদৃশ্য জগতের গোপন রহস্যাবলি অন্তরে উদ্ভাসিত করে। এমনকি বান্দা সবকিছু চাক্ষুষ দেখতে পায়; যেন আল্লাহ তাআলাই তাকে দেখাচ্ছেন। ফলে সে সৃষ্টিজগতের রহস্য সম্পর্কে কথা বলতে থাকে।'[৬৯৫]

---

[৬৯৪] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৩৮৬।

[৬৯৫] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৩৮৬।

দারানি ﷺ বলেছেন, 'অন্তর্দৃষ্টি বা ফিরাসাত হলো অন্তর উদ্ভাসিত হওয়া এবং গোপন বিষয়াবলি দেখতে পাওয়া। এটি হলো ঈমানের স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তর।'[৬৯৬]

আবূ বকর ﷺ ছিলেন এই উম্মাতের সবচেয়ে বড়ো বিচক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তারপরে উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ। উমর ﷺ-এর অন্তর্দৃষ্টির কথা তো খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি কোনোকিছু সম্পর্কে বলতেন, 'এ ব্যাপারে আমি এই ধারণা করি।' পরে দেখা যেত তিনি যেরকম বলেছেন, ঠিক সেরকমই ঘটেছে। তার ফিরাসাতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, অনেক জায়গায় আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের সাথে তার সিদ্ধান্ত মিলে গিয়েছে।

একবার উমর ﷺ-এর পাশ দিয়ে সাওয়াদ ইবনু কারিব যাচ্ছিলেন। তখন উমর ﷺ তাকে চিনতেন না। উমর ﷺ বললেন, 'আমার ধারণা ভুলও হতে পারে, তবে আমার মনে হয়, এই লোকটি গণক ছিল অথবা জাহিলি যুগে গণকবিদ্যায় পারদর্শী ছিল।' সাওয়াদ ইবনু কারিব যখন তার সামনে বসলেন, তখন তিনি তাকে সে কথাগুলো জানালেন। প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে যেভাবে সম্বোধন করলেন এর আগে আপনার সাথিসঙ্গীদের কেউই আমাকে এভাবে সম্বোধন করেনি।' উমর ﷺ বলেন, 'আমরা তো জাহিলি যুগে এর চেয়েও বেশি ছিলাম। বরং আপনাকে যা জিজ্ঞেস করলাম, সে সম্পর্কে বলুন।' তিনি বলেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আপনি সত্য বলেছেন। জাহিলি যুগে আমি গণক ছিলাম।' এরপর তিনি তার পুরা কাহিনি বর্ণনা করতে শুরু করেন।[৬৯৭]

২. সাধনা, ক্ষুধা, রাত্রিজাগরণ ও নির্জনতা যাপনের মাধ্যমে অর্জিত অন্তর্দৃষ্টি : মানুষের অন্তর যখন সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়, তখন তাতে সে অনুপাতে অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতা আসে। এটি মুমিন-কাফির সবার জন্যই উন্মুক্ত। এটি ঈমানের ও আল্লাহর নৈকট্যশীল হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে না। অনেক জাহিল ও অজ্ঞ ব্যক্তি এর মাধ্যমে ধোঁকায় পড়ে যায়।

---

[৬৯৬] ইবনু আবিল ইযয, শারহুল আকীদাতিত তহাবিয়্যা, ৪৯৯।

[৬৯৭] বিস্তারিত দেখুন, বুখারি, ৩৮৬৬।

৩. সৃষ্টিগত অন্তর্দৃষ্টি : এ বিষয়ে অনেক চিকিৎসকসহ আরও অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যাবলির মাধ্যমে চারিত্রিক গুণাবলির ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন; এ দুটির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে। যে সম্পর্কগুলো আসলে আল্লাহ তাআলার হিকমতেরই দাবি।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি তিনটি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত : চোখ, কান ও অন্তর। চোখের কাজ হলো নিদর্শন, চিহ্ন ও আলামতসমূহ পর্যবেক্ষণ করা। কানের কাজ হলো কথাবার্তা শ্রবণ করা, এর সুস্পষ্ট, অস্পষ্ট, ইশারা-ইঙ্গিত, ভাবভঙ্গি, সারমর্ম, কথা বলার স্বর ও সুর ইত্যাদি আয়ত্ত করতে তৎপর থাকা। আর অন্তরের কাজ হলো দেখা ও শোনা বিষয়গুলোতে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে, দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা এবং এর গোপন রহস্যাবলি উদঘাটনে চেষ্টা করা। বাহ্যিক দিক দেখে এর ভেতরে প্রবেশ করা। যেমন সাইরাফি বা স্বর্ণ পরীক্ষক বাইরের নকশা ও ধাতব মুদ্রা দেখেই এর ভেতরে কী পরিমাণ ভেজাল বা খাদ রয়েছে, তা বলে দিতে পারে। এমনিভাবে বিচক্ষণ বা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও অবস্থা দেখে রূহ ও অন্তরের ভেতরগত গোপন অবস্থা বলে দিতে পারে। সুতরাং রূহ ও অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি স্বর্ণ পরীক্ষকের মতো; যে বাইরের নকশা ও চেহারা দেখেই বলে দিতে পারে যে, কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু ভেজাল।

অন্তর্দৃষ্টি বা ফিরাসাত অর্জনের দুইটি কারণ রয়েছে :

প্রথম কারণ : অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির মস্তিষ্কের উৎকৃষ্টতা, অন্তরের তীক্ষ্ণতা এবং মেধার প্রখরতা।

দ্বিতীয় কারণ : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলীল-প্রমাণ ও আলামতসমূহ ভালোভাবে প্রকাশিত হওয়া।

সুতরাং কারও মধ্যে যখন দুটি কারণই একত্রিত হয়, তখন তার অন্তর্দৃষ্টি ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে খুব কম। আর দুটি কারণই যখন কারও নিকট অনুপস্থিত থাকে, তখন তার অন্তর্দৃষ্টি সঠিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। যদি কারও একটি কারণ শক্তিশালী থাকে এবং আরেকটি থাকে দুর্বল, তা হলে সেই ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি হবে মাঝামাঝি পর্যায়ের।

ইয়াস ইবনু মুআবিয়া ﵀ তার যুগের অনেক বড়ো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এ ব্যাপারে তার প্রসিদ্ধ অনেক ঘটনা রয়েছে। এমনিভাবে ইমাম শাফিয়ি ﵀-ও সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বলা হয় এ বিষয়ে তার অনেক রচনা রয়েছে।

*****

৪৫ নং মানযিল

প্রশান্তি (اَلسَّكِيْنَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—প্রশান্তি বা সাকীনার মানযিল।

এই মানযিলটি হলো আল্লাহর দেওয়া মানযিলসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি মানযিল। এটি মানুষের অর্জন ক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের ছয়টি স্থানে اَلسَّكِيْنَةُ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।[৬৯৮] তার মধ্যে একটি হলো :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

"তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন তাঁর রাসূলের ওপর ও মুমিনদের ওপর।"[৬৯৯]

প্রশান্তি বা সাকীনার মূল হলো নিশ্চিন্ততা, গাম্ভীর্য ও স্থিরতা, যা আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে নাযিল করেন; যখন বান্দা ভয়ভীতি কিংবা পেরেশানিতে অস্থির হয়। ফলে এসব পরিস্থিতিতে সে উদ্‌বিগ্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অস্থির না হয়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। এতে তার ঈমান আরও বেড়ে যায় এবং ইয়াকীনে দৃঢ়তা আসে।

এই কারণে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনদের ওপর পেরেশানি ও অস্থিরতার সময় প্রশান্তি বা সাকীনা অবতীর্ণ করার কথা জানিয়েছেন। যেমন, নবি ﷺ-এর হিজরতের সময়; যখন তিনি ও তাঁর সাথি আবূ বকর رضي الله عنه গুহার ভেতরে ছিলেন আর শত্রুপক্ষ ছিল গুহার ওপরে। তাদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকাত, তা হলেই তাঁদের দেখতে পেত। এমনিভাবে হুনাইনের যুদ্ধের দিন; যখন

---

[৬৯৮] উল্লেখিত স্থানগুলো হলো—সূরা বাকারা, ২ : ২৪৮; সূরা তাওবা, ৯ : ২৬, ৪০; সূরা ফাতহ, ৪৮ : ৪, ১৮, ২৬।

[৬৯৯] সূরা তাওবা, ৯ : ২৬।

কাফিরদের প্রচণ্ড আক্রমণে মুসলিমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, কেউ কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ করছিল না। এমনিভাবে হুদাইবিয়ার দিন; যখন কাফিরদের ফায়সালা শুনে, তাদের শর্তগুলো মেনে নিয়ে মুমিনদের অন্তর দুঃখভারাক্রান্ত হয়েছিল। এমন এমন শর্ত ছিল যা কেউ মানতে পারছিল না, উমর ﵁-এর মতো সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিও সেদিন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে আবূ বকর ﵁ তাকে শান্ত করেছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন,

كُلُّ سَكِينَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ طُمَأْنِينَةٌ إِلَّا الَّتِيْ فِيْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

'সূরা বাকারাতে ব্যতীত কুরআনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি সাকীনার অর্থই হলো নিশ্চিন্ততা।'[৭০০]

যখন অন্তরে সাকীনা অবতীর্ণ হয়, তখন অন্তর প্রশান্ত হয়, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্থিরতা আসে। সাকীনা গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে, জবানকে সঠিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলায় এবং অশ্লীল, নোংরা, অহেতুক ও বাতিল কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে। ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, 'আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, উমর ﵁-এর জবানে ও অন্তরে যেন সাকীনাই কথা বলে।'[৭০১]

***

শাইখুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল হারাবি ﵀ বলেছেন, 'সাকীনা হলো যা নবি ﷺ ও মুমিনদের অন্তরে নাযিল করা হয়েছিল। এটি এমন এক বস্তু যা অন্তরে আলো, শক্তি ও সজীবতা আনে; ভীত ব্যক্তি এখানে এসে স্বস্তি পায়, এর মাধ্যমে বিষণ্ন ও ব্যথিত ব্যক্তি সান্ত্বনা লাভ করে এবং এর মাঝে অবাধ্য, পাপাচারী ও গুনাহগার ব্যক্তিও খুঁজে পায় নিরাপদ আশ্রয়।'[৭০২]

এটি হলো তার বাণীসমূহের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণী। যার ব্যাপারে তার

---

[৭০০] বাগাবি, তাফসীর, ৭/২৯৮।

[৭০১] সুয়ূতি, জামিউল আহাদীস, ৩৪৪৫৫; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৩৫৮৭৫।

[৭০২] মানাযিলুস সায়িরীন, ৮৪।

সমবয়সিরাও প্রশংসা করেছেন। যা অন্তরে গেঁথে যায়। এটি তার সুস্থ রুচির পরিচয় বহন করে, শুধু ইলম থেকে কারও এমন উপলব্ধি আসে না।

তিনি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাআলা যে সাকীনা তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর মুমিন বান্দাদের অন্তরে অবতীর্ণ করেন, তা তিনটি বিষয়কে শামিল করে : আলো, শক্তি ও সজীবতা।

এরপর এর তিনটি ফলাফল উল্লেখ করেছেন : ভীত ব্যক্তির আশ্বস্ত ও নিরাপদ হওয়া, বিষণ্ণ ও ব্যথিত ব্যক্তির সান্ত্বনা লাভ করা এবং অবাধ্য, পাপাচারী ও গুনাহগার ব্যক্তির নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়া।

সজীবতার মধ্যে রয়েছে অন্তরের প্রাণ, সাকীনার মাধ্যমে প্রাপ্ত আলোর দ্বারা অন্তর আলোকিত ও উজ্জ্বল হয় আর শক্তির মাধ্যমে আসে দৃঢ়তা, উদ্যম ও উৎফুল্লতা।

সুতরাং নূর বা আলো ব্যক্তির জন্য ঈমান ও ইয়াকীনের তাৎপর্য ও প্রমাণসমূহকে প্রকাশিত করে। হক ও নাহক, সত্য ও মিথ্যা এবং হিদায়াত ও গোমরাহির মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

প্রাণশক্তি বা সজীবতা মানুষকে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত ও মনোযোগী করে তোলে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

আর শক্তি ও সক্ষমতা সত্য কথা বলতে, সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে, কুপ্রবৃত্তির আহ্বানকে দমিয়ে রাখতে এবং নিজেকে দোষত্রুটি ও নোংরামি থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এ কারণেই সাকীনার দ্বারা ঈমান কেবল বৃদ্ধিই পায়।

ঈমানের ফল হলো নূর, সজীবতা ও শক্তি-সামর্থ্য। আবার এই তিনটি বিষয় ঈমান আনতে সাহায্য করে এবং ঈমানকে বৃদ্ধি করে। সুতরাং বলা যায় ঈমান এগুলোর দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে।

সাকীনা বা প্রশান্তির দ্বারা যে নূর অর্জিত হয়, তার মাধ্যমে ঈমানের নিদর্শনাদি পরিস্ফুট হয় এবং যে সজীবতা অর্জিত হয়, তার মাধ্যমে গাফলত থেকে সতর্ক হয়ে সজাগ থাকা যায় আর এর দ্বারা যে শক্তি পাওয়া যায়, তার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তি, নফস ও শয়তানকে দমিয়ে রাখা যায়।

৪৬ নং মানযিল

নিশ্চিন্ততা (اَلطُّمَأْنِيْنَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—নিশ্চিন্ততার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

> "তারা এমন লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা নিশ্চিন্ত হয়েছে। আর জেনে রেখো, কেবল আল্লাহর যিক্‌র দ্বারাই অন্তরসমূহ নিশ্চিন্ত হয়।"[৭০৩]

اَلطُّمَأْنِيْنَةُ হলো : কোনো বস্তুর প্রতি অন্তর প্রশান্ত হওয়া এবং অস্থির ও পেরেশান না হওয়া। এ অর্থেই প্রসিদ্ধ একটি হাদীসে এসেছে,

اَلصِّدْقُ طُمَأْنِيْنَةٌ وَالْكَذِبُ رِيْبَةٌ

"সত্য হলো নিশ্চিন্ততা আর মিথ্যা হলো দ্বিধাগ্রস্ততা।"[৭০৪]

অর্থাৎ সত্য শ্রবণে শ্রোতার অন্তর নিশ্চিন্ত হয় এবং প্রশান্তি অনুভব করে। আর মিথ্যা অস্থিরতা ও সংশয় সৃষ্টি করে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ

"সৎকাজ হলো, যার প্রতি অন্তর নিশ্চিন্ত হয়।"[৭০৫]

---

[৭০৩] সূরা রা'দ, ১৩ : ২৮।

[৭০৪] তিরমিযি, ২৫১৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৭২৩।

[৭০৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৮০০১।

অর্থাৎ এর প্রতি শান্তি খুঁজে পায় এবং সব ধরনের খটকা, অস্থিরতা ও দ্বিধা দূর হয়ে যায়।

ওপরে বর্ণিত আয়াতে ذِكْرُ اللهِ (আল্লাহর যিক্র)-এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে :

১. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বান্দা তার রবকে স্মরণ করবে। কারণ আল্লাহর যিক্রের মাধ্যমে অন্তর নিশ্চিন্ত হয় এবং শান্তি পায়। সুতরাং অন্তর যখন অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, তখন সে আল্লাহর যিক্র ছাড়া আর কোথাও শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পাবে না।

২. এখানে 'আল্লাহর যিক্র' দ্বারা 'কুরআন'কে বুঝানো হয়েছে। এটি হলো আল্লাহর যিক্র, যা তিনি তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। কুরআনের মাধ্যমে মুমিনের অন্তর নিশ্চিন্ততা লাভ করে। কেননা অন্তর কেবল ঈমান ও ইয়াকীনের দ্বারাই নিশ্চিন্ত হয়; আর কুরআন ছাড়া ঈমান ও ইয়াকীন অর্জনের আর কোনো পথ নেই। সুতরাং অন্তরের সুকূন ও নিশ্চিন্ততা আসে এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থেকে আর অন্তরের অস্থিরতা ও উদ্বেগ আসে এর প্রতি দ্বিধা ও সংশয় থেকে। কুরআন দৃঢ়তা অর্জনের স্থান, দ্বিধা ও সন্দেহ থেকে বান্দাকে রক্ষা করে। সুতরাং মুমিনের অন্তর কেবল কুরআনের মাধ্যমেই নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি লাভ করে।

এই ব্যাখ্যাটিই হলো অধিক পছন্দনীয়।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের হৃদয়ে নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি নিহিত রেখেছেন আর নিশ্চিন্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ ও খোশখবর দিয়েছেন। সুতরাং তাদের জন্য সুখবর ও সর্বোত্তম ঠিকানা!

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ

"হে নিশ্চিন্ত আত্মা, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও।"[৭০৬]

আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে প্রমাণ রয়েছে যে, আত্মাসমূহ তাঁর নিকট কেবল নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরে যাবে। প্রশান্ত আত্মার অধিকারী ব্যক্তিরা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সালাফদের দুআর মধ্যে এটিও ছিল যে,

---

[৭০৬] সূরা ফাজ্র, ২৭-২৮।

اَللّٰهُمَّ هَبْ لِيْ نَفْسًا مُّطْمَئِنَّةً إِلَيْكَ

'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার প্রতি প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত আত্মা দান করুন।'

আমার মনে হয় اَلسَّكِيْنَةُ আর اَلطُّمَأْنِيْنَةُ এর মধ্যে দুটি পার্থক্য রয়েছে :

১ নং পার্থক্য : সাকীনা বা প্রশান্তি হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে শক্তিশালী কোনো শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে, যে তাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এমন অবস্থায় সে তার শত্রু থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, ফলে তার অন্তর শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। আর তুমা'নীনা বা নিশ্চিন্ততা হলো একটি দুর্গের ন্যায়, যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় পায়, ফলে তাতে প্রবেশ করে এবং নিরাপদ হয়ে যায়। অতঃপর সেখানে সে তার সাথিসঙ্গী ও আসবাবপত্রের সমাবেশে শক্তিশালী হয়। সুতরাং অন্তরের তিনটি অবস্থা :

১. নিজের সাথে সংঘটিত কোনো ঘটনায় ভয় পাওয়া, অস্থির হওয়া ও পেরেশান হওয়া,
২. সেই ঘটনা দূর হয়ে যাওয়া এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু না ঘটা আর
৩. সংঘটিত ঘটনাটি যে কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, সেই কাজে সফল হওয়া।

আসলে সাকীনা ও তুমা'নীনা একটি অপরটিকে আবশ্যক করে এবং পরস্পরকে যুক্ত রাখে। নিশ্চিন্ততা প্রশান্তিকে আবশ্যক করে, কখনো বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। এমনিভাবে প্রশান্তিও নিশ্চিন্ততাকে আবশ্যক করে, কখনো পৃথক হতে দেয় না। তবে নিশ্চিন্ততার কারণে প্রশান্তি পাওয়া শক্তিশালী হয়।

২ নং পার্থক্য : নিশ্চিন্ততা বা তুমা'নীনা হলো ব্যাপক। এটি ইলম ও ইয়াকীনের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। এ কারণেই অন্তরসমূহ কুরআনের মাধ্যমে নিশ্চিন্ত হয়। কেননা কুরআনের মাধ্যমে ঈমান, ইয়াকীন, মা'রিফাত এবং বিভিন্ন পথের সঠিক দিকনির্দেশনা অর্জন করা যায়। কুরআনের মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান হয় এবং এর মাধ্যমেই সব সংশয়, সন্দেহ ও দ্বিধা দূর হয়ে যায়।

আর প্রশান্তি বা সাকীনা হলো ভয়ের সময় অন্তর স্থির থাকা এবং উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা দূর হওয়া। যেমন যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সৈনিক মুজাহিদগণ তা লাভ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

৪৭ নং মানযিল

ভালোবাসা (اَلْمَحَبَّةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -এর আরেকটি মানযিল হলো—ভালোবাসা বা মহাব্বতের মানযিল।

এটি এমন এক মানযিল; যা অর্জন করতে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতায় নামে, আমলকারীরা এর দিকেই মুখিয়ে থাকে, অগ্রগামীরা এর প্রতিই তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখে, এর ওপরেই আল্লাহর মহাব্বতকারীরা তাদের জীবন উৎসর্গ করে আর এর সজীবতাতেই ইবাদাতকারীরা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। ভালোবাসা হলো অন্তরের শক্তি, আত্মার খোরাক, চোখের প্রশান্তি। এটিই মানুষের সেই প্রাণশক্তি, যা থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এটি এমন এক আলো, যে তা হারিয়ে ফেলে সে অন্ধকারের সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এটি এমন এক ওষুধ, যে এর সেবন থেকে বিরত থাকে, সমস্ত অসুখ তার অন্তরে এসে বাসা বাঁধে। এটি এমন স্বাদের, যে তা আস্বাদন করে না, পুরা জীবনটাই তার ব্যথা আর যন্ত্রণায় ভরে ওঠে।

মহাব্বত হলো হলো ঈমান, আমল ও উচ্চ মর্যাদাসমূহের প্রাণ। যখন এগুলো মহাব্বত-শূন্য হয়, তখন সেগুলো প্রাণহীন দেহের ন্যায় নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

আল্লাহর শপথ! মহাব্বতকারীরা দুনিয়া ও আখিরাতের সব মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করে নিয়েছে। কারণ তাদের জন্য রয়েছে তাদের মাহবূব স্বয়ং আল্লাহর নৈকট্য। কেননা আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি করার সময় এই ফায়সালা করে রেখেছেন যে, যে যাকে ভালোবাসবে, সে তার সঙ্গী হবে। সুতরাং মহাব্বতকারীদের জন্য কত উত্তম নিয়ামাতই না অপেক্ষা করছে!

ভালোবাসার সংজ্ঞা (تَعْرِيْفُ الْمَحَبَّةِ)

মহাব্বত বা ভালোবাসাকে কোনো সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সংজ্ঞা কেবল অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতাই বৃদ্ধি করে। এর অস্তিত্বই হলো এর সংজ্ঞা। মহাব্বতের পরিচয় দেওয়ার জন্য মহাব্বতের চেয়ে সুস্পষ্ট আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

মানুষ ভালোবাসার কারণ, অনুঘটক, আলামত, দৃষ্টান্ত, ফলাফল ও হুকুম-আহকাম নিয়ে আলোচনা করে থাকে। তাদের দেওয়া সংজ্ঞা এই ছয়টি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তবে বিভিন্ন ভঙ্গি ও উপস্থাপনায় বিভিন্ন রকম অভিমত উঠে আসে। আসলে সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, মর্যাদা আর যোগ্যতা অনুসারেই এ ব্যাপারে কথা বলে।

শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে مَحَبَّةٌ শব্দটি পাঁচটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে :

১. স্বচ্ছতা ও শুভ্রতা। যেমন : পরিষ্কার ও সাদা দাঁতের ক্ষেত্রে বলা হয়—حَبَبُ الْأَسْنَانِ

২. উচ্চতা ও প্রকাশমানতা। যেমন : ঝুমবৃষ্টির সময় যে ফেনাগুলো ওপরে ভেসে থাকে, তা বোঝাতে বলা হয়, حَبَبُ الْمَاءِ وَحُبَابُهُ, এমনিভাবে ভরা গ্লাসের ক্ষেত্রেও বলা হয়, حَبَبُ الْكَأْسِ

৩. লেগে থাকা ও স্থির থাকা। উট যখন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে এবং আর না ওঠে, তখন বলা হয়,حَبَّ الْبَعِيْرُ وَأَحَبَّ

৪. সারাংশ বা মূল বস্তু। যেমন : অন্তরের মূল ও ভেতরের অংশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় حَبَّةُ الْقَلْبِ; এমনিভাবে দানা বা শস্যকণাকেও حَبَّة বলা হয়। কারণ এটিই হলো মূল ও প্রধান উপাদান।

৫. সংরক্ষণ করা ও আটকে রাখা। যেমন : যে পাত্রে পানি সংরক্ষণ করা হয়, তাকে বলা হয় حِبُّ الْمَاءِ

এর মধ্যে স্থিরতার অর্থও বিদ্যমান রয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এই পাঁচটি অর্থই ভালোবাসার অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কারণ

ভালোবাসা হলো প্রিয় মানুষের জন্য স্বচ্ছ ও আন্তরিক অনুরাগ, অন্তরের সমস্ত ইচ্ছা-অভিলাষ থাকে তাকেই ঘিরে। সর্বোচ্চ ভালোবাসাটাও থাকে তার প্রতি নিবেদিত। তার প্রতি হৃদয়ের আকৃষ্টতা সবসময়ই দৃঢ় ও স্থির থাকে, কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। প্রিয় মানুষকে নিজের সবচেয়ে দামি ও সম্মানিত বস্তু—নিজের অন্তরই দিয়ে দেয়। আর সব ইচ্ছা-অনুরাগ, চাওয়া-পাওয়া তার জন্যই সংরক্ষণ করে রাখে।

সুতরাং ওপরে উল্লেখিত পাঁচটি অর্থই মহাব্বতের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

মহাব্বত সৃষ্টির কারণসমূহ

দশটি বিষয় আল্লাহর প্রতি মহাব্বত সৃষ্টি করে :

এক. অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তাতে কী বোঝানো হয়েছে, তা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা-সহ অধ্যয়ন করা। যেমন কেউ কোনো কিতাব অধ্যয়ন করতে চিন্তা-ফিকির করে এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখে বোঝার চেষ্টা করে, লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন।

দুই. ফরজ আমলসমূহ আদায়ের পর নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করা। কারণ এটি বান্দাকে মহাব্বতকারীর স্তর থেকে মহাব্বত লাভকারীর স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। (অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তখন তাকে ভালোবাসেন।)

তিন. জবান, অন্তর ও আমলের মাধ্যমে সবসময় আল্লাহর যিক্‌র করা। কারণ বান্দা যতটুকু যিক্‌র করে, আল্লাহর সাথে তার ততটুকুই মহাব্বত সৃষ্টি হয়।

চার. কষ্টকর হলেও আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়গুলোকে নিজের পছন্দনীয় বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দেওয়া। কষ্ট করে হলেও নফসের খাহেশাতকে দমিয়ে রাখা।

পাঁচ. আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি হৃদয়ঙ্গম করতে এবং এর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা। কারণ যে ব্যক্তি নাম ও গুণাবলিসহ আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাবে, সে অবশ্যই আল্লাহকে ভালোবাসবে।

ছয়. আল্লাহর দেওয়া প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত দয়া, অনুগ্রহ, রহমত ও নিয়ামাতকে

গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা। কারণ এই পর্যবেক্ষণ করা আল্লাহকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করবে।

সাত. এটি হলো সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের অন্তরকে ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। এই বিষয়টি বর্ণনা করা যায় না। (এটি আসলে অনুভবের বিষয়।) লেখার ক্ষেত্রে তো কতগুলো অক্ষর ও শব্দ ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান হয় না।

আট. বিশেষ বিশেষ রহমতের সময়, যখন আল্লাহ তাআলা বান্দার খুব কাছাকাছি আসেন, তখন আল্লাহর সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা। তাঁর প্রতি যিক্‌রে, মুনাজাতে ও কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হওয়া। পুরা সময়টা দেহমন উপস্থিত রেখে দাসত্বের আদব পরিপূর্ণভাবে মেনে তাঁর অভিমুখী হওয়া এবং ইস্‌তিগফার ও তাওবার মাধ্যমে বিশেষ সময়গুলো অতিবাহিত করা।

নয়. সত্যবাদী ও আল্লাহপ্রেমিকদের সাথে উঠাবসা করা এবং তাঁদের সান্নিধ্যে থাকা। তাঁদের বাণীসমূহ থেকে উত্তম বাণীগুলোকে নিজের পাথেয় হিসেবে সংগ্রহ করা; যেমন ফল সংগ্রহ করার সময় যেগুলো ভালো, কেবল সেগুলোই সংগ্রহ করা হয়। তাঁদের মজলিসে তীব্র প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা। যদি কথা বলায় নিজের ও অপরের উপকার হয়, তবেই কথা বলা।

দশ. যে সমস্ত কারণ আল্লাহ তাআলার মাঝে ও বান্দার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা।

উপরিউক্ত দশটি কারণ মানুষকে আল্লাহর মহাব্বত বা ভালোবাসার মানযিলে পৌঁছিয়ে দেয় এবং এর দ্বারা ব্যক্তি আল্লাহর মহাব্বতকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সবগুলোর মূল ও ভিত্তি হলো দুইটি বিষয় : এর জন্য অন্তরকে প্রস্তুত করা এবং চোখ-কান খোলা রাখা। কেবল আল্লাহ তাআলাই সাহায্যকারী।

বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা

এ সংক্রান্ত আলোচনা দুইটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত : আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা।

অধিকাংশ সূফিয়ায়ে কেরাম এই দুটি বিষয় যে প্রমাণিত, সে ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন এবং এ ব্যাপারেও একমত হয়েছেন যে, আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা সমস্ত ভালোবাসার চেয়ে ঊর্ধ্বে। এর সাথে অন্য কোনো ভালোবাসার তুলনাই হয় না। আর এটিই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর হাকীকত বা তাৎপর্য। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা যে নবি, রাসূল ও আউলিয়াদের ভালোবাসেন সেটিও তাদের নিকট প্রমাণিত। এটি আল্লাহ তাআলার রহমত, দয়া ও দানের চেয়েও উচ্চ স্তরের একটি সিফাত। কারণ রহমত, দয়া ও দান ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ ও ফল। কেননা আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে ভালোবাসেন, তখন তাদের প্রতি তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও নিয়ামাত পূর্ণতা পায়।

দলীল-প্রমাণের যতগুলো প্রকার রয়েছে—কুরআন-সুন্নাহ, যুক্তি, ফিতরাত, কিয়াস, রুচি, ইলহাম—সবগুলো দ্বারা প্রমাণিত যে, বান্দা তার রব আল্লাহকে ভালোবাসে আর আল্লাহ তাআলাও তার বান্দাদেরকে ভালোবাসেন।

আমি ভালোবাসা সম্পর্কে আমার এক দীর্ঘ রচনায় এর প্রায় ১০০টি পন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে ভালোবাসার উপকারিতা ও মাহাত্ম্য, ব্যক্তির জন্য ভালোবাসা কী কী মর্যাদা বয়ে আনে, এর কারণ ও উপকরণ সম্পর্কেও বিশদ বর্ণনা করেছি। যারা একে অস্বীকার করে তাদের প্রতিহত করেছি এবং তাদের কথাবার্তার অসারতা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। আসলে যারা মহাব্বত ও ভালোবাসাকে অস্বীকার করে, তারা মূলত আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও আদেশ-নিষেধের মূল তাৎপর্যকেই অস্বীকার করে। কারণ সৃষ্টিজগৎকে সৃষ্টি করা, আদেশ-নিষেধ, সাওয়াব-শাস্তি, জান্নাত-জাহান্নাম সবই এই মহাব্বতের কারণেই অস্তিত্বে এসেছে। মহাব্বতই হলো সেই মৌলিক ও প্রকৃত কারণ, যার দরুন আসমান-জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আদেশ-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মহাব্বতই হলো প্রভুত্বের রহস্য আর মহাব্বতের এককত্ব হলো লা ইলাহা ইল্লাহ-এর সাক্ষ্যদান।

অস্বীকারকারীরা যেমন ধারণা করে যে, ইলাহ্ হচ্ছে কেবল রব ও স্রষ্টা; বিষয়টি এমন নয়। কারণ মুশরিকরাও স্বীকার করত আল্লাহ ছাড়া কোনো রব নেই এবং তিনি ব্যতীত আর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। তারা সৃষ্টি করা এবং প্রতিপালন করার দিক দিয়ে আল্লাহকে এক হিসেবে মানত; কিন্তু প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক সার্বভৌম সত্তা বলে স্বীকার করত না। আর এটি হলো মহাব্বত ও সম্মান প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। বরং এ ক্ষেত্রে মুশরিকরা আল্লাহর সাথে অন্যকেও ইলাহ্ হিসেবে মানত। এটিই হলো শির্ক। আল্লাহ তাআলা শির্ক কখনো ক্ষমা করবেন না। শির্ককারী হলো যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ

"আর কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনই ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে।"[৭০৭]

আল্লাহ্ তাআলা এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেউ যদি আল্লাহকে বাদে অন্য কাউকে এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত; তা হলে সেই ব্যক্তি যেন অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করল। এটি হলো ভালোবাসা ও মহাব্বতের ক্ষেত্রে সমকক্ষ বানানো, সৃষ্টিগত ও রুবুবিয়্যাত বা প্রতিপালনগত ক্ষেত্রে সমকক্ষ বানানো নয়। কারণ এই পৃথিবীর কেউই রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করে না। কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা পৃথিবীবাসীর অধিকাংশ মানুষই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

---

[৭০৭] সূরা বাকারা, ২ : ১৬৫।

"অথচ ঈমানদাররা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।"[৭০৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ বলতেন, 'এ কারণেই তাদের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে যে, তারা ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর মাঝে ও তাদের শরীকদের মাঝে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। তাদের মহাব্বত ও ভালোবাসা মুমিনদের মতো একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ ছিল না।'[৭০৯]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣١

"হে নবি, লোকদের বলে দিন, 'যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমার অনুসরণ করো, ফলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়োই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"[৭১০]

এই আয়াতটিকে 'ভালোবাসার আয়াত' (آيَةُ الْمَحَبَّةِ) বলা হয়।

আবূ সুলাইমান দারানি ﷺ বলেছেন, 'যখন মানুষের অন্তর আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য ভালোবাসার এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন—"যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমার (নবির) অনুসরণ করো, ফলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।"

পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, 'একটি সম্প্রদায় আল্লাহকে ভালোবাসে বলে দাবি করেছিল, তখন ভালোবাসার এই আয়াতটি আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিলেন—"যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তা হলে আমার অনুসরণ করো, ফলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।"[৭১১]

---

[৭০৮] সূরা বাকারা, ২ : ১৬৫।

[৭০৯] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ৮/৩৫৭।

[৭১০] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৩১।

[৭১১] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৩১।

আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন, يُحْبِبْكُمُ اللهُ "ফলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।" এর মধ্যে ভালোবাসার প্রমাণ, ফলাফল ও উপকারিতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। মহাব্বতের প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা। আর এর ফলাফল ও উপকারিতা হলো স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জিত হবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলের আনুগত্য আপনার জীবনে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসাও নিখাদ হবে না; আর আপনার প্রতিও আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে শূন্যের কোঠায়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ
>
> "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যায়, (সে ফিরে যাক), অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।"[৭১২]

আল্লাহ তাআলা এখানে তাদের চারটি আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন :

এক ও দুই. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ 'মুমিনদের প্রতি কোমল' অর্থাৎ তাদের প্রতি নরম, দয়ালু, স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া এবং أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ 'কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর'। আতা ﷺ বলেছেন, 'তারা মুমিনদের জন্য তেমনই (সহানুভূতিশীল) হবে, যেমন পিতার প্রতি সন্তান এবং মনিবের প্রতি গোলাম (সহানুভূতিশীল) হয়। আর তারা কাফিরদের ওপর কঠোর হবে, যেমন সিংহ তার শিকারের ওপর কঠোর হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

---

[৭১২] সূরা মায়িদা, ৫ : ৫৪।

"তারা কাফিরদের প্রতি অতি কঠোর আর নিজেরা পরস্পর দয়া পরবশ।"[৭১৩]

তিন. আল্লাহর পথে নিজের জান দিয়ে, হাত দিয়ে, জবান দিয়ে এবং সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা। এর মাধ্যমে ভালোবাসার দাবির সত্যতা ফুটে ওঠে।

চার. আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে তিরস্কারকারীর তিরস্কারের কোনো পরোয়া না করা। এটি হলো খাঁটি ভালোবাসার নিদর্শন। প্রিয় মানুষের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তিরস্কারের ভয় করে, সে আসলে প্রকৃত ভক্ত নয়। যেমন কবি বলেন,

لَا كَانَ مَنْ لِّسِوَاكَ فِيْهِ بَقِيَّةٌ ••• يَجِدُ السَّبِيْلَ بِهَا إِلَيْهِ الْعُذَّلُ

সে তোমার প্রকৃত ভক্ত ও অনুরক্ত নয়,
যার মাঝে তোমাকে ছাড়াও কিছু অবশিষ্ট রয়;
ফলে সে পথ ধরে তিরস্কারকারীরা তিক্ত করে হৃদয়।

'*সহীহ বুখারি*'-তে এসেছে, আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ أَنْ يَّكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ

"তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করে :

১. তার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া,

২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং

৩. কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করা।"[৭১৪]

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

---

[৭১৩] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ২৯।

[৭১৪] বুখারি, ১৬; মুসলিম, ৪৩।

'আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমার বান্দার ওপর আমি যা কিছু ফরজ করেছি, আমার নিকট তার চাইতে অধিক প্রিয় কোনো আমল নেই, যা দ্বারা সে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে। আর আমার বান্দা নফল আমল দ্বারা প্রতিনিয়ত আমার অধিক নৈকট্য লাভ করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার কাছে কোনোকিছু চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে নিশ্চিতভাবেই আমি তাকে আশ্রয় দিই।"[৭১৫]

'সহীহাইন'-এর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادٰى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِيْ جِبْرِيْلُ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ

"যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরীল ﷺ-কে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস।' তখন জিবরীল ﷺ-ও তাকে ভালোবাসেন। তারপর জিবরীল ﷺ আসমানবাসীর মধ্যে ঘোষণা করে

[৭১৫] বুখারি, ৬৫০২।

দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাস।' তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর পৃথিবীতেও তার গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।"[৭১৬] কারও প্রতি ঘৃণা করার ক্ষেত্রেও এ রকম করে ঘোষণা দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভালোবাসেন, কুরআন ও সুন্নাহে তাদের অনেক আলোচনা এসেছে। তাদের কোন কথা, কোন কাজ এবং কোন আখলাক আল্লাহ তাআলার প্রিয় সে বর্ণনাও এসেছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"[৭১৭]

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

"আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[৭১৮]

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।"[৭১৯]

فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

"অবশ্যই আল্লাহ পরহেজগারদের ভালোবাসেন।"[৭২০]

এর বিপরীতে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত ব্যক্তিকে এবং যে সমস্ত কাজকে ভালোবাসেন না, সেগুলোর আলোচনাও এসেছে। যেমন :

---

[৭১৬] বুখারি, ৩২০৯; মুসলিম, ২৬৩৭।

[৭১৭] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৪৬।

[৭১৮] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৩৪।

[৭১৯] সূরা বাকারা, ২ : ২২২।

[৭২০] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৭৬।

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝

"আল্লাহ ফাসাদ (দাঙ্গা-হাঙ্গামা) পছন্দ করেন না।"[১২১]

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

"যারা নিজেরা নিজেদের বড়ো মনে করে এবং অহংকার করে বেড়ায়, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।"[১২২]

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

"আল্লাহ অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না।"[১২৩]

সুন্নাহতেও আল্লাহর পছন্দনীয় আমলের বর্ণনা এসেছে। যেমন : আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ : اَلصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا، ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো : যথা সময়ে সালাত আদায় করা। এরপর মা-বাবার খিদমত করা। এরপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[১২৪]

আরেকটি হাদীসে এসেছে,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ: اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ

"আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল হলো : আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। এরপর আল্লাহর পথে জিহাদ। এরপর গুনাহমুক্ত হাজ্জ।"[১২৫]

---

[১২১] সূরা বাকারা, ২ : ২০৫।

[১২২] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৩।

[১২৩] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৫৭।

[১২৪] মুসলিম, ৮৫।

[১২৫] বুখারি, ১৫১৯; মুসলিম, ৮৩।

আরেকটি হাদীসে এসেছে,

أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ : مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো : যে আমলটি ব্যক্তি নিয়মিত করতে থাকে।"[৭২৬]

এ রকম আরও অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। বান্দার তাওবার কারণে আল্লাহ্ তাআলা একজন মানুষ যত খুশি হতে পারে, তার চেয়েও বেশি খুশি হন। তাওবা ও তাওবাকারীর জন্য এটি আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসার নিদর্শন।

সুতরাং ভালোবাসা ও মহাব্বতের বিষয়টি যদি বাতিল হতো, তা হলে ঈমান ও ইহ্সানের সমস্ত স্তর বাতিল হয়ে যেত। আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার সমস্ত মানযিল অকেজো হয়ে পড়ত। কারণ মহাব্বতই হলো সব আমল ও মানযিলের রূহ। তাই আমল যখন মহাব্বতশূন্য হয়, তখন তা মৃত ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। আমলের সাথে মহাব্বতের সম্পর্ক হলো, আমলের সাথে ইখলাসের সম্পর্কের ন্যায়। বরং মহাব্বতই হলো ইখলাসের মূল। বরং বলা যায় মহাব্বতই হলো ইসলাম। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ্ তাআলার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য, মহাব্বত ও অপদস্থতা স্বীকার করা। সুতরাং আল্লাহর মহাব্বত যার নেই, নিশ্চিতভাবেই তার ইসলামও নেই। মহাব্বত হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়ার হাকীকত বা প্রকৃত মর্ম। কেননা ইলাহ্ হলো সেই সত্তা, বান্দা যাকে মহাব্বত ও বশ্যতা, ভয় ও আশা এবং আনুগত্য ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে ইলাহ্ মানে। ইলাহ্ অর্থ : মা'লূহ (مَأْلُوْهٌ) অর্থাৎ যার প্রতি অন্তর ভালোবাসায় ও নত স্বীকারে পরিপূর্ণ থাকে।

اَلتَّأَلُّهُ (প্রভুত্ব)-এর মূল হলো اَلتَّعَبُّدُ (দাসত্ব)। আর দাসত্ব হলো মহাব্বতের শেষ ধাপ। যখন অনুরক্ত ব্যক্তি তার প্রিয় মানুষের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে এবং তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তখন বলা হয় عَبَّدَهُ الْحُبُّ وَتَيَّمَهُ

সুতরাং মহাব্বত হলো দাসত্বের মূল ভিত্তি। মহাব্বত, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা, ভয় ও আশা ব্যতীত কি আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া যায়? আসলে মহাব্বতকারীদের সবর ছাড়া আর কি কোনো সবর আছে? কারণ আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি

---

[৭২৬] বুখারি, ৪৩; মুসলিম, ৭৮৫।

অর্জন করার জন্য ধৈর্য ধারণ করে তাদের অপেক্ষা করতে হয়। (এর সাথে কি আর কোনো অপেক্ষার কোনো তুলনা চলে?)

মহাব্বতের উৎস ও স্থায়িত্ব

বান্দার প্রতি আল্লাহর দেওয়া প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামতসমূহ গভীরভাবে দেখা ও পর্যবেক্ষণ করার দ্বারা আল্লাহর সাথে তাদের মহাব্বত সৃষ্টি হয়। পর্যবেক্ষণের গভীরতা অনুসারে মহাব্বতের তীব্রতা নির্ণীত হয়। কারণ অন্তর অনুগ্রহকারীকে ভালোবাসতে আর খারাপ আচরণকারীকে ঘৃণা করতে বাধ্য। বান্দার প্রতি যত অনুগ্রহ ও নিয়ামাত সবই আল্লাহরর তরফ থেকে। অপরদিকে সব ধরনের মন্দ ও খারাপ বিষয়াদি আসে অভিশপ্ত শয়তানের পক্ষ থেকে। (সুতরাং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে আর শয়তানের প্রতি ঘৃণা।)

বান্দা যদি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতসমূহ পর্যবেক্ষণ করে, তা হলে সে দেখতে পাবে, তার ওপর আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড়ো নিয়ামাত হলো—আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার, তাঁর সম্পর্কে জানার, তাঁর সন্তুষ্টি আশা করার এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করার যোগ্যতা তাকে দেওয়া হয়েছে। এর মূল হলো একটি নূর, যা আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন। এরপর যখন সেই নূর ব্যক্তির অন্তরে ও সত্তায় উদ্ভাসিত হয়, তখন সে নিজেকে গভীরভাবে দেখতে পায় এবং যে সমস্ত মর্যাদা ও সৌন্দর্যের যোগ্যতা তার মাঝে নিহিত রাখা হয়েছে, তাও সে দেখতে পায়। এতে তার মনোবল সুদৃঢ় হয়, সংকল্প ও ইচ্ছা শক্তিশালী হয় এবং নিজের নফস ও স্বভাব থেকে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়। কারণ আলো আর অন্ধকার একজায়গায় একসাথে অবস্থান করে না। একটির আগমনে অপরটি এমনি এমনি অপসারিত হয়ে যায়।

কথায়, কাজে ও আচার-আচরণে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করার দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার ভালোবাসা প্রমাণিত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। কারও জীবনে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ যতটুকু হবে, আল্লাহর সাথে তার মহাব্বতও ততটুকু স্থায়ী ও শক্তিশালী হবে। আর রাসূলের অনুসরণে যে পরিমাণ ঘাটতি হবে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাও সে পরিমাণ কমে যাবে। যেমন পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, নবিজির অনুসরণ আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা

উভয়টিই একসাথে তৈরি করে। আর এ দুটি ব্যতীত (বান্দার সফলতার) বিষয়টি পরিপূর্ণ হয় না।

(জেনে রাখুন,) প্রকৃত মর্যাদা এর মধ্যে নয় যে, আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন। বরং প্রকৃত মর্যাদা এর মধ্যে রয়েছে যে, আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ আপনাকে কেবল তখনই ভালোবাসবেন, যখন আপনি আপনার প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় তাঁর হাবীব ﷺ-এর অনুসরণ করবেন, তাঁর দেওয়া খবরসমূহকে সত্যায়িত করবেন, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করবেন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবেন, তাঁর অনুসরণকেই সবার আগে প্রাধান্য দেবেন এবং অন্যের দেওয়া সিদ্ধান্ত এড়িয়ে তাঁর দেওয়া সিদ্ধান্তেই, অন্যের ভালোবাসা উপেক্ষা করে তাঁর ভালোবাসাতেই এবং অন্যের অনুসরণ বাদ দিয়ে কেবল রাসূল ﷺ-এর অনুসরণেই নিজেকে উৎসর্গ করবেন। আপনার অবস্থা যদি এ রকম না হয়, তা হলে নিজেকে নিয়ে ভাবুন, নিজের জন্য আলো খুঁজুন। কারণ এখনো আপনার কিছুই অর্জন হয়নি।

আর এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করুন—

فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

“আমার আনুগত্য করো, তা হলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।”[৭২৭]

অর্থাৎ প্রকৃত মর্যাদা হলো আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন। আপনি আল্লাহকে ভালোবাসবেন এটি প্রকৃত মর্যাদা নয়। আর আপনার সেই মর্যাদা হাসিল হবে আল্লাহর হাবীব ﷺ-এর অনুসরণ করার মাধ্যমে।

*****

[৭২৭] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৩১।

৪৮ নং মানযিল

আত্মসম্মানবোধ (اَلْغَيْرَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আত্মসম্মানবোধের মানযিল।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"আপনি বলে দিন, আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন, তা হচ্ছে : প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা..."[৭২৮]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ وَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ

* আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদার অধিকারী আর কেউ নেই; এ জন্য তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন।

* আল্লাহর চেয়ে প্রশংসাপ্রিয় আর কেউ নেই; এ কারণে তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন।

* আল্লাহর চেয়ে ওজর কবুলকারী আর কেউ নেই; যার ফলে তিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূল প্রেরণ করেছেন।"[৭২৯]

---

[৭২৮] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৩।

[৭২৯] বুখারি, ৪৬৩৪; মুসলিম, ২৭৬০।

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ

"আল্লাহ্ তাআলা আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করেন এবং মুমিনরাও আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করেন। বান্দার ওপর আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন, বান্দা যখন তাতে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্ তাআলার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত আসে।"[৭৩০]

'সহীহ বুখারি' ও *'সহীহ মুসলিম'*-এ আরও এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ

"তোমরা কি সা'দ (ইবনু উবাদা)-এর আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্য হচ্ছো? আমি ওর থেকেও অধিক আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। আর আল্লাহ তাআলা আমার থেকেও অধিক আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী!"[৭৩১]

নিম্নের আয়াতটি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে :

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ﴿٤٥﴾

"আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আপনার মাঝে ও যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে আমি একটি অদৃশ্য পর্দা স্থাপন করি।"[৭৩২]

সারি সাকাতি ﷺ তার সাথিদের বলেছেন, 'তোমরা কি জানো সেই অদৃশ্য পর্দাটি কী? আত্মসম্মানবোধের পর্দা। আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মসম্মানবোধের অধিকারী আর কেউ নেই। আল্লাহ তাঁর কালাম বোঝার যোগ্যতা, তাঁর পরিচয়, তাওহীদ ও তাঁকে ভালোবাসার উপযুক্ততা কাফিরদের দান করেননি। ফলে তাদের মাঝে ও তাঁর রাসূল, কালাম ও তাওহীদের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা স্থাপন করে দিয়েছেন।

---

[৭৩০] বুখারি, ৫২২৩; মুসলিম, ২৭৬১।

[৭৩১] বুখারি, ৬৮৪৬; মুসলিম, ১৪৯৯।

[৭৩২] সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৫।

আসলে অযোগ্যরা তা পেয়ে যাবে, এই বিষয়টি তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে।'[৭৩৩]

আত্মসম্মানবোধের মানযিল হলো অনেক সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ একটি মানযিল। কিন্তু পরবর্তী যুগের কিছু নামধারী সূফি এর বিষয়বস্তুকেই পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা নিজেরা নতুন একটি বাতিল মাযহাব তৈরি করে নিয়েছে। তারাও এর নাম দিয়েছে 'আত্মসম্মানবোধ' (اَلْغَيْرَةُ)। অতঃপর অপাত্রে ও ভিন্ন স্থানে তা প্রয়োগ করেছে। তারা বিষয়টি বুঝতে না পেরে বিরাট তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। শীঘ্রই আপনি তা দেখতে পাবেন।

আত্মসম্মানবোধ বা গাইরত দুই ধরনের :

১. কোনো বস্তুর কারণে আত্মসম্মানবোধ (اَلْغَيْرَةُ مِنَ الشَّيْءِ)এবং

২. কোনো বস্তুর ওপর আত্মসম্মানবোধ (اَلْغَيْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ)।

১. কোনো বস্তুর কারণে আত্মসম্মানবোধ : এটি হলো আপনার ভালোবাসার বস্তুতে অন্যের শরীকানা ও ভিড়কে অপছন্দ করা।

২. কোনো বস্তুর ওপর আত্মসম্মানবোধ : ভালোবাসার বস্তুকে একাই পেতে চাওয়ার প্রচণ্ড লোভ। অন্য কেউ যাতে তাতে অংশীদার না হয় এবং ভাগ না বসায়, তা কামনা করা।

গাইরাতের আরও একটি প্রকার রয়েছে :

বান্দার নিজের নফস থেকে নফসের ওপর গাইরাত বা আত্মসম্মানবোধ; যেমন: তার নফস থেকে তার কল্‌বের ওপর গাইরাত, তার বিচ্ছিন্নতা থেকে তার স্থির থাকার ওপর গাইরাত, তার উপেক্ষা করা থেকে তার উদ্যমী হওয়ার ওপর গাইরাত, তার মন্দ স্বভাব থেকে তার প্রশংসনীয় স্বভাবের ওপর গাইরাত। (অর্থাৎ উত্তম বিষয়গুলো অর্জন করার জন্য আত্মসম্মানবোধ বা গাইরাত থাকা।) এই প্রকার আত্মসম্মানবোধ হলো সম্মানিত ও পবিত্র নফসের বৈশিষ্ট্য। নীচু ও নিম্ন স্বভাবের নফসের জন্য এতে কোনো অংশ নেই। নফসের পবিত্রতা ও সুউচ্চ হিম্মতের পরিমাণ অনুসারে এই আত্মসম্মানবোধ অর্জিত হয়।

---

[৭৩৩] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-ইসতিকামাহ, ২/৪৫।

আত্মসম্মানবোধের আরও দুটি প্রকার রয়েছে :

১. বান্দার ওপর আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ এবং

২. আল্লাহর জন্য বান্দার আত্মসম্মানবোধ, আল্লাহর ওপরে আত্মসম্মানবোধ নয়।

১. বান্দার ওপর আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ : এটি হলো আল্লাহ তাআলা তাকে অন্য কোনো সৃষ্টির গোলাম বানাবেন না; বরং তাকে কেবল নিজের জন্যই গোলাম হিসেবে গ্রহণ করবেন। এতে কাউকে অংশীদার করবেন না। তাকে শুধু নিজের জন্যই বেছে নেবেন। এটি এই দুই প্রকারের মধ্যে উঁচু স্তরের আত্মসম্মানবোধ।

২. আল্লাহর জন্য বান্দার আত্মসম্মানবোধ : এটি আবার দুই প্রকার : নিজের সাথে আত্মসম্মানবোধ এবং অপরের সাথে আত্মসম্মানবোধ।

বান্দার নিজের সাথে আত্মসম্মানবোধ হলো : বান্দা তার কাজকর্ম, কথাবার্তা, অবস্থা, সময়, শ্বাসপ্রশ্বাস মোটকথা তার ছোটোবড়ো সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই নিবেদন করবে। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জন্য নয়।

আর অপরের সাথে আত্মসম্মানবোধ হলো : কেউ যখন তাকে অন্যায়-অপকর্ম ও হারামে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করবে, তার হকসমূহের ব্যাপারে অবহেলা করবে এবং তা নষ্ট করবে, তখন এ বিষয়গুলো তাকে রাগান্বিত করে তুলবে এবং তার ক্রোধ বাড়িয়ে দেবে।

***

অপরদিকে আল্লাহ তাআলার ওপর আত্মসম্মানবোধ দেখানো হলো সবচেয়ে বড়ো মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা। যারা এ আচরণ করে, তারা সবচেয়ে বড়ো মূর্খ এবং চরম বিভ্রান্ত। কখনো কখনো এটি ব্যক্তিকে আল্লাহর সাথে শত্রুতার দিকে ঠেলে দেয়; অথচ সে তা টেরই পায় না। কখনো কখনো মূল দ্বীন ও ইসলাম থেকেই বের করে দেয়। এরা আল্লাহর-পথের-পথিকদের পথচলায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। এ পথের চোর-ডাকাতের চেয়ে এরা ক্ষতিকর হয়। এরাই প্রকৃত পথরোধকারী। আল্লাহর জন্য যারা আত্মসম্মানবোধ করেন, তাদের সাথে এদের কত পার্থক্য! তারা আল্লাহর জন্য নিজের কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-আচরণ সবকিছু উৎসর্গ

করে দেয়। জ্ঞানীরা আল্লাহর জন্য আত্মসম্মানবোধ করে আর মূর্খরা আল্লাহর ওপর আত্মসম্মানবোধ করে। সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, أَنَا أَغَارُ عَلَى اللهِ 'আমি আল্লাহর ওপর আত্মসম্মানবোধ করি।' বরং বলতে হবে أَنَا أَغَارُ لِلهِ 'আমি আল্লাহর জন্য আত্মসম্মানবোধ করি।'

বান্দার নিজের সাথে আত্মসম্মানবোধ অপরের সাথে আত্মসম্মানবোধের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনি যখন আপনার নিজের সাথে আত্মসম্মানবোধ উপলব্ধি করবেন, তখন অপরের সাথে আল্লাহর জন্য আপনার আত্মসম্মানবোধও সঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যখন নিজেকে বাদ দিয়ে অপরের সাথে আত্মসম্মানী হয়ে উঠবেন, তখন নিশ্চিতভাবেই আপনার আত্মসম্মানবোধ অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত হবে। সুতরাং এটা নিয়ে ভাবুন এবং এর প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন।

এই স্তরের এই কথাগুলো নিয়ে বুদ্ধিমান পথিকদের চিন্তাভাবনা করা উচিত। কারণ এখানে এসে অধিকাংশ পথিকেরই পা পিছলে যায়। আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথ দেখান, পথ চলার তাওফীক দেন আর তিনিই তাতে সুদৃঢ় রাখেন।

যেমন (তথাকথিত) এক প্রসিদ্ধ সূফি বলেছেন, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি পাই না; যতক্ষণ-না আল্লাহর যিক্‌র করছে এমন কাউকে দেখি।' এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো সে ব্যতীত অন্যান্য গাফিলদের মধ্যে কাউকে যিক্‌র করতে দেখা। এর চেয়েও আশ্চর্যের হলো এটাকে তার বুজুর্গি ও শ্রেষ্ঠত্ব বলে গণ্য করা হয়!

আরেকজন বলেছেন, 'আমি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে এবং তাঁকে দেখতে পছন্দ করি না।' তাকে বলা হলো, 'কেন?' তিনি জবাব দেন, 'আল্লাহর ওপর আত্মসম্মানবোধের কারণে; আমার মতো ব্যক্তি তাঁকে দেখবে?!'

এটি হলো মন্দ ও নিকৃষ্ট পর্যায়ের আত্মসম্মানবোধ। যা ব্যক্তির মূর্খতার প্রতিই ইঙ্গিত করে। যদিও সে নিজেকে ছোটো মনে করা, বিনয়, নম্রতা, অক্ষমতা ও অপদস্থতার গুণে গুণান্বিত থাকে।

*****

করে দেয়। জ্ঞানীরা আল্লাহর জন্য আত্মসম্মানবোধ করে আর মূর্খরা আল্লাহর ওপর আত্মসম্মানবোধ করে। সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, أَنَا أَغَارُ عَلَى اللهِ 'আমি আল্লাহর ওপর আত্মসম্মানবোধ করি।' বরং বলতে হবে أَنَا أَغَارُ لِلهِ 'আমি আল্লাহর জন্য আত্মসম্মানবোধ করি।'

বান্দার নিজের সাথে আত্মসম্মানবোধ অপরের সাথে আত্মসম্মানবোধের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনি যখন আপনার নিজের সাথে আত্নসম্মানবোধ উপলব্ধি করবেন, তখন অপরের সাথে আল্লাহর জন্য আপনার আত্মসম্মানবোধও সঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যখন নিজেকে বাদ দিয়ে অপরের সাথে আত্মসম্মানী হয়ে উঠবেন, তখন নিশ্চিতভাবেই আপনার আত্মসম্মানবোধ অসম্পূর্ণ ও ক্রটিযুক্ত হবে। সুতরাং এটা নিয়ে ভাবুন এবং এর প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন।

এই স্তরের এই কথাগুলো নিয়ে বুদ্ধিমান পথিকদের চিন্তাভাবনা করা উচিত। কারণ এখানে এসে অধিকাংশ পথিকেরই পা পিছলে যায়। আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথ দেখান, পথ চলার তাওফীক দেন আর তিনিই তাতে সুদৃঢ় রাখেন।

যেমন (তথাকথিত) এক প্রসিদ্ধ সূফি বলেছেন, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি পাই না; যতক্ষণ-না আল্লাহর যিক্‌র করছে এমন কাউকে দেখি।' এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো সে ব্যতীত অন্যান্য গাফিলদের মধ্যে কাউকে যিক্‌র করতে দেখা। এর চেয়েও আশ্চর্যের হলো এটাকে তার বুজুর্গি ও শ্রেষ্ঠত্ব বলে গণ্য করা হয়!

আরেকজন বলেছেন, 'আমি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে এবং তাঁকে দেখতে পছন্দ করি না।' তাকে বলা হলো, 'কেন?' তিনি জবাব দেন, 'আল্লাহর ওপর আত্মসম্মানবোধের কারণে; আমার মতো ব্যক্তি তাঁকে দেখবে?!'

এটি হলো মন্দ ও নিকৃষ্ট পর্যায়ের আত্মসম্মানবোধ। যা ব্যক্তির মূর্খতার প্রতিই ইঙ্গিত করে। যদিও সে নিজেকে ছোটো মনে করা, বিনয়, নম্রতা, অক্ষমতা ও অপদস্থতার গুণে গুণান্বিত থাকে।

*****

৪৯ নং মানযিল

আগ্রহ (اَلشَّوْقُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—আগ্রহের মানযিল।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ

"আল্লাহর সাথে যে সাক্ষাতের আশা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই।"[৭৩৪]

বলা হয়েছে : এই আয়াতটি তাদের জন্য সুখবর ও সান্ত্বনা, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী। অর্থাৎ আমি জানি যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে, তারা আমার প্রতি প্রবল আগ্রহী। তবে আমি এর জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছি; অচিরেই তার আগমন ঘটবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। যা কিছুর আগমন ঘটবে, তা তো নিকটবর্তীই।

নবি ﷺ তাঁর দুআয় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার চেহারার দিকে তাকানোর স্বাদ এবং আপনার সাক্ষাতের আগ্রহ প্রার্থনা করছি।"[৭৩৫]

আগ্রহ (اَلشَّوْقُ) হলো : মহাব্বতের প্রভাব ও বহিঃপ্রকাশ। কারণ প্রিয় মানুষের প্রতি অন্তর সবসময়ই ধাবিত হয়।

---

[৭৩৪] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫।

[৭৩৫] নাসাঈ, ১৩০৫।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আগ্রহ হলো : অন্তরকে প্রিয় মানুষের সাক্ষাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলা।'

জুনাইদ বাগদাদি ﵀ বলেছেন, 'আমি সারি সাকাতি ﵀-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'শাওক (আগ্রহ) হলো আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মানযিল। কেউ যখন আগ্রহের মানযিলে পৌঁছে যায়, তখন সে তার আগ্রহের বিষয় ব্যতীত সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে চলে।''[৭৩৬] এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, জান্নাতের অধিবাসীরা আল্লাহ তাআলার দর্শন ও নৈকট্য লাভ করা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

আগ্রহের দুটি স্তর রয়েছে : ১. ইবাদাতকারীর জান্নাতের আগ্রহ এবং ২. আল্লাহ তাআলার প্রতি আগ্রহ। তবে এটি জান্নাতের প্রতি আগ্রহ থাকার বিপরীত নয়। কেননা জান্নাতের সর্বোত্তম নিয়ামাত হলো আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা, তাঁর দর্শন পাওয়া, তাঁর কথা শ্রবণ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা।

*****

[৭৩৬] আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৪৯৯।

৫০ নং মানযিল

স্বাদ আস্বাদন করা (اَلذَّوْقُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—স্বাদ আস্বাদন করার মানযিল।

স্বাদ (اَلذَّوْقُ) : এটি হলো পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বস্তুসমূহকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা। কুরআনের ভাষা ও আরবদের ভাষা অনুযায়ী স্বাদ (اَلذَّوْقُ) শুধু মুখ দ্বারা অনুভব করার সাথেই সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾

> "অতএব এখন তোমরা তোমাদের কুফরির বিনিময়স্বরূপ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।"[৭৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

> "ফলে আল্লাহ ক্ষুধা ও ভীতির পোশাকে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করালেন।"[৭৩৮]

চিন্তা করুন—আল্লাহ তাআলা কীভাবে স্বাদ আস্বাদন করা ও পোশাকের বিষয়টি একসাথে উল্লেখ করেছেন; এটি বোঝানোর জন্য যে, তিনি তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়েছেন দ্রুত ও পরিপূর্ণভাবে। সুতরাং আয়াতটি স্বাদ আস্বাদনের কথা

---

[৭৩৭] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১০৬।

[৭৩৮] সূরা নাহল, ১৬ : ১১২।

উল্লেখ করে এই সংবাদ দিচ্ছে যে, শাস্তিটি কোনো রকম বিলম্ব ছাড়া দ্রুতই দেওয়া হয়েছিল। কেননা মানুষ কখনো কখনো দেরিতেও ভয় পায়, তাৎক্ষণিকভাবে ভয় পায় না। (স্বাদ যেমন খাওয়ার সাথে সাথেই অনুভূত হয়, তেমনি তাদেরকে ভীতির শাস্তি দ্রুতই দেওয়া হয়েছিল।) আর পোশাকের কথা উল্লেখ করে এই সংবাদ দিচ্ছে যে, শাস্তিটি ছিল পরিপূর্ণভাবে বেষ্টনকারী। যেমন পোশাক শরীরকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে নেয়।

'সহীহ মুসলিম'-এ এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا

"সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে রব হিসেবে আল্লাহকে, দ্বীন হিসেবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে পেয়ে সন্তুষ্ট।"[৭৩৯]

নবি ﷺ জানিয়েছেন যে, ঈমানেরও স্বাদ রয়েছে আর অন্তর তা আস্বাদন করে। যেমন মুখ খাদ্য ও পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করে।

নবি ﷺ ঈমান ও ইহ্সানের হাকীকত উপলব্ধি করাকে এবং অন্তরে তা অর্জিত হওয়াকে কখনো স্বাদের মাধ্যমে, কখনো খাবার-পানীয়ের মাধ্যমে আবার কখনো মিষ্টতা অনুভূত হবে বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন ওপরে বর্ণিত হাদীসে আমরা দেখেছি। এমনিভাবে তিনি বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ أَنْ يَّكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ

"তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারে—

১. তার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া,

২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং

৩. কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ

---

[৭৩৯] মুসলিম, ৩৪।

করা।"[৭৪০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-কে ধারাবাহিকভাবে সাওম পালন করতে যখন নিষেধ করেছিলেন, তখন তারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি তো ধারাবাহিকভাবেই পালন করেন?' নবি ﷺ তখন জবাব দিয়েছিলেন,

إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

"আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়, আমাকে আহার করানো হয় এবং পানও করানো হয়।"

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

"আমি এমন অবস্থায় রাত্রিযাপন করি যে, আমার রব আমাকে খাওয়ান এবং পান করান।"[৭৪১]

যারা ধারণা করে যে, এই খাবার খাওয়ানো এবং পান করানো বস্তুগত খাদ্য ও পানীয়; যা মুখ দিয়ে খাওয়া হয়, তাদের বোধশক্তিতে মোটা পর্দা পড়েছে। তারা যেমন ধারণা করে বিষয়টি যদি এমনই হতো, তা হলে তো নবি ﷺ সাওম পালনকারীই সাব্যস্ত হবেন না; ধারাবাহিকভাবে তা পালন করা তো দূরের কথা। যখন নবি ﷺ সাহাবিদের জবাব দিয়েছেন যে, "আমি তোমাদের মতো নই।" তখন তাঁর মাঝে-ও তাদের মাঝে পার্থক্যটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁকে পানাহার করানো হয়। যদি নবি ﷺ তাঁর পবিত্র মুখ দিয়েই পানাহার করতেন, তা হলে তিনি সাহাবিদের প্রশ্নের উত্তরে বলতেন, 'আমিও ধারাবাহিকভাবে সাওম পালন করি না।' সুতরাং যখন 'আপনি তো ধারাবাহিকভাবে সাওম পালন করেন?'—তাদের এই প্রশ্নকে তিনি সমর্থন করেছেন, তখন বোঝা যায় যে, নবি ﷺ-ও খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর জন্য আল্লাহর-দেওয়া আত্মিক-পানাহারই যথেষ্ট ছিল; যা তাঁকে বাহ্যিক পানাহার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছিল।

---

[৭৪০] বুখারি, ১৬; মুসলিম, ৪৩।

[৭৪১] বুখারি, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৬; মুসলিম, ১১০২-১১০৫।

এই স্বাদ গ্রহণের বিষয়টির মাধ্যমে রোম সম্রাট হিরাক্ল নুবুওয়াতের বিশুদ্ধতার ওপরে প্রমাণ পেশ করেছিলেন; তিনি আবূ সুফ্ইয়ানকে বলেছিলেন, 'তাদের কেউ কি তাঁর দ্বীনের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তা থেকে ফিরে যায়?' আবূ সুফ্ইয়ান উত্তর দিয়েছিলেন, 'না।' তখন তিনি বলেছিলেন, 'ঈমান এমনই; যখন তার মিষ্টতা ও স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে যায়। (তখন আর কেউ তা থেকে ফিরে যায় না।)'[৭৪২]

রোম সম্রাট হিরাক্ল নবি ﷺ-এর অনুসারীদের জন্য ঈমানের যে স্বাদ অনুভূত হয়, তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তা হলো নুবুওয়াত ও রিসালাতের দাবি; বাদশাহি ও রাজত্ব লাভের দাবি নয়। আসলে ঈমানের স্বাদ যখন কোনো অন্তরের সাথে মিশে যায়, তখন সে অন্তর আর কখনো ঈমান থেকে বিমুখ হয় না।

মূলকথা হলো : অন্তর ঈমান ও ইহ্সানের মিষ্টতা অনুভব করে। ঠিক যেমন মুখ বস্তুগত খাদ্য ও পানীয়ের স্বাদ অনুভব করে থাকে। ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা আস্বাদন করার পূর্ব পর্যন্ত অন্তরে সংশয় ও সন্দেহ আসতেই থাকে। কিন্তু যখন তা অর্জিত হয়, তখন সব সংশয় দূর হয়ে যায়। ঈমানের স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে গেলে, ব্যক্তি প্রতিটি আমলেই আনন্দ ও মিষ্টতা অনুভব করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন।

*****

[৭৪২] বিস্তারিত দেখুন, বুখারি, ৭।

৫১ নং মানযিল

পরিচ্ছন্নতা (اَلصَّفَاءُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—পরিচ্ছন্নতার মানযিল।

اَلصَّفَاءُ বলা হয় নোংরা থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়াকে। যেমন বলা হয় صَفَاءُ الْعِلْمِ (জ্ঞানের পরিচ্ছন্নতা)। নবি ﷺ যে ইলম নিয়ে এসেছেন তার সবটুকুই স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন।

জুনাইদ বাগদাদি ﵀ সবসময় বলতেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করেনি এবং হাদীস লিখে রাখেনি, সে অনুসরণযোগ্য নয়। কারণ আমাদের এই ইলম কেবল কুরআন ও সুন্নাহর সাথেই সম্পৃক্ত।'[৭৪৩]

সুতরাং এই পরিচ্ছন্ন ইলম, যা ওহি ও নুবুওয়াতের পাত্র থেকে আহরিত; সেটি আপনাকে ইবাদাত ও দাসত্বের পথে চলার জন্য যা যা প্রয়োজন সব শেখাবে। এর মৌলিক কথা হলো : প্রকাশ্যে ও গোপনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদব-শিষ্টাচার নিজের মাঝে ধারণ করা, সবক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তকেই মেনে নেওয়া এবং নবি ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবিকই চলা এবং বিরত থাকা।

আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজের শাইখ, ইমাম, নেতা ও বিচারপতি হিসেবে গ্রহণ করুন। নিজের অন্তরকে ও আধ্যাত্মিকতাকে তাঁর অন্তর ও আধ্যাত্মিকতার সাথে সংযুক্ত করে দিন; ফলে তিনি যখন আপনাকে আহ্বান করবেন, আপনি তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবেন; যখন থামতে বলবেন, তখন থামবেন; যখন চলতে বলবেন, তখন চলবেন; যখন বিশ্রাম নিতে বলবেন, তখন বিশ্রাম নেবেন; যখন কোথাও অবতরণ করতে বলবেন, তখন সেখানে অবতরণ করবেন; তাঁর রাগে রাগান্বিত হবেন; তাঁর আনন্দে আনন্দিত হবেন; যখন তিনি কোনো বিষয়ে কথা বলবেন,

[৭৪৩] শাতিবি, আল-ই'তিসাম, ১/১৬৪।

তখন তা এমনভাবে গ্রহণ করবেন যেন আপনি নিজ চোখে দেখেছেন; আর যখন তিনি আল্লাহ সম্পর্কে কোনো সংবাদ দেবেন, তখন আপনি তা এমনভাবে বিশ্বাস করবেন, যেন আপনি নিজ কানে সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকেই শুনেছেন।

মোটকথা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজের শাইখ, শিক্ষক, মুরব্বী এবং আদব শিক্ষাদানকারী হিসেবে গ্রহণ করবেন। আর আপনার মাঝে ও তাঁর মাঝের সমস্ত মাধ্যম উপেক্ষা করবেন; শুধু পৌঁছানোর ক্ষেত্রটি ছাড়া। যেমন ইবাদাতের ক্ষেত্রে আপনার মাঝে আর আপনার রবের মাঝের সব ধরনের মাধ্যম উপেক্ষা করে থাকেন। (এ ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি আপনার রবের ইবাদাত করে থাকেন।) কেবল আদেশ-নিষেধ পৌঁছানোর বিষয়টি ব্যতীত আর কোনোকিছু এর মাঝে সাব্যস্ত করেন না। (ঠিক তেমনি রাসূলের সাথেও এ রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে; মাঝে কাউকে ওসীলা বা মাধ্যম বানানো যাবে না।)

এই দুটি বিষয়ই হলো أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-এর হাকীকত। আল্লাহ তাআলাই ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হকদার, তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের অধিকারী কেউ নেই। আর তাঁর রাসূল ﷺ-ই আনুগত্য লাভের অধিকারী; তাঁকে ব্যতীত আর কারও আনুগত্য করা যাবে না। তবে যাদেরকে অনুসরণ করার কথা নবি ﷺ নিজেই বলে দিয়েছেন, তাদের বিষয়টি আলাদা। কারণ তাদের অনুসরণ রাসূলেরই অনুসরণ।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ ব্যতীত সমস্ত পথ বন্ধ। প্রকাশ্যে ও গোপনে কেবল তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। তাঁর দেখানো পথ ব্যতীত সফর করলে পথ শেষে ক্লান্তি ছাড়া আর কিছুই মিলবে না; আর তাঁর অনুসরণ ব্যতীত আমল করার পরিণতি হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

> كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً حَتّٰى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

> “পানিহীন মরুপ্রান্তরে মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছুল কিছুই পেল না; বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেল, যিনি তার হিসাব পরিপূর্ণভাবে

মিটিয়ে দিলেন। আর আল্লাহর দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"[৭৪৪]

***

পরিচ্ছন্নতার একটি দিক হলো :
আপনি এমনভাবে ইবাদাত করবেন যেন আল্লাহকে দেখছেন

ইহ্‌সানের স্তর বোঝাতে নবি ﷺ বলেছেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

"তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, যেন আল্লাহকে দেখছো।"[৭৪৫]

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূল ﷺ কর্তৃক আনীত খবরসমূহকে সত্যায়ন করা এবং তাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে অন্তর এ রকম শক্তিশালী হয় যে, গায়েব বা অদৃশ্যের বিষয়াবলি চাক্ষুষ দেখার মতো হয়ে যায়। এই স্তরে উপনীত ব্যক্তি যেন আল্লাহকে সাত আসমানের ওপর আরশে সমাসীন দেখতে পান যে, তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সবকিছু অবগত, তিনি তাদেরকে দেখছেন, তাদের কথাবার্তা শুনছেন এবং তাদের ভেতর-বাহির সবকিছু অবলোকন করছেন।

তিনি যেন আল্লাহকে শুনছেন যে, আল্লাহ ওহির কথা বলছেন, এ সম্পর্কে জিবরীল ﵇-এর সাথে কথোপকথন করছেন, আল্লাহ যা চান তাকে তার আদেশ দিচ্ছেন, নিষেধ করছেন, ফেরেশতাদের সমস্ত বিষয়াদি পরিচালনা করছেন; সবকিছুর মালিকানা তাঁরই এবং সবকিছু তাঁর থেকেই অবতীর্ণ হয়।

ইহ্‌সানের স্তরে উপনীত ব্যক্তি যেন আল্লাহকে অবলোকন করছেন যে, আল্লাহ খুশি হচ্ছেন, রাগান্বিত হচ্ছেন, ভালোবাসছেন, ঘৃণা করছেন, দান করছেন আবার দান করা থেকে বিরত থাকছেন, হাসছেন, আনন্দ প্রকাশ করছেন, ফেরেশতাদের মাঝে তাঁর ওলিদের প্রশংসা করছেন এবং তাঁর শত্রুদের নিন্দা করছেন।

---

[৭৪৪] সূরা নূর, ২৪ : ৩৯।

[৭৪৫] বুখারি, ৫০; মুসলিম, ৯, ১০।

সেই ব্যক্তি যেন আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করছেন এবং তাঁর পবিত্র দুই হাতকেও দেখছেন যে, এক হাতে সাত আসমান এবং অপর হাতে সাত জমিনকে কবজা করে রেখেছেন। সাত আসমান যেন তাঁর ডান হাতে এমনভাবে ভাঁজ করা আছে, যেমন নথিপত্র বইয়ের সারিতে ভাঁজ করা থাকে।

সেই ব্যক্তি যেন দেখছেন, বান্দাদের মাঝে আল্লাহর ফায়সালা আসছে, আর এর আলোয় পুরো পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাচ্ছে।

তিনি যেন বর্তমানে তার নিজ কানে শুনতে পাচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা আদম ﷺ-কে ডাকছেন :

يَا آدَمُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ

"হে আদম, জাহান্নামি দলকে বের করে দাও।"[৭৪৬]

এমনিভাবে এটিও শুনতে পাচ্ছেন যে, কিয়ামাতের ময়দানে দণ্ডায়মান লোকদের আল্লাহ বলছেন,

مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝٦٥

"তোমরা রাসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?"[৭৪৭]

مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ؟

"তোমরা কার ইবাদাত করতে?"[৭৪৮]

মোটকথা ইহ্‌সান বা পরিচ্ছন্নতার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি নিজ অন্তর দ্বারা সেই সমস্ত গুণাবলি সহকারে আল্লাহকে দেখতে পান; যা আসমানি কিতাবসমূহ ও রাসূলগণ বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে তারা দ্বীনকেও দেখতে পান; যে দ্বীনের প্রতি রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছেন এবং তারা বস্তুর সেই সব রহস্য ও হাকীকতও প্রত্যক্ষ করেন, যে সম্পর্কে রাসূলগণ জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে তিনি যেন নিজ অন্তর দ্বারা তা

---

[৭৪৬] বুখারি, ৩৩৪৮; মুসলিম, ২২২।

[৭৪৭] সূরা কাসাস, ২৮ : ৬৫।

[৭৪৮] বুখারি, ৪৫৮১।

সরাসরি দেখতে পান; যেমন তাওয়াতুর বা সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত কোনো সংবাদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। যেমন কোনো শহর বা ঘটনা (সম্পর্কে শুনে শুনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, ব্যক্তি যেন তা নিজ চোখে অবলোকন করেছে; অথচ সে তা দেখেইনি।) সুতরাং মুহসিন বা পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির ঈমান স্বচক্ষে দেখায় ন্যায় (সংশয়মুক্ত) হয়। অপরদিকে অন্যান্য ব্যক্তির ঈমান হয় অন্ধ ব্যক্তির অনুসরণের মতো।

*****

৫২ নং মানযিল
খুশি ও আনন্দ (اَلْفَرَحُ وَالسُّرُوْرُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—খুশি ও আনন্দ লাভের মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

"হে নবি, আপনি বলে দিন, এটি আল্লাহর মেহেরবানি এবং তাঁর রহমত। সুতরাং এ জন্য তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে, সেসবের চেয়ে এটি অনেক ভালো।"[৭৪৯]

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের আদেশ করেছেন যে, তারা যেন তাঁর মেহেরবানি ও রহমত প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়। এটি যিনি দান ও অনুগ্রহ করেছেন তাঁরও খুশি ও আনন্দিত হওয়ার মাধ্যম। কারণ যে ব্যক্তি কোনো অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত হয়; তখন যিনি তাকে এই অনুগ্রহ দান করেন তিনি আরও বেশি আনন্দিত হন।

নিচে আমরা এই আয়াতটির অর্থ ব্যাখ্যা করব—

ইবনু আব্বাস, কাতাদা, মুজাহিদ, হাসান বাস্‌রিসহ আরও অনেকেই বলেছেন, 'এই আয়াতে فَضْلُ اللهِ (আল্লাহর মেহেরবানি)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : ইসলাম এবং رَحْمَتُهُ (তাঁর রহমত)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : কুরআন।' তাঁরা ফাদ্‌ল বা মেহেরবানির চেয়ে রহমতকে খাছ করেছেন। কারণ তাঁর মেহেরবানি মুসলমানদের জন্য ব্যাপক। আর তাঁর রহমত হলো অনেকের মাঝে মাত্র কয়েকজনকে কুরআন

[৭৪৯] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৮।

শিক্ষা দেওয়া। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁর ফাদ্ল বা মেহেরবানিতে তাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন। আর তাঁর রহমতের কারণে তাদের নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كُنتَ تَرْجُوْ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

"আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার রবের রহমত।"[৭৫০]

আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'فَضْلُ اللهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : কুরআন। আর رَحْمَتُهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : তিনি আমাদেরকে কুরআনের অধিকারী বানিয়েছেন।'[৭৫১]

আমার অভিমত হলো : এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য দুইটি বিষয় :

এক. হুবহু আল্লাহর মেহেরবানিই উদ্দেশ্য এবং

দুই. আল্লাহর মেহেরবানি গ্রহণ করার জন্য স্থানকে উপযুক্ত করা উদ্দেশ্য। যেমন: ফসল-উৎপাদনে-উপযোগী-স্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করা। এর দ্বারা আল্লাহর ফাদ্ল ও রহমতের যে উদ্দেশ্য তা পূর্ণতা পায়। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

প্রিয়জন ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে অন্তরে স্বাদ অনুভূত হওয়ার অবস্থাকেই ফারাহ্ বা আনন্দ বলে। যেমন প্রিয়জন ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর বিচ্ছেদে সৃষ্টি হয় দুশ্চিন্তা ও কষ্টের অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তাঁর দেওয়া মেহেরবানি ও রহমতের কারণে আনন্দিত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন নিচের এই আয়াতটি উল্লেখ করার পর পরই—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٧

"হে লোকসকল, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং

[৭৫০] সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৬।

[৭৫১] আবুল মুযাফফার সামআনি, তাফসীর, ২/৩৯০।

মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।”[৭৫২]

আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি ও রহমতের চেয়ে অধিক যোগ্য কোনো বস্তু নেই, যা নিয়ে বান্দা আনন্দিত হতে পারে। কারণ তা নসীহত, সমস্ত আত্মিক রোগের ওযুধ, দয়া এবং হিদায়াতকে ধারণ করে। এই কারণে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ দুনিয়াবি যে ধনসম্পদ ও সম্মান অর্জন করে তার চেয়ে বহুগুণ উত্তম হলো তিনি বান্দাদের যে সমস্ত নিয়ামাত দান করেছেন সেগুলো। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো; **নসীহত;** যা উৎসাহমূলক ও ভীতিমূলক আদেশ-নিষেধ দ্বারা পরিপূর্ণ, **আত্মিক রোগের ওষুধ;** যা মূর্খতা, জুলুম, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, রাগ ইত্যাদি রোগগুলো দূর করে দেয়। আসলে অন্তরের রোগ শরীরের রোগের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু মানুষ তাতে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে এর ব্যথা অনুভব করে না। তবে এই দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় মানুষ সেগুলোর ব্যথা ও যন্ত্রণার তীব্রতা উপলব্ধি করবে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দান করেছেন হৃদয় প্রশান্তকারী ও নিশ্চয়তা দানকারী **হিদায়াত ও রহমত;** যা সমস্ত কল্যাণের ধারক এবং সমস্ত অকল্যাণ ও অনিষ্ট দূরকারী।

তাই বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার দেওয়া এই সমস্ত নিয়ামাতের কারণে আনন্দিত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি এর কারণে আনন্দিত হয়, সে আসলে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু পাওয়ার কারণেই আনন্দিত হয়। দুনিয়ার প্রাচুর্যতা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এতে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা এগুলো আরও বিপদ-মুসীবত ডেকে আনে; দুনিয়ার সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী, আর অচিরেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন কেউ ঘুমের মধ্যে অনেক কিছু দেখে এবং জমা করতে থাকে; কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখে কিছুই নেই।

***

[৭৫২] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৭।

কুরআন মাজীদে اَلْفَرَحُ বা আনন্দের কথা দুইভাবে এসেছে : শর্তহীনভাবে এবং শর্তযুক্তভাবে।

শর্তহীনভাবে : আল্লাহ তাআলা এর নিন্দা করেছেন। যেমন :

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾

"আনন্দের আতিশয্যে গর্ব করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ গর্বকারীদের ভালোবাসেন না।"[৭৫৩]

শর্তযুক্তভাবে : এটি আবার দুই প্রকার :

এক. দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত আনন্দ; যা ব্যক্তিকে আল্লাহর ফাদ্‌ল, দয়া ও অনুগ্রহ ভুলিয়ে দেয়। এটি নিন্দনীয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾

"অতঃপর তারা যখন ওই উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সমৃদ্ধির সকল দরজা খুলে দিলাম। এমনকি তাদেরকে দেওয়া বিষয়াদির জন্য যখন তারা খুব আনন্দিত (গর্বিত) হয়ে পড়ল, তখন আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল।"[৭৫৪]

দুই. যা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের সাথে সম্পৃক্ত। এটি আবার দুই প্রকার :

১. আল্লাহর মেহেরবানি ও রহমতের কারণে আনন্দিত হওয়া। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

"হে নবি, আপনি বলে দিন, এটি আল্লাহর মেহেরবানি এবং তার রহমত। সুতরাং এ জন্য তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে

[৭৫৩] সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৬।

[৭৫৪] সূরা আনআম, ৬ : ৪৪।

সেসবের চেয়ে এটি অনেক ভালো।"[৭৫৫]

২. আল্লাহ তাআলা যা দান করেন, তার জন্য আনন্দিত হওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

"আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত।"[৭৫৬]

সুতরাং আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ঈমান, সুন্নাহ, ইলম, কুরআন—এই সব কারণে আনন্দিত হওয়া হলো আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ স্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُم مَّنْ يَّقُوْلُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ إِيْمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

"আর যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, 'এর ফলে তোমাদের কার ঈমান বেড়ে গেছে?' আসলে যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং এতে তারা আনন্দিত হয়েছে।"[৭৫৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَالَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

"এবং আমি আগে যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছিলাম, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তারা তাতে আনন্দিত হয়।"[৭৫৮]

ইলম, ঈমান এবং সুন্নাহের কারণে আনন্দিত হওয়া—এটাই প্রমাণ করে যে, সেগুলোর প্রতি ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে এবং সে অন্যান্য বস্তুর ওপর সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়। কারণ কোনো বস্তুর প্রতি কারও আনন্দবোধ তখনই

---

[৭৫৫] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৮।

[৭৫৬] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭০।

[৭৫৭] সূরা তাওবা, ৯ : ১২৪।

[৭৫৮] সূরা রা'দ, ১৩ : ৩৬।

হয়, যখন সে সেগুলোকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং সেগুলোর প্রতি আগ্রহ রাখে। তাই যার কোনো বস্তুর প্রতি আগ্রহ নেই, সে বস্তুর প্রাপ্তিতে তার কোনো আনন্দ থাকে না এবং এর অপ্রাপ্তিতে তার কোনো দুঃখবোধও হয় না।

আসলে আনন্দিত হওয়া ভালোবাসা ও আগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ।

(اَلْفَرَحُ এবং اَلْإِسْتِبْشَارُ-এ দুটি শব্দের অর্থই আনন্দিত হওয়া।) তবে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে :

اَلْفَرَحُ হলো : প্রিয় বস্তু অর্জিত হওয়ার পরে আনন্দিত হওয়া আর اَلْإِسْتِبْشَارُ হলো : প্রিয় বস্তু অর্জিত হওয়ার আগে আনন্দিত হওয়া; যখন অর্জন হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত। এই কারণে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ
>
> “আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। আর তাদের পরবর্তী যারা এখনো তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি, তাদের জন্যও তারা আনন্দিত হয়।”[৭৫৯]

اَلْفَرَحُ–এর মধ্যে পরিপূর্ণতার গুণ রয়েছে। এই কারণে আল্লাহ তাআলা আনন্দিত হওয়ার সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ রূপটিকে এর সাথে গুণান্বিত করে উল্লেখ করেছেন। যেমন : যে ব্যক্তি মরুভূমিতে নিজের খাদ্য-পানীয়সহ তার বাহন হারিয়ে ফেলে আর তা পাওয়ার আশা থেকে নিরাশ হয়ে যায়, অতঃপর সে যখন তার বাহন পেয়ে যায়; তখন তার খুশির চেয়ে তাওবাকারীর তাওবার কারণে আল্লাহ তাআলা বেশি খুশি হন।[৭৬০]

মূলকথা ফারাহ্ হলো : সর্বোচ্চ স্তরের আত্মিক আনন্দ, প্রফুল্লতা ও খুশি। আসলে আনন্দ ও প্রফুল্লতা হচ্ছে অন্তরের শান্তি আর দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি হচ্ছে অন্তরের শাস্তি। কোনো বস্তুতে আনন্দিত হওয়া তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার চেয়েও বড়ো বিষয়। কেননা সন্তুষ্টি হলো নিশ্চিন্ততা ও স্থিরতা। আর ফারাহ হলো স্বাদ, আনন্দ ও

---

[৭৫৯] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭০।

[৭৬০] মুসলিম, ২৭৪৪।

প্রফুল্লতা। সুতরাং প্রতিটি আনন্দতেই রয়েছে সন্তুষ্টি। পক্ষান্তরে প্রতিটি সন্তুষ্টিতেই আনন্দ নেই। (অনেক সময় আনন্দ না থাকলেও বিভিন্ন কারণে সন্তুষ্ট হতে হয়।) এই কারণে ফারাহ্ বা আনন্দের বিপরীত হলো হুয্ন বা দুশ্চিন্তা। আর সন্তুষ্টির বিপরীত হলো রাগ। দুশ্চিন্তা মানুষকে ব্যথা দেয়; কিন্তু রাগে মানুষ ব্যথিত হয় না। তবে যখন প্রতিশোধ নিতে অক্ষম হয়, তখন ব্যথা পায়। আল্লাহ্ তাআলাই অধিক জানেন।

*****

৫৩ নং মানযিল

অপরিচিত হয়ে জীবনযাপন করা (اَلْغُرْبَةُ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর আরেকটি মানযিল হলো—অপরিচিত হয়ে জীবনযাপন করার মানযিল।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْ بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ

"তা হলে তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এমন সব লোক কেন থাকল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে লোকদের বাধা দিত? এমন লোক থাকলেও অতি সামান্য সংখ্যকই ছিল। তাদেরকে আমি ওই জাতিদের থেকে রক্ষা করেছি।"[৭৬১]

পৃথিবীতে অপরিচিত বা গুরাবা ব্যক্তির গুণাবলি উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেই নবি ﷺ বলেছেন,

بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيْبًا، وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا، فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ

"ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং অচিরেই আবার তা শুরুর মতো অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের (অর্থাৎ এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের ওপর টিকে থাকবে) তাদের জন্য সুসংবাদ।"[৭৬২]

---

[৭৬১] সূরা হূদ, ১১ : ১১৬।

[৭৬২] মুসলিম, ১৪৫।

আরেকটি হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ

"নিশ্চয়ই ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং অচিরেই আবার তা শুরুর মতো অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের তাদের জন্য সুসংবাদ।"

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, অপরিচিত ব্যক্তি কারা?'

রাসূল ﷺ জবাব দিলেন,

اَلنُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ

"বিভিন্ন গোত্র থেকে যারা হিজরত করে এসেছে।"[৭৬৩]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا، وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং অচিরেই তা আবার শুরুর মতো অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের তাদের জন্য মুবারাকবাদ।"

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, অপরিচিত ব্যক্তি কারা?'

রাসূল ﷺ জবাব দিলেন,

اَلَّذِيْنَ يُحْيُوْنَ سُنَّتِيْ وَيُعَلِّمُوْنَهَا عِبَادَ اللهِ

"ওই সমস্ত ব্যক্তি, যারা আমার সুন্নাহকে জীবিত করে এবং আল্লাহর বান্দাদের তা শিক্ষা দেয়।"[৭৬৪]

---

[৭৬৩] ইবনু মাজাহ, ৩৯৮৮; তিরমিযি, ২৬২৯।

[৭৬৪] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলমি ও ফাদলিহী, ২/৯৯৭।

নাফি' ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি মালিক ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'একবার উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, মুআয ইবনু জাবাল ﵁ কা'বার দিকে বসে কাঁদছেন। তখন উমর ﵁ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবূ আবদির রহমান, কীসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? আপনার ভাই মারা গেছে?' মুআয ﵁ বললেন, 'না; বরং একটি হাদীস যা আমাকে আমার প্রিয় হাবীব ﷺ মাসজিদে থাকাবস্থায় বলেছিলেন।' উমর ﵁ বললেন, 'সেটা কী?' তিনি জবাব দিলেন, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْأَخْفِيَاءَ الْأَحْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَبْرِيَاءَ الَّذِيْنَ إِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا، وَإِذَا حَضَرُوْا لَمْ يُعْرَفُوْا، قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ عَمْيَاءَ مُظْلِمَةٍ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন আত্মগোপনকারী, খালি-পায়ে-থাকা, মুত্তাকী ও সহজ-সরল বান্দাদের, যারা অনুপস্থিত থাকলে তাদের খোঁজ করা হয় না এবং সামনে উপস্থিত থাকলে কেউ তাদের চেনে না। তাদের অন্তরসমূহ হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। তারা সব ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা থেকে নিরাপদে বের হয়ে যায়।"[৭৬৫]

এই সমস্ত ব্যক্তিরাই হলো অপরিচিত বা গুরাবা, যারা প্রশংসিত ও ঈর্ষণীয়। মানুষের মাঝে সংখ্যায় তারা স্বল্প হওয়ার কারণে তাদের নামকরণ করা হয়েছে অপরিচিত বা اَلْغُرَبَاءُ বলে। কারণ তারা যেসব গুণাবলির অধিকারী, অধিকাংশ মানুষই সেসব গুণে গুণান্বিত নয়।

সুতরাং সমস্ত মানুষের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা হলো অপরিচিত বা গুরাবা।

আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে আবার যারা পরিপূর্ণ মুমিন, তারা হলো তাদের মাঝে গুরাবা।

আবার মুমিনদের মধ্যে যারা ইলম অর্জন করেছে, তারা হলো তাদের মাঝে গুরাবা।

আবার ইলমের অধিকারীদের মধ্যে যারা সুন্নাহ ও বিদআতের মাঝে পার্থক্য করতে

[৭৬৫] ইবনু মাজাহ, ৩৯৮৯।

পারে, তারা হলো তাদের মাঝে গুরাবা।

আবার তাদের মধ্যে যারা সুন্নাহর প্রতি আহ্বান করে এবং বিরোধিতাকারীর-দেওয়া-কষ্টে যারা ধৈর্যধারণ করে, তারা হলো তাদের মাঝে সবচেয়ে উঁচু স্তরের গুরাবা। তবে ওপরে বর্ণিত সবাই সত্যিকারার্থেই আল্লাহওয়ালা। তাদের মাঝে কোনো অপরিচিতি নেই। তাদের অপরিচিতি (اَلْغُرْبَةُ) কেবল অন্যান্য মানুষের বিবেচনায়। যেমন আল্লাহ তাআলা অধিকাংশ মানুষের ব্যাপারে বলেছেন,

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

> "যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে।"[৭৬৬]

আসলে অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, দ্বীন ও শারীআ সম্পর্কে জানে না, তাদের কাছে এগুলো অপরিচিত। তাদের এই অজ্ঞতা ও অপরিচিতি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হবে। যদিও তারা বেশ প্রসিদ্ধ এবং তাদের দিকে ইশারা করা হয়।

অপরিচিতির প্রকারভেদ

অপরিচিতি তিন প্রকার :

১. দুনিয়ার সব মানুষের মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীদের অপরিচিতি: এটি এমন অপরিচিতি (বা গুরবাহ) রাসূলুল্লাহ ﷺ যার প্রশংসা করেছেন এবং তিনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার ব্যাপারে বলেছেন بَدَأَ غَرِيبًا "এর সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়" এবং অচিরেই তা আবার শুরুর মতো অপরিচিত হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারীদের তিনি গুরাবা বা অপরিচিত বলে অভিহিত করেছেন।

স্থান, সময় ও সম্প্রদায়ভেদে এই অপরিচিতি পার্থক্য হয়। তবে এই গুণের অধিকারী সবাই আল্লাহওয়ালা। কারণ তারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, রাসূল ﷺ-কে বাদ দিয়ে অন্য কোনো আদর্শের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন না এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা ব্যতীত অন্য কোনো মতাদর্শের প্রতি কাউকে দাওয়াতও দেন না।

---

[৭৬৬] সূরা আনআম, ৬ : ১১৬।

তাদেরর জন্য এই অপরিচিতি একাকিত্ব হয়ে দাঁড়ায় না। বরং মানুষ যখন একাকিত্ব অনুভব করে, তখন তারা (আল্লাহর সাথে) ঘনিষ্ঠ হয়। আর মানুষ যখন পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়, তখন তারা (অপরিচিত হওয়ার কারণে) একাকিত্ব অনুভব করে; (যদিও তারা সবসময় আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ থাকে)। গুরাবা ব্যক্তিবর্গের অভিভাবক আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল এবং মুমিন বান্দারা; যদিও অধিকাংশ মানুষ তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদের বিরোধিতা করে।

অপরিচিত বা গুরাবা শ্রেণির মধ্যে ওই সমস্ত ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত, যাদের কথা আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত এই হাদীসে এসেছে : নবি ﷺ বলেছেন,

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"এলোমেলো অগোছালো চুলবিশিষ্ট, ধূলিমলিন ও পুরাতন দুখানা ছেঁড়া কাপড় পরিহিত এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা হয় না। অথচ তারা আল্লাহর নামে কসম করলে, আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেন।"[৭৬৭]

হাসান বস্‌রি ﷺ বলেছেন, 'দুনিয়াতে মুমিন ব্যক্তি হলেন অচেনা লোকের মতো; যিনি অপমানে ধৈর্যহারা হন না, সম্মান অর্জনে প্রতিযোগিতাও করেন না। মানুষ থাকে এক অবস্থায় আর তিনি থাকেন আরেক অবস্থায়। মানুষজন তার থেকে শান্তি ও স্বস্তিতে থাকে; কিন্তু তিনি নিজের (আমল) নিয়ে বেশ পরিশ্রমের মধ্যে থাকেন।'[৭৬৮]

এই সমস্ত অপরিচিত বা গুরাবাদের ব্যাপারে স্বয়ং নবি ﷺ ঈর্ষাবোধ করেছেন। তাদের বৈশিষ্ট্য হলো : তারা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে; যখন মানুষ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দ্বীনের নামে লোকজন নতুন যা উদ্ভাবন করে, তারা তা পরিত্যাগ করে; যদিও মানুষের নিকট তা খুব প্রসিদ্ধ কোনো রীতি হোক না কেন। তারা তাওহীদকে খাঁটি রাখে; যদিও অধিকাংশ মানুষ তা অস্বীকার করে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারও প্রতি সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকে; তারা না কোনো শাইখের প্রতি সম্পৃক্ত হয় আর না কোনো পথ বা দলের প্রতি। বরং

---

[৭৬৭] তিরমিযি, ৩৮৫৪; মুসলিম, ২৬২২; ইবনু হিব্বান, ৬৪৮৩।

[৭৬৮] ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৩/১১২৬; ইবনু আবী শাইবা, ৩৫২১০।

তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার অনুসরণের সাথেই সম্পৃক্ত থাকে। তারাই সত্যিকারার্থে জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণকারী। আর অধিকাংশ মানুষ; বরং বলা যায় সমস্ত মানুষই তাদেরকে তিরস্কার করে। মানুষজনের সাথে অপরিচিতির কারণে মানুষ তাদেরকে বৃহৎ দল থেকে বিচ্ছিন্ন, আলাদা ও পথভ্রষ্ট হিসেবে গণ্য করে!

আসলে যে মুমিন আল্লাহর পথ অনুসরণ করে জীবন কাটায়, সে কীভাবেই-বা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে থাকবে না, যারা সবসময় নিজেদের খেয়াল-খুশি আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে!?

আর এ কারণেই বর্তমান সময়ের একজন সত্যবাদী খাঁটি মুসলিম, যে দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে, তার প্রতিদান হবে পঞ্চাশজন সাহাবির প্রতিদানের সমান।

'সুনানু আবী দাউদ'-এ এসেছে, আবূ সা'লাবা খুশানি ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ

"হে ঈমানদারগণ, নিজেদের কথা চিন্তা করো, অন্য কারোর গোমরাহিতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, যদি তোমরা নিজেরা সত্য সঠিক পথে থাকো।"[৭৬৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন,

بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُّطَاعًا، وَهَوًى مُّتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ - يَعْنِيْ - بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، اَلصَّبْرُ فِيْهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ

"বরং তোমরা পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ দাও এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখো। অবশেষে যখন দেখবে, কৃপণতার আনুগত্য

[৭৬৯] সূরা মায়িদা, ৫ : ১০৫।

করা হচ্ছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে আর প্রত্যেকেই নিজের মতকে প্রাধান্য দিচ্ছে, তখন তুমি নিজের ব্যাপারে যত্নবান হোয়ো এবং জনসাধারণের সংশোধন-চিন্তা পরিত্যাগ কোরো। কেননা তোমাদের সামনে ধৈর্য ধরার যুগ আসছে, যখন ধৈর্য ধরা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখার মতো কষ্টকর হবে। সে সময় আমলকারীকে তার মতো পঞ্চাশজন আমলকারীর আমলের সমান সাওয়াব দেওয়া হবে।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, তাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন?

জবাবে তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজনের সমান সাওয়াব দেওয়া হবে।"[৭৭০]

এই বিশাল সাওয়াব প্রাপ্তির কারণ হলো : মানুষের মাঝে অজ্ঞাত ও অপরিচিত হয়ে থাকা এবং লোকজন যেখানে প্রবৃত্তি আর খাহেশাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা।

২. অপরিচিতির দ্বিতীয় প্রকার—নিন্দিত অপরিচিতি : এটি হলো বাতিলপন্থি ও পাপাচারীদের অপরিচিতি। তারা আল্লাহর সফলতাপ্রাপ্ত দল থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও তারা একাকী ও নিঃসঙ্গ। কারণ তারা পৃথিবীবাসীর কাছে পরিচিত, কিন্তু আসমানবাসীর নিকট অপরিচিত।

৩. সাধারণ অপরিচিতি : যা প্রশংসিতও নয় আবার ঘৃণিতও নয়। এটি হলো নিজ ঘরবাড়ি থেকে দূরে গিয়ে অপরিচিত হয়ে থাকা। কেননা এই দুনিয়াতে সব মানুষই গৃহহীন, অপরিচিত। কারণ এখানে কারও কোনো স্থায়ী ঘর নেই আর এর জন্য মানুষজনকে সৃষ্টিও করা হয়নি। নবি ﷺ আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵄-কে বলেছিলেন,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ

"তুমি দুনিয়াতে অবস্থান করো যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা পথচারী।"[৭৭১]

---

[৭৭০] আবু দাউদ, ৪৩৪১; তিরমিযি, ৩০৬০।

[৭৭১] বুখারি, ৬৪১৬; তিরমিযি, ২৩৩৩; ইবনু মাজাহ, ৪১১৪।

দুনিয়ার বাস্তবতা আসলে এমনই। বিষয়টি অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে এবং এর সঠিক পরিচয় হাসিল করতে (কুরআন-হাদীসে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আর কীভাবেই-বা মানুষ এই দুনিয়াতে মুসাফির হিসেবে থাকবে না? সে তো সর্বদাই সফর করে চলেছে! তার এই সফর কেবল কবরবাসীদের নিকট পৌঁছার পরেই ক্ষান্ত হবে। আসলে মানুষ হচ্ছে বসে-থাকা-অবয়বে চলন্ত মুসাফির। কবি বলেন,

وَمَا هٰذِهِ الْأَيَّامُ إِلَّا مَرَاحِلُ *** يَحُثُّ بِهَا دَاعٍ إِلَى الْمَوْتِ قَاصِدُ

وَأَعْجَبُ شَيْءٍ لَوْ تَأَمَّلْتَ أَنَّهَا *** مَنَازِلُ تُطْوٰى وَالْمُسَافِرُ قَاعِدُ

এই সব দিনরাত্রি কেবলই একেকটা করে মানযিল,
এর দ্বারা মৃত্যুর দূত সবাইকে আমলে উদ্‌বুদ্ধ করছে।
তবে যদি চিন্তা করেন সবচেয়ে আশ্চর্যের যা দেখবেন :
মানযিলসমূহ রয়েছে গুটানো আর মুসাফিররা উপবিষ্ট।

*****

৫৪ অধ্যায়

জীবন বা প্রাণশক্তি (اَلْحَيَاةُ)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

"আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি...।"[৭৭২]

এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : যে ব্যক্তির অন্তর মৃত ছিল; যার মাঝে ইলম, হিদায়াত ও ঈমান নামক রূহ ছিল না; পরে আল্লাহ তাকে দেহ-সচল-রাখার রূহ ব্যতীত ভিন্ন এক প্রকার রূহের মাধ্যমে জীবন দান করেছেন। আর তা হলো আল্লাহ তাআলার পরিচয়, তাওহীদ, মহাব্বত এবং এককভাবে কেবল তাঁরই ইবাদাত করা; যাঁর কোনো শরীক নেই। কারণ এগুলো ছাড়া রূহও নিষ্প্রাণ। এগুলোর অভাবে (মানুষ) মৃত ব্যক্তিদের দলভুক্ত বলে গণ্য হয়। এ কারণেই যারা এসব গুণে গুণান্বিত নয়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মৃত বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

"আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি...।"[৭৭৩]

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

"আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও নয়, যখন

---

[৭৭২] সূরা আনআম, ৬ : ১২২।

[৭৭৩] সূরা আনআম, ৬ : ১২২।

তারা পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যায়।"[৭৭৪]

আল্লাহ তাআলা ওহির নামকরণ করেছেন 'রূহ' দ্বারা। কারণ ওহির মাধ্যমেই অন্তরাত্মা জীবন পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ

"আমি আমার নির্দেশে আপনার কাছে এক রূহকে ওহি হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনি জানতেন না কিতাব কী আর ঈমানই বা কী? কিন্তু আমি সেই রূহকে একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ দেখাই।"[৭৭৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, ওহি হলো রূহ; যার মাধ্যমে জীবন হাসিল হয় এবং এটি হলো নূর বা আলো; যার দ্বারা পথ পাওয়া যায় এবং জ্যোতি অর্জন করা যায়।

সুতরাং ওহি হলো রূহের জীবন, যেমন রূহ হলো শরীরের জীবন। এই কারণে যে এই রূহ (ওহি) থেকে বঞ্চিত, সে দুনিয়া-আখিরাতের উপকারী জীবন থেকে বঞ্চিত। দুনিয়ার জীবনে তার জীবন হয় জন্তু-জানোয়ারের জীবন এবং অতি সংকীর্ণ জীবন। আর আখিরাতে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; যেখানে সে মৃত্যুবরণও করবে না, আবার জীবিতও থাকবে না।

অপরদিকে যারা সৎকর্ম করে এবং আল্লাহর পরিচয় অর্জনে, তাঁর মহাব্বতে ও তাঁর ইবাদাতে ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম ও প্রশান্তিময় জীবন দান করেন। যেমন তিনি বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"পুরুষ হোক বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তা হলে

---

[৭৭৪] সূরা নামল, ২৭ : ৮০।

[৭৭৫] সূরা শূরা, ৪২ : ৫২।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ

"যারা সৎকাজ করে, তাদের জন্য এ জগতে কল্যাণ রয়েছে এবং আখিরাতের আবাস তো তাদের জন্য আরও উত্তম।"[৭৭৯]

আল্লাহ তাআলার যিক্‌র, মহাব্বত, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি ধাবিত হওয়া দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম জীবনের নিশ্চয়তা দান করে। পক্ষান্তরে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকা, পাপাচারে ডুবে যাওয়া এবং সৎকাজকে উপেক্ষা করে চলা দুনিয়া ও আখিরাতে সংকীর্ণ ও সংকুচিত জীবন টেনে আনে।

জীবনের অনেকগুলো স্তর রয়েছে :

এক. মূর্খতার মৃত্যু থেকে ইলমের মাধ্যমে জীবন লাভ করা; কেননা মূর্খ মানুষের মূর্খতা মৃত্যুর সমতুল্য। যেমন কবি বলেন,

وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ لِأَهْلِهِ *** وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُوْرِ قُبُوْرُ

وَأَرْوَاحُهُمْ فِيْ وَحْشَةٍ مِنْ جُسُوْمِهِمْ *** فَلَيْسَ لَهُمْ حَتَّى النُّشُوْرِ نُشُوْرُ

মূর্খ ব্যক্তির মূর্খতার মাঝে মৃত্যুর পূর্বেই রয়েছে মৃত্যু;
কবরস্থ হওয়ার আগেই কবর হয়ে যায় তাদের শরীর।
তাদের দেহ ছাড়িয়ে তাদের অন্তরে থাকে নিঃসঙ্গতা;
মহাজাগরণের পূর্বে আর হয় না তাদের জেগে ওঠা।

আসলে জাহিল ব্যক্তিরা অন্তর ও রূহের দিক দিয়ে মৃত। যদিও তাদের দেহ থাকে জীবিত। তার শরীর একটা কবর; যা নিয়ে সে জমিনের বুকে হেঁটে বেড়ায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

"আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি...।"[৭৮০]

---

[৭৭৯] সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৩০।

[৭৮০] সূরা আনআম, ৬ : ১২২।

তিনি আরও বলেন,

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

"এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন। যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৭৮১]

তিনি আরও বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۝

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে শুনান। আর যারা কবরে রয়েছে, আপনি তাদেরকে শুনাতে পারবেন না।"[৭৮২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের মৃত্যুর কারণে তাদেরকে কবরবাসীদের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ তাদের রূহ প্রাণহীন আর তাদের শরীর পরিণত হয়েছে (জীবন্ত) কবরে। তাই কবরবাসীদেরকে যেমন কোনোকিছু শুনানো যায় না, তেমনি তাদেরকেও কিছু শুনানো যায় না। জীবন তো অনুভূতি ও নড়াচড়া করা এবং এ দুটির সংশ্লিষ্টতার নাম। তাই অন্তরও যখন ইলম ও ঈমানকে অনুভব করে না এবং এসবের কারণে জেগে ওঠে না, তখন তা প্রকৃত মৃত্যুরই শামিল। এখানে যে সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে তা শরীরের মৃত্যুর কারণে নয়; বরং তা হলো অন্তর ও রূহের মৃত্যুর কারণে।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ তার 'কিতাবুয যুহ্দ'-গ্রন্থে লোকমান হাকীমের কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন :

يَا بُنَيَّ، جَالِسِ الْعُلَمَاءَ وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ فَإِنَّ اللهَ يُحْيِي الْقُلُوْبَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ

'ছেলে আমার, উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে যাবে, তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসবে। কারণ আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞার আলো দিয়ে অন্তরকে জীবিত করেন; যেমন মৃত জমিনকে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে

[৭৮১] সূরা ইয়া-সীন, ৩৬ : ৬৯-৭০।
[৭৮২] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২২।

জীবিত করেন।'[৭৮৩]

মুআয ইবনু জাবাল ﷺ বলেছেন, 'ইলম অর্জন করুন। কারণ আল্লাহর জন্য ইলম শেখা অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে, ইলম অন্বেষণ করা ইবাদাত, তা নিয়ে আলোচনা করা তাস্‌বীহ, এতে গবেষণা করা জিহাদ, যে জানে না তাকে শিক্ষা দেওয়া সদাকা, উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য তা খরচ করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম; কারণ ইলম হলো হালাল-হারামের নিদর্শন, ইলম জান্নাতের পথ দেখায়, নিঃসঙ্গতায় সঙ্গ দেয়, একাকিত্ব দূর করে, নির্জনতায় আলাপ করে, সুখে-দুঃখে পাশে থাকে, শত্রুর মোকাবিলায় অস্ত্র হিসেবে কাজ করে, বন্ধুদের নিকট সুশোভিত করে তোলে, আল্লাহ তাআলা ইলমের মাধ্যমে অনেকের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, তাদেরকে কল্যাণকর কাজে ইমাম ও নেতা বানিয়ে দেন; যার ফলে তাদের কাজকর্মের অনুসরণ করা হয়, তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ফায়সালা করা হয়, ফেরেশতারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয়, তাদের পদতলে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দিয়ে সম্মান দেখায়, শুকনো ও সিক্ত প্রতিটি বস্তু তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, জল-স্থলের সমস্ত প্রাণী তাদের জন্য দুআ করতে থাকে; কারণ ইলম মূর্খতা থেকে অন্তরকে জীবিত করে, অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে চোখের জন্য প্রদীপের ভূমিকা রাখে, ইলমের মাধ্যমে ব্যক্তি দুনিয়া-আখিরাতে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করে নেয়, ইলম নিয়ে চিন্তাভাবনা করা সিয়াম পালনের সমতুল্য, এ ব্যাপারে পরস্পর আলোচনা করা তাহাজ্জুদ আদায়ের সমপর্যায়ের, এর মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো সুদৃঢ় রাখা যায়, হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের পরিচয় পাওয়া যায়, ইলম হলো আমলের ইমাম আর আমল হলো তার অনুসারী, সৌভাগ্যবানদের ইলম দান করা হয় আর দুর্ভাগাদের ইলম থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।'[৭৮৪]

অনেকেই এই রিওয়ায়াতটিকে নবি ﷺ-এর বাণী বলে বর্ণনা করেন; তবে এটি সাহাবির কথা হিসেবেই অধিক বিশুদ্ধ।

দুই. হিম্মত ও ইচ্ছাশক্তির জীবন : মানুষের অন্তর যখন দুর্বল থাকে, তখন তার হিম্মত ও সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ে। আর অন্তর যখন প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকে,

[৭৮৩] আহমাদ, কিতাবুয যুহ্‌দ, ৫৫২; মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ৩৬৭০।

[৭৮৪] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলমি ও ফাদলিহী, ২৬৯; যামাখশারি, রবিউল আবরার, ৪/১৫।

তখন হিম্মত থাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের এবং তখন তার ভালোবাসা ও ইচ্ছাও হয় শক্তিশালী। কেননা ইচ্ছা ও ভালোবাসা হয় প্রিয় ব্যক্তির প্রতি অনুভূতি এবং অন্তর সুস্থ থাকা অনুপাতে; অন্তরের বিভিন্ন অসুস্থতা ব্যক্তির মাঝে এবং তার ইচ্ছা ও চাওয়ার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। (ফলে ভালোবাসা ও সংকল্পে ঘাটতি আসে।)

সুতরাং হিম্মত ও ইচ্ছাশক্তিতে দুর্বলতা আসার কারণ হয়তো অনুভূতি ও উপলব্ধির ঘাটতি অথবা প্রাণশক্তিতে দুর্বলতা আনে এমন রোগের উপস্থিতি। ইচ্ছা ও উপলব্ধি শক্তিশালী হওয়া প্রাণশক্তি শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এমনিভাবে ইচ্ছা ও উপলব্ধি দুর্বল হওয়া প্রাণশক্তি দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেরকমভাবে উচ্চ হিম্মত পরিপূর্ণ প্রাণশক্তির প্রমাণ বহন করে। পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র জীবন লাভের জন্য এগুলো হলো মাধ্যম। কেননা উত্তম, পবিত্র ও প্রশান্তিময় জীবনের নাগাল তো উচ্চ হিম্মত, খাঁটি ভালোবাসা এবং ভরপুর ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই পাওয়া যায়। এগুলোর পরিমাণ অনুপাতে উত্তম ও প্রশান্তিময় জীবন লাভ হয়। যার হিম্মত, ভালোবাসা ও কোনোকিছু অর্জনের ইচ্ছাশক্তি যত কম ও দুর্বল, তার জীবন তত যন্ত্রণার ও নিম্নমানের। সেসময় তার জীবনের চেয়ে পশুপাখির জীবন উত্তম বলে বিবেচিত হয়।

যেরকমভাবে খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে প্রাণশক্তি আসে, ঠিক তেমনি অন্তরও প্রাণবন্ত হয় অবিরাম আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর প্রতি ধাবমানতা এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

অন্তরে শেকড়-গেড়ে-বসা গাফলতি, নোংরা-অশ্লীলতার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ততা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যক্তির প্রাণ ও জীবনীশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এই দুর্বলতা ও নিস্তেজতা বাড়তেই থাকে। অবশেষে তা অন্তরকে মেরে ফেলে। অন্তরের মৃত্যুর আলামত হলো ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলে বোঝার অনুভূতি হারিয়ে ফেলা।

প্রকৃত মানুষ তো সে-ই ব্যক্তি, যে তার অন্তরের মৃত্যুর ভয় করে, তার দেহের মৃত্যুর নয়। কারণ অধিকাংশ মানুষই তাদের শারীরিক মৃত্যুর ভয়ে ভীত; কিন্তু অন্তরের মৃত্যুর কোনো পরোয়াই করে না। তারা বাহ্যিক এই জীবন ব্যতীত আর

কোনো জীবনের কথা জানেই না। এটি আসলে কল্‌ব ও রূহের মৃত্যুর কারণে হয়ে থাকে। কেননা বাহ্যিক এই জীবন আসলে ক্ষণস্থায়ী কোনো ছায়ার মতো অথবা দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া কোনো ঘাসের মতো কিংবা ঘুমের ঘোরে দেখা আপাত সত্য কোনো স্বপ্নের মতো; ঘুম ভেঙে গেলে পরে এই উপলব্ধি হয় যে, এর সবই ছিল কল্পনা। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তিকে পার্থিব এই দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ সবকিছু দিয়ে দেওয়া হয়; অতঃপর মৃত্যু এসে তার কাছে উপস্থিত হয়, তা হলে তার অবস্থা হবে সেই ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো; যে স্বপ্নে আনন্দদায়ক অনেক কিছু দেখে, এরপর জেগে উঠে দেখে তার হাতে কিছুই নেই।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'মৃত্যু দুই প্রকার : স্বেচ্ছায় মৃত্যু এবং স্বাভাবিক মৃত্যু। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবে, স্বাভাবিক মৃত্যু তার জন্য (প্রকৃত) জীবন হবে।'

এর ব্যাখ্যা হলো : স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করার মানে হচ্ছে খাহেশাত ও প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমিয়ে রাখা, এর জ্বলন্ত আগুনকে নিভিয়ে দেওয়া এবং এর ধ্বংসাত্মক উত্তেজনাকে শান্ত করা। এর ফলে ব্যক্তির কীসে পূর্ণাঙ্গতা ও সফলতা তা নিয়ে অন্তর ও রূহ চিন্তাভাবনা করার এবং তাতে নিমগ্ন হওয়ার সুযোগ পায়। তখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী ছায়াকে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির ওপর প্রাধান্য দেওয়া সর্বোচ্চ ক্ষতির কারণ।

এটি এমন একটি বিষয়, যা কেবল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বুঝতে পারে। আর এর দাবি অনুযায়ী কেবল উচ্চ মনোবল ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিরাই আমল করে থাকে।

তিন. সুন্দর গুণাবলি ও উত্তম আচরণের প্রাণশক্তি : এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির সুদৃঢ় ও শক্তিশালী জীবন হাসিল হয়। এই ব্যক্তির জন্য পরিপূর্ণতার স্তরে পৌঁছাতে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। তার উত্তম আখলাক ও প্রশংসনীয় গুণাবলির কারণে এর জন্য তাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যদি গুণাবলি থেকে সে পৃথক হয়ে যায়, তা হলে তার তবিয়ত ও সহজাত বৈশিষ্ট্য থেকেই সে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি সৃষ্টিগতভাবেই লাজুকতা, পবিত্রতা, উদারতা, দানশীলতা, মানবিকতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত সেই ব্যক্তির জীবন ওই ব্যক্তির জীবনের তুলনায় পরিপূর্ণ, যে নিজের

নফসের সাথে মুজাহাদা ও কঠোর পরিশ্রম করে এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। কেননা এই ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে অসুস্থতা থেকে ওযুধ সেবনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করেছে। আসলে যে রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করেছে আর যে আগে থেকেই সুস্থ—এই দুই ব্যক্তি যেমন শারীরিক দিক থেকে এক নয়, তেমনি তারাও সমশ্রেণির হয় না।

যখন কারও মাঝে সুন্দর গুণাবলির পূর্ণ সমাবেশ ঘটবে, তখন তার জীবনীশক্তিও বেশ শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ হবে। এ কারণেই লাজুকতার গুণটি (اَلْحَيَاءُ) শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়েই জীবনীশক্তি (اَلْحَيَاةُ) থেকে উৎসারিত হয়েছে। ফলে পরিপূর্ণ জীবনীশক্তির অধিকারী ব্যক্তির লাজুকতাও বেশি থাকে। আর যার লাজুকতা কম তার জীবনীশক্তিতেও ঘাটতি থাকে। কেননা রূহ যখন মারা যায়, তখন খারাপ ও নোংরা কিছুর কারণে তার কোনো ব্যথা অনুভূত হয় না। ফলে সে কোনো লজ্জা অনুভব করে না। আর যদি কল্‌ব ও রূহ জীবিত থাকে, তা হলে তা অশ্লীলতা অনুভব করে এবং তাতে লজ্জা পায়। এমনিভাবে অন্যান্য উত্তম গুণাবলির ক্ষেত্রেও একই কথা। প্রাণশক্তির পূর্ণতায় সেগুলোও পূর্ণতা পায় এবং প্রাণশক্তির ঘাটতিতে সেগুলোতেও ঘাটতি আসে।

চার. আনন্দ, খুশি ও আল্লাহর প্রতি চোখের শীতলতার জীবন : এই স্তরের জীবন লাভ হয় উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পরে। যার দ্বারা এর অন্বেষণকারীর চক্ষু শীতল হয়। এটি ব্যতীত কোনো উপকারী জীবন নেই। এ রকম জীবন লাভের জন্যই সমস্ত মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বাদে সবাই ভুল পথে পা বাড়ায়, বিভিন্ন পথে ঘুরতে থাকে। সবাই এই জীবনেরই সন্ধান করে; কিন্তু অধিকাংশই এর থেকে বঞ্চিত থাকে।

বঞ্চিত থাকার কারণ হলো : বুদ্ধির স্বল্পতা, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকরণে দুর্বলতা, দূরদর্শিতা, উচ্চ মনোবল ও হিম্মতের অভাব। কারণ এর উপকরণ হলো সুউচ্চ মনোবল এবং শাণিত অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা; যা অন্ধ ব্যক্তিকেও পথ দেখায়, পরিপূর্ণ জ্যোতিতে তাকে আলোকিত করে। উপরিউক্ত দোষত্রুটিগুলো কখনো কখনো সৃষ্টিগতভাবেই থাকে, আবার কখনো বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হয়।

মোটকথা জীবনের এই স্তরটিই সর্বোচ্চ মর্যাদার স্তর। কিন্তু এই স্তরে সেই ব্যক্তি

কীভাবে পৌঁছুবে, যার বুদ্ধি-বিবেচনা সবসময় খাহেশাত আর প্রবৃত্তির শহরেই বন্দি থাকে, যার আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাদ আর বিলাসিতার অনুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ, যার জীবন কেটে যায় মন্দ স্বভাবের তাড়নায়, যার দ্বীন গুনাহ আর অপকর্মের কারণে ধ্বংস হওয়ার দ্বারপ্রান্তে, যার মনোবল নিম্ন পর্যায়ের আর যার আকীদা-বিশ্বাস নববি আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত!?

আপনি যদি প্রশ্ন করেন : আপনি যে জীবনের কথা বললেন, যে জীবন থেকে অধিকাংশ মানুষই বঞ্চিত এবং মৃত—সে জীবনে পৌঁছার পথ সম্পর্কে কি বিশদ বিবরণ দিতে পারবেন, যাতে আমি সেখানে পৌঁছতে পারি, তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারি? এবং যাতে আমার সামনে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমরা যে জীবনযাপন করছি তা পশু-প্রাণীর জীবন, কখনো কখনো আমাদের থেকে পশুর জীবনও উত্তম হয়ে ওঠে, তারা গুনাহ ও অপকর্ম থেকে মুক্ত এবং তাদের কোনো শেষ পরিণতি নেই বলে!

তা হলে আমি বলব : আল্লাহর শপথ! আপনার এই জীবনের প্রতি আগ্রহ, এর সম্পর্কে জানা ও জ্ঞান লাভ করার যে উদ্দীপনা তা-ই প্রমাণ করে যে আপনি জীবন্ত, নিশ্চিতভাবেই আপনি অন্যান্য মৃতদের কাতারে না।

এ পথের প্রথম কাজ হলো আল্লাহ তাআলাকে চিনে নেওয়া এবং এমন পন্থা অবলম্বন করা, যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে এবং দূরদর্শিতার উজ্জ্বলতায় স্বভাবের সব অন্ধকার দূর করে দেবে; ফলে অন্তরে আখিরাতের দিকে আহ্বানকারী একজন নিযুক্ত হবে, যে তাকে পরিপূর্ণভাবে সে দিকে টেনে নেবে, ধ্বংসশীল সমস্ত সম্পর্ক থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, খাঁটি তাওবা করতে উদ্‌বুদ্ধ করবে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব আদেশ পালন করতে এবং নিষেধকৃত সব কাজকর্ম পরিত্যাগ করতে উদ্দীপনা জোগাবে; অতঃপর তার অন্তরে প্রহরী হিসাবে অবস্থান করবে, ফলে আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন এমন প্রতিটি চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে কোনো ছাড় দেবে না এবং অহেতুক অপকারী ভাবনা থেকেও (অন্তরকে) দূরে রাখবে। যার দরুন অন্তর কুচিন্তা ও ওয়াসওয়াসা থেকে স্বচ্ছ হবে। তখন আল্লহ তাআলার স্মরণে, তাঁর ভালোবাসায় এবং তাঁর দিকে ধাবিত হতে অন্তর মুক্ত হবে। নফস ও সৃষ্টিগত তবিয়তের খোলস থেকে বেরিয়ে আপন রবের সান্নিধ্য ও স্মরণে নিমগ্ন হবে। যেমন কবি বলেন,

وَأَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْبُيُوتِ لَعَلَّنِيْ ••• أُحَدِّثُ عَنْكَ النَّفْسَ بِالسِّرِّ خَالِيَا

ঘরবাড়ি ছেড়ে আমি বেরিয়ে এসেছি এই আশায় বেঁধে মন,
নির্জনতায় তোমার সাথে হবে হৃদয়ের গোপন কথোপকথন।

আসলে তখন তার অন্তর, চিন্তা-চেতনা, হৃদয়ে উদিত ভাবনা, আল্লাহর সন্ধান করা এবং আল্লাহর প্রতি আগ্রহ—এ সবই আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়।

এ ব্যাপারে সে একনিষ্ঠ ও সত্যবাদী হলে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসা দান করা হবে, নবি ﷺ-এর রূহানিয়্যাত তার অন্তরে স্থান করে নেবে। ফলে সে নবিজিকে নিজের ইমাম, পথপ্রদর্শক, শিক্ষক, শাইখ ও নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। যেভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবি, রাসূল ও তাঁর দিকে পথ প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন। এরপর সে নবি ﷺ-এর সীরাত, তাঁর প্রাথমিক বিষয়াদি, কীভাবে তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হতো ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করবে, তাঁর গুণাবলি, আখলাক-চরিত্র, আচার-আচরণ, চলাফেরা, জাগরণ-নিদ্রা, ইবাদাত-বন্দেগি, নিজ পরিবারের লোকজন এবং সাথিসঙ্গীদের সাথে আচার-ব্যবহারে রীতিনীতি কেমন ছিল তাও জানতে থাকবে। এক পর্যায়ে তার অবস্থা এমন হবে, যেন সে নবি ﷺ-এর সঙ্গী হয়ে তাঁর সাথে অবস্থান করছে।

তার অন্তর যখন এ বিষয়টিতে মজবুত ও দৃঢ় হবে, তখন তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-ওহি বোঝার যোগ্যতা দান করা হবে; তা এমনভাবে যে, যদি কোনো সূরা পাঠ করে, তা হলে যে বিষয়ে তা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা দ্বারা যে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, তার অন্তর সেটা প্রত্যক্ষ করবে। সেই সূরা থেকে প্রশংসনীয় গুণাবলি, আদব-আখলাক গ্রহণ করবে, তাতে পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে পরিশ্রম করবে এবং অপছন্দনীয় বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে; যেমন ভয়ংকর কোনো অসুখ থেকে সুস্থতা লাভ করতে চেষ্টা করে থাকে।

এতে সফল হলে তার অন্তরে ভিন্ন একটি চোখ খুলে যাবে, যার দ্বারা সে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি দেখতে পাবে। একসময় তার অন্তর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার মতো অবস্থায় পৌঁছে যাবে। ফলে সে সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহ তাআলার কার্যক্রম দেখতে পাবে। সে দেখতে পাবে আল্লাহর আরশে সমাসীন হওয়া, তাঁর নিকট থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর বিভিন্ন হুকুম অবতীর্ণ হওয়া, ওহি নিয়ে জিবরীলের

সাথে কথা বলা, তাকে যা ইচ্ছা যার নিকট ইচ্ছা পাঠিয়ে দেওয়া, সমস্ত বিষয়াদি আল্লাহর নিকট আসা, আল্লাহর সামনে পেশ করা ইত্যাদি।

এর ফলে তার অন্তর আল্লাহ তাআলাকে প্রত্যক্ষ করবে যে, তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর প্রতাপশালী, আদেশদাতা, নিষেধকারী, নবি-রাসূল প্রেরণকারী, আসমানি কিতাব অবতীর্ণকারী এবং তিনি হলেন অনুসরণীয় মা'বূদ, যাঁর কোনো শরীক নেই, সমকক্ষ ও সদৃশ নেই, যাঁর সাথে কোনো বিষয়ে কারও অণুপরিমাণও অংশীদারত্ব নেই, বরং সমস্ত বিষয় রয়েছে কেবল তাঁরই কবজায়। সে আল্লাহর রাজত্ব ও ক্ষমতা সরাসরি দেখতে পাবে—নড়াচড়া করা, স্থির থাকা, উপকার করা, ক্ষতি করা, দান করা, দান করা থেকে বিরত থাকা, সম্প্রসারিত হওয়া, সংকুচিত হওয়া সবই কেবল তাঁরই ক্ষমতায় ও পরিচালনায় পরিচালিত হয়। সে দেখতে পাবে পুরা সৃষ্টিজগৎ তাঁর হুকুমেই পরিচালিত। তবে তিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁকে কেউ চালিত করে না; বরং তিনিই সবকিছুকে পরিচালিত করেন।

যখন ব্যক্তির অন্তরে এই বিষয়গুলো বসে যায়, তখন তার সামনে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সান্নিধ্যের দরজা উন্মুক্ত করা হয়। ফলে আসমানের ওপরে আল্লাহর আরশে সমাসীন থাকা, সৃষ্টিজগৎ থেকে পৃথক থাকা, সবকিছু পরিচালনা করা, সৃষ্টি করা, আদেশ দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় সক্রিয়তা সত্ত্বেও সে নিজের সাথে আল্লাহকে দেখতে পায়, তার থেকে তিনি কখনো অনুপস্থিত থাকেন না, বরং তিনি তার নিকটেই অবস্থান করেন। শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে সে আল্লাহর এই সমস্ত সিফাতসহ তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে। নিঃসঙ্গতার পরে তার এই সঙ্গ লাভ হয়, দুর্বলতার পরে এর মাধ্যমে সে শক্তিশালী হয়, পেরেশানি ও অস্থিরতার পরে সে এর দ্বারা আনন্দিত হয়, নিঃস্ব অবস্থা দূর হয়ে সে প্রাচুর্যতার অধিকারী হয়। এ পর্যায়ে এসে সে রাসূল ﷺ-এর বর্ণিত এই হাদীসের স্বাদ অনুভব করে—

> وَلَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ، وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ، وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِىْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَأُعِيذَنَّهُ
>
> "আমার বান্দা নফল আমল দ্বারা প্রতিনিয়ত আমার অধিক নৈকট্য হাসিল করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর

> যখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার কাছে কোনোকিছু চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে নিশ্চিতভাবেই আমি তাকে আশ্রয় দিই।"[৭৮৫]

উত্তম ও প্রশান্তিময় জীবন বলতে এই ব্যক্তির জীবনকেই বোঝায়। সে আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন, সে আল্লাহর নিকটবর্তী, আল্লাহও তার নিকটবর্তী। তার অন্তরে আল্লাহর প্রভাব প্রকট হওয়ার কারণে, সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করার কারণে এবং তার ইচ্ছা আল্লাহর সন্তুষ্টির অধীন হওয়ার কারণে সে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়। এমনকি সে আল্লাহর কান, চোখ, হাত ও পায়ে পরিণত হয়। আর এগুলো হলো তার উপলব্ধি, আমল ও কাজকর্ম করার মাধ্যম। সুতরাং সে যদি শোনে আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ই শোনে, যদি দেখে আল্লাহর প্রিয় বস্তুই দেখে, যদি কিছু ধরে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ধরে আর যদি চলে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই চলে।

বিষয়টির উপলব্ধি যদি আপনার কাছে কঠিন মনে হয় যে, পরিপূর্ণ ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তি তার প্রিয় মানুষের কান দিয়ে শুনবে, তার চোখ দিয়ে দেখবে, তার হাত দিয়ে ধরবে, তার পা দিয়ে হাঁটবে; অথচ সে তার থেকে অনুপস্থিত!? তা হলে আপনি এর থেকে চোখ বন্ধ করে রাখুন এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য ছেড়ে দিন। কবি বলেন,

خَلِّ الْهَوَى لِأُنَاسٍ يُعْرَفُوْنَ بِهِ *** قَدْ كَابَدُوا الْحُبَّ حَتَّى لَانَ أَصْعَبُهُ

কিছু মানুষের জন্য ছেড়ে দিন ভালোবাসার বিষয়,
ভালোবাসার মাধ্যমেই পাওয়া যায় তাদের পরিচয়।
ভালোবাসার জন্য তারা করে বেশ কঠোর পরিশ্রম;
ফলে অতি কষ্টের বস্তুও তাদের জন্য হয় মনোরম।

---

[৭৮৫] বুখারি, ৬৫০২।

পাঁচ. শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে রূহের জীবন : দুনিয়ার এই জেলখানা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাবার পর রূহ আসল জীবন লাভ করে। কারণ দুনিয়ার ওপারেই রয়েছে প্রশস্ততা, আরাম-আয়েশ আর পরিপূর্ণ সুখের জীবন। রূহের নিকট আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে মায়ের পেটের মতো কিংবা তার চেয়েও সংকীর্ণ মনে হয়।

আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ বলেছেন, 'দুনিয়া থেকে বের হওয়ার জন্য তোমার তৎপরতা হোক ঠিক সেরকম, যেরকম সংকীর্ণ কারাগার থেকে প্রিয়জনদের নিকট ফিরে যেতে এবং তাদের সাথে মনোরম পরিবেশে একত্রিত হতে তৎপর থাকো।'

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾

"যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; তা হলে তার জন্য রয়েছে আরাম-আয়েশ, উত্তম রিয্ক এবং নিয়ামাতে-ভরা-উদ্যান।"[৭৮৬]

আখিরাতের জীবন সুখময় হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সেখানে সুউচ্চ বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হবে আর দুনিয়ার স্বার্থপর ও আঘাত দানকারী বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; যাদের সাক্ষাৎ ও দর্শন জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলত। মৃত্যু আখিরাতের জীবনের প্রবেশদ্বার ও সেতু; মৃত্যুর মধ্যে যদি এটি ছাড়া আর কোনো কল্যাণ না-ও থাকত, তবুও মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহার হওয়ার জন্য যথেষ্ট হতো।

সুতরাং দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ জীবনে পরিশ্রম করা, মেহনত করা, দুঃখ-কষ্ট-মুসীবত সহ্য করা কেবল সেই জীবনের জন্যই। ইলম ও আমল তাতে পৌঁছার মাধ্যম। আখিরাতের জীবন হলো জাগ্রত অবস্থা আর এর পূর্বে যা ছিল তা ঘুমন্ত অবস্থা। আখিরাতের জীবন হলো মূল আর এর পূর্বে যা ছিল তা এর অধীন। আখিরাতের জীবন এমন, যাতে সবকিছু পাওয়া যাবে। সেখানে পছন্দনীয় কোনোকিছুরই অপ্রাপ্তি থাকবে না। সুখ, শান্তি, স্বাদ, স্বস্তি, আরাম-আয়েশ সবকিছুই মিলবে সেখানে। এর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে মানুষ অক্ষম। কারণ

---

[৭৮৬] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৮৮-৮৯।

এটি এমন এক আবাস, যার ব্যাপারে আমাদের কোনো জানাশোনা নেই। আমাদের মাঝে আর সেখানকার বাসিন্দাদের মাঝে কোনো সংযোগও নেই। যার ফলে নফস দুনিয়ার এই সংকীর্ণ জীবনে অনেক সময় ধরে অবস্থান করার কারণে এখান থেকে সেখানে স্থানান্তরিত হতে অপছন্দ করে এবং এই দুনিয়া ছেড়ে যেতে বিষণ্ণ বোধ করে।

আমাদের নিকট আখিরাতের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান এসেছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত, জ্ঞানী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পাঠানো খবর ও সংবাদের দরুন। ফলে মুমিনদের অন্তরে তা চোখে দেখার ন্যায় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

এই স্তরে শহীদদের জীবন সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের রবের নিকট হতে তাদেরকে রিয্‌ক দেওয়া হয়, তাদের জীবন হলো দুনিয়ার জীবনের তুলনায় পরিপূর্ণ ও প্রশান্তিময়; যদিও তাদের শরীর ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, গোশত ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে, হাড়-হাড্ডি শরীর থেকে পৃথক হয়ে পচে গিয়েছে। কিন্তু তাদের আমল বৃথা যায়নি। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে সমূহ মর্যাদা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আপনি তাদেরকে কখনো মৃত মনে করবেন না। বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত এবং তাদেরকে রিয্‌ক দেওয়া হচ্ছে।"[৭৮৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, তবে তোমরা তা টের পাও না।"[৭৮৮]

শহীদ ব্যক্তিগণ কবরের জীবনে এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে নবি-রাসূলদের নির্দেশিত পথে চলার কারণে এবং তাদেরকে অনুসরণ করার মাধ্যমে। তা হলে

---

[৭৮৭] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৬৯।

[৭৮৮] সূরা বাকারা, ২ : ১৫৪।

নবি-রাসূলদের কবরজীবন কেমন হবে বলে আপনার ধারণা?!

দুনিয়ার জীবনের তুলনায় সেখানে আম্বিয়ায়ে কেরাম, শহীদ ও সিদ্দীকদের জীবন হবে পরিপূর্ণ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। দুনিয়ার জীবন তো সামান্য সময়ের। প্রতিটি ব্যক্তিই তার দুনিয়ার জীবনযাপন অনুযায়ী সেই জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সাহায্য-লাভের উৎস।

ছয়. চিরস্থায়ী অনন্ত জীবন : দুনিয়ার জীবন ফুরিয়ে যাবার পর এই জীবনের দেখা মিলবে, যা কখনো ফুরাবে না। এটিই হলো সেই জীবন যার দিকে আগ্রহীরা দ্রুত ধাবিত হয়, প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে আর অগ্রগামীরা এ দিকেই অগ্রসর হয়। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনা, সমস্ত আসমানি কিতাব ও নবি-রাসূল এর প্রতিই আহ্বান করেছেন। যে ব্যক্তি এই জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি, সে এ জীবন সম্পর্কে বলবে :

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

"কখনই নয়, পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেওয়া হবে এবং আপনার রব এমন অবস্থায় দেখা দেবেন, যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে। সেদিন মানুষ বুঝবে; কিন্তু তার বুঝতে পারা তখন কী কাজে আসবে? সে বলবে, 'হায়, আমি যদি নিজের জীবনের জন্য অগ্রীম কিছু পাঠিয়ে দিতাম!' সেদিন আল্লাহ যে শাস্তি দেবেন, তেমন শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। আর আল্লাহ যেমন বাঁধবেন, তেমন আর কেউ বাঁধতে পারবে না।"[৭৮৯]

এই জীবন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

"এই দুনিয়ার জীবন একটি খেলা ও মন ভুলানোর সামগ্রী ছাড়া আর

[৭৮৯] সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ : ২১-২৬।
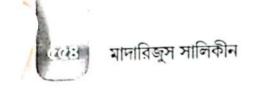
কিছুই নয়। পরকালের আবাসই প্রকৃত জীবন। হায়, যদি তারা জানত!”[৭৯০]

পরকালীন জীবনের তুলনায় এই জীবন হলো ঘুমের ন্যায়। এর পূর্বে যত আলোচনা হয়েছে—আল্লাহর-পথের-পথিকদের পথচলা ও এর বিভিন্ন মানযিলসমূহের বিবরণ—সবকিছুই হলো এই জীবনে পৌঁছার মাধ্যম। নবি ﷺ দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের জীবনের একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন :

مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ

“দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের পানিতে তার একটি আঙুল ডুবিয়ে তুলে আনল। সে লক্ষ করে দেখুক, তার আঙুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে।”[৭৯১]

যেমন বলা হয়ে থাকে, ‘আখিরাত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেছে। দুনিয়া হলো এর শ্বাসপ্রশ্বাসের একটি অংশ। সৌভাগ্যবানরা এর উত্তম অংশ পেয়েছে; ফলে তারা তার ওপরই আমল করে থাকে। অপরদিকে দুর্ভাগারা পেয়েছে মন্দ অংশ; আর তারা তার ওপরই আমল করে থাকে।’

ঈমানদার ও নেককার ব্যক্তিদের জীবন যখন এই দুনিয়াতেই উত্তম ও প্রশান্তিময় হয়, তখন কবরজগতে তাদের জীবন কেমন হবে বলে আপনার ধারণা, যখন তারা দুনিয়ার কারাগার ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে?! অতঃপর তাদের অনন্তকালের অফুরান জান্নাতি জীবন কেমন হবে? যার সুখ-শান্তি কখনো ফুরাবে না, আর তারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের রবের দর্শন লাভ করবে এবং তাঁর সম্ভাষণ শ্রবণ করতে থাকবে!?

*****

---

[৭৯০] সূরা ২৯ : ৬৪।

[৭৯১] মুসলিম, ২৮৫৮; তিরমিযি, ২৩২৩; ইবনু মাজাহ, ৪১০৮।

৫৫ অধ্যায়

সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা (اَلْقَبْضُ وَالْبَسْطُ)

সংকীর্ণতা (اَلْقَبْضُ) দুই প্রকার : অবস্থার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা এবং মূল বস্তুতে সংকীর্ণতা।

অবস্থার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা হলো এমন বিষয়, যা অন্তরে করাঘাত করে অন্তরকে খুশি ও আনন্দ থেকে বিরত রাখে। এটি আবার দুই প্রকার।

১. যার কারণ জানা যায়। যেমন : গুনাহ, শিথিলতা, আল্লাহর থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া, রূঢ়তা কিংবা এ ধরনের কোনো বিষয়ের কথা স্মরণ হওয়া।

২. যার কারণ জানা যায় না। বরং সংকীর্ণতা ও অস্থিরতা অন্তরে এসে ভিড় জমায়; যা থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তির সাধ্যের বাইরে। এ ধরনের সংকীর্ণতার প্রতিই সূফিয়ায়ে কেরাম ইঙ্গিত করে থাকেন। এর বিপরীত হলো اَلْبَسْطُ বা প্রশস্ততা। তাদের নিকট সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা অন্তরের এমন দুটি অবস্থা, যা থেকে অন্তর কখনো নিষ্কৃতি পায় না।

আবুল কাসিম জুনাইদ বাগদাদি ﷺ বলেছেন, 'সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততার অর্থের মধ্যে ভয় ও আশার অর্থও রয়েছে। আশা আনুগত্যের দিকে নিয়ে যায় আর ভয় গুনাহ থেকে বিরত রাখে।'

সূফিয়ায়ে কেরামের সবাই সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা সম্পর্কে এই পদ্ধতিতে কথা বলেছেন। এভাবে তারা এগুলোর অনেক প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন—শিষ্টাচারে সংকীর্ণতা, শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংকীর্ণতা, একত্রিত করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা এবং পৃথক করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা। এই কারণে কারও মধ্যে যখন এই সংকীর্ণতাগুলো স্থান করে নেয়, তখন সেগুলো তাকে খাবার, পানীয়, কথাবার্তা,

তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং নিজ পরিবার-পরিজনদের সাথে ও অন্যান্য মানুষের সাথে প্রফুল্লতা নিয়ে মেলামেশা করা থেকে বিরত রাখে।

শিষ্টাচারে সংকীর্ণতা : এটি হয় অমনোযোগিতা, খারাপ চিন্তা কিংবা নিকৃষ্ট ভাবনার শাস্তিস্বরূপ।

শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংকীর্ণতা : এটি ভবিষ্যতে বিরাট প্রশস্ততা আসার জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ। সুতরাং প্রশস্ততার পূর্বে সংকীর্ণতায় পতিত হওয়া প্রশস্ততা আসার নির্দেশনা এবং ভূমিকার মতো। যেমন ওহি নাযিল হওয়ার পূর্বে এবং ওহি ধারণের জন্য প্রস্তুতি-গ্রহণ-স্বরূপ নবি ﷺ-এর দুর্বলতা ও সংকীর্ণতা অনুভব করা। এমনিভাবে সচ্ছলতার পূর্বে দরিদ্রতা, নিরাপত্তার পূর্বে বিপদাপদ, নিশ্চিন্ততার পূর্বে কঠিন ভয় ইত্যাদি। আসলে আল্লাহ তাআলার রীতি হলো, উপকারী ও প্রিয় কিছু অর্জন করতে হলে এর বিপরীত (অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের) দরজা দিয়েই সেগুলোর নিকট প্রবেশ করতে হয়।

একত্রিত করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা : এটি হলো দুনিয়া ও দুনিয়াসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি থেকে অন্তর সংকীর্ণ হয়ে কেবল আল্লাহ তাআলার ওপরই একত্রিত হওয়া। ফলে অন্তরে অনর্থক কোনো বিষয় আর অবশিষ্ট থাকে না এবং অন্তর যার ওপর একত্রিত হয়, তাকে ছাড়া আর অন্য কিছুর দিকে যায় না। এই পরিস্থিতিতে কেউ যদি সেই ব্যক্তির সাথে সখ্যতা বা আলোচনা করতে চায়, যা তাকে সেখান থেকে বের করে দেবে; তা হলে সে যেন ওই ব্যক্তির প্রতি অবিচার করল।

পৃথক করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা : এটি হলো আল্লাহ সম্পর্কে ব্যক্তির অন্তরে সংকীর্ণতার সৃষ্টি হওয়া এবং অন্তর বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়া। এর সর্বনিম্ন শাস্তি হলো এই সংকীর্ণতায় ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করে।

***

প্রশস্ততা (اَلْبَسْطُ) হলো : বান্দার বাহ্যিক কাজকর্ম ও অবস্থা ইলমের দাবি অনুসারে পরিচালিত হবে। আর তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহর সান্নিধ্য, ভালোবাসা ও মুরাকাবা বা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকবে। ফলে তার ভেতর ও বাহির সৌন্দর্যমণ্ডিত

হবে। তার বাহ্যিক অবস্থা ইলমের দাবি অনুযায়ী আমল করার দরুন সুবাসিত হবে আর অভ্যন্তরীণ অবস্থা মহাব্বত, আশা, ভয়, মুরাকাবা, ভরসা, সান্নিধ্য ইত্যাদি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে। সুতরাং বাহ্যিক আমল তার জন্য হবে সৌন্দর্যের আবরণ আর মূল সৌন্দর্য থাকবে ভেতরগত অবস্থায়। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ—এই দুই সৌন্দর্যকে একসাথে উল্লেখ করেছেন :

يَا بَنِيٓ آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

"হে বানী আদম, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে রাখে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।"[৭৯২]

দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা যে ময়দানকে প্রশস্ততা দান করেছেন তা হলো (অন্তরের প্রশস্ততা)—যা তিনি তাঁর আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আচরণ তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথিসঙ্গী, কাছের ও দূরের সমস্ত মানুষের সাথে করেছেন; যেমন : অন্তরের প্রশস্ততা, সবসময় হাশিখুশি থাকা, উত্তম ব্যবহার, সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া, কেউ থামতে বললে তার জন্য থামা, কখনো কখনো ছোটোবড়ো সবার সাথে সত্য বিষয়ে সামান্য রসিকতা করা, দাওয়াত গ্রহণ করা, সবার সাথেই নম্র ব্যবহার করা ইত্যাদি। এর ফলে প্রত্যেক সাহাবিই মনে করতেন যে, নবিজি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এই অঙ্গনে আপনি ওয়াজিব, মুস্তাহাব আর মুবাহ ছাড়া (খারাপ) কিছু পাবেন না। মুবাহ্ বিষয়টিও আবার ওয়াজিব ও মুস্তাহাবকে শক্তিশালী করে।

সৃষ্টিজগতের সাথে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের উদার ও নম্র ব্যবহার করাকে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য রহমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য নম্র ও কোমল হয়েছেন।

[৭৯২] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৬।

পক্ষান্তরে আপনি যদি রুক্ষ স্বভাবের ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তা হলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত!"[৭৯৩]

আল্লাহ তাআলা নবি-রাসূলদের নম্র ও কোমল বানিয়েছেন, যাতে আল্লাহর পথে যারা চলতে চায় তারা তাদের অনুসরণ করতে পারে, পেরেশান ব্যক্তি তাদের মাধ্যমে নিজের পেরেশানি দূর করতে পারে, অসুস্থ ব্যক্তি তাদের দ্বারা সুস্থতা লাভ করতে পারে এবং তাদের জ্ঞান, উপদেশ, নসীহত ও হিদায়াতের নূরের মাধ্যমে নফস ও প্রবৃত্তির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। সুতরাং তারা যখন নীরব থাকে, আল্লাহর-পথের-পথিকরা তাদের অনুসরণ করে আর যখন কথা বলে, তখন তাদের কথামালা দ্বারা উপকৃত হয়। কেননা তাদের নড়াচড়া, স্থিরতা ও নীরবতা সবই আল্লাহর হুকুমে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় হয়ে থাকে; ফলে সত্যবাদীদের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। যে আলো দিয়ে তারা মানুষদেরকে আলোকিত করেন, তা হলো—ইলম ও মা'রিফাত বা আল্লাহর পরিচয়মূলক জ্ঞানের আলো।

আলিম তিন প্রকার :

এক. এমন আলিম যিনি নিজেও তার ইলমের আলোয় আলোকিত হন এবং লোকজনও তার দ্বারা উপকৃত হয়। এই সমস্ত আলিমগণই রাসূলদের খলীফা এবং ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বা আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিশ।

দুই. এমন আলিম যে তার ইলম দ্বারা কেবল নিজেই উপকৃত হয়, অন্যরা এর থেকে বঞ্চিত থাকে। এই শ্রেণির ব্যক্তিরা যদি (আমলে) অবহেলা না করেন, তা হলে তাদের নিজেদের মাঝেই তাদের ইলমের উপকারিতা সীমাবদ্ধ থাকে। এই শ্রেণির আলিম প্রথম শ্রেণির আলিমের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন।

তিন. এমন আলিম যার ইলম তার নিজেরও উপকার করে না এবং মানুষজনও তার দ্বারা উপকৃত হয় না। এই ব্যক্তির ইলম তার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। মানুষের সাথে এই শ্রেণির আলিমদের মেলামেশা ভয়ংকর ফিতনা। আর প্রথম শ্রেণির আলিমগণ হলেন মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত।

---

[৭৯৩] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৫৯।

৫৬ অধ্যায়
জানাশোনা (اَلْمَعْرِفَةُ)

মা'রিফাত এবং ইলম দুটি শব্দই কুরআনে এসেছে। (এ দুটি শব্দ প্রায় কাছাকাছি অর্থ প্রদান করে।) যেমন, মা'রিফাত শব্দটির ক্ষেত্রে :

"আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে; যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে।"[৭১৪]

আর ইলম শব্দটির ক্ষেত্রে :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।"[৭১৫]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নিজের জন্য ইলম শব্দটি গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, আলিম (عَالِمٌ: জ্ঞানী), আলীম (عَلِيْمٌ : মহাজ্ঞানী), আল্লাম (عَلَّامٌ : অনেক জ্ঞানের অধিকারী), আলিমা (عَلِمَ : তিনি জেনেছেন), ইয়া'লামু (يَعْلَمُ : তিনি জানেন)। এমনিভাবে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর ইলম রয়েছে। আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য মা'রিফাত শব্দটি ব্যবহার করেননি। আর জানা কথা যে, আল্লাহ্ তাআলা যা নিজের জন্য ব্যবহার করেন, সে অর্থের অন্যান্য শব্দের তুলনায় তা অধিক পরিপূর্ণ।

কুরআন শরীফে মা'রিফাত শব্দটি বিশেষভাবে পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

---

[৭১৪] সূরা বাকারা, ২ : ১৪৬।

[৭১৫] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯।

اَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ

"আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে; যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে।"[৭৯৬]

কিছু দল রয়েছে যারা মা'রিফাতকে ইলমের ওপর বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাদের অনেকেই ইলমের দিকে মাথাও উঠায় না। তারা মা'রিফাত ব্যতীত ইলমকে (আল্লাহর মাঝে) একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখে। অথচ তাদের মধ্যে যারা সঠিক পথপ্রাপ্ত, তারা তাদের মুরীদদের বেশ গুরুত্বসহকারে ইলমের ওসিয়ত করে যেতেন। তাদের নিকট ইলম অর্জন করা ব্যতীত কেউ পরিপূর্ণ ওলি হতে পারে না। আসলে আল্লাহ তাআলা জাহিল-মূর্খদের নিজের ওলি হিসেবে গ্রহণ করেন না। মূর্খতা হলো : প্রতিটি বিদআত, ভ্রষ্টতা ও লোকসানের মূল। আর ইলম হলো : সমস্ত কল্যাণ, হিদায়াত ও পরিপূর্ণতার মূল।

ইলম ও মা'রিফাতের মধ্যে পার্থক্য :

শব্দগত পার্থক্য :

اَلْمَعْرِفَةُ শব্দটি একটি মাফউল বা কর্মকারককে দাবি করে। যেমন :

عَرَفْتُ الدَّارَ 'আমি বাড়িটি চিনি' ।عَرَفْتُ زَيْدًا 'আমি যাইদ সম্পর্কে জানি'। এমনিভাবে কুরআনে এসেছে,

فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٨﴾

"সে তাদেরকে চিনল; কিন্তু তারা তাকে চিনল না।"[৭৯৭]

পক্ষান্তরে اَلْعِلْمُ দুইটি মাফউল বা কর্মকারককে দাবি করে। যেমন :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ

"তোমরা যদি তাদের সম্পর্কে জানতে পারো যে, তারা ঈমানদার...।"[৭৯৮]

---

[৭৯৬] সূরা বাকারা, ২ : ১৪৬।

[৭৯৭] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৫৭।

[৭৯৮] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১০।

আর اَلْعِلْمُ যদি একটি মাফউলের সাথে আসে, তা হলে মা'রিফাতের অর্থ নির্দেশ করে। যেমন,

وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ

"...এবং তাদেরকে ছাড়া অন্য এমন সব শত্রুকে, যাদেরকে তোমরা চিনো না। কিন্তু আল্লাহ চেনেন।"[৭৯৯]

অর্থগত পার্থক্য :

অর্থগতভাবে এ দুটি শব্দের মধ্যে বেশ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে :

১ নং পার্থক্য : মা'রিফাত হলো : বস্তুর মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আর ইলম হলো : বস্তুর অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। যেমন: عَرَفْتُ أَبَاكَ 'আমি তোমার বাবাকে চিনি' অপরদিকে عَلِمْتُهُ صَالِحًا عَالِمًا 'আমি তাকে সৎ ও আলিম হিসেবে জানি'। এ কারণেই কুরআনে ইলমের হুকুম এসেছে, মা'রিফাতের নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।"[৮০০]

সুতরাং মা'রিফাত হলো অন্তরে বস্তুর আকার-আকৃতি ও তার সম্পর্কে জ্ঞান উপস্থিত থাকা। আর ইলম হলো বস্তুর অবস্থা, গুণাবলি ও গুণাবলির সাথে তার অবস্থান সম্পর্কে অবগত থাকা। ফলে মা'রিফাত কাল্পনিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং ইলম নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

২নং পার্থক্য : মা'রিফাত হলো কোনো বস্তুকে স্মরণ করা। অর্থাৎ ভুলে-যাওয়া কোনো বস্তুকে উপস্থিত করা। এই কারণে মা'রিফাতের বিপরীত হলো ইনকার বা অস্বীকার করা (ভুলে যাওয়ার ভান করা)। আর ইলমের বিপরীত হলো জাহ্ল বা মূর্খতা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

[৭৯৯] সূরা আনফাল, ৮ : ৬০।

[৮০০] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

“তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চেনে, এরপর তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।”[৮০১]

যেমন বলা হয়, عَرَفَ الْحَقَّ فَأَقَرَّ بِهِ ‘সে সত্য চিনেছে, অতঃপর তা স্বীকার করেছে।’ عَرَفَهُ فَأَنْكَرَهُ ‘সে তা চিনেছে, অতঃপর তা অস্বীকার করেছে।’

৩ নং পার্থক্য : আপনি যখন বলবেন, عَلِمْتُ زَيْدًا ‘আমি যাইদ সম্পর্কে জানি’ এর মাধ্যমে শ্রোতার কোনো উপকার হবে না। কারণ সে অপেক্ষা করবে আপনি তার সম্পর্কে কী জানেন, তা শোনার জন্য। এরপর আপনি যখন বলবেন, كَرِيمًا أَوْ شُجَاعًا ‘ সে ভদ্র বা সাহসী’ তখন শ্রোতার উপকার হবে, সে যাইদ সম্পর্কে জানতে পারবে। আর আপনি যখন বলবেন, عَرَفْتُ زَيْدًا ‘আমি যাইদকে চিনি’ তখন শ্রোতা সাথে সাথে বুঝতে পারবে যে, আপনি অন্য সবার মধ্য থেকে যাইদকে চেনেন। ফলে সে আর কিছুর অপেক্ষা করবে না।

সূফিয়ায়ে কেরামের নিকট ইলম ও মা'রিফাতের মধ্যে পার্থক্য

তাদের নিকট মা'রিফাত হলো সেই ইলম, যার দাবি অনুসারে একজন আলিম আমল করে থাকে। তারা শুধু ইলম বা জানাকে মা'রিফাত বলে না; বরং তারা সেই ব্যক্তিকেই কেবল মা'রিফাতের অধিকারী বলে থাকে, যে আল্লাহর সম্পর্কে ইলম রাখে; আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ, সেই পথের বাধা-বিপদ সম্পর্কেও জানে এবং আল্লাহর সাথে যার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

সুতরাং তাদের নিকট আরিফ বা মা'রিফাতের অধিকারী ব্যক্তি হলো : যে আল্লাহ তাআলাকে তাঁর সমস্ত নাম, গুণাবলি ও কার্যাবলিসহ চেনে, অতঃপর আল্লাহকে সমস্ত বিষয়ে সত্যায়ন করে, অতঃপর নিজের ইচ্ছা ও নিয়তকে খাঁটি করে নেয়, অতঃপর খারাপ ও নিকৃষ্ট আদব-আখলাক থেকে নিজেকে দূরে রাখে এবং সেগুলো থেকে নিজেকে পবিত্র করে, অতঃপর সুখে-দুঃখে সবসময় আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামের ওপর ধৈর্য ধরে তা পালন করতে থাকে, অতঃপর দ্বীন ও শারীআর ওপর অবিচল থেকে অন্যকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকে, অতঃপর তার

[৮০১] সূরা নাহল, ১৬ : ৮৩।

আহ্বানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আনীত বিষয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে; মানুষের সিদ্ধান্ত, মতামত, পছন্দ, যুক্তি এগুলোর সাথে তা মেলায় না; এগুলোর মাধ্যমে নবি ﷺ-এর আনীত বিষয়কে পরিমাপ করে না। এমন গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে 'আরিফ' নামে ভূষিত হওয়ার অধিকার রাখে। এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে আরিফ বা আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত বলে অভিহিত করা হলে, তা হবে কেবল অসার ও মৌখিক দাবি।

মা'রিফাতের আলামত ও নিদর্শন

কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহর মা'রিফাত প্রাপ্তির একটি আলামত হলো : আল্লাহর ভয় হাসিল হওয়া। যার মা'রিফাত বা আল্লাহর ব্যাপারে জানাশোনা যত বেশি হবে, তার আল্লাহর ভয়ও তত বেশি হবে।'[৮০২]

আরিফ বা আল্লাহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির কিছু আলামত হলো : সে কারও কাছে কোনোকিছু চাইবে না, কারও সাথে ঝগড়ায় জড়াবে না, কাউকে গালি দেবে না, কারও ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখবে না এবং কারও ওপর তার কোনো হক নজরে পড়বে না।

তার আরও কিছু নিদর্শন হলো : সে হারিয়ে যাওয়া আর না-পাওয়া কোনোকিছুর জন্য হাহুতাশ করবে না এবং কোনোকিছুর প্রাপ্তিতে উল্লসিতও হবে না। কারণ সে বস্তুজগতের প্রতি এ দৃষ্টিভঙ্গিই রাখে যে, এর সবকিছু নশ্বর ও ধ্বংসশীল। কেননা এই জগৎ তো প্রকৃতপক্ষে ছায়া আর কল্পনারই নামান্তর।

জুনাইদ বাগদাদি ﷺ বলেছেন, 'আরিফ ততক্ষণ পর্যন্ত আরিফ হতে পারে না, যতক্ষণ-না সে জমিনের মতো হয়; যার ওপর দিয়ে সৎ-অসৎ সবাই অতিক্রম করে এবং যতক্ষণ-না মেঘের মতো হয়; যা সবাইকেই ছায়া দান করে এবং যতক্ষণ-না বৃষ্টির মতো হয়; যা পছন্দের-অপছন্দের সবাইকেই সিক্ত করে।'[৮০৩]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয ﷺ বলেছেন, 'আরিফ বা মা'রিফাতের অধিকারী ব্যক্তি পার্থিব জগৎ থেকে বের হয়ে যায়। দুটি বিষয়ে সে কখনো অবহেলা করে না : ১.

[৮০২] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৪৭৭। আবূ আলি দাক্কাক ﷺ-এর বাণী।
[৮০৩] আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ২/৪৮০।

নিজের ওপর ক্রন্দন, ২. রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।'[৮০৪]

এটি অনেক সুন্দর ও অর্থবহ একটি কথা। কারণ এটি নিজের দোষত্রুটির পরিচয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে এবং আল্লাহ তাআলার বড়োত্ব, মহত্ত্ব ও পূর্ণাঙ্গতারও প্রমাণ বহন করে। তাই সে সবসময় নিজের ওপর কান্না করতে থাকে আর আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় রত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কীভাবে আমরা আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাব?' তিনি জবাবে বললেন, 'এভাবে যে, তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগৎ থেকে পৃথক হয়ে আসমানসমূহের ওপর আরশে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।'[৮০৫]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀ এখানে প্রকৃত মা'রিফাতের কথাই বলেছেন, যা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার পরিচয়, মা'রিফাত ও স্বীকৃতি সঠিক হয় না। আর তা হলো : ১. সৃষ্টিজগৎ থেকে আল্লাহ তাআলার বিচ্ছিন্নতা ও ২. আরশে আযীমে অধিষ্ঠিত থাকা।

***

মা'রিফাতের ক্ষেত্রে এবং ঈমানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির পা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত-না সে আল্লাহ তাআলার সমস্ত গুণাবলির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সেগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত হয় এবং রব সম্পর্কে মূর্খতার সীমা থেকে বেরিয়ে যায়। আসলে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ওপর বিশ্বাস রাখা এবং তা সম্পর্কে জানা হলো—ইসলামের ভিত্তি, ঈমানের খুঁটি এবং ইহ্সান বৃক্ষের ফল। যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি আরিফ বা আল্লাহর মা'রিফাতের অধিকারী হওয়া দূরের কথা, সে তো ইসলামের ভিত্তি, ঈমানের খুঁটি এবং ইহ্সানকেই ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর সিফাত অস্বীকারকারী ব্যক্তিদেরকে তাঁর প্রতি খারাপ-ধারণা-পোষণকারী বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর তাদেরকে এমন শাস্তির কথা বলেছেন; যা মুশরিক, কাফির ও কবীরা গুনাহকারীদেরকেও বলেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

[৮০৪] ইবনুল মুলাক্কিন, তবাকাতুল আউলিয়া, ৩২৪।

[৮০৫] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ৫/২৮০।

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"তোমরা এ থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে না যে, তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে; তোমরা তো বরং মনে করেছিলে যে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের খবর আল্লাহও রাখেন না। তোমাদের এই ধারণা—যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে—তোমাদের ধ্বংস করে দিয়েছে; ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।"[৮০৬]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর গুণসমূহ থেকে একটি গুণ (অর্থাৎ সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়াকে) তারা যে অস্বীকার করেছে, তা হলো আল্লাহর প্রতি তাদের খারাপ ধারণা আর এটিই তাদের ধ্বংস করে দেবে। আল্লাহ তাআলার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"তাদের জন্য রয়েছে মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন; যা অত্যন্ত জঘন্য জায়গা!"[৮০৭]

আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারীদের ছাড়া আর কারও প্রতি এমন ধমকি ও শাস্তির কথা আসেনি। আর আল্লাহর সিফাতসমূহ অস্বীকার করা এবং তাঁর নামসমূহের প্রকৃত মর্মকে না মানাই হলো আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড়ো খারাপ ধারণা।

***

[৮০৬] সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১ : ২৩।

[৮০৭] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ৬।

আকল বা বুদ্ধি আল্লাহর সিফাতসমূহের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে অক্ষম। কারণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যে, আল্লাহ কেমন। এটিই হলো সালাফদের بِلَا كَيْفٍ কথার অর্থ। অর্থাৎ আল্লাহর অবস্থা উপলব্ধি করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা যাঁর মৌলিক উপাদান ও উপকরণই জানা যায় না, তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যাবলি জানা কীভাবে সম্ভব? কিন্তু এই বিষয়টি ঈমান আনার ক্ষেত্রে এবং এর অর্থ অনুধাবনের বিষয়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। কাইফিয়্যাত বা প্রকৃত অবস্থা তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়। যেমন আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যে সংবাদ দিয়েছেন, তার মর্মার্থ আমরা অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু এটি কীভাবে হবে, তার প্রকৃত অবস্থা আমরা জানি না। অথচ এগুলোর সবই মাখলূক বা সৃষ্ট বস্তু; তা হলে আমরা কীভাবে খালিক বা স্রষ্টার হাকীকত সম্পর্কে জানতে পারব? মাখলূকের সাথে যাঁর কোনো তুলনাই হয় না? যিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে?

সুতরাং আমরা কীভাবে সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ ও সৃষ্ট বোধবুদ্ধি নিয়ে সেই সত্তার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারব, সবদিক দিয়েই যাঁর রয়েছে পূর্ণাঙ্গতা, যিনি সমস্ত সৌন্দর্যের মালিক, যাঁর রয়েছে সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ ইলম, পরিপূর্ণ কুদরত, বড়োত্ব ও সব ধরনের ক্ষমতা? সেই সত্তা যাঁর চেহারা থেকে পর্দা সরানো হলে উজ্জ্বলতার আধিক্যে আসমান-জমিন, এর মধ্যবর্তী অংশ এবং এদুয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু পুড়ে যাবে? যিনি সবকটি আসমানকে আপন হাতে ধারণ করেছেন; ফলে তা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, যেমন সরিষার দানা আমাদের হাতের তালুতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। যাঁর ইলমের তুলনায় সৃষ্টিজগতের সমগ্র ইলম, ইলমের সমুদ্রে চড়ুই পাখির একটি ঠোঁকরের পরিমাণের চেয়েও কম। যদি সাতসমুদ্র কালি হয় আর সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে কিয়ামাত পর্যন্ত পৃথিবীর সব গাছ কলম হয়, অতঃপর সেগুলো দিয়ে লিখতে আরম্ভ করা হয়, তা হলে কালি ও কলম একসময় ফুরিয়ে যাবে; কিন্তু সেই মহান সত্তার কথামালা তখনো ফুরাবে না। পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ, জিন, যারা কথা বলতে পারে এবং যারা কথা বলতে পারে না, এমন সবকিছুকে যদি একটি কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তারা সেই সত্তাকে বেষ্টন করতে পারবে না। যিনি সমস্ত আসমানকে একটি আঙুলে, সমস্ত জমিনকে একটি আঙুলে, সমস্ত পাহাড়কে একটি আঙুলে এবং সমস্ত গাছপালাকে আরেকটি আঙুলে স্থাপন করবেন, অতঃপর সেগুলোকে নাড়া দিয়ে

বলবেন, 'أَنَا الْمَلِكُ' আমিই সবকিছুর মালিক।'

একটি তাহকীক : আল্লাহ তাআলার গুণাবলি তাঁর নামের মধ্যে শামিল রয়েছে। সুতরাং নাম হিসাবে 'আল্লাহ', 'রব', 'ইলাহ্' ইত্যাদি এমন কোনো নাম নয়, যা গুণাবলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেননা গুণমুক্ত কোনো সত্তার অস্তিত্ব অসম্ভব। এটি একটি অলীক কল্পনা। 'আল্লাহ', 'রব', 'ইলাহ্'—এগুলো হলো এমন সত্তার নাম, যা সব ধরনের পূর্ণাঙ্গতা, বড়োত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী। যেমন : ইলম, কুদরত, হায়াত, ইচ্ছা, কথা, শ্রবণ, দর্শন, স্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতাসহ এমন সব গুণাবলি, যা আল্লাহ্ তাআলার সত্তার জন্য উপযুক্ত। সুতরাং বোঝা যায় এই গুণাবলি হলো তাঁর সত্তার অন্তর্ভুক্ত। আসলে সত্তা থেকে গুণাবলিকে মুক্ত করা এবং গুণাবলি থেকে সত্তাকে মুক্ত করা একটি কল্পনা; যার কোনো বাস্তবতা নেই। (তবে মনে রাখতে হবে,) এটি একটি গৌণ বিষয়, এতে তেমন কোনো উপকারিতা নেই এবং এর ওপর ঈমান-আমলের কোনোকিছু নির্ভরশীল নয়। আর এটি মৌলিক জ্ঞানেরও কোনো বিষয় নয়। (তাই এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি পরিত্যাজ্য।)

*****

৫৭ তাওবা
সালিকীনদের সর্বশেষ মানযিল

সালিক বা আল্লাহর-পথের-পথিকদের সর্বশেষ মানযিল হলো—তাওবা বা আল্লাহর দিকে ফেরা। যা তাদের মানযিলসমূহের সূচনা ছিল।

এটা শুনে আপনার কান হয়তো চূড়ান্তভাবে তা অপছন্দ করবে, আর আপনি বলবেন, 'এটা হলো সেই ব্যক্তির কথা, তাসাওউফের পথঘাট সম্পর্কে যার জানা নেই এবং যে এর মানযিলসমূহে অবতরণও করেনি।' আল্লাহর শপথ! অনেক মানুষ আপনার সাথে একমত পোষণ করবে এবং বলবে, 'আমরা কোথায়? আমরা যাচ্ছি কোথায়? আমরা তো অনেক আগেই তাওবার মানযিল অতিক্রম করে এসেছি। আমাদের মাঝে আর এর মাঝে রয়েছে অসংখ্য মাকাম! আমরা কি তা হলে এত সব মাকাম ছেড়ে আবার সেখানে ফিরে যাব, আর একেই সালিকীনদের সর্বশেষ মানযিল বলে সাব্যস্ত করব?'

তা হলে এখন শুনুন এবং স্মরণ রাখুন। দ্রুতই অস্বীকার করতে ও প্রতিহত করতে উদ্যত হবেন না। নিজের পরিচয় পাওয়ার জন্য, আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলার হক ও অনুগ্রহ এবং তাঁর প্রতি আপনার করণীয় কী সে সম্পর্কে উপলব্ধি করতে নিজের মস্তিষ্ককে উন্মুক্ত করুন। অতঃপর আপনার আমল, অবস্থা ও যে সমস্ত মানযিল আপনি অতিক্রম করেছেন—খাঁটি দিলে সবকিছুকে আল্লাহ তাআলার বড়োত্ব ও মহত্ত্বের বিশালতার দিকে খেয়াল রেখে এবং তিনি যার উপযোগী ও উপযুক্ত সেদিকে মনোযোগী হয়ে তাঁর নিকট তা পেশ করুন।

যদি দেখেন আপনার যে আমল ও অবস্থা, তা আপনার ওপর আল্লাহর যে হক ও অনুগ্রহ রয়েছে তার জন্য যথেষ্ট এবং আপনার আমল সেগুলোর সমান; তা হলে তাওবার কোনো প্রয়োজন নেই। তাওবার দিকে ফিরে আসা, তখন আপনার জন্য

হবে উঁচু মর্যাদা থেকে নিচু স্তরের দিকে আসা। উচ্চ মর্তবা থেকে নিম্ন মর্তবায় নেমে যাওয়া এবং শেষ থেকে শুরুর দিকে প্রত্যাবর্তন। এটা দূরে নয় যে, অনেকেই এমন দাবি করে থাকে। তারা নিজেদের আমল, অবস্থা, মা'রিফাত ও ইলমের কারণে ধোঁকায় পড়ে রয়েছে!

আর যদি দেখেন সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠতা, অগ্রসরমানতা, তাওয়াক্কুল, যুহ্দ, ইবাদাত-বন্দেগিসহ আপনার সমস্ত আমল, আল্লাহ্ তাআলার যে হক আপনার ওপর রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র হকটিরও সমপরিমাণ নয়। আপনার প্রতি আল্লাহর যে অনুগ্রহ রয়েছে, তার থেকে একটি অনুগ্রহেরও সমান নয় আর আল্লাহ্ তাআলা যে বড়োত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী, সমস্ত সৃষ্টিজগৎ যা ধারণ করে তার চেয়েও তা বড়ো, মহৎ ও সুউচ্চ।

তা হলে এখন জেনে রাখুন, প্রতিটি আরিফ বা আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির শেষ মানযিল এবং আল্লাহর পথের প্রতিটি পথিকের চূড়ান্ত ঠিকানা হলো তাওবা। যেভাবে এটি ছিল সূচনা, তেমনিভাবে তা শেষ। শেষ পর্যায়ে এসে তাওবার প্রয়োজন শুরুর পর্যায়ের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি প্রকট হয়। বরং পথের শেষে এসে তাওবা জরুরি পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

এখন শুনুন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলকে জীবনের শেষ সময়ে কী বলে সম্বোধন করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে কত কঠোরভাবে বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি মনোযোগী ছিলেন (তাও লক্ষ করুন)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন নবি, মুহাজির ও আনসারদের, যারা সংকট-মুহূর্তে নবির সঙ্গে ছিল, তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হওয়ার পরেও তিনি তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান, পরম দয়ালু।"[৮০৮]

---

[৮০৮] সূরা তাওবা, ৯ : ১১৭।

এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন তাবূক যুদ্ধের পরে। আর এটিই ছিল নবি ﷺ-এর সশরীরে-অংশ নেওয়া-সর্বশেষ যুদ্ধ। আল্লাহ তাআলা তাদের এই জিহাদ ও কঠিন আমলের প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন (اَلتَّوْبَةُ عَلَيْهِمْ)।

আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-এর শেষ জীবনে নাযিল করেছেন—

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

> "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি তাওবা গ্রহণকারী।"[৮০৯]

'সহীহ বুখারি'-তে এসেছে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়া পর নবি ﷺ যে সালাতই আদায় করতেন তার রুকূ-সাজদাতে এই দুআটি পাঠ করতেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

> "হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।"[৮১০] এটি ছিল নবি ﷺ-এর জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে।

এই কারণে এ সূরা থেকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা আলিম ছিলেন—যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنهم—তারা বুঝেছেন, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনসীমা নির্দেশ করছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। নবিজি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জীবনের শেষ সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইস্তিগফার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

[৮০৯] সূরা নাস্র, ১১০ : ১-৩।

[৮১০] বুখারি, ৭৯৪; মুসলিম, ৪৮৪।

রবের সান্নিধ্যে যাবার পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ নিঃসৃত সর্বশেষ যে বাণী শোনা গিয়েছে, তা হলো—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلٰى

“হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো আর আমাকে মহান বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়ে দাও।”[৮১১]

নবি ﷺ প্রতিটি নেক আমল ইস্‌তিগফার আদায়ের মাধ্যমে শেষ করতেন। যেমন: সাওম, সালাত, হাজ্জ, জিহাদ। কেননা তিনি যখন জিহাদ কিংবা হাজ্জ থেকে ফিরতেন এবং মদীনায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন,

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

“(আমরা) প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদাতগুজার, আমরা আমাদের প্রতিপালককে সাজদাকারী এবং তাঁর প্রশংসাকারী।”[৮১২]

শারীআতে যেকোনো মজলিসের শেষে ইস্‌তিগফার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে; যদিও কল্যাণ ও নেককাজের মজলিস হয়।[৮১৩]

এমনিভাবে এরও হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, বান্দা তার দিন শুরু করবে ইস্‌তিগফারের মাধ্যমে। দিনের শুরুতে সে বলবে :

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

“আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর সত্তা এবং আমি তাঁর নিকট তাওবা করছি।”[৮১৪]

মানুষকে ঘুমানোর আগে এবং সকাল-সন্ধ্যা সাইয়্যিদুল ইস্‌তিগফার পাঠ করারও

---

[৮১১] বুখারি, ৫৬৭৪; মুসলিম, ২৪৪৪।

[৮১২] বুখারি, ১৭৯৭; মুসলিম, ১৩৪৪।

[৮১৩] আবূ দাউদ, ৪৮৫৯; দারিমি, ২৬৬১।

[৮১৪] আবূ দাউদ, ১৫১৭; মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১৬২২।

হুকুম দেওয়া হয়েছে।[৮১৫]

***

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে এবং তাঁর নামসমূহ, গুণাবলি ও হক সম্পর্কে অবগত, সে জানে যে, সর্বশেষ পর্যায়ে বান্দা তাওবার দিকেই সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকে।

মূলকথা হলো সালিকীন বা আল্লাহ-অভিমুখীদের পথের সমাপ্তিতে রয়েছে দাসত্বকে পরিপূর্ণ করা। আর এটি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে মাত্র দুজনের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা এই গুণের অধিকারী ছিলেন। একজন হলেন ইবরাহীম ﷺ; যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি দাসত্বের হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন। আরেকজন হলেন বানী আদমদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ। কারণ তিনি দাসত্বের স্তর পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছেন। পরিণতিতে তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছেন। তিনি ওসীলা ও সুপারিশের অধিকারী হয়েছেন; যা থেকে সমস্ত রাসূলও পিছিয়ে থাকবেন। (কিয়ামাতের দিন সমস্ত উম্মাহ যখন নবি-রাসূলদের নিকট থেকে নিরাশ হয়ে নবি ﷺ-এর নিকট সুপারিশের জন্য যাবেন,) তখন তিনি বলবেন, أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا "আমিই এর উপযুক্ত, আমিই এর উপযুক্ত।"[৮১৬] এ কারণেই অর্থাৎ নবি ﷺ-এর পরিপূর্ণ বন্দেগি ও দাসত্বের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁকে দাসত্বের উচ্চ মাকাম ও সম্মানের সাথে উল্লেখ করেছেন। যেমন বলেছেন,

سُبْحَانَ الَّذِیْ أَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَيْلًا

---

[৮১৫] বুখারি, ৬৩০৬। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ, তুমি আমার রব। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা। আমি তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর অবিচল থাকার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। আমি যা কিছু করেছি তার অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমাকে যে নিয়ামাত দান করেছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহের ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।"

[৮১৬] বিস্তারিত দেখুন—ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৯/৪৯১।

"পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন।"[৮১৭]

এ কারণেই সবাই যখন সুপারিশের জন্য ঈসা ﷺ-এর কাছে যাবে, তখন তিনি বলবেন,

اِذْهَبُوْا إِلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

"আপনারা মুহাম্মাদের কাছে যান; তিনি এমন বান্দা, আল্লাহ তাআলা যার আগে-পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[৮১৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন আল্লাহর দাসত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করার কারণে এবং আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমা প্রাপ্তির দরুন।

সুতরাং বোঝা গেল, সমস্ত মানযিল ও মাকামের শেষ হলো তাওবা ও খাঁটি গোলামি। নিজের সত্তা ও অস্তিত্বকে জমিয়ে রাখা এবং নিজের সম্পৃক্ততাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে ফানা হয়ে যাওয়া সমস্ত মানযিল ও মাকামের শেষ নয়। (যেমনটি ধারণা করে থাকে কিছু সূফিসাধক।)

যদি প্রশ্ন করেন : এই জমিয়ে রাখা তো খাঁটি তাওবা ও পরিপূর্ণ দাসত্বের মাধ্যমেই অর্জিত হয়?

উত্তর : বিষয়টি আসলে এমন নয়। বরং এর মাধ্যমে যে বিষয়টি অর্জিত হয়, তা হলো রাসূল ও তাদের খলীফাদের জমিয়ে রাখা। আর সেটি হলো : মহাব্বত, ইনাবাত, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ও মুরাকাবার মাধ্যমে নিজের হিম্মত ও মনোবলকে আল্লাহর ওপর জমিয়ে রাখা। এমনিভাবে জিহাদ ও দাওয়াতের মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের মাঝে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করতে হিম্মত ও মনোবলকে জমিয়ে রাখা।

এখানে দুইটি বিষয় : ১. অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপরেই জমিয়ে রাখা এবং ২. নিজের ইচ্ছা ও মনোবল শুধু আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের ওপরেই

---

[৮১৭] সূরা ইসরা, ১৭ : ১।

[৮১৮] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ১/২৯৪; বুখারি, ৩৩৪০; মুসলিম, ১৯৬।

সীমাবদ্ধ রাখা।

যদি প্রশ্ন করেন : এই দুই প্রকার জমানোর ব্যাপারে কি কোনো দলীল-প্রমাণ রয়েছে?

আমি বলব : পুরা কুরআনেই এর দলীল রয়েছে। সূরা ফাতিহার এই আয়াত থেকেই তা গ্রহণ করুন—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞

> "আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[৮১৯]

إِيَّاكَ (একমাত্র) এই শব্দটি নিয়ে ভাবুন। এখানে ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনা করাকে কেবল আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার সাথেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। نَعْبُدُ "আমরা তোমার ইবাদাত করি" এই শব্দটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কালকেই বোঝায় এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের ইবাদাতকেই অন্তর্ভুক্ত করে। ইবাদাতের সমস্ত প্রকারই এর মধ্যে শামিল; বর্তমান-ভবিষ্যৎ, কথা-কর্ম, প্রকাশ্য-গোপনসহ সমস্ত ইবাদাত। এমনিভাবে اَلْإِسْتِعَانَةُ বা সাহায্য প্রার্থনা করার বিষয়টিও পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকটেই, অন্য কারও নিকট নয়। এই কারণে বলা যায় (সালিকীনদের) সমস্ত পথই এই দুই শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এটিই সূফিয়ায়ে কেরামের এই বাক্যের মর্ম—اَلطَّرِيْقُ فِيْ : إِيَّاكَ أُرِيْدُ بِمَا تُرِيْدُ (প্রকৃত পথ নিহিত রয়েছে এর মধ্যে : আপনি যা ইচ্ছা করেন, আমারও তা-ই ইচ্ছা।) উদ্দেশ্য এক হওয়া এবং তিনি যা পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন নিজের ইচ্ছাকে তাতেই নিবদ্ধ রাখা। নবি-রাসূলগণ শুরু থেকে শেষ সবাই এর প্রতিই আহ্বান করেছেন, আমলকারীরা এটিকেই আঁকড়ে ধরেছেন এবং আগ্রহীরা এ পথেই অগ্রসর হয়েছেন। সমস্ত মানযিল ও মাকাম শুরু থেকে শেষ এরই আওতাধীন এবং এরই ফল।

সুতরাং দাসত্ব পূর্ণ বিনয়ের সাথে পূর্ণ ভালোবাসাকে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবিক তাঁর আদেশসমূহকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেওয়াকে আবশ্যক করে। এটিই হলো শেষ গন্তব্য; এর ওপরে আর কোনো গন্তব্য নেই। দাসত্বে যথাযথভাবে

---

[৮১৯] সূরা ফাতিহা, ১ : ৫।

পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করার যখন কোনো পথ নেই, তখন তাওবাই হলো শেষ ঠিকানা ও আশ্রয়স্থল। শুরুতে তাওবার যেমন প্রয়োজন, শেষে তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন। যেমনটি আপনি আগেই জেনে এসেছেন। যদি তাওবার বিষয়টি না থাকত, তা হলে ব্যক্তির মাঝে ও রব্বুল আলামীনের নিকট পৌঁছার মাঝে নিরাশার সৃষ্টি হতো। এ রকমটা হয় বান্দা যখন তার ওপর যে দায়িত্ব ও হক রয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করে। সুতরাং ওই ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে যে গাফলত, অলসতা আর অমনোযোগিতায় নিমগ্ন, যে অধিকাংশ সময়ই নিজের হককে রবের হকের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে; যা থেকে সে কখনো মুক্তি পায় না? বিশেষ করে আল্লাহর-পথের-পথিক; যে ফানা ও জমার পথে অগ্রসর হয়? কারণ আল্লাহ তাআলা তার কাছ থেকে দাসত্ব ও গোলামি তলব করে, আর তার নফস জমা ও ফানা তলব করে! যদি নিজের নফসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় এবং সঠিকভাবে এর হিসাব গ্রহণ করা হয়, তা হলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, স্বার্থচিন্তা ও আনন্দ অর্জনে সে মত্ত। হ্যাঁ, প্রত্যেকেই তাতে লিপ্ত। তবে পার্থক্য হলো কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পছন্দীয় বস্তুর মাঝে তা খোঁজে আর কেউ নিজের নফসের পছন্দের মাঝে খোঁজে। (সুতরাং স্পষ্ট হলো যে, তাওবা সবার জন্য জরুরি এবং তাওবাই হলো আল্লাহর পথের পথিকের শুরু ও শেষ মানযিল।) আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দাতা।

*****

৫৮ অধ্যায়

তাওহীদ বা একত্ববাদ (اَلتَّوْحِيْدُ)

তাওহীদ হলো নবি-রাসূলগণের সর্বপ্রথম দাওয়াত, সমস্ত মানযিলের প্রথম মানযিল এবং আল্লাহর-পথের-পথিকদের শুরুর মাকাম।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ

"আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছি। সে বলল : 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ নেই।'"[৮২০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

"প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, 'আল্লাহর বন্দেগি করো এবং তাগূতের বন্দেগি পরিহার করো।'"[৮২১]

তাওহীদই হলো রাসূলদের দাওয়াতের চাবি। এ কারণেই নবি ﷺ তাঁর দূত মুআয ইবনু জাবাল رضي الله عنه-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

إِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلٰى أَنْ يَّشْهَدُوْا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

---

[৮২০] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৯।

[৮২১] সুরা নাহল, ১৬ : ৩৬।

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ...

"তুমি এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা আহলুল কিতাব। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে, তখন তাদেরকে আহ্বান করবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তা হলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন।..."[৮২২]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

"আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন লোকদের সাথে লড়াই করতেই থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত-না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"[৮২৩]

এই কারণে সঠিক অভিমত হলো মুকাল্লাফ বা শারঈ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হলো: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই)-এর সাক্ষ্য দেওয়া।

চিন্তা-ফিকির করা কিংবা যুক্তি দেওয়া সর্বপ্রথম ওয়াজিব নয়। যেমনটি অজ্ঞ দার্শনিকরা বলে থাকেন।

সুতরাং তাওহীদ হলো ইসলামে প্রবেশের সর্বপ্রথম কথা আর দুনিয়া থেকে বের হওয়ার সর্বশেষ কথা। যেমন নবি ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যার সর্বশেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ

---

[৮২২] বুখারি, ১৪৯৬; মুসলিম, ১৯।

[৮২৩] বুখারি, ২৫; মুসলিম, ২২।

করবে।”[৮২৪]

এটিই হলো সর্বপ্রথম ওয়াজিব আমল এবং এটিই হলো সর্বশেষ ওয়াজিব আমল। সুতরাং তাওহীদই হলো বান্দার সবকিছুর শুরু ও শেষ।

রাসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন

যে তাওহীদের প্রতি রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছেন এবং আসমানি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে তা দুই প্রকার :

১. জ্ঞান ও সত্যায়নের ক্ষেত্রে তাওহীদ (تَوْحِيْدٌ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ)

২. উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে তাওহীদ(تَوْحِيْدٌ فِي الْمَطْلَبِ وَالْقَصْدِ)

১. জ্ঞান ও সত্যায়নের ক্ষেত্রে তাওহীদ : এটি হলো আল্লাহ তাআলার সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি, কাজকর্ম, আসমানসমূহের ওপরে তাঁর আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া, কিতাব সম্পর্কে তাঁর কথা বলা, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার সাথে ইচ্ছা কথা বলা, তাঁর কুদরত, ক্ষমতা, হিকমত ইত্যাদিকে সত্যায়ন করা। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কুরআন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। যেমন : সূরা হাদীদের শুরুতে, সূরা ত্বহায়, সূরা হাশরের শেষে, সূরা ফুস্‌সিলাতের শুরুতে, সূরা আ-ল ইমরানের শুরুতে, সূরা ইখলাসের পুরাটাতেই এর আলোচনা রয়েছে। এমনিভাবে আরও বিভিন্ন সূরাতে এর আলোচনা এসেছে।

২. উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে তাওহীদ : এই প্রকার তাওহীদ হলো যেমন সূরা কাফিরূনের বিষয়বস্তু এবং নিম্নের এই আয়াতে যে বিষয়ের আলোচনা এসেছে, তা—

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

“বলুন, ‘হে আহলে কিতাবগণ, একটি বিষয়ের দিকে আসো, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য

[৮২৪] আবূ দাউদ, ৩১১৬, সহীহ।

কারও ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করবে না।'"[৮২৫]

সূরা সাজদার শুরুতে ও শেষে, সূরা ইউনুসের শুরুতে, মাঝে ও শেষে, সূরা আ'রাফের শুরুতে ও শেষে, সূরা আনআমের পুরোটা জুড়েই এবং কুরআনের প্রায় অধিকাংশ জায়গাতেই; বরং প্রতিটি সূরার আলোচ্য বিষয় এই দুই প্রকার তাওহীদ।

আমি বরং বলব : কুরআনের প্রতিটি আয়াতই তাওহীদকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং এর প্রতি আহ্বান করে। কেননা কুরআন হয়তো আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাবলি সম্পর্কে খবর দেয়; যা জ্ঞানগত ও সত্যায়নগত তাওহীদ।

অথবা একক সত্তা, যাঁর কোনো শরীক নেই, সেই আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করতে এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সবকিছুর উপাসনা পরিত্যাগ করতে আহ্বান জানায়; যা ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যগত তাওহীদ।

অথবা আদেশ ও নিষেধের সংবাদ দেয় এবং আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যকে আবশ্যক করে। এটি হলো তাওহীদের হক এবং তাওহীদকে পরিপূর্ণকারী।

অথবা কুরআন তাওহীদপন্থি ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তাআলার পুরস্কার, দুনিয়াতে ও আখিরাতে তাদেরকে কী কী নিয়ামাত ও সম্মান তিনি দান করবেন, সে সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে; যা তাওহীদের প্রতিদান।

অথবা কাফির-মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দেয়, দুনিয়াতে তাদের ওপর কী কী আযাব নেমে আসে এবং আখিরাতে তাদেরকে কী রকম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে অবহিত করে; যা তাওহীদের হুকুম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরিণতি।

সুতরাং পুরা কুরআনেই তাওহীদ, তাওহীদের হক, তাওহীদের প্রতিদান, শিরক এবং শিরককারী বা তাওহীদ থেকে বিমুখতা প্রদর্শনকারীদের শাস্তি সম্পর্কেই

---

[৮২৫] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৬৪।

আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ তাওহীদ, ﴿رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ তাওহীদ, ﴿اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ তাওহীদ, ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ তাওহীদ, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ তাওহীদ, ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ তাওহীদ, ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ তাওহীদ; যা তাওহীদপন্থিদের পথের দিকে হিদায়াত প্রার্থনাকে অন্তর্ভুক্ত করে; আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন। غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ হলো তাওহীদ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারীদের প্রসঙ্গ।

আল্লাহ তাআলার নিজের ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্যদান

আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের ব্যাপারে তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ফেরেশতাগণ, রাসূলগণ এবং আম্বিয়ায়ে কেরামও সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۗ
>
> "আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। আর ফেরেশতা ও সকল আলিমগণই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় সত্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"[৮২৬]

এই আয়াতটি প্রকৃত তাওহীদকে সাব্যস্ত করে, সমস্ত বাতিলপন্থিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের কথা ও মতবাদ যে ভ্রান্ত তার সাক্ষ্য দেয়। এই আয়াতে ঈমান এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞার যে মর্মার্থ নিহিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করার পর এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

ওপরের আয়াতটি মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সবচেয়ে সম্মানিত, সত্য ও ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দেওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। এবং যে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন তাও সবচেয়ে সম্মানিত। সালাফগণ সাক্ষ্যদানের অর্থ সম্পর্কে যা বলেছেন; তা

---

[৮২৬] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৮-১৯।

হুকুম প্রদান করা, ফায়সালা দেওয়া, জানানো, ব্যাখ্যা করা এবং খবর দেওয়া—এই অর্থগুলোর মধ্যেই আবর্তিত হয়। মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, '(সাক্ষ্য দেওয়া মানে) হুকুম প্রদান করা এবং ফায়সালা দেওয়া।' যাজ্জাজ ﷺ বলেছেন, 'ব্যাখ্যা করা।' কেউ কেউ বলেছেন, 'জানিয়ে দেওয়া এবং খবর প্রদান করা।'

এই সব অভিমতের সবগুলোই সঠিক; পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা সাক্ষ্যদান সাক্ষীর কথাবার্তা ও খবর, কোনোকিছু জানিয়ে দেওয়া, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, তার হুকুম, ফায়সালা সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সাক্ষ্যদানের চারটি স্তর রয়েছে—

১. যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তা সঠিক হওয়ার জন্য সে বিষয়ের জ্ঞান থাকা এবং তা বিশ্বাস করা আবশ্যক।

২. সে সম্পর্কে কথা বলা; যদিও তা মানুষকে না জানায়। বরং সে নিজেই নিজের সাথে তা নিয়ে কথা বলবে, তা স্মরণ করবে অথবা লিখে রাখবে।

৩. যে বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, তা মানুষজনকে জানানো, সে সম্পর্কে খবর দেওয়া এবং তা সুস্পষ্ট করা।

৪. এর বিষয়বস্তুর আদেশ দেওয়া এবং তা মানতে বাধ্য করা।

সুতরাং নিজের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ন্যায়নিষ্ঠভাবে সাক্ষ্যদান এই চারটি স্তরকেই শামিল করে : এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইলম রয়েছে, তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, তা সবাইকে জানিয়েছেন, সে সম্পর্কে আদেশ করেছেন এবং তা মানা বাধ্যতামূলক করেছেন।

(উপরিউক্ত চারটি স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা :)

ইলমের স্তর : সত্য-সাক্ষ্য দেওয়া ইলমের স্তরকে আবশ্যিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যথায় সাক্ষ্যদাতা এমন বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, যে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই! আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

"তবে যদি কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দান করে।"[৮২৭]

খবর দেওয়া ও কথা বলার স্তর : যে ব্যক্তি কথা বলল ও খবর দিলো, সে যেন সে সম্পর্কে সাক্ষ্যই দিলো; যদিও সাক্ষ্য দেওয়ার কথা মুখে উচ্চারণ না করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

"এরা স্ত্রীলোক গণ্য করেছে ফেরেশতাদেরকে; যারা দয়াময় আল্লাহর খাস বান্দা। তারা কি তাদের দৈহিক গঠন প্রত্যক্ষ করেছে? এখন তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৮২৮]

এটিকে তাদের সাক্ষ্যস্বরূপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদিও তারা সাক্ষ্য দেওয়ার কথা মুখে উচ্চারণ করেনি এবং অপরের কাছে তা পৌঁছিয়েও দেয়নি।

সংবাদ প্রদান করা ও জানিয়ে দেওয়ার স্তর : এটি দুই প্রকার : ১. কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া এবং ২. কাজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া। কোনো বিষয়ে জানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ দুটি পন্থা অবলম্বন করা হয়। কখনো কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় আবার কখনো কাজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। এ কারণেই যে ব্যক্তি নিজের বাড়িকে মাসজিদ বানায়, এর দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয় এবং সেখানে সালাতের সময় আযান দেয়; তা হলে তা ওয়াক্ফ হিসেবে গণ্য হয়, তার বাড়ি শারঈ মাসজিদ হিসেবে সাব্যস্ত হয়। যদিও সে ওয়াক্ফের কথা মুখে উল্লেখ না করে।

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যদান, ব্যাখ্যা, কোনোকিছু জানানো কখনো কথার মাধ্যমে হয় আবার কখনো কাজের মাধ্যমেও হয়।

কথার মাধ্যমে : যা দিয়ে তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। সমস্ত রাসূল আল্লাহ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নিজের

---

[৮২৭] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮৬।

[৮২৮] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১৯।

ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ 'তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই' এবং তিনি তাঁর বান্দাদেরও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার বাণী পৌঁছানোর সবকটি উৎস থেকেই এ বিষয়টি জানা যায়।

কাজের মাধ্যমে : আল্লাহ্ তাআলার ব্যাখ্যা, কোনোকিছু সম্পর্কে অবগত করানো তাঁর কাজের মাধ্যমেও জানা যায়। চিন্তাভাবনা করলে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর মাঝেই আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

"অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো পৃথিবীর দিক-দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তা যথার্থ সত্য।"[৮২৯]

অর্থাৎ কুরআন যথার্থই সত্য। আল্লাহ্ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে-থাকা নিদর্শনাদি তাঁর বাণী-সমৃদ্ধ-নিদর্শন কুরআনকে সত্যায়ন করে। কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা অনেক মুফাস্সির ও ইমামগণও বলেছেন। ইবনু কাইসান ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ্ তাআলার সুনিপুণ পরিচালনা ও সৃষ্টিজগতে তাঁর অনন্য সৃষ্টিই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই।'[৮৩০]

আদেশ দেওয়া ও বাধ্যতামূলক করার স্তর : যদিও শুধু সাক্ষ্য প্রদান করাই আদেশ দেওয়া ও বাধ্যতামূলক করাকে আবশ্যক করে না। কিন্তু এখানে আল্লাহ্র সাক্ষ্যদান এর প্রতি ইঙ্গিত করে এবং তা অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা এর সাক্ষ্যও দিয়েছেন এবং বান্দাদের তা আদেশও করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ

"আপনার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না।"[৮৩১]

---

[৮২৯] সূরা ফুস্সিলাত, ৪১ : ৫৩।

[৮৩০] সা'লাবি, তাফসীর, ৮/১৫৮।

[৮৩১] সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩।

তিনি আরও বলেন,

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ

"আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না, উপাস্য তো মাত্র একজনই।'"[৮৩২]

পুরা কুরআনই এই বিষয়ের সাক্ষী।

আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যদান এই বিষয়টিকে (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে) আবশ্যক করার কারণ হলো : আল্লাহ যখন এই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই, তখন তিনি এই বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন, সুস্পষ্ট করেছেন, হুকুম দিয়েছেন এবং ফায়সালা করেছেন যে, তিনি ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তা ইলাহ্ নয়, তাদের ইলাহ্ হওয়াটা চরম ভ্রান্ত ও বাতিল। সুতরাং তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদাত পাওয়ার অধিকার রাখে না, যেমন তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইলাহ্ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর এই বিষয়টিই এক আল্লাহকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করার আদেশকে আবশ্যক করে এবং অন্য কাউকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে।

***

আল্লাহ তাআলার এই সাক্ষ্য প্রদানে আলিমদের ব্যাপারে প্রশংসা রয়েছে, যারা এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। এতে আলিমদের ন্যায়পরায়ণতারও প্রমাণ রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা আলিমদের সাক্ষ্যকে নিজ সাক্ষ্যের সাথে ও ফেরেশতাদের সাক্ষ্যের সাথে মিলিয়েছেন এবং আলিমদের মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। কেউ যখন সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে যেমন দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়, তেমনিভাবে এই সাক্ষ্যকে যারা অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা আলিমদেরকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। সুতরাং সৃষ্টির ওপর রাসূলদের মাধ্যমে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর বান্দাদের ওপর আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আলিমগণ হলেন রাসূলদের খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত।

---

[৮৩২] সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৫১।

আলিমদের সাক্ষ্যদানকে কেউ কেউ স্বীকার করা অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার কেউ কেউ বর্ণনা করা ও প্রকাশ করা অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। **সঠিক অভিমত হলো** এটি উপরিউক্ত দুইটি বিষয়কেই শামিল করে। আলিমদের সাক্ষ্যদান তা স্বীকার করা, বর্ণনা করা, প্রকাশ করা, প্রচার করা সবগুলো অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তারাই কিয়ামাতের ময়দানে মানুষের ওপর আল্লাহর পক্ষে সাক্ষী হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا
>
> "আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যমপন্থি' উম্মাতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রাসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী।"[৮৩৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

> هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
>
> "তিনিই তোমাদের নাম 'মুসলমান' রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানুষদের ওপর।"[৮৩৪]

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আলিমদেরকে সর্বোত্তম ও ন্যায়পরায়ণ বানিয়েছেন, তাদের সৃষ্টি করার পূর্বেই বিশেষভাবে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানতেন তিনি কাদেরকে কিয়ামাতের দিন সমস্ত উম্মাতের ওপর সাক্ষী বানাবেন। সুতরাং যে এই সাক্ষ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জানবে না, সে অনুযায়ী আমল করবে না, তা স্বীকার করবে না, তার দাওয়াত দেবে না, কাউকে তা শিখাবে না এবং পৌঁছাবে না; সে আল্লাহ তাআলার সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সাহায্য-লাভের উৎস।

---

[৮৩৩] সূরা বাকারা, ২ : ১৪৩।

[৮৩৪] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৮।

(সাক্ষ্য প্রদানের পরে) আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।”[৮৩৫]

মুফাস্‌সিরগণ এই বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন যে, এটি নতুন একটি বাক্য নাকি পূর্বে বর্ণিত সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত? এবং এটিও সাক্ষ্যের একটি অংশ।

এই মতবিরোধ মূলত إِنَّ শব্দটির ই'রাবকে ঘিরে। অর্থাৎ যেরযুক্ত (إِنَّ) হবে নাকি যবরযুক্ত (أَنَّ) হবে—এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই এই মতভেদ।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মত হলো নতুন বাক্য হিসেবে যের (إِنَّ) হবে। একমাত্র ইমাম কাসায়ি ﷬ যবরের পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু যের হওয়াটাই হলো সঠিক অভিমত। কারণ এর পূর্বেই বাক্য পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তবে দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুকে আরও শক্তিশালী করে। এটি বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ এবং প্রশংসা ও স্তুতির ক্ষেত্রে বেশ গভীর।

তাওহীদপন্থিদের পরস্পরের মাঝে পার্থক্য

কোনো সন্দেহ নেই যে, তাওহীদপন্থিদের পরস্পরের ভেতর তাওহীদের ক্ষেত্রে তাদের ইলম, আমল, মা'রিফাত ও অবস্থা অনুসারে অনেক পার্থক্য রয়েছে; যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হিসেব করতে সক্ষম নয়।

মানুষের মধ্যে তাওহীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম ﷺ। আবার তাদের চেয়েও বেশি পরিপূর্ণ ছিলেন রাসূলগণ ﷺ।

তাদের মধ্যে আবার অগ্রগামী ছিলেন, যারা দৃঢ়তার অধিকারী (أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ)। তারা হলেন : নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ ﷺ।

তাদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলেন : আল্লাহর দুই খলীল, মুহাম্মাদ ও ইবরাহীম ﷺ। কারণ তাঁরা দুজন ইলম, মা'রিফাত, অবস্থা, মানুষকে এর প্রতি দাওয়াত দেওয়া, জিহাদ করা ইত্যাদি সার্বিক বিবেচনায় তাওহীদকে এমনভাবে

[৮৩৫] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৯।

ধারণ করেছিলেন, যা আর কেউ পারেনি।

সমস্ত রাসূল যে স্তরের তাওহীদের অধিকারী ছিলেন, তার চেয়ে পরিপূর্ণ তাওহীদ আর নেই। এর প্রতিই তারা দাওয়াত দিয়েছেন এবং এর ওপরেই তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-কে এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রাসূলদের অনুসরণ করার আদেশ করেছেন। যেমন : ইবরাহীম ﷺ-এর আলোচনা এবং তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়ের সাথে শির্কের ভ্রান্তি ও তাওহীদের বিশুদ্ধতা নিয়ে ইবরাহীম ﷺ-এর বাক্‌বিতণ্ডা উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

“তাদেরকেই আমি কিতাব, শারীআত ও নুবুওয়াত দান করেছি। অতএব, এখন যদি এরা আপনার নুবুওয়াত অস্বীকার করে, তা হলে (কোনো পরোয়া নেই।) এর জন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। (হে মুহাম্মাদ,) তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল। অতএব, আপনি তাদের পথ অনুসরণ করুন।”[৮৩৬]

সুতরাং তাওহীদের ক্ষেত্রে তাঁদের চেয়ে পরিপূর্ণ আর কেউ নেই। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ করা হয়েছে।

যখন নবি-রাসূলগণ ইলম, আমল, দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে তাওহীদের হাকীকতকে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করেছেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে সৃষ্টিকুলের জন্য ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন, যারা আল্লাহর প্রতি পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাঁর দিকেই দাওয়াত দেবেন। আর সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে তাদের অধীন বানিয়েছেন; যারা তাঁদের অনুসরণ করবে এবং তাঁদের দেখানো পথে চলবে। আল্লাহ্ তাআলা নবি-রাসূলদের অনুসারীদের সৌভাগ্য, সফলতা ও হিদায়াতের অধিকারী বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বিরোধিতা-কারীদেরকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ বলে চিহ্নিত করেছেন। নবি-রাসূলদের ইমাম ও তাদের শাইখ

---

[৮৩৬] সূরা আনআম, ৬ : ৮৯-৯০।

ইবরাহীম ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

"'আমি তোমাকে সকল মানুষের ইমাম বানাব।' ইবরাহীম বলল, 'আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অঙ্গীকার?' তিনি বললেন, 'আমার এ অঙ্গীকার জালিমদের ব্যাপারে নয়।'"[৮৩৭]

অর্থাৎ ইমাম বানানোর এই অঙ্গীকার মুশরিকদের ব্যাপারে নয়।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-কে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করতে বলেছেন। আর নবি ﷺ তাঁর সাহাবিদের শেখাতেন—"যখন সকাল হবে, তখন তোমরা বলবে,

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"আমরা সকাল করলাম ইসলামের ফিতরাতের ওপর, ইখলাসের কালিমার ওপর, আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীনের ওপর, আমাদের পিতা ইবরাহীম ﷺ-এর মিল্লাতের ওপর; যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[৮৩৮]

মিল্লাতু ইবরাহীম হলো : তাওহীদ। **মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীন** হলো : আল্লাহর নিকট হতে তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন—কথা, কাজ ও আকীদা-বিশ্বাস। **ইখলাসের কালিমা** হলো : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া। আর **ইসলামের ফিতরাত** হলো : আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছেন; তাঁর প্রতি ভালোবাসা, একক অদ্বিতীয় সত্তার ইবাদাত করা এবং গোলাম হিসেবে, বিনয়ী হয়ে, তাঁর সবকিছু মেনে নিয়ে, সবসময় তাঁকে স্মরণে রেখে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

এটি হলো বিশিষ্টজনদের তাওহীদ। যে ব্যক্তি এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে হলো

---

[৮৩৭] সূরা বাকারা, ২ : ১২৪।

[৮৩৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৫৩৬০; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ১০১৭৫।

সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

"ইবরাহীমের দ্বীন থেকে কে মুখ ফেরায়? যে নিজেকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় আচ্ছন্ন করেছে, সে ছাড়া আর কে এ কাজ করতে পারে? ইবরাহীমকে তো আমি দুনিয়ায় নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলাম আর আখিরাতে সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে। তার অবস্থা ছিল এই যে, যখন তার রব তাকে বলল, 'আত্মসমর্পণ করো', তখনই সে বলে উঠল, 'আমি বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম।'"[৮৩৯]

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন : ১. সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বোধ এবং ২. বুদ্ধিমান। নির্বোধ হলো : যে ব্যক্তি ইবরাহীম ﷺ-এর মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শির্কের প্রতি ধাবিত হয়। আর বুদ্ধিমান হলো : যে ব্যক্তি মৌখিকভাবে, কাজের মাধ্যমে এবং ভাবভঙ্গিতে শির্ক থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে। ফলে তার কথা হয় তাওহীদ, তার কাজ হয় তাওহীদ, তার অবস্থা হয় তাওহীদ এবং তার দাওয়াতও হয় তাওহীদ।

সাধারণ মুসলমানদের দলীল-প্রমাণ

কোনো সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ মানুষ সুন্দরভাবে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে না। তাদের অন্তরে তাওহীদের উপস্থিতির চেয়ে এটি অতিরিক্ত একটি বিষয়। কোনোকিছু অর্জন হলে, কোনো বিষয় সম্পর্কে জানলে এবং কোনোকিছুতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলেই সবাই তার ওপর সুন্দর করে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে না, তা দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করতে পারে না এবং তাতে আরোপিত আপত্তিগুলো প্রতিহতও করতে পারে না। এ রকম যোগ্যতা থাকা এক বিষয় আর সে সম্পর্কে জানা, বিশ্বাস করা আরেক বিষয়। তবে তাওহীদ সম্পর্কে জানা ও বিশ্বাস করার সাথে সাথে এক প্রকার দলীল-প্রমাণও বান্দার নিকট থাকতে হবে। যদিও তা তার্কিকরা যেমন সুন্দর করে বিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করে সেরকম হওয়া জরুরি

[৮৩৯] সূরা বাকারা, ২ : ১৩০-১৩১।

নয়। আসলে তাওহীদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এটি কোনো শর্তও নয়। আর তাওহীদ সম্পর্কে জানতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতেও এর কোনো প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য ও অবস্থা অনুসারে প্রমাণ পেশ করবে। আসলে প্রমাণ উপস্থাপনের প্রকার, পদ্ধতি ও স্তর অসংখ্য; আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা গণনা করার সক্ষমতা রাখে না। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই রয়েছে পথপ্রদর্শক।

প্রতিটি সহীহ ইলম ও ইয়াকীনের দলীল রয়েছে; যা সেই বিষয়কে আবশ্যক করে এবং এর সাক্ষীও রয়েছে; যার মাধ্যমের তার বিশুদ্ধতা নির্ণীত হয়। কিন্তু কখনো কখনো সেই ইলম ও ইয়াকীনের অধিকারী ব্যক্তি তা উপস্থাপন করতে পারে না; অক্ষমতা বা মূর্খতার কারণে। যদি কখনো সেই বিষয়ে কথা বলে, তখন জ্ঞানীদের পরিভাষা ও শব্দ ব্যবহার করতে পারে না। (তবে তাদের মধ্যেও অনেক উপকারী বিষয় পাওয়া যায়।) অনেক দলীল এমন রয়েছে, যেগুলো দ্বারা সত্যের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়; সেগুলো দার্শনিকদের দলীল ও প্রস্তাবনার চেয়ে বেশি বিশুদ্ধ, সংশয় থেকে অনেক দূরবর্তী এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বেশ কাছাকাছি হয়।

যে ব্যক্তি মানুষজনের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, সে ব্যক্তি অধিকাংশ মুসলিমকেই এমন পায় যে, তারা তাওহীদ, মা'রিফাত ও ঈমানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ দার্শনিক, তার্কিক ও যুক্তিবিদের চেয়ে বেশি অগ্রগামী ও মজবুত। সাধারণ মুসলিমদের নিকট সে এমন এমন দলীল ও নিদর্শনাদিও পেয়ে যায়, যা তাদের বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচায়ক, যা মুতাকাল্লিমীন বা দার্শনিকদের নিকট থাকা দলীল-প্রমাণের চেয়ে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে প্রাকৃতিক নিদর্শনাদির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে তাঁর তাওহীদ, সিফাত, কার্যাবলি ও রাসূলদের সত্যবাদিতার ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। সেই নিদর্শনগুলো ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়, আকল দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এবং সেগুলো মানুষের তবিয়তে সৃষ্টিগতভাবেই রয়েছে। যা বোঝার জন্য পর্যবেক্ষণকারীর প্রয়োজন পড়ে না যে, সে তার্কিক ও দার্শনিকদের পথ, মত, পরিভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করবে। সুস্থ অনুভূতি ও পার্থক্যকারী বোধবুদ্ধির অধিকারী প্রতিটি ব্যক্তিই তা চিনতে পারে, তা স্বীকার করে এবং সেসব নিদর্শন যা বোঝায়, তা হৃদয়ঙ্গম করে। কুরআন মাজীদে এ রকম প্রায় দশ হাজার

সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করেনি; যখন সে তা শুনবে, বুঝার চেষ্টা করবে এবং তা উপলব্ধিতে আনবে, তখন আয়াতগুলো যা বোঝাতে চেয়েছে, তার মস্তিষ্ক সে দিকে খুব দ্রুতই ধাবিত হবে এবং তা স্বীকার করে নেবে।

মোটকথা কোনোকিছু সম্পর্কে জানে এমন প্রতিটি ব্যক্তিই সে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে না। আবার দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে এমন প্রতিটি ব্যক্তিই তা সুবিন্যস্তভাবে গুছিয়ে বলতে পারে না, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না এবং সে সম্পর্কে কোনো আপত্তির খণ্ডনও করতে পারে না।

আমরা দুচোখে যা দেখি, তা-ই দলীল। যেমন : নির্মিত বস্তুর মাধ্যমে নির্মাতার ওপর এবং সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে স্রষ্টার ওপর দলীল উপস্থাপন। এটি হলো কুরআনের পন্থা; যার চেয়ে উত্তম আর কোনো পন্থা নেই।

*****

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত প্রবন্ধমালা

বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার কারণে 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থেরই বিভিন্ন জায়গায় লেখকের বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত কয়েকটি প্রবন্ধ এই অধ্যায়ে সংযুক্ত করে দেওয়া হলো। আশা করি পাঠক এতে উপকৃত হবেন।

১. প্রবন্ধ :

পরিভাষাসমূহ এবং এর থেকে সাধারণ মানুষের দূরত্ব

জেনে রাখুন—ফানা, ইত্তিসাল, জামউশ শাওয়াহিদ, জামউল উজূদ, জামউল 'আইন[৮৪০] ইত্যাদি মাকামগুলোর চেয়ে তাওবার প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষিতা অনেক বেশি। আর কীভাবেই-বা উপরিউক্ত বিষয়গুলো সালিকীনদের সর্বোচ্চ সম্মানিত মানযিল ও নৈকট্যশীল বান্দাদের সর্বশেষ মাকাম হিসেবে গণ্য হবে; অথচ কুরআন-সুন্নাহর কোথাও এগুলোর আলোচনা নেই?! হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ এগুলো সম্পর্কে জানেই না। অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত কষ্ট ও মেহনত করার পর এ সম্পর্কে সামান্য ধারণা পেতে পারে। বেশির ভাগ লোকজনই ব্যাখ্যা করা বাদে এই সব মাকাম বা মানযিলেরর কথা শোনার পর তা বুঝতে পারবে না এবং এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তাও অনুধাবন করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলার কালামে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতে বা সাহাবায়ে কেরামের বাণীতে—যাঁদের ইলম, মা'রিফাত ও মর্যাদা ছিল পরবর্তীদের তুলনায় অনেক বেশি, তাঁদের দ্বীনদারি ও দ্বীনের জন্য কষ্ট স্বীকার করাও ছিল অতুলনীয়—সেগুলোর কোথাও কি এমন কথা রয়েছে, যা এসব মাকাম ও মানযিলের দিক্‌নির্দেশনা দান করে? অথবা এগুলোর প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত করে? যার ফলে পরবর্তীদের মধ্যে যারা সংক্ষিপ্ত শব্দ আর অস্পষ্ট অর্থের মাধ্যমে এই সব পরিভাষা আবিষ্কার করেছে, তারাই নবি-রাসূলদের পরে আল্লাহর-পথের-পথিকদের মাকাম ও মানযিল সম্পর্কে এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী হয়ে গেছে!?

---

[৮৪০] এগুলো বিভিন্ন মানযিলের নাম; যা পরবর্তী যুগের সূফিয়ায়ে কেরাম আবিষ্কার করেছেন। তাদের নিকট এগুলো একেকটা পরিভাষা; প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আর এগুলোই তাদের নিকট ইবাদাতের সর্বোচ্চ মাকাম।

এটি হলো সবচেয়ে বড়ো পথভ্রষ্টতা!!

ইরাদা, তলব ও সুলূকের পথে এই সমস্ত ব্যক্তিরা হলো ভ্রান্ত মু'তাযিলা ও জাহ্মিয়্যাদের মধ্যে যারা দার্শনিক, তাদের মতো। আর যারা ইলম, আল্লাহ তাআলার সত্তা, সিফাত ও নামসমূহ জানার ক্ষেত্রে তাদের দেখানো পথে চলে তারা উভয় দলই; এবং তাদের মধ্যে ফিক্হের অনেক লেখকও চরম লৌকিকতা অবলম্বনকারী। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

"বলুন, 'আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।'"[৮৪১]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেছেন,

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. أُولٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا أَفْضَلَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ

'যে ব্যক্তি কোনো পথ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের পথ অনুসরণ করে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ জীবিত মানুষ ফিতনা হতে মুক্ত নয়। মৃত ব্যক্তিগণ হলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবিগণ, যারা এ উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ, সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী, যাদের ইলম ছিল অনেক গভীর এবং যারা ছিলেন লৌকিকতাহীন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলের সঙ্গী হিসেবে এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদেরকে বাছাই করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করো এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো আর সাধ্যমতো তাদের আখলাক ও জীবনযাপন পদ্ধতি শক্ত করে আঁকড়ে ধরো। কারণ

---

[৮৪১] সূরা সা দ, ৩৮ : ৮৬।

তাঁরা হিদায়াত ও সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর ছিলেন।'[৮৪২]

আপনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট (ভ্রান্ত সূফিদের মতো) শব্দে ও অর্থে দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা এবং কৃত্রিমতা কখনো পাবেন না। কেবল তাদের নিকটই অস্পষ্টতা পাওয়া যাবে, যারা সাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বুঝতে পারবে যে, তাদের বানানো পরিভাষাগুলো হলো অতি দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়; যা রয়েছে দুর্গম কোনো পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায়, যাতে চড়া সহজ নয় যে, কেউ আরোহণ করবে আবার তা এমন লোভনীয় কোনো বস্তুও নয় যে, কেউ কষ্ট স্বীকার করে সেখানে পৌঁছাবে। আসলে এটি আপনার পথকে কেবল দীর্ঘায়িত করবে, আপনার জন্য অনর্থক আলোচনা বিস্তৃত করবে এবং দুর্লভ দুর্লভ শব্দ ও অর্থ আপনার সামনে নিয়ে আসবে। অতঃপর আপনি যখন পথের শেষপ্রান্তে পৌঁছবেন, দেখবেন আপনার উল্লেখযোগ্য কোনো অর্জনই হয়নি। তবে আপনি সেখানে অনেক শোরগোল ও হইচই শুনতে পাবেন; কিন্তু তেমন কোনো উপকার দেখতে পাবেন না।

মুতাকাল্লিমীন বা দার্শনিকরা আজীবন শুধু নিম্নোক্ত শব্দাবলির শোরগোলই শুনতে পায়, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো উপকারিতার দেখা কখনো পায় না—

আল-জাওহার (اَلْجَوْهَرُ), আল-আরায (اَلْعَرَضُ), আল-কাওন (اَلْكَوْنُ), আল-লাওন (اَللَّوْنُ), আল-জাওহারুল ফার্দ (اَلْجَوْهَرُ الْفَرْدِ), আল-হাল (اَلْحَالُ), আল-হারাকাহ (اَلْحَرَكَةُ), আস-সুকূন (اَلسُّكُوْنُ), আল-উজূদ (اَلْوُجُوْدُ), আল-মাহিয়্যাহ (اَلْمَاهِيَّةُ), আল-ইনহিয়ায (اَلْاِنْحِيَازُ), আল-জিহাত (اَلْجِهَاتُ), আন-নাসাব (اَلنَّسَبُ), আল-ইযাফাত (اَلْإِضَافَاتُ), আল-গাইরাইনি ওয়াল খিলাফাইনি (اَلْغَيْرَيْنِ وَالْخِلَافَيْنِ), আয-যিদ্দাইনি ওয়ান নাকীদাইনি (اَلضِّدَّيْنِ وَالنَّقِيْضَيْنِ), আত-তামাসিল ওয়াল ইখতিলাফ (اَلتَّمَاثِلُ وَالْاِخْتِلَافُ), আরায কি দুই জমানায় বাকি থাকে? জামান (اَلزَّمَانُ) ও মাকান (اَلْمَكَانُ) কাকে বলে? ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু জামান ও মাকান কাকে বলে তাও তার জানা হয়ে ওঠে না। সে নিজেও স্বীকার করে, সে উজূদকে জানতেই পারেনি—এটি মাহিয়্যাতুশ শাই নাকি এর ওপর অতিরিক্ত কিছু? এটাও স্বীকার করে যে, সে রবের উজূদ (অস্তিত্ব)

---

[৮৪২] তাবরিযি, মিশকাত, ১৯৩, দঈফ।

নিয়ে সংশয়ে রয়েছে, তা কি উজূদে মাহ্য নাকি মাহিয়্যাতের সাথে সংযুক্ত উজূদ? একেবারে শেষে গিয়ে বলে, 'আমার নিকট সঠিক অভিমত হলো : এই মাসআলায় বেশি অগ্রসর না হয়ে থেমে যাওয়া!'

তাদের মধ্যে (নিজ ভাবনায়) সবচেয়ে উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তিই মৃত্যুর সময় বলেছেন, 'আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি; অথচ আমি কেবল একটি বিষয় জানতে পেরেছি। আর তা হলো মুমকিন বস্তুসমূহ (অর্থাৎ সৃষ্টবস্তু) ওয়াজিব সত্তা (আল্লাহর) প্রতি মুখাপেক্ষী। অতঃপর তিনি বলেছেন, 'কিন্তু মুখাপেক্ষী হওয়া তো একটি অস্তিত্বহীন বিষয়! (তাই এ বিষয়টিও প্রকৃতভাবে বুঝতে পারলাম না)। আসলে আমি মারা যাচ্ছি; কিন্তু এ জীবনে কিছুই জানা হলো না!' এটি হলো সেই ব্যক্তির অবস্থা, যিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও উপযুক্ত। আসলে তাদের মধ্যে এরকম অবস্থা এত বেশি যে, তা উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না। যেমন সালাফদের একজন বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে মৃত্যুর সময় সবচেয়ে বেশি সংশয়গ্রস্ত থাকে—আরবাবুল কালাম অর্থাৎ যারা সবসময় ইলমুল কালাম বা যুক্তিশাস্ত্র নিয়ে নিমগ্ন থাকে।'

আরও একদল রয়েছে, যারা তাদের চেয়েও বেশি কষ্ট স্বীকার করে। কিন্তু তারা উপকারী ইলম থেকে থাকে অনেক দূরে। তারা হলেন নিম্নোক্ত গুণের অধিকারী :

আল-হাইয়ূলা (اَلْهَيُوْلٰى), আস-সূরাহ (اَلصُّوْرَةُ), আল-আসতুক্কুসসাত (اَلْأَسْطُقُصَّاتُ), আল-আরকান (اَلْأَرْكَانُ), আল-'ইলালুল আরবাআ (اَلْعِلَلُ الْأَرْبَعَةُ), আল-জাওয়াহিরুল আকলিয়্যাহ (اَلْجَوَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ), আল-মুফারাকাত (اَلْمُفَارَقَاتُ), আল-মুজাররদাত (اَلْمُجَرَّدَاتُ), আল-মাকূলাতুল আশর (اَلْمَقُوْلَاتُ الْعَشْرُ), আল-কুল্লিয়্যাতুল খামস (اَلْكُلِّيَّاتُ الْخَمْسُ), আল-মুখতালিতাত (اَلْمُخْتَلِطَاتُ), আল-মুওয়াজ্জাহাত (اَلْمُوَجَّهَاتُ), আল-কদায়াল মুসাউওয়ারাত (اَلْقَضَايَا الْمُسَوَّرَاتُ), আল-কদায়াল মুহমালাত (اَلْقَضَايَا الْمُهْمَلَاتُ)। এই দলের ব্যক্তিবর্গরা সর্বোচ্চ কষ্ট স্বীকার করে। কিন্তু তাদের উপকারী ইলম ও নেক আমল অর্জিত হয় সবচেয়ে কম।

এমনিভাবে নিম্নোক্ত গুণাবলির অধিকারীরাও বেশ কষ্ট করেন; কিন্তু তাদের উপকার হয় অতি সামান্য—

আল-ইরাদা (اَلْإِرَادَةُ), আস-সুলূক (اَلسُّلُوْكُ), আল-হাল (اَلْحَالُ), আল-মাকাম

(اَلْمَقَامُ), আল-ওয়াক্ত (اَلْوَقْتُ), আল-মাকান (اَلْمَكَانُ), আল-বাদী (اَلْبَادِي), আল-বাযিহ (اَلْبَاذِهُ), আল-ওয়ারিদ (اَلْوَارِدُ), আল-খাতির (اَلْخَاطِرُ), আল-ওয়াকি' (اَلْوَاقِعُ), আল-কাদিহ (اَلْقَادِحُ), আল-লামি' (اَللَّامِعُ), আল-গাইবাত (اَلْغَيْبَةُ), আল-হুযূর (اَلْحُضُورُ), আল-মুহিক্ব (اَلْمُحِقُّ), আল-হাক্ব (اَلْحَقُّ), আস-সুক্র (اَلسُّكْرُ), আল-লাওয়ায়িহ (اَللَّوَائِحُ), আত-তাওয়ালি' (اَلطَّوَالِعُ), আল-আতাশ (اَلْعَطَشُ), আদ-দাহাশ (اَلدَّهَشُ), আত-তালবীস (اَلتَّلْبِيسُ), আত-তামকীন (اَلتَّمْكِينُ), আত-তালবীন (اَلتَّلْوِينُ), আল-ইসম (اَلْاِسْمُ), আর-রসম (اَلرَّسْمُ), আল-জামউ (اَلْجَمْعُ), জামউল জামঈ (جَمْعُ الْجَمْعِ), জামউশ শাওয়াহিদ (جَمْعُ الشَّوَاهِدِ), জামউল উজূদ (جَمْعُ الْوُجُودِ), আল-আসার (اَلْأَثَرُ), আল-কাওন (اَلْكَوْنُ), আল-বাওন (اَلْبَوْنُ), আল-ইত্তিসাল (اَلْاِتِّصَالُ), আল-ইনফিসাল (اَلْاِنْفِصَالُ), আল-মুসামারাহ (اَلْمُسَامَرَةُ), আল-মুশাহাদাহ (اَلْمُشَاهَدَةُ), আল-মুআয়ানা (اَلْمُعَايَنَةُ), আত-তাজাল্লী (اَلتَّجَلِّيْ), আত-তাখাল্লী (اَلتَّخَلِّيْ), আনা বিলা আনা (أَنَا بِلَا أَنَا), আনতা বিলা আনতা (أَنْتَ بِلَا أَنْتَ) নাহনু বিলা নাহনু (نَحْنُ بِلَا نَحْنُ), হুয়া বিলা হুয়া (هُوَ بِلَا هُوَ) ইত্যাদি। এগুলো হলো তাদের কষ্ট ও কৃত্রিমতার সামান্য নমুনামাত্র। এমনিভাবে ফিক্হের সাথে সম্পৃক্ত অনেকেই এরকম কষ্ট স্বীকার করে। অনেক ক্ষেত্রে সূফিয়ায়ে কেরামের কষ্টের চেয়ে তাদের কষ্ট বেশি হয়। (কিন্তু শেষে গিয়ে সামান্যই উপকৃত হয়।)

এই দলগুলো নিজেদের কাছে যা আছে, তা নিয়েই মগ্ন এবং তাতেই তারা আঁটকানো। তাদের ধারণা তারা ইলমের সমুদ্রে ডুব দিয়েছে; অথচ তাদের পা-ই ভিজে না। তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও বোধ-বিবেচনাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে; কিন্তু নবি-রাসূলদের আনীত ইলমের দ্বারা নিজেদের হৃদয়াত্মা আলোকিত করতে পারেনি। তাদের নিকট যে জ্ঞান রয়েছে তাতেই তারা মহাখুশি, তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। তারা রয়েছে এক উপত্যকায় আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম ﷽ রয়েছেন আরেক উপত্যকায়। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন, আমরা তাদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে কথা বলিনি; বরং আমাদের যা বলা উচিত, আমরা কেবল তা-ই বলেছি। ফলে অনেক বিষয় থেকে আমরা খুব সামান্যই উল্লেখ করেছি।

তাদের সবাই নিজেদের সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার অধীনে চলে; যার ব্যাপারে সালাফগণ একমত যে, তা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়।

তারাই হলেন প্রকৃত আহলুর রায় তথা যুক্তিবিদ। যাদের ব্যাপারে উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيْثُ أَنْ يَحْفَظُوْهَا فَقَالُوْا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا

'তোমরা আসহাবুর রায় অর্থাৎ যুক্তিবিদদের থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ তারা হলো সুন্নাহর শত্রু; হাদীসসমূহ আয়ত্ত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে তারা যুক্তি দিয়ে কথা বলে। পরিণতিতে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করে।'[৮৪৩]

তিনি আরও বলেছেন,

أَصْحَابُ الرَّأْيِ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، أَعْيَتْهُمْ أَنْ يَعُوْهَا، وَتَفَلَّتَتْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْوُوْهَا، فَاشْتَغَلُوْا عَنْهَا بِالرَّأْيِ

'আসহাবুর রায় হলো সুন্নাহর শত্রু। তারা সুন্নাহকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তা বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছে। অতঃপর সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়ে রায় বা যুক্তি নিয়ে মত্ত হয়েছে।'[৮৪৪]

আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ বলেছেন,

أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِيْ؟ وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِيْ؟ إِنْ قَلْتُ فِيْ كِتَابِ اللهِ بِرَأْيِيْ، أَوْ بِمَا لَا أَعْلَمُ،

'যদি আমি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে নিজের রায় দিয়ে কথা বলি কিংবা যা জানি না, তা বলি; তা হলে কোন জমিন আমাকে আশ্রয় দেবে আর কোন আসমান আমাকে ছায়া দান করবে?!'[৮৪৫]

---

[৮৪৩] দারাকুতনি, আস-সুনান, ৪২৮০; ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী, ২০০৪।

[৮৪৪] অনুরূপ দেখুন—ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলমি ও ফাদলীহি, ২০০১।

[৮৪৫] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩০৭৩১; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/১৬।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ

"সাবধান! চরমপন্থিরা (যারা সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করে, তারা) ধ্বংস হয়ে গেছে। সাবধান! চরমপন্থিরা ধ্বংস হয়ে গেছে। সাবধান! চরমপন্থিরা ধ্বংস হয়ে গেছে।"[৮৪৬]

এই সমস্ত দল ও ফিরকা থেকে আমরা যেরকম দুর্বোধ্য শব্দ, পরিভাষা ও অর্থ পেয়েছি, তা যদি চরমপন্থা না হয়, তা হলে চরমপন্থার কোনো বাস্তবতাই নেই! আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

বিভিন্ন প্রকার পরিভাষাসংক্রান্ত আলোচনা

اَلْإِتِّصَالُ (সম্পর্ক) এবং اَلْوُصُوْلُ (পৌঁছা) দ্বারা সূফিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক এবং আল্লাহর নিকট পৌঁছে যাওয়া। এর অর্থ এই নয় যে, বান্দার সত্তা আল্লাহর সত্তার সাথে মিলে যাবে, যেরকমভাবে দুটি সত্তা একে অপরের সাথে মিলে যায়; এটিও উদ্দেশ্য নয় যে, একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করবে। বরং এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহর পথে চলতে নিজের নফস ও সৃষ্টিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এ ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যের কথা কল্পনাও করা যায় না, কারণ তা অসম্ভব।

কারণ সালিক বা আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত পথ চলতেই থাকে। তার পথচলা কেবল তখনই থেমে যায়, যখন সে মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং এই জীবনে এমন কোনো মর্তবা বা স্তর নেই, যেখানে পৌঁছে গেলে পথচলা ফুরিয়ে যাবে, এমনিভাবে আল্লাহর সাথে বান্দার বাস্তবিকভাবে মিলে যাওয়ারও কোনো অস্তিত্ব নেই, যেখানে পৌঁছলে বান্দা ইবাদাত-বন্দেগি থেকে মুক্তি পাবে।

সুতরাং পথচলা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার দাবি করা হলো : তা'তীল ও ইলহাদ। (অর্থাৎ শারীআতকে অকেজো মনে করা এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া।)

[৮৪৬] মুসলিম, ২৬৭০; আবূ দাউদ, ৪৬০৮।

আর আল্লাহর সাথে বাস্তবিকভাবে মিলে যাওয়ার দাবি করা হলো : হুলূল ও ইত্তিহাদ। (অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার সাথে একীভূত হয়ে যাওয়া এবং তাতে প্রবিষ্ট হওয়া।)

প্রকৃত বিষয় হলো : আল্লাহর পথ থেকে নফস ও সৃষ্টিজগৎকে দূরে রাখা। কারণ এ দুটির সাথে অবস্থান করা মানে আল্লাহ-অভিমুখে পথচলা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। আর এ দুটিকে দূরে রাখাই হলো ইত্তিসাল বা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

যারা বলে, সমস্ত সত্তা ও অস্তিত্ব এক। তারা হলো ধর্মত্যাগী, দ্বীন থেকে খারিজ। কারণ তারা বলে বান্দা আল্লাহ তাআলার কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তাআলার কার্যাবলি তাঁর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁর গুণাবলি হলো তাঁর সত্তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ফলাফলস্বরূপ দাঁড়ায়, বান্দা হলো আল্লাহর সত্তার অন্তর্ভুক্ত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে।

তারা যে জায়গায় ভুল করেছে তা হলো : (তারা বান্দাকে আল্লাহর কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত করেছে, অথচ) বান্দা আল্লাহ তাআলার মাফঊলাত তথা কৃতকাজের অন্তর্ভুক্ত, তাঁর আফআলাত বা কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়; যেগুলো তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর কৃতকাজ হলো তাঁর কার্যাবলির প্রভাব। আর তাঁর কার্যাবলি হলো তাঁর সেসব গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত, যা তাঁর সত্তার সাথে সংযুক্ত। সুতরাং আল্লাহর জাত তাঁর সিফাত ও কার্যাবলিকে আবশ্যক করে। আর তাঁর কৃতকাজ এর থেকে পৃথক। যা সৃষ্ট এবং ধ্বংসশীল। অপরদিকে আল্লাহ তাঁর জাত, সিফাত ও কার্যাবলিসহ চিরঞ্জীব স্রষ্টা।

সুতরাং আপনি এই সমস্ত পরিভাষাগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকবেন; যেগুলো পথভ্রষ্ট দার্শনিক ও ভ্রান্ত সূফিয়ায়ে কেরাম আবিষ্কার করেছে। কারণ এগুলোই সব সমস্যার মূল। আর এগুলোই হলো সিদ্দীক ও যিন্দীক চেনার উপায়।

আল্লাহ সম্পর্কে দুর্বল মা'রিফাত ও ইলমের অধিকারী ব্যক্তি যখন এই শব্দগুলো শুনবে : ইত্তিসাল, ইনফিসাল, মুসামারাহ, মুকালামাহ, আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনো অস্তিত্ব নেই; সমগ্র সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব কেবলই জল্পনা আর কল্পনা, এগুলো অন্যের-সাথে-থাকা-ছায়ার অস্তিত্বের মতো—তখন আপনি তার থেকে হুলূল, ইত্তিহাদ ও শাতাহাত সম্পর্কে এমন কিছু শুনবেন, যা আপনার

আর আল্লাহর সাথে বাস্তবিকভাবে মিলে যাওয়ার দাবি করা হলো : হুলূল ও ইত্তিহাদ। (অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার সাথে একীভূত হয়ে যাওয়া এবং তাতে প্রবিষ্ট হওয়া।)

প্রকৃত বিষয় হলো : আল্লাহর পথ থেকে নফস ও সৃষ্টিজগৎকে দূরে রাখা। কারণ এ দুটির সাথে অবস্থান করা মানে আল্লাহ-অভিমুখে পথচলা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। আর এ দুটিকে দূরে রাখাই হলো ইত্তিসাল বা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

যারা বলে, সমস্ত সত্তা ও অস্তিত্ব এক। তারা হলো ধর্মত্যাগী, দ্বীন থেকে খারিজ। কারণ তারা বলে বান্দা আল্লাহ তাআলার কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তাআলার কার্যাবলি তাঁর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁর গুণাবলি হলো তাঁর সত্তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ফলাফলস্বরূপ দাঁড়ায়, বান্দা হলো আল্লাহর সত্তার অন্তর্ভুক্ত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে।

তারা যে জায়গায় ভুল করেছে তা হলো : (তারা বান্দাকে আল্লাহর কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত করেছে, অথচ) বান্দা আল্লাহ তাআলার মাফঊলাত তথা কৃতকাজের অন্তর্ভুক্ত, তাঁর আফআলাত বা কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়; যেগুলো তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর কৃতকাজ হলো তাঁর কার্যাবলির প্রভাব। আর তাঁর কার্যাবলি হলো তাঁর সেসব গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত, যা তাঁর সত্তার সাথে সংযুক্ত। সুতরাং আল্লাহর জাত তাঁর সিফাত ও কার্যাবলিকে আবশ্যক করে। আর তাঁর কৃতকাজ এর থেকে পৃথক। যা সৃষ্ট এবং ধ্বংসশীল। অপরদিকে আল্লাহ তাঁর জাত, সিফাত ও কার্যাবলিসহ চিরঞ্জীব স্রষ্টা।

সুতরাং আপনি এই সমস্ত পরিভাষাগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকবেন; যেগুলো পথভ্রষ্ট দার্শনিক ও ভ্রান্ত সূফিয়ায়ে কেরাম আবিষ্কার করেছে। কারণ এগুলোই সব সমস্যার মূল। আর এগুলোই হলো সিদ্দীক ও যিন্দীক চেনার উপায়।

আল্লাহ সম্পর্কে দুর্বল মা'রিফাত ও ইলমের অধিকারী ব্যক্তি যখন এই শব্দগুলো শুনবে : ইত্তিসাল, ইনফিসাল, মুসামারাহ, মুকালামাহ, আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনো অস্তিত্ব নেই; সমগ্র সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব কেবলই জল্পনা আর কল্পনা, এগুলো অন্যের-সাথে-থাকা-ছায়ার অস্তিত্বের মতো—তখন আপনি তার থেকে হুলূল, ইত্তিহাদ ও শাতাহাত সম্পর্কে এমন কিছু শুনবেন, যা আপনার

কানকে ভারী করে তুলবে।

আল্লাহর পরিপূর্ণ মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই সব পরিভাষা ও শব্দকে সঠিক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছেন এবং বিশুদ্ধ অর্থেই তা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করার কারণে তাদেরকে গালমন্দ করে এবং তাদেরকে কুফর ও ইলহাদের দিকে সম্পৃক্ত করে। আর এ ক্ষেত্রে তাদের অস্পষ্ট বক্তব্যগুলোকে তির ও ঢাল হিসেবে গ্রহণ করে।

*****

২. প্রবন্ধ :

উপকরণ অবলম্বন করা শারীআতের দাবি

একদল সূফিয়ায়ে কেরাম আসবাব-উপকরণকে মিটিয়ে দেওয়া, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা এবং তা অবলম্বন না করার দিকে গিয়েছেন।

আমরা বলি : দ্বীন হলো উপকরণকে সাব্যস্ত করা, তা অবলম্বন করা এবং সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ারই নাম। এগুলো ব্যতীত কোনো দ্বীন নেই, যেমন এগুলো ব্যতীত কোনো বাস্তবতা নেই। বাস্তবতা ও শারীআতের ভিত্তি হলো উপকরণ সাব্যস্ত করার ওপর, এটি মিটিয়ে দেওয়ার ওপর নয়। আমরা উপকরণ অবলম্বন করাকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ উপকরণ অবলম্বন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ। কারও ইসলাম ও ঈমান এটি ব্যতীত পূর্ণতা পাবে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে উপকরণ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যদি উপকরণ পাই, তা হলে হুকুম সাব্যস্ত করব আর যদি না পাই, তা হলে হুকুম সাব্যস্ত করব না। আমরা এর দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টিসংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর দলীল পেশ করব। আসলে উপকরণ অবলম্বন করাই হলো হাকীকত (বাস্তবতা) ও শারীআতের দাবি।

এই পৃথিবীতে কোনো প্রাণীই কী আসবাব অবলম্বন করা ব্যতীত জীবনযাপন করতে সক্ষম? ফলে বৃষ্টি যেখানে পড়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেবে, উর্বর সবুজ মাঠ বাদ দিয়ে ঘাসহীন অনুর্বর ধু ধু প্রান্তরে বিচরণ করবে, নিরাপদ থাকার কোনো ব্যবস্থা নেবে না, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করবে না? কীভাবে তা সম্ভব!? অথচ বাতাস অবলম্বন করে সে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, তার নড়াচড়া করা, তার শোনা, তার দেখা, তার খাবারগ্রহণ, অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করা, তার পথচলা— সবকিছুর সাথেই উপকরণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৌভাগ্য ও সফলতা নির্ভর করে সঠিক পন্থায় উপকরণ ব্যবহার করার ওপর আর উপকরণ থেকে বিমুখ হওয়া,

এগুলোকে অর্থহীন মনে করার মধ্যেই রয়েছে পথভ্রষ্টতা ও দুর্ভাগ্য। সুতরাং উভয় জগতে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হলো সেই ব্যক্তি, যে সঠিক উপকরণ অবলম্বন করে; যা তাকে পৌঁছে দেয় দুনিয়া-আখিরাতের সমূহ কল্যাণ ও উপকারিতায়। আর উভয় জগতে সবচেয়ে দুর্ভাগা হলো সেই ব্যক্তি, যে উপকরণকে বেকার মনে করে এবং সেগুলোর প্রতি বিমুখ থাকে। আসলে উপকরণই হলো আদেশ-নিষেধ, পুরস্কার-শাস্তি ও সফলতা-ব্যর্থতার জায়গা। (এর মাধ্যমেই সেগুলো নির্ধারিত হয়।)

উপকরণের মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায় এবং আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করা হয়, নৈকট্যশীল ব্যক্তিরা এর মাধ্যমেই তাঁর নৈকট্য হাসিল করে, তাঁর আউলিয়ারা এর মাধ্যমেই জান্নাতে তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য অর্জন করে নেয়, এর মাধ্যমেই তিনি তাঁর দলকে ও দ্বীনকে সাহায্য করেন আর মুমিনরা এর মাধ্যমেই তাঁর দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত রাখেন, এর মাধ্যমেই তিনি রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শারীআত প্রণয়ন করেছেন আর এই উপকরণের মাধ্যমেই মানুষ বিভক্ত হয় সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান এবং পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট হিসেবে।

সুতরাং আসবাব বা উপকরণ অবলম্বন করা, তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা এবং তা অবলম্বন করা শারঈভাবে ওয়াজিব। যেমন তা তাকদীরিভাবে অবশ্য সংঘটিত। তবে আপনি ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যাদের বোধবুদ্ধির পর্দা মোটা হয়ে গেছে এবং যাদের তবিয়ত চেতনাহীন অসাড় হয়ে পড়েছে। ফলে তারা বলে, সৃষ্টি করা ও প্রভাব খাটানোর ক্ষেত্রে উপকরণ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেগুলো হলো আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন রব, (যা সব কাজ সমাধা করে।) আপনি যদি এমন কাউকে পেয়ে যান যে বিশ্বাস রাখে, উপকরণই সবকিছু করে, সেগুলোও রব, আল্লাহ সাথে সেগুলোও ইলাহ, যা সৃষ্টি করার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথবা তা আল্লাহর সাহায্যকারী, কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ সেগুলোর মুখাপেক্ষী, অথবা সেগুলো তাঁর শরীক—তা হলে আপনি তাকে পাকড়াও করবেন, তার চামড়া ছিন্নভিন্ন করে দেবেন, তার সাথে সাধ্যমতো শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবেন। কারণ তার এই দৃষ্টিভঙ্গি হলো—আল্লাহ যা সাব্যস্ত করেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করা; তিনি যা মূল্যায়ন করেছেন, তা অকেজো করে দেওয়া; তিনি যা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা বেকার মনে করা; তিনি যা দাঁড় করিয়েছেন, তা ভেঙে দেওয়া; তিনি যা লিখে রেখেছেন, তা মুছে দেওয়া এবং তিনি যা সংযুক্ত করেছেন,

তা বিচ্ছিন্ন করা। সুতরাং এখন যদি বলেন, আপনি উপকরণকে ইলাহিয়্যাতের মর্যাদা প্রদান করেন না, আবার তা থেকে বিচ্ছিন্নও থাকেন না, তা হলে আপনি সুন্নাতে নববির অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা সব ধরনের অংশীদারত্ব থেকে পবিত্র, তিনি ইলাহিয়্যাত ও রুবুবিয়্যাতের একচ্ছত্র মালিক।

হায়, দার্শনিক ও সূফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে কতই না মূর্খ ব্যক্তি রয়েছে! যাদের নিকট তাওহীদ সাব্যস্ত হয় কেবল উপকরণকে বেকার মনে করা এবং সেগুলোকে পুরোপুরিভাবে মিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এবং এই বিশ্বাসের মাধ্যমে যে, আল্লাহ সৃষ্টির মাঝে কোনো শক্তি রাখেননি, তবিয়তের মাঝে ও স্বভাব-প্রকৃতির মাঝেও রাখেননি যে, তা কোনো প্রভাব ফেলবে। এমনিভাবে আগুনের মধ্যে উষ্ণতা ও জ্বালানোর ক্ষমতা রাখেননি, ওষুধের মধ্যে রোগ দূর করার ক্ষমতা রাখেননি, রুটির মধ্যে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা রাখেননি, পানির মধ্যে তৃষ্ণা মিটানোর ক্ষমতা রাখেননি, চোখের মধ্যে দেখার ক্ষমতা রাখেননি, নাকের মধ্যে ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা রাখেননি, বিষের মধ্যে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখেননি, লোহার (ছুরির) মধ্যে কেটে ফেলার ক্ষমতা রাখেননি। আল্লাহ তাআলা কোনো বস্তুর দ্বারা কোনো বস্তু সংঘটিত করেন না এবং কোনোকিছুর জন্যই কোনোকিছু করেন না!

এটিই হলো তাদের তাওহীদের চূড়ান্ত স্তর, এর চারপাশে তারা ঘুরতে থাকে এবং তা সাব্যস্ত করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে।

আল্লাহর শপথ! তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর জ্ঞানীগণ হাসাহাসি করেন এবং তা দেখে শত্রুরা উল্লসিত হয়। তারা শত্রুদের জন্য নবি-রাসূলদের প্রতি খারাপ ধারণা করার পথ তৈরি করে দেয়, ইসলাম ও কুরআনের ওপর তারা সবচেয়ে বড়ো জুলুম করে। অথচ তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী, আমরা ইসলাম ও রাসূলদের শত্রুদের শক্তি চূর্ণ করার কাজে নিযুক্ত।' আল্লাহর কসম! তারা আসলে দ্বীনকেই ছিন্নভিন্ন করে কাজে নিয়োজিত এবং দ্বীনের ওপর বাতিলপন্থিদের বিজয়ী করার ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ কারণেই বলা হয়, 'মূর্খদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকো, কারণ সে তোমার উপকার করার ইচ্ছায় ক্ষতি করতে থাকবে।'

সুতরাং যেখানে আসবাব গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আসবাব গ্রহণ করুন, আর যেখানে তা থেকে পৃথক থাকার আদেশ করা হয়েছে, সেখানে

তা থেকে পৃথক থাকুন। যেমন ইবরাহীম খলীল ﷺ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তা থেকে পৃথক ছিলেন, যখন জিবরীল ﷺ তাঁর সামনে শক্তিশালী উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনার কি কোনো প্রয়োজন রয়েছে?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

আপনি উপকরণের সাথেই অবস্থান করুন, এর লাগাম যাঁর হাতে তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিন, আদেশপ্রাপ্ত বান্দার ন্যায় আপনি উপকরণের প্রতি মনোযোগী হোন, এর যথার্থ মূল্যায়ন করুন, এর থেকে অনুপস্থিত থাকবেন না, এর থেকে মুখও ফিরিয়ে নিবেন না; বরং এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন, এর মর্যাদা ও অবস্থান সেরকমই, যেরকম মর্যাদা ও অবস্থান দিয়ে আল্লাহ তা অবতীর্ণ করেছেন।

জেনে রাখবেন, উপকরণের কারণে উপকরণ দানকারী থেকে আপনার অনুপস্থিত থাকা আপনার দাসত্বের মধ্যে ঘাটতির আলামত। বরং পরিপূর্ণ অবস্থা হলো আপনি মা'বূদকেও প্রত্যক্ষ করবেন এবং আপনি তাঁর দাসত্ব যে ভালোভাবে পালন করছেন, তা-ও প্রত্যক্ষ করবেন। আপনি প্রত্যক্ষ করবেন যে, আপনার আমল করাটা কেবল তাঁরই তাওফীকে, আপনার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কারণে নয় এবং তাঁরই পক্ষ থেকে, আপনার পক্ষ থেকে নয়। আপনি যদি এ রকম না করেন, তা হলে দুটি বিচ্যুতি আপনার সামনে উপস্থিত হবে, যার একটি আপনাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, হয়তো আপনি উপকরণে নিমগ্ন হয়ে মূল উদ্দেশ্য থেকেই অনুপস্থিত থাকবেন, এমনটি হতে পারে আপনার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, গাফলত কিংবা মা'রিফাত ও ইলম কম থাকার কারণে। আর নয়তো উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন আপনি উপকরণ থেকেই অনুপস্থিত থাকবেন যে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাতই করবেন না।

পূর্ণাঙ্গ অবস্থা হলো : আল্লাহ তাআলা এই দুই বিচ্যুত অবস্থা থেকেই আপনাকে নিরাপদ রাখবেন, ফলে আপনি এমন বান্দা হবেন, যে তার দাসত্বের দিকেও দৃষ্টি দেয় আবার তার মা'বূদের দিকেও দৃষ্টি দেয়। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সাহায্য-লাভের উৎস, ভরসা করতে হবে কেবল তাঁরই ওপর, মহামহিম আল্লাহ ছাড়া না আছে কারও কোনো শক্তি, আর না আছে কোনো সামর্থ্য।

৩. প্রবন্ধ :

'নিশ্চিতভাবেই আমাকে তার কাছে পেতে'

'সহীহ মুসলিম'-এর একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন বলবেন,

> يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَّرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَّنِيْ عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ يَا ابْنَ آدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ

"'হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করোনি।'

সে বলবে : 'হে আমার রব, আমি কী করে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক?'

আল্লাহ বলবেন : 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? কিন্তু তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে নিশ্চিতভাবেই আমাকে তার কাছে পেতে?'

'হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি

আমাকে খেতে দাওনি।'

সে বলবে : 'হে আমার রব, আমি কী করে তোমাকে আহার করাতে পারি, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক?'

তিনি বলবেন : 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে আহার করাতে, তা হলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে?'

'হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।'

সে বলবে : 'হে আমার রব, আমি কী করে তোমাকে পান করাবো, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক?'

তিনি বলবেন : 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পান করাতে, তা হলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে।'"[৮৪৭]

হাদীসটির প্রতি লক্ষ করুন, খাবার ও পানীয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে'। আর অসুস্থের সেবা-শুশ্রূষা করার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'নিশ্চিতভাবেই তার নিকট আমাকে পেতে'। এটা বলেননি, 'অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে'। এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য যে, আল্লাহ তাআলা অসুস্থ ব্যক্তির খুব নিকটে অবস্থান করেন। কারণ অসুস্থতার সময় ব্যক্তি খুব বিনয়ী থাকে, একাগ্রতার সাথে আল্লাহকে ডাকে, হৃদয়-মন ভাঙা থাকে, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে; আর এগুলোই তার নিকট আল্লাহর উপস্থিতিকে আবশ্যক করে। অথচ আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের ওপর আরশে অধিষ্ঠিত এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে তিনি পৃথক; তবুও তিনি বান্দার কাছেই থাকেন!

*****

[৮৪৭] মুসলিম, ২৫৬৯।

৪. প্রবন্ধ :

যে পর্দাগুলো আল্লাহর ব্যাপারে অন্তরে আড়াল সৃষ্টি করে

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤

"কখনো না; বরং তারা যা করে, তা-ই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।"[৮৪৮]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ এবং আরও অনেকেই বলেছেন, 'গুনাহের পর গুনাহ করতে থাকলে তা অন্তরকে ঢেকে দেয়। অবশেষে অন্তরের ওপর তা মরিচার মতো হয়ে যায়।'[৮৪৯]

অন্তরে আড়াল সৃষ্টিকারী পর্দা দশটি :

১. আল্লাহকে নিষ্ক্রিয় মনে করা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলির হাকীকতকে অস্বীকার করার পর্দা : এটি সবচেয়ে মোটা পর্দা। যার ফলে এই রকম পর্দার অধিকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পরিচয় পাওয়া এবং তাঁর নিকট পৌঁছা কখনো সম্ভব হয় না। যেমন পাথরের জন্য ওপরে আরোহণ করা সম্ভব হয় না।

২. শির্কের পর্দা : এটি হলো অন্তর দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করা।

---

[৮৪৮] সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ : ১৪।

[৮৪৯] বাগাবি, তাফসীর, ৪/৪৬০; তাবারি, তাফসীর, ২৪/২০২।

৩. বিদআতি কথার পর্দা : যেমন : প্রবৃত্তিপূজারি এবং যারা নিজেদের মনমতো বাতিল কথাবার্তা বলে, তাদের পর্দা।

৪. বিদআতি আমলের পর্দা : যেমন : বিদআতপন্থিদের পর্দা; যারা তাদের পথ ও অভিমতে নতুন কিছু সৃষ্টি করে নেয়।

৫. গোপন-কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের পর্দা : যেমন : অহংকার, রিয়া, হিংসা, আত্মগর্ব, দাম্ভিকতা ইত্যাদিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের পর্দা।

৬. প্রকাশ্য-কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের পর্দা : এদের পর্দা গোপন-কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের পর্দার চেয়ে ক্ষতিকর ও তীক্ষ্ণ। কারণ যারা গোপনে গুনাহ করে তাদের গোপন-গুনাহ থাকলেও তারা ইবাদাত-বন্দেগি করে। সুতরাং তারা প্রকাশ্য-কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের তুলনায় তাওবার বেশি কাছাকাছি থাকে। কারণ প্রকাশ্য-কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মানুষের সামনে গুনাহে লিপ্ত হতে কোনো লজ্জা অনুভব করে না এবং ইবাদাত-বন্দেগিও তেমন করে না, ফলে তাদের অনুতপ্ত হওয়া বেশ কঠিন। তাদের অন্তর গোপনে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের চেয়ে নিকৃষ্ট।

৭. সগীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের পর্দা।

৮. বৈধ বিষয়ে বিলাসিতাকারীদের পর্দা।

৯. গাফিলদের পর্দা : যারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে গাফিল। তাদের ওপর আল্লাহর কী হক রয়েছে; যেমন : সবসময় তাঁর যিক্‌র করা, তাঁর শুকরিয়া আদায় করা, তাঁর ইবাদাত করা ইত্যাদি থেকে তারা উদাসীন ও অমনোযোগী।

১০. আল্লাহর পথে পরিশ্রমী ব্যক্তিগণ, যারা উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে পথ চলতে থাকে তাদের পর্দা।

আল্লাহ তাআলার মাঝে ও বান্দার অন্তরের মাঝে এই দশটি পর্দা রয়েছে; যার কারণে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা আসে। এই পর্দাগুলো সৃষ্টি হয় চারটি উপাদান থেকে : নফস, শয়তান, দুনিয়া ও অবৈধ কামনা। সুতরাং অন্তরে এই উপাদানগুলোর মূল উপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্তরের পর্দাগুলো দূর

করা সম্ভব নয়।

অন্তরে এই চারটি উপাদান প্রকট হওয়া না-হওয়ার ভিত্তিতে কথা, কাজ, ইচ্ছা ও পথ সবকিছুর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এগুলো কথা, কাজ ও ইচ্ছার পথকে অন্তর পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে। যদি তা কোনোভাবে অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে, তা হলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কথা ও কাজ এবং অন্তরের মাঝে একটি দূরত্ব রয়েছে। ফলে তা অন্তরে পৌঁছিয়ে দিতে বান্দাকে সফর করতে হয়। যাতে সেখানকার আশ্চর্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু এই পথের চোর-ডাকাত হলো সেই উপাদানগুলো। যদি কেউ সেগুলোর সাথে যুদ্ধ করে সফল হয় এবং আমলকে অন্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, তা হলে আমল তার আশেপাশে ঘুরতে থাকে এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ খোঁজে। কারণ তাঁর নিকট না পৌঁছানো ব্যতীত কিছুই স্থির হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

"তোমার পালনকর্তার কাছেই সবকিছুর সমাপ্তি।"[৮৫০]

যখন তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়, তখন তিনি এর কারণে আমলকারীর ঈমান, ইয়াকীন, ইলম, মা'রিফাত, বুদ্ধি-বিবেচনা আরও বাড়িয়ে দেন, তার ভেতর-বাহির সুন্দর করে দেন। এর কারণে নেক আমল ও উত্তম আখলাকের পথ দেখান, মন্দ আমল ও স্বভাব থেকে দূরে রাখেন। আল্লাহ তাআলা অন্তরের জন্য ইলমকে সৈন্য হিসেবে নিযুক্ত করেন; ফলে সে আমলসমূহ অন্তর পর্যন্ত পৌঁছার পথে পথদস্যুদের সাথে লড়াই করবে। **দুনিয়ার** সাথে লড়াই করবে যুহ্দ বা দুনিয়াবিরাগের মাধ্যমে এবং অন্তর থেকে দুনিয়াকে বের করে দেওয়ার মাধ্যমে। তবে দুনিয়ার প্রাচুর্যতা ব্যক্তির হাতে ও ঘরে থাকলে তা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তার আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করা থেকেও বিরত রাখে না। **শয়তানের** সাথে যুদ্ধ করবে প্রবৃত্তির আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার মাধ্যমে। কারণ শয়তান সবসময় কুপ্রবৃত্তির সাথে থাকে; এর থেকে সে কখনো পৃথক হয় না। এমনিভাবে **অবৈধ কামনা**র সাথে যুদ্ধ করবে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করার মাধ্যমে এবং সব ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধিনিষেধ অনুসরণ করার মাধ্যমে। অবশেষে ব্যক্তির করা না-

---

[৮৫০] সূরা নাজম, ৫৩ : ৪২।

করা কোনো কাজেই অবৈধ কামনার কোনো অংশ থাকে না। আর নফসের সাথে যুদ্ধ করবে ইখলাসের শক্তি দিয়ে।

এর সবগুলো তখনই হবে, যখন আমল অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট যাওয়ার পথ পাবে। আর যদি পথ না পেয়ে সেখানেই ঘুরতে থাকে, তা হলে নফস তার ওপর ঝাপিয়ে পড়বে, তাকে নিজের কবজায় নিয়ে নেবে এবং তাকে নিজের সৈন্য বানিয়ে ফেলবে। ফলে উলটো সে এর দ্বারা আক্রমণ করবে, আত্মগর্বে লিপ্ত হবে এবং বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করতে থাকবে। এক পর্যায়ে সে নিজেকে সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ, ইবাদাতকারী এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমী ও সাধক হিসেবে মনে করবে। অথচ সে তখন থাকে আল্লাহ থেকে সবচেয়ে দূরে। তার চেয়ে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী থাকে এবং তারা তার চেয়েও ইখলাস ও নাজাতের বেশি কাছাকাছি অবস্থান করে।

সুতরাং সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ করুন—যে অধিক সাজদাকারী, ইবাদাতকারী, দুনিয়াবিমুখ এবং যার কপালে রয়েছে সাজদার চিহ্ন, কীভাবে তার আমলের অহংকার তাকে নবি ﷺ-এর ওপর আপত্তি করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে! সে এর কারণে অন্যান্য মুসলমানদের তুচ্ছ মনে করেছে; এমনকি তাদের বিরুদ্ধে সে তরবারি নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের রক্তকে বৈধ মনে করেছে![৮৫১]

আর সেই মদ্যপায়ী মাতাল ব্যক্তির প্রতিও লক্ষ করুন, যাকে মাতাল অবস্থায় বহুবার নবি ﷺ-এর নিকট আনা হয়েছিল; অতঃপর এর কারণে তাকে হদ অর্থাৎ বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তার এই পরিমাণ ঈমান ও ইয়াকীনের শক্তি ছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, নম্রতা ও বিনয় এই পরিমাণ ছিল যে, নবি ﷺ তার ওপর অভিশাপ দিতে নিষেধ করেছেন![৮৫২]

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পরিণতির দিক দিয়ে ইবাদাত-বন্দেগির অহংকার ও বাড়াবাড়ির চেয়ে গুনাহের আধিক্য বিপদমুক্ত ও নিরাপদ।

*****

[৮৫১] এখানে যুল-খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন—বুখারি ৪৩৫১; মুসলিম, ১০৬৪।

[৮৫২] এখানে আবদুল্লাহ হিমার নামক এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৬৭৮০।

৫. প্রবন্ধ :
অন্তর বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ

অন্তর বিনষ্টকারী বস্তু হলো পাঁচটি :

১. মানুষের সাথে অধিক মেলামেশা করা,
২. অতিরিক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা করা,
৩. গাইরুল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখা,
৪. সবসময় পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়া এবং
৫.বেশি বেশি ঘুমানো।

জেনে রাখুন—নূর, হায়াত, শক্তি, আত্মিক সুস্থতা, দৃঢ়তা, চোখ ও কানের সুস্থতা, ব্যস্ততা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকা—এগুলোর মাধ্যমে অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দিকে ও আখিরাতের প্রতি ধাবিত হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত এই পাঁচটি বস্তু অন্তরের নূরকে নিভিয়ে দেয়, অন্তর্দৃষ্টিকে নিস্তেজ করে ফেলে, বান্দার কানকে ভারী করে তোলে; যদি একেবারে বধির করতে না পারে তবে প্রচণ্ড দুর্বল করে দেয়, অন্তরের সুস্থতায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং দৃঢ়তায় স্থবিরতা এনে দেয়। যে ব্যক্তি এগুলো অনুভব করতে পারে না, সে মৃত অন্তরের অধিকারী। কারণ মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করলে সে কোনো ব্যথা অনুভব করে না। ফলে পরিপূর্ণতা অর্জনের পথে এটি বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং যে উদ্দেশ্যে মানুষের সৃষ্টি, তাতে পৌঁছাতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে।

এই পাঁচটি বস্তু বান্দার অন্তরে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, কল্যাণ অর্জনের পথ রুদ্ধ করে, পথ চলতে বাধা দেয়, অন্তরে বিভিন্ন রকমের রোগ সৃষ্টি করে; যা থেকে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অন্তরের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।

অধিক মেলামেশার প্রভাব : অধিক মেলামেশার ফলে আদম সন্তানদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ধোঁয়ায় অন্তর ভরে ওঠে; এক পর্যায়ে এর প্রভাবে অন্তর কালো হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ততা, বিভক্তি, দুঃখ-কষ্ট, পেরেশানি ও দুর্বলতার সৃষ্টি করে। অধিক মেলামেশার কারণে এমন ভার বহন করতে হয়, যা বহন করার ক্ষমতা ব্যক্তির থাকে না; যেমন : অসৎ বন্ধুদের জন্য খরচ করা, নিজের উপকার-কল্যাণকে নষ্ট করে তাদের সময় দেওয়া, তাদের সান্নিধ্য আর তাদের বিষয়াদির মধ্যে ডুবে থাকার কারণে নিজের ভালোমন্দ থেকে অমনোযোগী থাকা, তাদের চাওয়া-পাওয়ার উপত্যকায় নিজের চিন্তাভাবনাকে বিসর্জন দেওয়া ইত্যাদি। সুতরাং (এগুলোর পরে) আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আখিরাতের জন্য তার আর কী অবশিষ্ট থাকে?!

এগুলোর পাশাপাশি মানুষের সাথে মেলামেশা আরও কত ধরনের যে বিপদ ও শাস্তি ডেকে আনে! আর কত নিয়ামাত থেকে দূরে রাখে! কত পরিশ্রম আর কাজ যে নামিয়ে আনে এবং কত কাজ যে পণ্ড করে দেয়! (তার কোনো হিসাব নেই।) মানুষের জন্য মানুষ ছাড়া আর কি কোনো বিপদ আছে? আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় তার অসৎ বন্ধুদের চেয়ে তার জন্য অধিক ক্ষতিকর আর কিছু কি ছিল?! তারা সবসময় তার সাথে লেগে ছিল; তারা তার মাঝে ও একটি কালিমার মাঝে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল; যে কালিমা তার জন্য চিরস্থায়ী সৌভাগ্য ও শান্তি বয়ে আনত।

দুনিয়ার জীবনে ভালোবাসা ও মহাব্বতের এই সম্পর্কগুলো, যেখানে একজন আরেকজনের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়; সেই সম্পর্কগুলোই কিয়ামাতের দিন শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে, মেলামেশাকারী ব্যক্তি অনুশোচনায় আফসোসে নিজের হাত কামড়াতে থাকবে। (হায়, যদি তাদের সাথে সম্পর্কে না জড়াতাম!) যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يَا وَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيْ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾
>
> "জালিমরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, 'হায় আফসোস, আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য! হায়, আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না

করতাম! আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে-ই আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। মানুষের জন্য শয়তান বড়োই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।”[৮৫৩]

মানুষের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে উপকারী একটি মূলনীতি হলো : সব ধরনের কল্যাণকর কাজে তাদের সাথে মিশবে। যেমন : জুমুআর সালাতে, জামাআতে, ঈদের সালাতে, হাজ্জে, ইলম শিখতে, জিহাদ করতে, উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইত্যাদি। আর অকল্যাণ ও মন্দ কাজের ক্ষেত্রে তাদের থেকে দূরে থাকবে। এমনিভাবে ফায়দাহীন বৈধ কাজেও মানুষজন থেকে পৃথক থাকবে। হ্যাঁ যদি মন্দ ও খারাপ কোনো বিষয়ে তাদের সাথে মেশার প্রয়োজন পড়ে এবং তাদের থেকে দূরে থাকা সম্ভব না হয়; তা হলে তাদের সাথে একমত হওয়া থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকবে এবং তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করবে। কারণ কারও যদি শক্তি ও সাহায্যকারী না থাকে, তা হলে অবশ্যই তারা তাকে কষ্ট দেবে। তবে এই কষ্টের পরেই তার জন্য রয়েছে ইজ্জত-সম্মান, মহাব্বত, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা; তা মানুষের নিকট থেকেও সে পাবে আবার সমস্ত মুমিন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেও পাবে। কিন্তু যদি তাদের সাথে একমত পোষণ করে, তা হলে এর পরে সে পাবে অপমান, লাঞ্ছনা, শাস্তি ও নিন্দা; মানুষের কাছ থেকেও এবং সমস্ত মুমিন এবং আল্লাহর কাছ থেকেও।

সুতরাং মানুষের দেওয়া কষ্ট ও পেরেশানিতে সবর করাই হলো কল্যাণকর। এর পরিণতি উত্তম ও প্রশংসিত। আর যদি বৈধ কিন্তু অতিরঞ্জিত কোনো বিষয়ে তাদের সাথে মিশতেই হয়, তা হলে যদি শক্তি-সামর্থ্য থাকে সেই মজলিসকে আল্লাহ তাআলার যিক্‌রের মজলিসে পরিণত করবে, এ ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসাহিত করবে এবং অন্তরকে দৃঢ় রাখবে। তখন শয়তানি ওয়াসওয়াসার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না; যেমন : এটা তো রিয়া (লোক-দেখানো আমল), মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কামানো, নিজের ইলম ও অবস্থান প্রকাশ করা ইত্যাদি। (এগুলোর প্রতি তোয়াক্কা না করে) শয়তানের সাথে লড়াই করবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর যথাসাধ্য মানুষজনকে কল্যাণের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করবে।

অতিরিক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রভাব : আশা-আকাঙ্ক্ষা এমন এক সমুদ্র, যার কোনো

---

[৮৫৩] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৭-২৯।

কূল-কিনারা নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তিরাই কেবল এই সমুদ্র পাড়ি জমায়। যেমন বলা হয়, 'অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা হলো সম্বলহীন দেউলিয়া মানুষদের মূলধন।' আর তাদের পাথেয় হলো শয়তানের প্রবঞ্চনা, অসম্ভব ও মিথ্যা কল্পনা। ফলে মিথ্যে আশা ও জল্পনা-কল্পনা তাদের নিয়ে খেলতে থাকে; যেমন কুকুর কোনো মৃতদেহ নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। আসলে এগুলো হলো প্রতিটি ছোটো, নীচ ও অপদস্থ নফসের পাথেয়। তাদের মধ্যে কোনো উচ্চ হিম্মত থাকে না, যার দ্বারা বাস্তবে কোনোকিছু অর্জন করবে। বরং তারা কেবল আশাই করতে থাকে; বাস্তব কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। অধিকাংশ মানুষই নিজের অবস্থা অনুসারে : শক্তি ও কর্তৃত্বের, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করার, ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যতা কামানোর অথবা উত্তম স্ত্রী ও সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে। আশা পোষণকারী ব্যক্তি যে বিষয়ের আশা পোষণ করে, তার একটা চিত্র মনের মধ্যে এঁকে নেয়; আর ভাবে সে তা অর্জন করে ফেলেছে এবং এ কারণে আনন্দও বোধ করে। এভাবেই চলতে থাকে; কিন্তু যখন জেগে ওঠে, তখন সে কেবল নিজের হাত আর মাদুরই দেখতে পায়।

আর উচ্চ মনোবল ও হিম্মতের অধিকারী ব্যক্তিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ইলম ও ঈমান অর্জন করার জন্যই তৃষ্ণার্ত থাকে, যে আমল আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে, তারা সে আমলের প্রতিই আগ্রহী থাকে। এই ব্যক্তির আশা হলো ঈমান, নূর ও হিকমত; আর ওই সব ব্যক্তির আশা হলো ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা।

নবি ﷺ কল্যাণ-প্রত্যাশীর প্রশংসা করেছেন। কিছু বিষয়ে কখনো কখনো তাদের প্রতিদান সরাসরি কাজ সম্পন্নকারীদের প্রতিদানের সমান বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন : কেউ বলল, 'যদি আমার সম্পদ থাকত, তা হলে আমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় আমল করতাম'; যে তার সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে এবং সম্পদের হকও আদায় করে। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নবি ﷺ বলেছেন,

فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ

"সাওয়াবের ক্ষেত্রে তারা দুজন সমান।"[৮৫৪]

[৮৫৪] বিস্তারিত দেখুন—তিরমিযি, ২৩২৫; ইবনু মাজাহ, ৪২২৮, সহীহ।

গাইরুল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাথে গভীর সম্পর্ক রাখার প্রভাব : এটি অন্তরের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এর চেয়ে অনিষ্টকর আর কিছু নেই। বান্দাকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে এটি মূল ভূমিকা পালন করে। এটি কল্যাণ ও সৌভাগ্য থেকেও ব্যক্তিকে বঞ্চিত রাখে। কারণ কেউ যখন (ইবাদাতের ক্ষেত্রে) আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কারও সাথে সম্পর্কে জড়ায়, তখন আল্লাহ তাকে সেই ব্যক্তির ওপরই ন্যস্ত করে দেন এবং তার মাধ্যমেই তাকে অপমানিত ও অপদস্থ করেন। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে সম্পর্ক রাখে, তা-ও সফল হয় না। সমস্ত আশা-উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝٧٤ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝٧٥

> "তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে; এই আশায় যে, তাদের সাহায্য করা হবে। অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করার সক্ষমতা রাখে না; বরং তারা হবে এদের (মতোই শাস্তিপ্রাপ্ত) এক বাহিনী, যাদের হাজির করা হবে।"[৮৫৫]

সুতরাং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারও সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। কেননা এর কারণে যে কল্যাণ, সৌভাগ্য ও সফলতা সে হারায়; তা অনেক বড়ো; যা সে অপরের সাথে সম্পর্ক করে পায় তার তুলনায়। আর তা তো ক্ষণিকের পাওয়া। অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। গাইরুল্লাহর সাথে সম্পর্ককারীর উপমা হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে তাপ কিংবা ঠান্ডা থেকে বাঁচতে মাকড়সার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়; যা সবচেয়ে দুর্বল ঘর!

***

পরিতৃপ্তির সাথে খাদ্যগ্রহণের প্রভাব : অন্তর বিনষ্টকারী খাদ্য দুই প্রকার :

এক. এমন খাবার, যার মূল উপাদানই অন্তরের বিনাস সাধন করে। যেমন হারাম বস্তুসমূহ। এটি আবার দুই প্রকার। এক প্রকার হলো : আল্লাহ তাআলার হকের

---

[৮৫৫] সূরা ইয়া-সীন, ৩৬ : ৭৪।

ক্ষেত্রে; যেমন : মৃতবস্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, সুচালো দাঁতবিশিষ্ট প্রাণী, ধারালো নখবিশিষ্ট পাখি ইত্যাদি খাওয়া।

আরেক প্রকার হলো : বান্দার হকের ক্ষেত্রে; যেমন : চুরি করা বস্তু, আত্মসাৎকৃত সম্পদ, ছিনতাই করা অর্থ, এমনিভাবে সেই অর্থকড়ি; যা কারও সম্মতি ব্যতীত গ্রহণ করা হয় হয়তো জোরজবরদস্তি করে অথবা লজ্জায় ফেলে দিয়ে।

দুই. এমন খাবার, যা পরিমাণ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে অন্তরের ক্ষতি করে; যেমন: হালাল বিষয়ে অপচয় করা, অতিরিক্ত পরিতৃপ্ত হওয়া। কেননা এগুলো ব্যক্তিকে ইবাদাতে ভারী করে তোলে। অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত রাখে। খাওয়া-দাওয়া করা আর এর ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতেই অধিকাংশ সময় চলে যায়। এর দ্বারা ব্যক্তির শাহওয়াত (প্রবৃত্তি) শক্তিশালী হয়। শয়তানের আসা-যাওয়ার পথ তৈরি করে দেয় এবং সেই পথকে প্রশস্ত বানায়। কেননা শয়তান মানুষের রক্তনালী ও রগে রগে বিচরণ করে। এই কারণে সাওম শয়তানের পথকে সংকীর্ণ রাখে এবং বন্ধ করে দেয়। আর পেট ভরে পরিতৃপ্তির সাথে খাবার গ্রহণ করা শয়তানের পথ প্রশস্ত করে। যে ব্যক্তি বেশি খায়, বেশি পান করে সে ঘুমায়ও বেশি; ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তও হয় বেশি। একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ: فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

"পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে, এমন কয়েক লোকমা খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আর তার চেয়ে বেশি যদি খেতেই হয়, তা হলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অবশিষ্ট রাখবে।"[৮৫৬]

***

[৮৫৬] তিরমিযি, ২৩৮০; ইবনু মাজাহ, ৩৩৪৯।

ক্ষেত্রে; যেমন : মৃতবস্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, সুচালো দাঁতবিশিষ্ট প্রাণী, ধারালো নখবিশিষ্ট পাখি ইত্যাদি খাওয়া।

আরেক প্রকার হলো : বান্দার হকের ক্ষেত্রে; যেমন : চুরি করা বস্তু, আত্মসাৎকৃত সম্পদ, ছিনতাই করা অর্থ, এমনিভাবে সেই অর্থকড়ি; যা কারও সন্তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হয় হয়তো জোরজবরদস্তি করে অথবা লজ্জায় ফেলে দিয়ে।

দুই. এমন খাবার, যা পরিমাণ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে অন্তরের ক্ষতি করে; যেমন: হালাল বিষয়ে অপচয় করা, অতিরিক্ত পরিতৃপ্ত হওয়া। কেননা এগুলো ব্যক্তিকে ইবাদাতে ভারী করে তোলে। অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত রাখে। খাওয়া-দাওয়া করা আর এর ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতেই অধিকাংশ সময় চলে যায়। এর দ্বারা ব্যক্তির শাহওয়াত (প্রবৃত্তি) শক্তিশালী হয়। শয়তানের আসা-যাওয়ার পথ তৈরি করে দেয় এবং সেই পথকে প্রশস্ত বানায়। কেননা শয়তান মানুষের রক্তনালী ও রগে রগে বিচরণ করে। এই কারণে সাওম শয়তানের পথকে সংকীর্ণ রাখে এবং বন্ধ করে দেয়। আর পেট ভরে পরিতৃপ্তির সাথে খাবার গ্রহণ করা শয়তানের পথ প্রশস্ত করে। যে ব্যক্তি বেশি খায়, বেশি পান করে সে ঘুমায়ও বেশি; ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তও হয় বেশি। একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ: فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

"পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে, এমন কয়েক লোকমা খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আর তার চেয়ে বেশি যদি খেতেই হয়, তা হলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অবশিষ্ট রাখবে।"[৮৫৬]

***

---

[৮৫৬] তিরমিযি, ২৩৮০; ইবনু মাজাহ, ৩৩৪৯।

বেশি বেশি ঘুমানোর প্রভাব : অধিক নিদ্রা অন্তরকে মেরে ফেলে, শরীরকে ভারী বানায়, সময় নষ্ট করে, অত্যধিক অমনোযোগিতা ও অলসতা সৃষ্টি করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুম সবসময়ই অপছন্দনীয় ও শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

সবচেয়ে উপকারী ঘুম হলো : যখন ঘুমের চাহিদা তীব্র হয়, তখন ঘুমানো। রাতের শেষ প্রহরে ঘুমানোর চেয়ে প্রথম প্রহরে ঘুমানো অধিক প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর। আর মধ্যরাতের ঘুম রাতের দুই প্রান্তের ঘুমের চেয়ে বেশি উপকারী। যখনই ঘুম দুই প্রান্তের নিকটবর্তী হয়, তখন উপকার কমতে থাকে এবং ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।। বিশেষ করে আসরের সময় ও দিনের শুরুর সময় (ফজরের পর) ঘুমানো বেশি ক্ষতিকর; তবে বিশেষ প্রয়োজনে রাত্রিজাগরণ করতে হলে ভিন্নকথা।

নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় ঘুমের মধ্যে অন্যতম হলো : ফজরের সালাত ও সূর্য উদিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো। কারণ এই সময়টা হলো বরকতময় ও গনীমতপূর্ণ সময়। সালিকীনদের নিকট এই সময়ে সফর করার আলাদা বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব রয়েছে। কেননা এটি হলো দিনের শুরু, দিনের চাবি এবং রিয্ক অবতীর্ণ হওয়ার সময়। এ সময় রিয্ক বণ্টন করা হয় এবং আসমান থেকে বরকত অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারাই দিন অস্তিত্বে আসে। এই সময়ের অবস্থা অনুসারেই পুরা দিনটা কেমন যাবে, তা নির্ধারিত হয়। সুতরাং এ সময় একান্ত অপারগতা ব্যতীত ঘুমানো অনুচিত।

মোটকথা ভারসাম্যপূর্ণ ও সবচেয়ে উপকারী ঘুম হলো রাতের প্রথম অর্ধেক এবং শেষের এক-ষষ্ঠাংশ সময় ঘুমানো।

*****

৬. প্রবন্ধ :
আখিরাত থেকে দূরে থাকার যত কারণ

যদি প্রশ্ন করেন : চিরসুখের জীবন, যার কোনো তুলনা নেই, সে জীবন অন্বেষণ করা থেকে নফসের দূরে থাকার কারণ কী? কীসে তাকে এর থেকে ভুলিয়ে রাখছে? আর এই ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি কেন তার এত আগ্রহ; যা কল্পনা আর স্বপ্নের মতো? উপলব্ধির ঘাটতি নাকি আখিরাতকে অস্বীকার করার কারণে? নাকি বুদ্ধি-বিবেচনা ক্ষতিগ্রস্ত, ফলে তা থেকে অন্ধ হয়ে আছে? নাকি যা অনুপস্থিত, ঈমানের মাধ্যমে জানা যায়, তার ওপর বর্তমানে যা চোখে দেখা যাচ্ছে তাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে?

উত্তর হলো : প্রশ্নোক্ত সবগুলোই এর কারণ।

আর এর **সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ** হলো ঈমানের দুর্বলতা। কেননা ঈমান হলো আমলের রূহ। ঈমানই ব্যক্তিকে আমলে উদ্‌বুদ্ধ করে, উত্তম ও নেককাজ করতে আদেশ দেয়, অশ্লীল ও অপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করে। ঈমানের শক্তি অনুসারেই ব্যক্তি আমলে অগ্রসর হয় এবং আদেশ-নিষেধ পালনে তৎপরতা দেখায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

"যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তা হলে এ কেমন ঈমান, যা তোমাদের এমন খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়?"[৮৫৭]

মূলকথা হলো : যখন ঈমানের শক্তি পূর্ণতা পায়, তখন আখিরাতের জীবনের প্রতি

---

[৮৫৭] সুরা বাকারা, ২ : ৯৩।

আগ্রহও শক্তিশালী হয় এবং তা অন্বেষণে ব্যক্তির তৎপরতাও বেড়ে যায়।

দুই নং কারণ : অন্তরে অমনোযোগিতা এসে ভিড় করা। কেননা অমনোযোগিতা হলো অন্তরের নিদ্রা। আর এ কারণেই আপনি অনেক মানুষকে এমন পাবেন, যারা বাহ্যিকভাবে জাগ্রত; কিন্তু প্রকৃতার্থে ঘুমন্ত। আপনি তাদেরকে দেখবেন তারা জাগ্রত; অথচ তারা ঘুমিয়ে রয়েছে। এর বিপরীত অবস্থা হলো তাদের, যাদের অন্তর জাগ্রত; কিন্তু তারা শারীরিকভাবে ঘুমন্ত। কেননা অন্তর যখন প্রাণবন্ত থাকে, তখন শরীর ঘুমিয়ে পড়লেও অন্তর ঘুমায় না। সবচেয়ে বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন অন্তরের অধিকারী ছিলেন আমাদের নবি ﷺ এবং সেই ব্যক্তি, যার অন্তরকে আল্লাহ নবিজির মহাব্বতে ও তাঁর রিসালাতের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে জাগ্রত করে দিয়েছেন।

আসলে সচেতনতা ও অসচেতনতা সৃষ্টি হয় অনুভূতি, বোধবুদ্ধি ও অন্তরে। অন্তরের জাগ্রত ও ঘুমন্ত ব্যক্তি হলো শারীরিকভাবে জাগ্রত ও ঘুমন্ত ব্যক্তি ন্যায়। বাহ্যিক জাগরণ যেমন দুই প্রকার; তেমনি অভ্যন্তরীণ জাগরণও দুই প্রকার।

বাহ্যিক জাগরণের প্রথম প্রকার : এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তার বাহ্যিক সমস্ত কাজকর্মকে যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়, গভীর মনোযোগ ও সচেতনতার সাথে সেগুলোতে সফলতা অর্জন করার চেষ্টা করে এবং তাতে উত্তম পন্থা অবলম্বন করে।

বাহ্যিক জাগরণের দ্বিতীয় প্রকার : নিজ সত্তা ও অন্তরের প্রতি মনোযোগী হয়। ফলে বান্দা তাতে পরিপূর্ণতা অর্জনের চেষ্টার মশগুল হয়। উত্তম-অনুত্তম ও ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করে নীচ গুণাবলির ওপর উত্তম গুণাবলিকে প্রাধান্য দেয়। দুটি বিষয়ের মধ্যে যেটা উত্তম, সেটাকে বেছে নেয়। দুটি মন্দের মধ্যে পরিণতিতে যেটা হালকা, সেটা গ্রহণ করে; এই আশঙ্কায় যে, শক্তিশালী ও বেশি মন্দ বিষয়টি যেন তার অংশে চলে না আসে। সে সব ধরনের সুন্দর আচার-আচরণে নিজেকে সুসজ্জিত করে; ফলে তার বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর হয়ে যায়। আর তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার চেয়েও পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা উত্তম স্বভাব-চরিত্র অর্জনে সেভাবেই তৎপর হয়ে ওঠে, যেভাবে সম্পদ লোভীরা দীনার-দিরহামের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এই ধরনের জাগরণ ও সচেতনতার মাধ্যমে

ব্যক্তি অন্য দুইটি বিষয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে।

এক. এর মাধ্যমে সে চিরস্থায়ী সুখের জীবন অর্জনে উদ্যমী হয়ে ওঠে; যে জীবনের কোনো তুলনা হয় না। দুনিয়ার এই জীবন তো ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী; যার কোনো মূল্যই নেই।

এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন : ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসশীল এ জীবনে অবস্থান করে কীভাবে আমি অনন্তকালীন জীবনের সুখ-শান্তি অর্জন করব? কীভাবে এটি হতে পারে? আমি বুঝতে পারছি না! আমার জন্য বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

এর উত্তরে আমি বলব : এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে অন্তর ঘুমন্ত বলে; বরং বলা যায় এটি হলো অন্তরের মৃত্যুর ফল। ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ায় অবস্থান করা ছাড়া আর কোথা থেকে আখিরাতের অনন্তজীবন লাভ করা যায়? যেমন আপনি আপনার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন নিভু নিভু কোনো একটি প্রদীপ থেকে; যা প্রায় নিভে যাওয়ার উপক্রম। এর ফলে আপনার প্রদীপটি জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে, তার আলোয় আশপাশ আলোকিত হয়, আর প্রথম প্রদীপটি নিভে যায়। দুনিয়ার জীবনে অবস্থান করে আখিরাতের জীবনকে আবাদকারী ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান থেকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে স্থানান্তরিত হয়। এই দুই বাসস্থানের একটি থেকে অপরটিতে যাওয়ার মাধ্যম ও সেতু হলো মৃত্যু; যা পাড়ি দেওয়া ব্যতীত কেউই আখিরাতে যেতে পারে না। মৃত্যু হলো আখিরাতে প্রবেশের একমাত্র দরজা। দুনিয়া ও আখিরাত দুইটি জীবন; মাঝে রয়েছে কেবল মৃত্যু। যেরকমভাবে আখিরাতের জীবনের আলো দুনিয়ার এই জীবনেই অর্জন করতে হয়; তেমনিভাবে দুনিয়ার জীবনেই আখিরাতের জীবন অর্জন করে নিতে হয়। সুতরাং দুনিয়ার এই জীবনে ঈমানের আলো যেমন হবে, আখিরাতের জীবনে ব্যক্তি তেমন আলোই লাভ করবে। আবার দুনিয়ার এই জীবন যতটুকু ঈমানি জিন্দেগি হবে, আখিরাতের জীবনেও ততটুকু সুখ-শান্তি লাভ করবে।

দুনিয়ার জীবনের এই আলো ও ঈমানি অবস্থা কবরজীবনে হারিয়ে যাবে না; বরং ব্যক্তির জন্য তা আলো হয়ে থাকবে। এমনিভাবে কিয়ামাতের ময়দানে, পুলসিরাতে সব জায়গায় তা ঈমানদারদের সঙ্গ দেবে; যতক্ষণ-না তারা আখিরাতের স্থায়ী ঠিকানায় পৌঁছে যায়। সূর্যের আলো নিভে যাবে; কিন্তু এই আলো কখনো নিভে

যাবে না। দুনিয়ার এ জীবন শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু সে জীবন কখনো ফুরাবে না। **এটি হলো অভ্যন্তরীণ জাগরণের প্রথম প্রকার।**

অভ্যন্তরীণ জাগরণের দ্বিতীয় প্রকার : এই জাগরণ এমন জীবনের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কল্পনাও সে পর্যন্ত বিচরণ করতে অক্ষম। শব্দের মাধ্যমে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। সেই জীবনের উপমা হলো প্রিয় মানুষের সাথে ব্যক্তির জীবন; যাকে ব্যতীত তার অন্তর, রূহ ও জীবনের কোনো মূল্য নেই, এক পলকও যার থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা যায় না, যাকে ছাড়া চোখের শীতলতা, অন্তরের নিশ্চিন্ততা আর রূহের স্থিরতা নেই। সে তার প্রতি নিজের কান, চোখ, খাবার; এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি মুখাপেক্ষী। সে ব্যতীত তার জীবন দুঃখকষ্ট ও আযাবময়। তার নৈকট্য, ভালোবাসা ও সঙ্গ পাওয়ার মাঝেই তার জীবন সীমাবদ্ধ। সে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার শাস্তি, অন্যান্য শাস্তি থেকে বেশি যন্ত্রণাদায়ক। যেমন আখিরাতে আল্লাহকে দেখার প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেলে অন্তর যে আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করবে, তা খাওয়া-পান করা এবং হূরদের সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর তৃপ্তি থেকে বহুগুণ বেশি হবে। এমনিভাবে আল্লাহকে না দেখে আড়ালে থাকার শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তির চেয়ে তীব্র। এই কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর আউলিয়াদের জন্য এই দুই প্রকার নিয়ামাতের কথাই উল্লেখ করেছেন—

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

> "যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে 'হুসনা' এবং আরও বেশি।"[৮৫৮]

এখানে 'হুসনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : জান্নাত এবং 'আরও বেশি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : জান্নাতে আদনে আল্লাহ তাআলার দর্শন। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর শত্রুদের ব্যাপারে এই দুই প্রকার আযাবের কথাই উল্লেখ করেছেন—

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ ۝١٦

> "কখনো নয়, নিশ্চিতভাবেই সেদিন তাদেরকে তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৮৫৯]

---

[৮৫৮] সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬।

[৮৫৯] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১৫-১৬।

মোটকথা অমনোযোগিতার কারণে আখিরাতের জীবন অন্বেষণ করা থেকে অন্তর ঘুমিয়ে থাকে। আর এটিই হলো অন্তরের পর্দা।

যদি এই অমনোযোগিতার পর্দাকে আল্লাহ তাআলার যিক্‌রের মাধ্যমে দূর করা হয়, (তা হলে তো ভালো); অন্যথায় তা আরও ঘনীভূত হবে। একসময়ে তা অলসতা, খেলাধুলা ও অনর্থক বিষয়াদিতে মশগুল হওয়ার পর্দায় পরিণত হবে।

যদি দ্রুত এই পর্দা দূর করার প্রতি মনোযোগী হয়, (তা হলে তো ভালো); অন্যথায় আরও ঘনীভূত হয়ে একসময় তা অবাধ্যতা ও সগীরা গুনাহের পর্দায় পরিণত হবে; যা ব্যক্তিকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

যদি দ্রুত এই পর্দা দূর করার প্রতি মনোযোগী হয়, (তা হলে তো ভালো); অন্যথায় আরও ঘনীভূত হয়ে একপর্যায়ে তা কবীরা গুনাহের পর্দায় পরিণত হবে; যা আল্লাহর ক্রোধ, গজব ও লা'নতকে আবশ্যক করবে।

যদি দ্রুত এই পর্দা দূর করার প্রতি মনোযোগী হয়, (তা হলে তো ভালো); অন্যথায় আরও ঘনীভূত হয়ে একসময়ে তা আমলি বিদআতের পর্দায় পরিণত হবে। যার দ্বারা ব্যক্তি নিজেই নিজেকে শাস্তি দেবে এবং আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু কোনো ধরনের কল্যাণ ও উপকারিতার দেখা পাবে না।

যদি দ্রুত এই পর্দা অপসারণ করার প্রতি মনোযোগী হয়, (তা হলে তো ভালো); অন্যথায় তা আরও ঘনীভূত হয়ে একসময়ে কওলি বিদআতের পর্দায় পরিণত হবে; যা আকীদা-বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা এবং রাসূল ﷺ যে সত্য নিয়ে এসেছেন, তা মিথ্যা সাব্যস্ত করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

যদি দ্রুত এই পর্দা দূর করার প্রতি মনোযোগী হয়, (তা হলে তো ভালো); অন্যথায় তা আরও ঘনীভূত হয়ে একসময়ে সংশয় ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পর্দায় পরিণত হবে; যা ইসলামের পাঁচটি ভিত্তিতেই সংশয় সৃষ্টি করবে। **ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি হলো :**

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান,

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান,

৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান,

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান এবং

৫. আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান।

ওই ব্যক্তির অন্তরে যে পর্দা পড়েছে তা মোটা, ঘন, কালো ও অন্ধকার হওয়ার দরুন সে ঈমানের মর্ম বুঝতে পারে না। শয়তান তার মাঝে জায়গা করে নেয়, তাকে প্রতিশ্রুতি দান করে আর আশার ধোঁকায় ফেলে রাখে। তার নফসে আম্মারা তাকে মন্দ ও অশ্লীল কাজকর্মে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। প্রবৃত্তির শক্তি ঈমানের শক্তির ওপর বিজয় লাভ করে। যদি তা ধ্বংস করতে না পারে, তবে তাকে বন্দি করে ও আটকে রাখে। ফলে প্রবৃত্তির শক্তিই পুরা দেহরাজ্য পরিচালনা করে এবং চাহিদার সৈন্যসামন্তকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নেয়। নেক আমল করার স্পৃহা নষ্ট করে দেয়। সচেতনতা ও জাগ্রত হওয়ার দরজা বন্ধ করে দেয়। অন্তরে গাফলত ও অমনোযোগিতার প্রহরী নিযুক্ত করে এবং বলে, 'সাবধান! তোমার দিক থেকে যেন নেক আমলের কোনো আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রবেশ করতে না পারে।' প্রবত্তির সৈন্যদের থেকে একজনকে দারোয়ান বানিয়ে দিয়ে তাকে বলে, 'তোমার কাছ থেকে যেন কেউ ভেতরে প্রবেশ করে আমার নিকট আসতে না পারে। হ্যাঁ কেউ এলে তুমি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমাদের এই রাজত্বের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার ও প্রহরীর নিকট ন্যস্ত রইল। সুতরাং হে গাফলতের প্রহরী, হে প্রবৃত্তির দারোয়ান, তোমরা নিজের সীমানা খুব ভালো করে আগলে রাখবে, যদি হেরফের হয়, তা হলে আমাদের রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে, শাসনক্ষমতা আবার আমাদের ভিন্ন অন্য কারও নিকট চলে যাবে, ঈমানের শক্তি আমাদের পরাজিত করে ফেলবে; তা কত-না নিকৃষ্ট অপমান ও অপদস্থতা! আমরা আর কোনোদিন এই শহরে (দেহের ভেতরে) আনন্দ-উল্লাস করতে পারব না!

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! যদি এই সৈন্যবাহিনী অন্তরে জমা হয়; আর সাথে থাকে ঈমানের দুর্বলতা, রসদের স্বল্পতা, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা, দুনিয়াদারদের পদাঙ্ক অনুসরণ এবং দীর্ঘ আশা, যা মানুষকে শেষ করে দেয়—তা হলে উপস্থিত, বর্তমান দুনিয়া প্রাধান্য পেয়ে যাবে অনুপস্থিত আখিরাতের ওপর, যা এই পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পরে সামনে আসবে। আল্লাহ তাআলাই সাহায্য-লাভের একমাত্র উৎস। ভরসা করতে হবে কেবল তারই ওপর।

৭. প্রবন্ধ :
বিভিন্ন আমলের ফলাফল ও উপকারিতা

ভয়ের ফল—তাকওয়া, দৃঢ়তা ও ছোটো আশা।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখার ফল—যুহ্‌দ বা দুনিয়াবিমুখতা।

মা'রিফাতের ফল—মহাব্বত, ভয় ও আশা।

অল্পেতুষ্টির ফল—সন্তুষ্টি।

যিক্‌র বা আল্লাহর স্মরণের ফল—অন্তরের প্রাণবন্ত জীবন।

তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের ফল—তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা।

আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলিতে অবিরাম চিন্তাভাবনার ফল—মা'রিফাত বা আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান।

আল্লাহ্‌ভীতির ফল—দুনিয়াবিমুখতা।

তাওবার ফল—মহাব্বত বা ভালোবাসা।

সবসময় যিক্‌র করার দ্বারাও মহাব্বত সৃষ্টি হয়।

সন্তুষ্টির ফল—শোকর।

সংকল্পের দৃঢ়তা ও ধৈর্যের ফল—সব ধরনের হাল (বিশেষ অবস্থা) ও মাকাম।

ইখলাস ও সত্যবাদিতা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। একটি অপরটির ফল এবং একটি অপরটিকে দাবি করে।

মা'রিফাত বা আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞানের ফল—উত্তম আখলাক।

চিন্তা-ফিকিরের ফল—সংকল্পের দৃঢ়তা।

মুরাকাবা বা ধ্যান করার ফল—সময়ের সদ্ব্যবহার ও এর হেফাজত এবং লজ্জা, ভয় ও আল্লাহমুখিতা।

নফসকে মেরে ফেলা এবং অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার দ্বারা অন্তরের প্রকৃত জীবন, সম্মান ও ইজ্জত লাভ হয়।

নিজের নফস ও নফসের চাহিদা এবং নিজের আমলের কমতি ও পাপাচারের আধিক্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাশীলতাকে আবশ্যক করে।

সঠিক অন্তর্দৃষ্টির ফল—ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস।

যেসব নিদর্শন মানুষ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে এবং শ্রবণ করে তাতে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার ফল—সঠিক অন্তর্দৃষ্টি।

এই সবগুলোর মূল হলো দুইটি বিষয় :

১. আপনি আপনার অন্তরকে দুনিয়ার আবাস থেকে স্থানান্তরিত করে আখিরাতের আবাসে বসবাস করাবেন। (প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার আগ্রহ, উদ্দীপনা থাকবে আখিরাতমুখী।)

২. এবং পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে কুরআনের শব্দ, অর্থ, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, নাযিল হওয়ার কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। প্রতিটি আয়াত থেকে নিজের করণীয় ও বর্জনীয় কী, তা গ্রহণ করবেন এবং নিজের অন্তরের রোগ নিরাময়ে সেগুলোকে প্রয়োগ করবেন।

(বইয়ের শুরু থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যা আলোচনা) এই হলো সুমহান বন্ধু (আল্লাহ) পর্যন্ত পৌঁছার সংক্ষিপ্ত, সহজ ও নিকটতম পথ। এটি এমন নিরাপদ পথ, যে পথে চলতে পথিকের কোনো ভয় নেই, কোনো ক্ষয় নেই, কোনো ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। আর এ পথে কোনো বিপদাপদও নেই। এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রহরী ও নিরাপত্তারক্ষী নিযুক্ত থাকে, যারা পথিকদের সুরক্ষা দেয় এবং পথের

বিপদাপদ থেকে বাঁচায়। এই পথের মর্যাদা কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারবে, যারা মানুষের তৈরি পথসমূহ এবং সে পথের বিপদাপদ, প্রতিবন্ধকতা ও চোর-ডাকাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। আল্লাহ তাআলাই সাহায্য-লাভের একমাত্র উৎস।

*****

উপসংহার

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

> "তারা যা বর্ণনা করে থাকে, তা থেকে আপনার রব পবিত্র, তিনি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। নবি-রাসূলগণের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"[৮৬০]

এই আয়াতের মাধ্যমেই আমরা আমাদের বইয়ের সমাপ্তি টানছি। আল্লাহ তাআলা যেরকম প্রশংসা ও স্তুতি লাভের যোগ্য এবং তিনি নিজেই যেমন নিজের প্রশংসা করেছেন, আমরা তাঁর জন্য সেরকম প্রশংসাই করছি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, উত্তম ও বরকতময় প্রশংসা; যেমন তিনি পছন্দ করেন এবং যে প্রশংসায় তিনি সন্তুষ্ট। তাঁর মহত্ত্ব ও বড়োত্বের উপযোগী প্রশংসা; আর এটিই যথেষ্ট কিংবা শেষ নয়। হে আমাদের রব, আমরা এর থেকে অমুখাপেক্ষীও নই।

আমরা আল্লাহর নিকট তাঁর দেওয়া নিয়ামাতের শোকরিয়া আদায় করার সামর্থ্য কামনা করছি, তাঁর হকসমূহ পালন করার তাওফীক চাচ্ছি, তিনি যেন আমাদেরকে সুন্দরভাবে তাঁর ইবাদাত, যিক্‌র ও শোকর আদায় করতে সাহায্য করেন সেই প্রার্থনা করছি, আরও প্রার্থনা করছি তিনি যেন এই রচনার কাজসহ আমাদের সমস্ত কাজকর্মকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই বানিয়ে দেন এবং সেগুলোকে তাঁর বান্দাদের জন্য নসীহত হিসেবে কবুল করেন।

---

[৮৬০] সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৮০-১৮২।

প্রিয় পাঠক, এই বইয়ের উপকারিতাগুলো আপনার জন্য আর এর যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির ভার লেখকের ওপর। এর সুমিষ্ট ফলগুলো আপনার জন্য আর এর পরিণামফল লেখকের দায়িত্বে। সুতরাং আপনি এখানে যা কিছু সঠিক ও হক হিসেবে পাবেন, তা গ্রহণ করুন। এর কথকের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং যা বলা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন, কে বলেছে তার প্রতি নয়। আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে মন্দ বলেছেন, যে শত্রু বলেছে বলে হককে প্রত্যাখ্যান করে, আর পছন্দের কেউ বলেছে বলে তা গ্রহণ করে। কোনো একজন সাহাবি ﷺ বলেছেন, 'সত্য যে-ই বলুক, তা গ্রহণ কোরো; যদিও সে তোমার শত্রু হয়। আর বাতিলকে প্রত্যাখ্যান কোরো; যদিও এর কথক হয় তোমার বন্ধু।'[৮৬১] আর আপনি এই বইয়ে যা কিছু ভুলত্রুটি পাবেন, জেনে রাখবেন—বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে ও বিশুদ্ধ রাখতে লেখকের চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। আসলে মানুষ দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, পরিপূর্ণতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। যেমন কবি বলেন :

وَالنَّقْصُ فِيْ أَصْلِ الطَّبِيْعَةِ كَامِنٌ *** فَبَنُو الطَّبِيْعَةِ نَقْصُهُمْ لَا يُجْحَدُ

দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা প্রোথিত আছে মানুষের স্বভাবের মূলেই,
স্বভাবের সন্তানদের ঘাটতি তাই অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই।

আর কীভাবেই-বা সেই ব্যক্তি নিজেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ঘোষণা করবে, যাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে অজ্ঞ ও অত্যাচারী করে? তবে যার ভুলত্রুটিগুলো তার শুদ্ধ ও সঠিক বিষয়গুলোর তুলনায় কম, তার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

এই বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে যারা কথা বলে, তাদের জন্য জরুরি হলো : তাদের কথার মূল ভিত্তি হবে হক ও সত্য বিষয় এবং তাদের উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তাদের মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি নাসীহা বা কল্যাণকামিতা। আর যদি তারা সত্যকে প্রবৃত্তি ও খাহেশাতের অনুসারী বানায়, তা হলে মানুষের অন্তর, আমল, অবস্থা ও চলার পথ নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

[৮৬১] উবাই ইবনু কা'ব। দেখুন—আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৯/১২১।

"আর সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুগত হতো, তা হলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা রয়েছে সবাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।"[৮৬২]

নবি ﷺ বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না তার প্রবৃত্তি ও খাহেশাত আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার অনুগত হয়।"[৮৬৩]

ইলম ও আদ্‌ল বা ন্যায়পরায়ণতা হলো সমস্ত কল্যাণের মূল। আর জুলুম ও জাহ্‌ল বা মূর্খতা হলো সমস্ত অকল্যাণের মূল। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁকে সবার মাঝে ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা করার হুকুম দিয়েছেন এবং কারও খেয়াল-খুশির অনুসরণ না করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

"সুতরাং আপনি সে বিষয়ের দিকেই আহ্বান করুন এবং আপনাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে তার ওপর অবিচল থাকুন আর তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আপনি বলুন, 'আমি ঈমান এনেছি (প্রত্যেক) সেই কিতাবের প্রতি, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহ আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে কোনো বিবাদ-বিসংবাদ নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং তাঁর

---

[৮৬২] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৭১।

[৮৬৩] নববি, আল-আরবাঈন, ৪১।

কাছেই ফিরে যেতে হবে।”[৮৬৪]

প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের অধিপতি। আর সালাত, সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক সর্বশেষ রাসূল, মুহাম্মাদ-এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন সবার ওপর।

*****

[৮৬৪] সূরা শূরা, ৪২ : ১৫।

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশনাসমূহ

	বই	লেখক
০১	রাসূলের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀
০২	সাহাবিদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀
০৩	তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀
০৪	সীরাতুন নবি ﷺ -১	শাইখ ইবরাহীম আলি ﵀
০৫	সীরাতুন নবি ﷺ -২	শাইখ ইবরাহীম আলি ﵀
০৬	সীরাতুন নবি ﷺ -৩	শাইখ ইবরাহীম আলি ﵀
০৭	সীরাতুন নবি ﷺ -৪	শাইখ ইবরাহীম আলি ﵀
০৮	মৃত্যু থেকে কিয়ামাত	ইমাম বাইহাকি ﵀
০৯	আত্মশুদ্ধি	আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী ﵀
১০	আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল	ইমাম ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া ﵀
১১	জীবিকার খোঁজে	ইমাম মুহাম্মাদ ﵀
১২	বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া	শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহতানি ﵀
১৩	মুমিনের পাথেয়	ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀

১৪	সুন্দর সম্পর্ক : বিনিময়ে জান্নাত	ইমাম ইবনুল জাওযি ﷺ
১৫	ঘর সাজান দুআ দিয়ে	টিম বায়ান
১৬	সবার ওপরে ঈমান	শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী
১৭	মাদারিজুস সালিকীন	ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশিতব্য বইসমূহ

	বই	লেখক
০১	কুরআন মাজীদ মূলপাঠ, সরল অনুবাদ ও পার্শ্বটীকা	সরল অনুবাদ ও পার্শ্বটীকা সংযোজন শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী
০২	হাদীসের পরিচয়	ইমাম নববি ﷺ
০৩	দুআ	সাঈদ ইবনু আলি কাহ্তানি ﷺ
০৪	যিকর [হিসনুল মুসলিম]	সাঈদ ইবনু আলি কাহ্তানি ﷺ
০৫	রুক্‌ইয়া	সাঈদ ইবনু আলি কাহ্তানি ﷺ
০৬	সময়কে কাজে লাগান	ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি ﷺ
০৭	ইসলাম ও জ্ঞান	ইবনু আব্‌দিল বার্ ﷺ
০৮	ইসলাম ও কলম	খতীব বাগদাদি ﷺ
০৯	জাহান্নামের ভয়াবহতা	ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি ﷺ
১০	তাফসীর ইবনু কাসীর	আল্লামা ইবনু কাসীর

প্রায় ছয়শত বছর পূর্বে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আত্মশুদ্ধি-বিষয়ে পৃথিবীর সেরা একটি কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম **মাদারিজুস সালিকীন**। যে বইটির আলোকে লেখা হয়েছে হাজার হাজার বই! এটি আত্মশুদ্ধি-বিষয়ে রেফারেন্স-বুক হিসেবে সমাদৃত। অসংখ্য বইয়ে এর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ পরিশ্রমের পর আমরাও বিখ্যাত এই বইটির অনুবাদ নিয়ে এসেছি। বইটি যত বেশি পড়া হবে, পাঠক তত বেশি উপকৃত হবে এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ পাবে।

ভালো মানুষ হওয়ার জন্য সবার আগে প্রয়োজন আত্মার সংশোধন। আত্মার সংশোধন ছাড়া দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। যার অন্তর সংশোধন হয়ে যায়, সে-ই প্রকৃত সফল। কিন্তু আত্মশুদ্ধির পথে রয়েছে নানান তরীকা। সঠিক তরীকা খুঁজে না পাওয়ার ফলে মানুষ অন্তরকে জীবন্ত করার বদলে মেরে ফেলে। কোন তরীকাটি সঠিক তা খুঁজে বের করা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। এই কঠিন কাজটি সহজ করে দিয়েছেন অষ্টম শতাব্দীর মহান ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)। যিনি ছিলেন আত্মার অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

লেখক বইটিতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আত্মশুদ্ধির সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আত্মশুদ্ধি অর্জন করার জন্য সূরা ফাতিহার আলোকে তিনি অর্ধশত মানযিলের বর্ণনা দিয়েছেন। এ রকম কিছু মানযিল হলো—তাওবা, আল্লাহভীতি, গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া, আল্লাহর ওপর ভরসা করা, সবর, শোকর, উত্তম চরিত্র, আল্লাহর স্মরণ, গাইরাত ও গুরাবা ইত্যাদি। আত্মশুদ্ধির পথে এই বইয়ের প্রতিটি মানযিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বইয়ে রয়েছে এক মানযিল থেকে আরেক মানযিলে সফর করার দিকনির্দেশনা। যে নির্দেশনায় বান্দা একের-পর-এক মানযিল পাড়ি দিয়ে হয়ে ওঠে আল্লাহওয়ালা।